বাংলা

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা

বহুমাত্রিক চেতনায়

মেদিনীপুর সিটি কলেজ ও দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
সপ্তম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ

২

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল ● দীপঙ্কর মল্লিক
রাকেশ জানা ● অভি কোলে

দিয়া পাবলিকেশন
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay

Vol. II

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Rakesh Jana ● Abhi Kole

Published by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com ‖ diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

Collaboration with

Midnapore city college
Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Pachim Medinipur
&
The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

ISBN : 978-93-87003-46-0

প্রথম প্রকাশ : ২.০৬.২০২৩

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৫৫৫/-

সূ | চি | প | ত্র

উপন্যাস নিয়ে ১-১৭২

ফকিরমোহন সেনাপতি-র 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' : একটি সামাজিক সমীক্ষা
শ্রীতা মুখার্জী
১

'গোরা' উপন্যাসের ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ
রমেশ সরেন
৭

রবীন্দ্র উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' : অন্তঃবাস্তবতা উন্মোচনে ভাষার নিপুণ প্রয়োগ
অভি কোলে
১৩

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মৃত্যুভাবনা
শুভাশিস দাস
২১

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাস : সংরূপ সন্ধানে
নম্রতা বিশ্বাস
২৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' : সমকালীন সমাজভাবনা
মনিকা মহাপাত্র
৩৪

ডাক্তার বনফুলের নির্বাচিত উপন্যাসে ডাক্তারি জীবিকার সংকট
রাকেশ জানা
৩৮

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এ নিম্নবর্গের সমাজ-চেতনার পর্যালোচনা
প্রেমাঙ্কুর মিশ্র
৪৬

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বনাম পুরুষতান্ত্রিকতা : প্রেক্ষিত ‘সুবর্ণলতা’
অস্মিতা মিত্র
৫৩

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ : আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে
রিয়ালী বসু
৫৮

বিমল করের ‘যদুবংশ’ : ষাটের দশকের অস্থির সময়ের আলোকে
সুতনু দাস
৬২

‘লালসালু’ : প্রসঙ্গ ধর্মীয় অন্ধ বেড়াজাল ও জীবনজীবিকা
চিত্ততোষ পৈড়া
৬৭

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ‘অরণ্য আদিম’ : এক প্রাচীন জনজাতির ইতিবৃত্ত
প্রশান্ত কুম্ভকার
৭২

সমরেশ বসু ‘টানাপোড়েন’ উপন্যাসের পেশাগত সমাজভাষিক আলোচনা
যমুনা ধাড়া
৭৮

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ : মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্বেষণ
অরূপ সিং
৮৫

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি
সুদীপা সাধু
৯১

‘গামহারডুংরী’ : সবুজায়নের এক বিপ্লবময় আখ্যান
কাকলি মোদক
৯৫

শোক থেকে শ্লোক : হাসান আজিজুল হকের ‘আগুন পাখি’
অভি দাস
১০০

শৈবাল মিত্রের ‘গোরা’ ও চৈতন্যজীবনী’র গোরা
সৌমিলি দেবনাথ
১০৪

ভগীরথ মিশ্রের ‘আড়কাঠি’ উপন্যাসে লোকসংগীত ও জীবন
নবগোপাল সামন্ত
১০৯

ভগীরথ মিশ্রের ‘চারণভূমি’ : লৌকিক বৃত্তিগত ভাষার পরিচয়
পিউ চক্রবর্তী
১১৪

অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ : বাজিকরদের জীবনের উপাখ্যান
স্বপন রানা
১২২

অভিজিৎ সেনের ‘রাজপাট ধর্মপাট’ : প্রেমিক, মানবিক, সংবেদনশীল শ্রীচৈতন্য
দেবারতি মল্লিক
১২৬

অমর মিত্রের ‘হাঁসপাহাড়ি’ : প্রান্তিক মানুষদের জীবনচিত্র
সুখেন্দু ঘোষ
১৩২

নলিনী বেরার ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ : উপন্যাসে লোকজ উপাদান অনুসন্ধান
রিঙ্কু দাস
১৩৭

নলিনী বেরার ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ উপন্যাসে জেলে কৈবর্ত সমাজ
শুভাশিস আচার্য
১৪৪

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস : জীবনবোধের দর্পণে
সত্যজিৎ সরকার
১৫১

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবন ও জীবিকা
মনিহার খাতুন
১৫৫

বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের চারের দশকে ভারত ও বঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ
বাণী রায়
১৬৪

গল্প নিয়ে **১৭৩-২৭২**

রবীন্দ্র-গল্পে নারীর ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন
চন্দন বিশ্বাস
১৭৩

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে সমাজব্যবস্থা
পার্থজিৎ বেরা
১৭৮

বন্ধু ভূতের আখ্যান : প্রসঙ্গ 'সব ভুতুড়ে'র নির্বাচিত গল্প
মধুসূদন সাহা
১৮৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপায়' গল্পে আশা ও মল্লিকা : একটি তুলনামূলক পাঠ
সুধাংশু কান্তি মুড়িয়া
১৮৯

'দুঃশাসন' : এক কলঙ্কিত পুরাণকথার পুনরাবৃত্তি
সুব্রত চক্রবর্তী
১৯৫

চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটে : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প
অরিত্র বাগ
২০৫

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্পে প্রেমধর্মের প্রকাশ
টিংকু কুমার ঘোড়াই
২১১

'আদাব' : মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাবোধের আখ্যান
বিপাশা বসাক
২১৭

ইকোক্রিটিসিজমের ভাবনায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' গল্প
গনেশ কর্মকার
২২৩

দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে পারিবারিক মূল্যবোধের অবনমন
উজ্জ্বল মণ্ডল
২২৭

নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্পে অবক্ষয়িত সময় ও সমাজের চিত্র : নির্বাচিত দুটি গল্প অবলম্বনে
মনিরা খাতুন
২৩৩

কায়েস আহমেদের গল্প : প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন
তাপস পাল
২৪০

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে জীবন-জীবিকায় প্রযুক্তির আগ্রাসন ও প্রভাব
বাপ্পী বর্মণ
২৪৬

অন্ন সংকট : 'নিম অন্নপূর্ণা', 'জাতুধান' ও 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'
সুস্মিতা ঘোষ
২৫২

সত্তরের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও ভাঙনের সংস্কৃতি
নবীনচন্দ্র দে
২৫৭

স্বরূপ ও বিবর্তন : নির্বাচিত গল্পের আলোকে
রবীন্দ্রনাথ মুদি
২৬৩

বাংলা অণুগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও বহুমাত্রিকতা
সুমন সরকার
২৬৮

উপন্যাস নিয়ে.....

ফকিরমোহন সেনাপতি-র 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' : একটি সামাজিক সমীক্ষা

শ্রীতা মুখার্জী

ফকিরমোহন সেনাপতি ১৮৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে উড়িষ্যা জেলার বালেশ্বর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র চোদ্দো বছর। শৈশবেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এর কিছু সময় পরে তাঁর মায়েরও মৃত্যু হয়। ফকিরমোহন নিজের দিদিমার কাছে বড়ো হতে থাকেন। সামাজিক তথা পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে তিনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেননি। কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তা আর মেধার জোরে তিনি উন্নতির চরম শিখর স্পর্শ করেন। উড়িষ্যা জেলায় তিনি উচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ছিলেন উড়িষ্যার প্রাণপুরুষ। উড়িষ্যার সমাজসংস্কারক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর নাম সদা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থেকে যাবে।

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ওড়িয়া সমাজে সে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন ফকিরমোহন সেনাপতি। ওড়িয়া ভাষার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে এবং আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইংরেজি ভাষায় তাঁর তেমন দখল ছিল না। কিন্তু ফকিরমোহন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। বাংলা ভাষা শিক্ষা করে বাংলা সাহিত্যপাঠ ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় শখগুলির মধ্যে একটি। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি বিষয়ে ফকিরমোহন অবগত ছিলেন। ওড়িয়া ভাষাকেও তিনি সেই উচ্চতায় আসীন করতে চেয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। ফকিরমোহন সেনাপতি কয়েকটি উপন্যাস-ছোটোগল্প, একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি আত্মজীবনী রচনা করেন। এর মধ্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হল 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' উপন্যাসটি। এই গ্রন্থের রচনাকাল ছিল ১৮৯৭ সাল। ১৯০২ সালে গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশরূপ লাভ করেছিল। 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' গ্রন্থের তাৎপর্য হল এই যে এটি ভারতীয়

ভাষায় লেখা প্রথম জমিদার-প্রজার অন্তর্বর্তী সম্পর্ক ও তাদের মধ্যবর্তী শ্রেণিশোষণ সম্পর্কিত উপন্যাস। এই বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্ক নিয়ে সমাজে জন্ম নিয়েছে প্রচুর বিক্ষোভ ও অন্দোলন। সুতরাং এই বিষয়টিকে উপন্যাস নামক সাহিত্যিক সংরূপের অঙ্গীভূত করা নিঃসন্দেহে লেখকের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গদেশের কৃষক'—প্রবন্ধটির কথা। এখানে বাংলাদেশের কৃষকদের দুরবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষকরা জমিদার ও ভূস্বামী কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে এসেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি তাদের ছিল না। তাই সমাজমনস্ক বঙ্কিম সেই দরিদ্র, বঞ্চিত, অত্যাচারিত কৃষকদের পক্ষ নিয়ে কলম ধরেছেন এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ লেখা হয় ১৮৭৭ সালের কাছাকাছি সময়ে।

এখানে বঙ্কিম বারংবার দেশের সরকারের থেকে অশিক্ষিত, মূর্খ, সরল চাষীদের জন্য সুবিচার প্রার্থনা করছেন। তিনি বলছেন সরকার যেন অত্যাচারী জমিদারদের শাস্তির ব্যবস্থা করে। এই একই লক্ষ ছিল ফকিরমোহন সেনাপতিরও। কিন্তু তা উপন্যাসে পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি'-র মতো কবিতায় 'উপেন' চরিত্রের মাধ্যমে নিরীহ প্রজার দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। 'উপেন'-নামী এই প্রতীকী চরিত্রের সঙ্গে 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা'-র 'ভগিআ' চরিত্রের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 'দুই বিঘা জমি'-র উপেন যখন জমি হারানোর যন্ত্রণায় গ্রাম ছেড়ে সন্ন্যাসীজীবন বেছে নিয়েছে, তাঁতী ভগিআ তখন উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়ে গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে সুবিচারের আশায় ঘুরে বেড়িয়েছে। ফকিরমোহন সেনাপতির বিশিষ্টতা এখানেই যে ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর আগে কেউ জমিদার-প্রজার ক্ষমতা সম্পর্ক নিয়ে উপন্যাস রচনার কথা ভাবেননি। এ ব্যাপারে তিনিই প্রথম। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সুতরাং তাঁর এই গ্রন্থ এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থেকে গেছে। তৎকালীন সমাজ-সম্প্রদায়ে সর্বশ্রেণীর পাঠকের মধ্যে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। ফকিরমোহন সেনাপতি ওড়িয়া ফিকশনেরও জনক ছিলেন। ওড়িয়া কথাসাহিত্যের ধারাকে তিনি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। সাহিত্য সমালোচক পদ্মশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু মনে করেছেন ঊনবিংশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যের জগতে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের অভিঘাত যতটা তীব্র ছিল, তেমনই ফকিরমোহন সেনাপতির 'ছ মাণ আট গুণ্ঠ' গ্রন্থটিও আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন।

ওড়িয়া ভাষায় এই গ্রন্থের নাম 'ছয় মাণ আঠ গুণ্ঠ'। এই নামের আক্ষরিক অর্থ হল ছয় একর বত্রিশ ডেসিমেল। এই উপন্যাস লেখা হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। এই গ্রন্থ গ্রামীণ কথ্যভাষায় লেখা হয়েছিল। ১৯৫৬৫ সালে এর বাংলা অনুবাদ করেন ফকিরমোহন সেনাপতির পৌত্রী মৈত্রী শুক্ল। তিনি এই অনূদিত গ্রন্থের নামকরণ করেন 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা'। গ্রন্থটি সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত ও পুরস্কৃত হয়েছিল। এই গ্রন্থের সর্বমোট ২৮টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতি অধ্যায় একটি বিশেষ শিরোনাম দ্বারা নামাঙ্কিত করা হয়েছে, যেমন — রামচন্দ্র মঙ্গারাজ, গ্রামের হালচাল, হিতোপদেশ ইত্যাদি। প্রত্যেক অধ্যায়ে উপন্যাসের কোনো বিশেষ চরিত্র বা ঘটনার ওপর আলোকপাত করা হয়। 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল 'রামচন্দ্র মঙ্গারাজ'। উপন্যাসের কথনবস্তুতে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এই রামচন্দ্র মঙ্গারাজ ছিল তালুক ফতেপুরের

জমিদার। শৈশব-বাল্যকাল অনাথ মঙ্গারাজ বহু কষ্টে অতিবাহিত করেছিল। মেদিনীপুরের ভূমাধ্যিকারী শেখ দিলদার মিয়ার থেকে ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা তাঁর সম্পত্তি করায়ত্ত করে ক্রমশ সে ক্ষমতাশালী ভূস্বামীর পদ প্রাপ্ত হয়। সে কেবলমাত্র নিজের চাতুর্য আর সাহসের ওপর ভিত্তি করে ক্রমশ এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল। দুষ্টবুদ্ধির অধিকারী এই ব্যক্তি নিরীহ প্রজাদের অত্যাচারে জর্জরিত করে রাখত। স্থানীয় প্রশাসনকেও সে তুষ্ট করে নিজের হাতের মুঠোয় রাখত। যার ফলে তার কোনো বিচার হতে পারত না।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র মঙ্গারাজের প্রধান দুর্বলতার জায়গা হল জমি। উর্বর জমি দেখলেই ছলে-বলে-কৌশলে সে তা হস্তগত করত। এই সূত্রেই গ্রাম গোবিন্দপুরের নিবাসী এক তাঁতী দম্পতির সঙ্গে তার সংঘাত বেঁধেছে। একদিন জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গারাজের চোখ পড়েছে সেই তাঁতী দম্পতির জমির উপর। নিঃসন্তান এই দম্পতিকে সন্তানের লোভ দেখিয়ে তাদের সরলতার সুযোগে তাদের জমিকে দখল করেছে রামচন্দ্র মঙ্গারাজ। গোবিন্দপুর গ্রামের নীরিহ-অসহায় তাঁতী দম্পতি ভগিআ-শারিআ-এর ওপর মঙ্গারাজের জোরজুলুম, জমিদখলের ইতিবৃত্তই কথিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এই পাপকর্মে মঙ্গারাজের সহায়ক হয়েছিল 'চম্পা' নামী রমণী। চৌকিদার গোবরা জেনা-র পরোক্ষ সহায়তা ও সমর্থনও মঙ্গারাজ সময় সময়ে লাভ করে থাকত। সমগ্র উপন্যাসটি সর্বজ্ঞ কথকের জবানীতে উত্তম পুরুষে কথিত হয়েছে। এখানে কথক-লেখকের অন্তর্ভুক্তি ও মন্তব্য, তথা, টীকা-টিপ্পনী লেখায় ভিন্ন মাত্রা আনে। সময়ে-সময়ে কথক চরিত্র সরাসরি পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেও প্রয়াসী হয়েছেন। এভাবে পাঠককে কথনের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়। ব্যঙ্গাবিদ্রুপ ও শ্লেষের ভঙ্গীতে জমিদারের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে সাহিত্যে হাস্যরসের জোগান দেওয়া হয়েছে। প্রশংসার ছলে লেখক রামচন্দ্র মঙ্গারাজের সকল অপরাধমূলক কর্মের বিবরণ প্রদানই শুধু করেননি, এই উপন্যাসে সামগ্রিকভাবে জমিদার সম্প্রদায়কেই বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি নিজে কর্মজীবনে ভূমি সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই উপন্যাসে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণের ছাপ লক্ষ করা যায়। এ হল সমাজের এই দুষ্টক্ষতকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করে তোলার পন্থা।

লেখকের কথনভঙ্গি থেকে একথা স্পষ্ট যে তিনি জানেন সমাজের ধনিক ও ক্ষমতাবান শ্রেণির মানুষরাই তাঁর সাহিত্যের উদ্দীষ্ট পাঠক। তাই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিদারি প্রথার অন্তঃসারশূন্যতাকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করে তাঁর গণ্যমাণ্য পাঠক তথা সমাজের ক্ষমতাবান শ্রেণির থেকে এর সুবিচার প্রার্থনা করেছেন লেখক। এই উপন্যাস পাঠ করতে করতে কখনো কখনো বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নাটক 'নীলদর্পণ' ও তার রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের কথাও মনে এসে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। 'নীলদর্পণ'-এর মতো এই উপন্যাসও সমাজসমস্যাকে উঠিয়ে এনে তার সমাধানে ব্রতী হয়েছে। নিবিড় পাঠের মধ্যে দিয়ে পাঠক-গবেষক 'রামচন্দ্র মঙ্গারাজ'-এই নামকরণের পেছনেও কোথাও যেন 'রাম' কেন্দ্রিক ভারতীয় মিথকে ভাঙার প্রয়াস লক্ষ করতে পারেন।

'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' ভারতীয় সনাতনী সমাজব্যবস্থার কথাই বলেছে। গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা ও ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতি এই ভারতবর্ষের ভিত গড়ে দিয়েছে। সেই জমির হস্তান্তর বা তাতে জবরদখল ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অব্যবস্থাকেই আরও বেশি করে প্রকট করে। ফকিরমোহন

সেনাপতি তাঁর জনপ্রিয় 'ছয় মাণ আঠ গুণ্ঠ' উপন্যাসে এই জ্বলন্ত সমস্যার কথাই বলেছেন। এই উপন্যাস উড়িষ্যার গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরে। 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' সিঙ্গাল প্লটেড নভেল। কাহিনির শুরু থেকেই পাঠক বুঝে নিতে পারেন অত্যাচারী জমিদার মঙ্গারাজের প্রবল প্রতাপ, পাপকর্ম ও অন্তিমে তার করুণ পরিণাম-প্রাপ্তি হল গল্পের মূল প্লট। উপন্যাসের ১০তম অধ্যায়ে 'ভগিআ-শারিআ'-এর জীবনযাত্রার ও ঘরকন্নার সহজ-সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে উদ্দেশ্য পরিকল্পিতভাবে, পরবর্তীতে তাদের জীবনের করুণ পরিণতিকে অধিক মর্মবিদারক করে তোলার জন্য। লেখক এতো যত্ন করে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান চরিত্রগুলিকেও এঁকেছেন যে তা পাঠকের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে। এ তাঁর এক বিশেষ লেখনীগুণ রূপে প্রতিভাত হয়। বাঘসিংহ বংশের পরিচারিকা 'মানিক'-এর চরিত্র, বউঠাকুরাণীর ভৃত্য 'মাকুন্দা' বা উকিল 'রাম রাম লালা'-র মতো নেহাতই অপ্রধান চরিত্রও সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের কলমস্পর্শে। বউঠাকুরাণীর চরিত্রচিত্রণে যতই মাধুর্য মিশ্রিত হয়েছে, অন্যত্র চম্পা ও গোবিন্দর জীবনের মর্মান্তিক করুণ পরিণতি বর্ণনায় ততটাই নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্যের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। নেতঅ—নামক গাভীটি কাহিনিতে প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। এক নির্বাক, অবলা প্রাণীচরিত্রকে উপন্যাসের কথনের কেন্দ্রে রাখাও রচনা বৈশিষ্টকেই নির্দেশ করে—

> নেত বড়ই সুলক্ষণা, এই প্রথম পিছনে একটি বকনা বাছুর লাগিয়াছে। নেতর সর্বাঙ্গ কালো, মাথায় সাদা চাঁদ।...লেজের আগায় চামরে মতো ঘন এক গোছা লোম মাটিতে লুটাইতেছে। পিঠটি নোয়ানো, এক মুঠির কিছু কম চওড়া। পাছাটি চওড়া ঝুঁটিটি ছোট, চাল কুমড়ার মতো পিঠের দিকে নুইয়া পড়িয়াছে। গলকম্বলটি অন্য গরুর চাইতে কিছু বেশী ঝুলিতেছে।[১]

একটি গাভীর দৈহিক গঠন বর্ণনায় এমত ভাষার প্রয়োগ দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরই এই প্রাণীটিকে নিয়ে একটি দুর্যোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে। এই উপন্যাসে পরপর অনেকগুলি ট্র্যাজিক মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—ভগিআ-এর পাগল হওয়া, শারিআ-এর মৃত্যু, বাঘসিংহদের ঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা। কিন্তু বউঠাকুরাণীর মৃত্যুই এই কাহিনির আসল ট্র্যাজিক-বিন্দু রচনা করছে। কারণ এই মৃত্যুর পরেই মঙ্গারাজ চরিত্রের পতনের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং কাহিনি অতি দ্রুত গতিতে তার উপসংহারের দিকে এগিয়েছে। খুব সম্ভব সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' জাতীয় লৌকিক প্রবাদকে নিজের কাহিনিতে সত্য করে দেখাতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক।

এই উপন্যাস পাঠ করতে করতে স্থানে স্থানে উত্তম পুরুষ কথনে মূল কাহিনির ঘটনাস্রোতে আন্তরিক বাচনের কথক-লেখকের উক্তি পাঠককে সজাগ, সচকিত করে রাখে। স্থানে স্থানে পাঠক এই জাতীয় নির্দেশাবলী প্রাপ্ত হন, 'আপনাদের মন জোগাইয়া চলা আমাদের কাজ, কিন্তু আপনার কথাটা আমাদের কেমনতর লাগিতেছে। আপনাকে বলিতেছি না আমাদের কথাটাই ঠিক, কিন্তু তাঁতীর বুদ্ধি অর্থ কি জানেন?'[২] এই জাতীয় কথনশৈলী সম্পর্কে অনিন্দ্য ভট্টাচার্য তাঁর 'কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'সর্বজ্ঞ কথক ঘটনাচক্রের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। চরিত্রের অন্তর্লোককে আলোকিত করে দেখে নিতে পারেন। একই সঙ্গে ঘটমান একাধিক ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারেন।'[৩] এই বিশেষ কথনরীতি নির্বাচনের পেছনে চরিত্রের অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করার প্রয়াস একদিকে যেমন ফকিরমোহন সেনাপতির মধ্যে ছিল, অন্যদিকে বঙ্কিমের

নীতিবাদী সত্তার প্রভাবও যে তাঁর মধ্যে একেবারেই পড়েনি, একথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। উপন্যাসের কোনো কোনো স্থানে কর্তীঠাকরুনের চরিত্রের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট 'বিষবৃক্ষ'-উপন্যাসের সূর্যমুখীর আদল লক্ষ করা যায়। বিশেষত কর্তীঠাকরুনের মৃত্যুর পরে লেখকের এই মন্তব্য—'...যে স্ত্রী ধর্ম কার্যে সহধর্মিণী, প্রাণাধিক সন্তান সন্ততির জননী, যে স্ত্রী সুখ দুঃখের একমাত্র সমভাগিনী, যে স্ত্রী রোগে শুশ্রূষাকারিণী, বিপদে মন্ত্রী, শরীর রক্ষায় ধাত্রী...।'[৪] বাঙালি পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা'-র 'চম্পা' নামী গৃহ পরিচারিকার চরিত্রকে 'বিষবৃক্ষ'-এর 'হীরা' চরিত্রের সমধর্মী বলে মনে হয়। দুটি উপন্যাসেই এই দুই নারীচরিত্র নেগেটিভ ভূমিকায় থেকে বিপদ বাঁধাতে ও ঘটনার অগ্রগতিতে জট পাকাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ফকিরমোহন লেখার মধ্যে অনেক জায়গায় ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গাবিদ্রুপ প্রকাশ পেয়েছে। 'কিন্তু আজকাল এরূপ মান্ধাতার আমলের বর্ণনা চলিবে না। ইংরেজি পড়ুয়া পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য ইংরেজি ধাঁচে রূপবর্ণনা আবশ্যক।'[৫] ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত এই বক্তব্যের পাশে যদি রাখা যায় আরেকটি উদ্ধৃতিকে—

> এই উনিশ শ সংবৎসরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের খুব মর্যাদা। কারণ এই শাস্ত্র সকল উন্নতির মূল। দেখুন ইংরেজরা কত ফরসা আর ওড়িয়াদের রঙ কালো। তাহার কারণ ইংরাজেরা বিজ্ঞানশাস্ত্র পড়িয়াছেন, ওড়িয়ারা পড়েন নাই। আমরা হালে বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করিয়াছি।[৬]

তাহলে দেখা যাবে প্রথমটিতে যেখানে ইংরাজি ভাষার প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে প্রচলিত সমাজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এর পেছনে লেখকের ব্যক্তিগত ভালো-খারাপের বোধ ও স্বদেশ-স্বজাতির প্রতি অন্ধপ্রেম ও আনুগত্য কাজ করেছে বলেই মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি লেখকের অনুরাগের প্রমাণ বহু স্থলে সংস্কৃত শ্লোক ও কাব্যের উদ্ধৃতি থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই যথাযথ ও বাস্তবসম্মত বলে বোধ হয়। এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র হল চম্পা ও বউঠাকুরানী। রামচন্দ্র মঙ্গারাজের পাপকর্মের প্রধানা সহায়িকা চম্পা ও রামচন্দ্র মঙ্গারাজের পুণ্যবতী পত্নী বউঠাকুরানীর মতো কনট্রাস্ট চরিত্রের ব্যবহারে ভারতীয় মতাদর্শ অনুসারী আদর্শ রমণী-মূর্তি অঙ্কণের প্রয়াসও এখানে লক্ষিত হয়।

উপন্যাসে অসুর দীঘি, বুড়ি মঙ্গালার থান জাতীয় স্থাননামের নির্দেশ এবং জনপ্রিয় ওড়িয়া প্রবাদের ব্যবহার, এমনকী নারীর নানাবিধ অলঙ্কারাদির বর্ণনা রচনার স্থানিকতাকেই নির্দেশ করে। মঙ্গালাঠাকুরাণীর বাঘে চড়ে গ্রামে টহল দেওয়ার কনসেপ্ট একেবারেই গ্রামীন বিশ্বাস ও অন্ধ কুসংস্কারকেই প্রমাণ করে, যদিও বাংলার গ্রামের থেকে উড়িষ্যার গ্রামের এই দেব-দেবী কেন্দ্রিক অন্ধ কুসংস্কারের চেহারা কিছুটা ভিন্ন, 'কাল নিশুতি রাতে বাইরে যাব বলে উঠেছিলাম, পথের মাঝখান থেকে ধুনোর গন্ধ এল, ঝমর ঝমর শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি বাঘের উপরে চড়ে ঠাকুরাণী আসছেন। বাপ রে সে কত বড় বাঘ! আমি কত বাঘ দেখেছি, এত বড় বাঘতো কোথাও দেখিনি। লম্বায় সাত কি আট হাত হবে। বড় মদ্দা মোষের মাথার মত এই বড় মিশকালো মাথা।'[৭] এই উদ্ধৃতি থেকে গ্রামকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়। বসনী, নাকবসনী, ফুলগুণা, বিদ, কাপ, নাটময়ুর প্রভৃতি অলঙ্কার উড়িষ্যা জেলার আঞ্চলিকতাকে ধরে রেখেছে। তার পাশাপাশি ফকিরমোহন লেখায় অজস্র উপমা ও প্রবাদের ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলি হল এরকম—

১. বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার আধা করলে চাষ; ২. আয় বাবা পাখি আয়, আঠা কাঠির কাছে আয়;৩. কুয়াশায় সাঁতার দিবার চেষ্টা; ৪. দুই প্রাণী ভাল, বাঁধ তল্পি চল; ৫. কালী গাই মাথায় চাঁদ, তারে এনে শ্রীঘরে বাঁধ; ৬. পিতার গুণে পুতা; ৭. গাঁ ধোয়া জল যেথা পশে, মোড়লের হল সেথা চষে; ৮. জমি পাইলে সেয়ানা, ধান বুনিবে রাবনা, এক হাত লম্বা ধানের শিষ, পাড়া পড়শীর চোখে বিষ; ৯. গাঁয়ের গুণ ধোপার ঠাঁটে; ১০. ভাঁড়ে তেলও থাকুক ছেলের মাথাও রুক্ষু না থাকুক; ১১. ডাঙ্গা ভুঁইয়ে গাব বৃক্ষ; ১২. মক্কেল বলে রাখ মউসা, উকিল বলে আন পয়সা।

এই প্রবাদগুলি থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে লেখক ফকিরমোহন গ্রামকেন্দ্রিক জীবনগাথাকেই উপন্যাসে বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গ্রামীণ জলবাতাসের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা এখানে সহজেই প্রতিভাত হয়। গ্রামীণ উড়িষ্যার জনজীবনকে নিজের সাহিত্যে প্রাণ দিয়ে তাকে ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত করার কৃতিত্ব যদি কারুর থেকে থাকে, তবে তা ফকিরমোহন সেনাপতির। এই জন্যই হয়তো তাঁর এই উপন্যাস সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক শ্রী কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী মন্তব্য করেন, 'উপন্যাস আকারে ইহা এক গভীর জীবনদর্শন অথচ সাধারণ জীবনের রঙ্গারসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আলোচিত সমস্যাগুলি আধুনিক সমাজে কোনো না কোনো আকারে বর্তমান। ইহাতেই গ্রন্থের সারবত্তা ও দূরদৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়। যদি ওড়িয়া জীবনের একটি পরিপূর্ণ বাস্তব আলেখ্য অঙ্কণ করা সম্ভব হয় তবে 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ'-এর একটি চরিত্রও তাহা হইতে বাদ দেওয়া বা তৎস্থলে অন্য চরিত্র বসানো যাইতে পারে না।'[৮]

কাহিনির প্রতি ছত্রে ছত্রে মানব মনস্তত্ত্বের আলোচনা লেখকের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে। চরিত্র নির্মাণ ও চরিত্রসমূহের ক্রমপরিণতি তাঁর লোকচরিত্র জ্ঞানের পরিচয় দেয়। ওড়িয়া মানুষের আত্মজাগরণের লক্ষ্যে সর্বদাই যিনি কাজ করে চলেছেন, তাঁর উপন্যাসও যে সেই সমাজবদলের লক্ষ্যেই লেখা হয়েছিল, এ কথা পাঠকের অজানিত থেকে যায় না। ভাষা ও সাহিত্য যেহেতু একটি জাতির ভিত নির্মাণ করে, সুতরাং ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলতেই কলম ধরেন ফকিরমোহন সেনাপতি। ওড়িয়া জাতির নিজের ভাষা ও জাতি পরিচয় সম্পর্কে নির্মোহ ভাব ও অজ্ঞানতাকে ঘুচিয়ে দিতেই অগ্রসর হয়েছিলেন ফকিরমোহন সেনাপতি। এই কর্মে নিয়োজিত থেকে অনুবাদমূলক ও মৌলিক সাহিত্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। নিছক সাহিত্য সৃষ্টি হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর উপন্যাস পাঠ করে কখনোই তাকে উদ্দেশমূলকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে হয় না। এখানেই তাঁর লেখক হিসাবে সার্থকতা।

উৎসের সন্ধানে

১. ফকিরমোহন সেনাপতি অনূদিত—শুল্ক মৈত্রী, উনিশ বিঘা দুই কাঠা, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৪৩
২. তদেব : পৃ. ৩৮
৩. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য : 'কথনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস', ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৩৫
৪. উৎস-১, পৃ. ৮৫
৫. তদেব : পৃ. ১৫
৬. তদেব : পৃ. ৩৫
৭. তদেব : পৃ. ২২
৮. তদেব : ভূমিকা অংশ

‘গোরা’ উপন্যাসের ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ

রমেশ সরেন

১৩১৪ সালের ভাদ্র থেকে শুরু করে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত ‘গোরা’, ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ অবকাশ, স্ত্রী, কন্যা ও প্রিয়তম পুত্র শমীর আকস্মিক মৃত্যুতেও তার লেখা থামেনি। ধারাবাহিক বত্রিশ কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি সাধনায় কোনো বিরাম বা বিচ্যুতি নেই। বলা যায় নির্মম সংসার জীবনে জ্বলতে জ্বলতেই তাঁর এই নির্মাণ কাজ। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতে অন্ধকারের বুকে জমে থাকা ভূগর্ভস্থ লাভা পৃথিবীর বহির্ভাগে এসে রবীন্দ্রনাথের কারখানা-ঘর থেকে আলোক শলাকা হাতে বেরিয়ে এল তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি ‘গোরা’ উপন্যাস।

‘গোরা উপন্যাসে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ’ এই গবেষণা পত্রে ‘গোরা’ উপন্যাসে গোরার হিন্দুত্ববাদ ও রবীন্দ্রনাথের সময় এই দুটি বিষয়কে পাশাপাশি রেখেই আমার এই আলোচনার অবতারণা। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় গোরাকে চিনতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সময়কে একটুখানি পিছন থেকে দেখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের পরিবার ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ‘গোরা’ উপন্যাসের যে দ্বন্দ্ব তা আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নয়, নব্য হিন্দু সমাজ তথা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রকটিত হয়েছে। উনিশ শতকের সাতের দশকের পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ভারতের ভাবনায় সদা জাগ্রত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ নাটকের জন্য লিখে দিচ্ছেন ‘জ্বল জ্বল জ্বল চিতা।’ তিনি লিখছেন—

“এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ,/প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি ইতিহাস/যতদিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে/ অশ্রু জলে তোর বক্ষ ভাসাইবে/ততদিন তুই কাঁদরে।” ‘সঞ্জীবনী সভা’র শপথ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—“তোমারি তরে মা, সঁপিনু এ দেহ, /তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ।”

এই প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে গোরা। তার চিন্তাধারা, আচার, সংস্কারের মধ্য দিয়ে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদকে প্রকটিত

করে তুলেছে। ভারত যে জ্ঞান-গরিমা ও পূর্ণ ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে তাকেই আঁকড়ে ধরে 'গোরা' উপন্যাসের পরিসর প্রস্তুত হয়েছে। এসম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস' গ্রন্থে বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের পটভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের এক রাজনৈতিক চেতনার প্রেরণা বর্তমান।" গোরা উপন্যাসের প্রারম্ভে গোরা কৃষ্ণদয়ালবাবুর আচার ও নিয়ম নিষ্ঠাকে দেখে বিরক্ত হয়েছে, সহ্য করতে পারেনি। তাঁর বাবার কাছে ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা এলে গোরা তাদের সঙ্গে তর্ক করেছে। তাদের পান্ডিত্য ও অর্থ লালসা নিয়ে সোচ্চার হয়েছে। অন্যদিকে হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পান্ডিত্য ও বেদান্ত দর্শনের জ্ঞানে গোরা বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত গোরা আগে কখনো ভাবেনি যে, কেবলমাত্র সংস্কৃত পড়ে এত ধৈর্য, এত জ্ঞান ও ভাবের গভীরতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই গোরা হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন শুরু করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যনীয় গোরার হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পরিবারের রাজনারায়ণ বসু ছিলেন। যিনি পান্ডিত্যে সুগভীর এবং ঔদার্যে বালকেরও বয়স্য ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক ঘনিষ্ঠের কথা জানাতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"রাজনারায়ণ বাবুর যখন পক্ককেশ বৃদ্ধ, তখন আমার বয়স ৮ বছর; ওই বয়সে তিনি আমার বয়স্য ছিলেন, আমার সহিত তাহার মেলামেশার কোন বাধা ছিল না" রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিগত সূত্রে রাজনারায়ণ বসুর মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের বক্তব্য, তিনি বলেন—

> ১৮৬১ এবং ১৮৬২ সালে রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় ভাবোদ্দীপনার প্রস্তাবনা ও বক্তৃতা, নবগোপাল মিত্রের হিন্দু জাতীয়তার পরিপোষক হিন্দুমেলার উদ্দীপনা ও হিন্দুধর্ম রক্ষায় সনাতনধর্মীদের উদ্যোগের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। কাজেই গোরার হিন্দু জাতীয়তা সমকালেরই ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবি।

হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনিন্দ্যনীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য 'হিন্দুইজম' নামক একটি ইংরেজি বই লেখে গোরা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় গোরার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ১৯০১(১৩০৮) শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে 'হিন্দুত্ব' নামে একটি প্রবন্ধে হিন্দু সভ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া তাঁর "ভারততীর্থ" কবিতায় ঐক্যের বাণী প্রচারিত হয়েছে। ফলে আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি রবীন্দ্রনাথের দর্শনের সঙ্গে গোরার একটা যোগের কথা। নেপাল মজুমদার এর মতে—"উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সংস্কারবাদী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র যেন রবীন্দ্রনাথের নিজেরই আত্মকাহিনী।"ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট গোরা হঠাৎ হিন্দু সংস্কার ও আচার পালনে নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করতে শুরু করে। টিকি রেখে খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার করে নিজেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। "গোরা তাহার উপদেশ ও আচরণে দেশের একদল লোককে যেন জাগাইয়া দিল। তাহারা যেন একটা টানাটানির হাত হইতে বাঁচিয়া গেল; হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আমরা ভালো কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য, তাহা লইয়া জবাবদিহি কারো কাছে করতে চাই না...কেবল আমরা ষোল আনা অনুভব করিতে চাই যে আমরা আমরাই।" গোরার হঠাৎ আচারনিষ্ঠ হয়ে ওঠায় কৃষ্ণদয়ালবাবু গোরাকে হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রের সংকীর্ণতা ও গভীরতার কথা বলেছেন। তিনি বলেন—"হিন্দু শাস্ত্র বড় গভীর জিনিস। ঋষিরা যে ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তা তলিয়ে বোঝা যে-সে লোকের কর্ম নয়। আমার বিবেচনায়, না বুঝে এ নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভালো।" তিনি আরও বলেন, হিন্দু

বললেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান ও খ্রিস্টান হওয়া সোজা। যে কেউ হতে পারে। কিন্তু হিন্দু হওয়া বড়ো শক্ত। এর উত্তরে গোরা তার বাবাকে বলে—

> আমি যে হিন্দু, হিন্দুধর্মের গূঢ় মর্ম আজ না বুঝি তো কাল বুঝবো; কোন কালে যদি না বুঝি তবু এই পথে চলতেই হবে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে পূর্বজন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারিনি বলেই তো এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, এমনি করেই জন্মে জন্মে এই হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের ভিতর দিয়েই অবশেষে এর চরমে উত্তীর্ণ হব।

এখানে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারছি ভারতীয় হিন্দুধর্মের নিগূঢ় সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম মতে হিন্দুধর্মে আশ্রয় পেতে গেলে পূর্ব জন্মের মধ্য দিয়ে বংশপরম্পরায় তা লাভ করা যায়। তিনি গোরাকে বলেন—"হিন্দু ধর্মে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছো এইটে তুমি মনে করছ, কিন্তু সে তোমার সম্পূর্ণই ভুল। সে তোমার সাধ্যই নেই। তোমার প্রত্যেক রক্তের কণা, তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার প্রতিকূল। হিন্দু হঠাৎ হবার জো নেই, ইচ্ছা করলেও জো নেই। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি চাই।" হিন্দু সমাজের চরম সত্য ও বাস্তব দিকটি হিন্দুধর্মপ্রাণ আচারনিষ্ঠ, সংস্কারাচ্ছন্ন কৃষ্ণদয়ালবাবুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাসে আমরা দেখি, গোরার ত্রিবেণীতে গঙ্গা স্নানের মধ্য দিয়ে, গোরা শত শত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে একীভূত হতে চেয়েছে। সে জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক করে মিশিয়ে দিয়ে, দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে। দেশের মানুষের হৃদয়ের আন্দোলনকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে চেয়েছে। সে তার ব্রাহ্মণত্বের জ্ঞান ও পূর্ণতা নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে, বারবার বলতে চেয়েছে—"আমি তোমাদের তোমরা আমার।"

হিন্দুহিতৈষী সভা গঠন করে গোরা স্বদেশের লোককে জাগ্রত করতে চেয়েছে। গোরার হিন্দুহিতৈষী অফিসের রোজকার কাজ হল সমস্ত বাংলাদেশের লোকদের পত্র লিখে জাগ্রত করে রাখা। তার ভক্তদের সে নানান উপদেশ শোনায়। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না তার উপদেশগুলি হল, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদ ও তার নানান নিয়মনিষ্ঠাগুলিকে পালন ও প্রচার করা। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়—রাজনারায়ণ বসুর—'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক ভাষণটির কথা। ১৮৭২ সালের হিন্দু মেলায় এবং পরবর্তীতে ১৮৮১ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি লেখেন, "মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দেব। কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেই রূপ হিন্দু সমাজেই আমাদিগের কার্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ...যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দু জাতিকে উত্তেজিত করিব।" অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু হিতৈষীর সঙ্গে গোরার হিন্দু হিতৈষী সভার ভাবনা-চিন্তা প্রায় একই রকমের একথা অনস্বীকার্য।

উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের আচার ও সংস্কারের প্রতি গোরার অবজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে। বরদাসুন্দরীদেবী গোরাকে সাকার উপাসনার কথা বললে, গোরা বলে, আকারের রহস্যকে ভেদ করা খুব দুঃসাধ্য। পরেশ বাবু বলেন, আকার যে অন্ত বিশিষ্ট। তার উত্তরে গোরা বলে—"অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন—নইলে তার প্রকাশ কোথায় যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।" এ প্রসঙ্গে বলা যায়, কেশবচন্দ্রের নব্য হিন্দু ও তার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের 'নববিধনে'র মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংঘাত আমরা কাহিনিতে দেখতে পাই। আদি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও হিন্দু মেলার চর্চা-এই দুইয়ের মিলনেই রবীন্দ্রনাথের হিন্দুমননের

আধার ছিল। তাই তিনি কাহিনীতে বাস্তবতাকে একটুখানি পুনর্নির্মাণ করেছেন। হিন্দু সমাজকে কেউ আঘাত করলে গোরার মনে তা বেদনা ও রাগের সঞ্চার করে। বিনয় হৃদয়ের বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্ম বাড়িতে অর্থাৎ পরেশ বাবুর বাড়িতে গেলে ও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করলে গোরাকে তা ভীষণভাবে পীড়া দেয়। বিনয় ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে ললিতাকে বিয়ে করতে চাইলে গোরা তাকে ত্যাগ করে। বিনয় বলে, সে যদি তার মুসলমান বন্ধু হত তাহলে গোরা কী করত? এই প্রসঙ্গে বলে রাখি গোরা আপাদমস্তক হিন্দু আচার ও সংস্কারে পরিপূর্ণ হলেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাব আমরা লক্ষ করেছি। সতের নম্বর পরিচ্ছেদে আমরা দেখি, এক বৃদ্ধ মুসলমানকে একটি সাহেবি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে চলে গেলে গোরা সহৃদয়তার সঙ্গে সেই বৃদ্ধ মুসলমানকে আপনার লোক বলে তার দুঃখে সমব্যথী হয়েছে। গোরা সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হলেও সে ছিল জাত-পাতের উর্ধে একজন ভারতীয় মনীষী। যে তার সংস্কার ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই সমস্ত ভারতবাসীকে আপন করে নিতে চেয়েছে। বিনয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোরা বলে—

> গাছের আপন ডাল ভেঙ্গে পড়ে যদি পর হয়ে যায় তবে গাছ তাকে কোনমতেই পূর্বের মত আপন করে ফিরিয়ে নিতে পারে না...কিন্তু বাইরে থেকে যে লতা এগিয়ে আসে তাকে সে আশ্রয় দিতে পারে, এমন কি, ঝড়ে ভেঙে পড়লে আবার তাকে তুলে নিতে কোনো বাধা থাকে না। আপন যখন পর হয় তখন তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। সেইজন্যই তো এত বিধিনিষেধ, এত প্রাণপণ টানাটানি।

একষট্টি নম্বর পরিচ্ছেদে হিন্দু সমাজের সীমাবদ্ধতা ও বিধি নিষেধ নিয়ে গোরা ও বিনয়ের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য কিছু যুক্তি উঠে এসেছে। বিনয়ের মনে হয়েছে হিন্দুসমাজ আগাগোড়া কেবলমাত্র নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। বিনয় বলে—"সমাজ বলে রাক্ষসের কাছে প্রতিদিন মানুষবলি দিয়ে কোনমতে তাকে ঠান্ডা করে রাখতে হবে এবং যেমন করে হোক তারই শাসনপাশ গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে, তাতে প্রাণ থাক আর না থাক এ আমি কোনমতেই স্বীকার করতে পারবো না।' বিনয়ের মতে—"যে সমাজে অতি সামান্য ঘা লাগলেই বিচ্ছেদ ঘটে এবং সে বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ হয়ে দাঁড়ায়, সে সমাজে মানুষের পক্ষে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা কাজকর্ম করার পক্ষে বাধা কত সে কথা কি চিন্তা করে দেখবে না।" এর উত্তরে গোরার যুক্তি—

> সমাজ এমন সমগ্রভাবে এমন বড় রকম করে চিন্তা করছে যে আমি টেরও পাচ্ছিনে সে ভাবছে। হাজার হাজার বৎসর ধরে সে ভেবেওছে এবং আপনাকে রক্ষাও করে এসেছে— এই আমার ভরসা। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে বেগে চলছে, কি সোজা চলছে, ভুল করছে কি করছে না, সে যেমন আমি ভাবি নি এবং না ভেবে আজ পর্যন্ত আমি ঠকি নি...আমার সমাজ সম্বন্ধেও আমার সেই ভাব।

হিন্দু সমাজের এই সীমাবদ্ধতা নিয়ে পরেশবাবুর বক্তব্য—

১. কোন মানুষের সঙ্গে সমাজের যখন বিরোধ বাধে তখন দুটো কথা ভেবে দেখবার আছে দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায় কোন দিকে এবং প্রবল কে। সমাজ প্রবল তাতে সন্দেহ নেই, অতএব বিদ্রোহীকে দুঃখ পেতে হবে।

২. মানুষকে সমাজের খাতিরে সংকুচিত হয়ে থাকতে হবে একথা কখনোই ঠিক নয়; সমাজকেই মানুষের খাতিরে নিজেকে কেবলই প্রশস্ত করে তুলতে হবে। সেজন্য যারা দুঃখ স্বীকার করতে রাজি আছে আমি তো তাদের নিন্দা করতে পারব না।

৩. যাহারা কেবলই বিধি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না।

পরেশ বাবুর এই মতকে সমর্থন করতে পারে না ধর্মপ্রাণ গোরা। এই যুক্তির উত্তরে গোরা বিনয়কে বলে—

> নদীর যে ধারা কুল ভেঙছে সেই ধারাই তাদের। আমি সম্মতি দিতে পারি নে, কেননা আমাদের ধারা কূলকে রক্ষা করে। আমাদের এই কূলে কত শতসহস্র বৎসরের অভ্রভেদী কীর্তি রয়েছে, আমরা কোন মতেই বলতে পারব না এখানে প্রকৃতির নিয়মই কাজ করতে থাক আমাদের কূলকে আমরা পাথর দিয়েই বাঁধিয়ে রাখব...তাতে আমাদের নিন্দাই কর আর যাই কর। এ আমাদের পবিত্র প্রাচীন পুরী।

হিন্দু ধর্মের প্রচলিত ধারণা ও ধর্ম সম্বন্ধে গোরা সুচরিতাকে বলে, তোমরা যাকে মূঢ় ও পৌত্তলিক বল—"আমি তাদের সবাইকে আহ্বান করে জানাতে চাই, না, তোমরা মূঢ় নও; তোমরা পৌত্তলিক নও; তোমরা জ্ঞানী, তোমরা ভক্ত! আমাদের ধর্মতত্ত্বে যে মহত্ত্ব আছে, ভক্তি ভক্তিতত্ত্বে যে গভীরতা আছে, শ্রদ্ধা প্রকাশের দ্বারা সেইখানেই আমার দেশের হৃদয়কে আমি জাগ্রত করতে চাই; যেখানে তার সম্পদ আছে সেইখানে তার অভিমানকে আমি উদ্ধত করে তুলতে চাই।" তেষট্টি নম্বর পরিচ্ছেদে আমরা দেখি, সুচরিতা গোরার কথাই স্মরণ করেছে বারে বারে। তার কথায় পৃথিবীতে অনেক প্রবল প্রজাতির একেবারে ধ্বংস হইয়াছে; ভারত কেবলমাত্র সংযমেই, কেবল দৃঢ়ভাবে নিয়ম পালন করিয়াই, এত শতাব্দীর প্রতিকূল সংঘাতেও আজ পর্যন্ত আপনাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছে। এই নিয়মে কুত্রাপি গোরা শৈথিল্য স্বীকার করিতে চায় না। গোরা বলে, "ভারতবর্ষের আর সমস্তই লুটপাট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার যে প্রাণপুরুষকে সে এই-সমস্ত কঠিন নিয়মসংযমের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার গায়ে কোনো অত্যাচারী রাজপুরুষের হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই।" হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গোরার বক্তব্য 'হিন্দু তো কোনো দল নয়। হিন্দু একটা জাতি। এ জাতি এত বৃহৎ যে কীসে এই জাতির জাতিত্ব তা কোনো সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে বলাই যায় না। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয়, হিন্দু তেমনি দল নয়।" হিন্দুধর্মের উদারতা, হিন্দুধর্মের বিশালতার কথা গোরা সুচরিতাকে জানায়, সে বলে—"হিন্দুধর্ম মায়ের মত নানা ভাবের নানা মতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা করেছে; অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্মই জগতে মানুষকে মানুষ বলেই স্বীকার করেছে, দলের লোক বলে গণ্য করে নি। হিন্দুধর্ম মূঢ়কেও মানে...জ্ঞানীকেও মানে; এবং কেবলমাত্র জ্ঞানের মূর্তিকেই মানে না, জ্ঞানের বহুপ্রকার বিকাশকে মানে।"

গোরা খ্রিস্টানধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলে, "খ্রিস্টানরা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে চায় না; তারা বলে, এক পারে খৃস্টানধর্ম আর এক পারে অনন্ত বিনাশ, এর মাঝখানে কোন বিচিত্রতা নেই। আমরা সেই খৃস্টানের কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছি, তাই হিন্দুধর্মের বৈচিত্রের জন্য লজ্জা পাই। এই বৈচিত্রের ভিতর দিয়েই হিন্দুধর্ম যে একেকে দেখবার জন্যে সাধনা করেছে সেটা আমরা দেখতে পাই নে। এই খৃস্টানি শিক্ষার পাক মনের চারি দিক থেকে খুলে ফেলে মুক্তিলাভ না করলে আমরা হিন্দুধর্মের সত্যপরিচয় পেয়ে গৌরবের অধিকারী হব না।" গ্রিস ও রোমের মূর্তিপূজার সঙ্গে তুলনা করে গোরা সুচরিতাকে বলে—

> সেখানকার মূর্তিতে মানুষের কল্পনা সৌন্দর্যবোধকে যতটা আশ্রয় করেছিল জ্ঞানভক্তিতে ততটা নয়। আমাদের দেশে কল্পনা-জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে গভীররূপে জড়িত। আমাদের কৃষ্ণরাধাই বলো হরপার্বতীই বলো, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক পূজার বিষয় নয়; তার মধ্যে মানুষের চিরন্তন তত্ত্বজ্ঞানের রূপ রয়েছে। সেইজন্যেই রামপ্রসাদের চৈতন্যদেবের ভক্তি এই-সমস্ত মূর্তিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তির এমন একান্ত প্রকাশ গ্রিস-রোমের ইতিহাসে কবে দেখা গিয়েছে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও সমাজের পরিবর্তনের কথা সুচরিতা জানতে চাইলে গোরা বলে—সে পরিবর্তনকে স্বীকার করে কিন্তু তা পাগলামি হলে চলবে না, মনুষ্যত্বের পথেই মানুষের এই পরিবর্তন সম্ভব। ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই। তার মতে দেশের শক্তি দেশের ঐশ্বর্য দেশের মধ্যেই সঞ্চিত আছে।

ভারতীয় হিন্দুত্ববাদে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কথায় গোরার বলে ব্রাহ্মণকে অনেকের মঙ্গল করতে হবে, এই জন্যই অনেকের সংসর্গ হতে ব্রাহ্মণ বঞ্চিত। ঠিক যেমন রাজা দূরত্বের বেস্টনী দ্বারা নিজেকে প্রজাদের সংসর্গ হতে তফাৎ রাখে। নইলে রাজার প্রয়োজন ও মান প্রজাদের কাছ থেকে হ্রাস পাবে। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণকেও তার শুচি মেনে চলতে হবে। দেবতা ও ভক্ত তার মাঝখানে ব্রাহ্মণ সেতুস্বরূপ উভয়ের যোগসাধন রক্ষা করে। 'ব্রাহ্মণের পক্ষে ভক্তির প্রয়োজন নেই ভক্তি জনসাধারণেরই বিশেষ সামগ্রী' এই ভক্ত ও ভক্তির বিষয়ের মাঝখানে যে সেতু তা হল জ্ঞানের সেতু। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হল ব্রাহ্মণ। যে জ্ঞানের চূড়ায় বসে তার ভক্তিরস সমস্ত মানুষের মনে সঞ্চারিত করবে। সেই জ্ঞানের তপস্যায় রত থাকবে ব্রাহ্মণ। সে মনে করে—

> সংসারে যেমন ব্রাহ্মণের জন্য আরামের ভোগ নাই। দেবার্চনাতেও তেমনি ব্রাহ্মণের জন্য ভক্তিরভোগ নাই। ইহাই ব্রাহ্মণের গৌরব। সংসারের ব্রাহ্মণের জন্য নিয়মসংযম এবং ধর্মসাধনায় ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞান।

'গোরা' উপন্যাসে স্বাদেশিকতা ও হিন্দুত্ববাদ পাশাপাশি অবস্থান করেছে। হিন্দুধর্মের সামাজিক সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ কৃষ্ণদয়ালবাবু ও হরিমোহিনী এবং গোরা। গোরাকে আমরা উপন্যাসের শুরুতে দেখি একজন সংকীর্ণচেতা ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসেবে। যে তার মায়ের হাতের রান্না পর্যন্ত খেতে অস্বীকার করেছে, কারণ তার মা খ্রিস্টান দাসী লছমিয়াকে নিয়ে সংসার করে বলে। তার ত্রিবেণী যাত্রা চরঘোষপুরে নাপিতের বাড়িতে জল স্পর্শ না করা, সমস্ত কিছু তার সংকীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের সীমাবদ্ধতা ও শুচিতাকেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও গোরাকে আমরা সাম্প্রদায়িক আখ্যায় আখ্যায়িত করতে পারি না। তার উদার মানসিকতার জন্য, তার ভাতৃত্ববোধের জন্য, স্বদেশের প্রতি সহমর্মিতার জন্য। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সম্পর্কে গোরার এই দৃঢ়তা এবং শুচিতাকে বলা যেতে পারে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ভারতের ঐতিহ্য ও গৌরবকেই প্রতিষ্ঠা করা। 'ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে নেপাল মজুমদার বলেন—"গোরার শুরু ধর্মে ও সাম্প্রদায়িকতা, সমাপ্তি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষতায়; গোরার শুরু হিন্দু জাতীয়তাবাদে, সমাপ্তি বিশ্বমানবতায়।"—যা গোরার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর বিশ্বমানবতার আদর্শকেই মনে করিয়ে দেয়।

তথ্যের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪২৭
২. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী', প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ডিসেম্বর ২০২২
৩. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, ডিসেম্বর ২০২২
৪. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবিজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, ডিসেম্বর ২০২২
৫. অঞ্জন চক্রবর্তী : 'গোরার রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের গোরা, নিউ বইপত্র, বইমেলা ২০২২
৬. প্রলয়, গোরা ও চতুরঙ্গ, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১৩

রবীন্দ্র উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' : অন্তঃবাস্তবতা উন্মোচনে ভাষার নিপুণ প্রয়োগ

অভি কোলে

'গো'রা' (১৯১০) উপন্যাস প্রকাশের ছয় বছর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাস। এই ছয় বছর রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অন্তর্বর্তী কালপরিসরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তিনটি ঘটনার বিশেষ প্রভাব পড়ে—

১. তাঁর পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ (১৯১২-১৯১৩)
২. তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি (১৯১৩, নভেম্বর)
৩. প্রথম বিশ্বসমর (১৯১৪-১৯১৮)

সবকিছু মিলিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পালাবদল দেখা দিল। গল্প-উপন্যাসে পালাবদল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান উক্তি উপন্যাসে নূতন রীতি-আলোচনার সূত্রপাতে অবশ্য স্মর্তব্য—

My Stories of a later Period have got the necessary technique... I have different strata of my life and all my writings can be divided into so many Periods. All of us have different incarnation in this very life. We are born again and again in this very life.[১]

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি রূপায়িত হয়েছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসে 'চতুরঙ্গ' একটি সম্পূর্ণ মাত্রা যোজনা করল। উপন্যাস পাঠের সমস্ত পূর্ব-সংস্কার বিপর্যস্ত হয়ে গেল 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। বাস্তবতা থেকে উপন্যাস এখন অন্তঃবাস্তবতায় (inner reality) উন্নীত হল—

বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনে এই উপন্যাসের গুরুত্ব অসীম। প্রথম এখানেই পাঠক জেনেছে চরিত্রের বিবর্তন বলতে বোঝায় তার নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ওরফে চরিত্রের জন্মান্তর। 'চতুরঙ্গ' একটি শচীশের কাহিনি নয়, নানা শচীশের কাহিনি। শচীশের অনেক জন্ম অনেক মৃত্যু ঘটেছে। শচীশ জীবনের একটি ছক আশ্রয় করেছে। অনতিবিলম্বেই তাকে

পরিত্যাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। দামিনীও তা-ই করেছে। বাংলা উপন্যাসে এ দুই চরিত্র প্রথম আধুনিক চরিত্র—

> 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রবক্তা শ্রীবিলাস জানিয়েছেন, এ দুই চরিত্রের অভিনয় আত্মগত। বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম চরিত্র আত্মানুসন্ধানে, আত্মসমীক্ষায় ব্যাপৃত হল। নিজের মুখোমুখি হল। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, বহির্জগৎ থেকে ভিতর-দেহলিতে প্রত্যাবর্তনের প্রথম শিল্পরূপ চতুরঙ্গ।[২]

স্বীকার্য, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা তথা ভারতীয় উপন্যাসে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে ইংরেজি-ফরাসী উপন্যাসে একই সময়ে নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়। মার্সেল প্রুস্তের ফরাসী উপন্যাস 'Du Cote de chez Swann' (১৯১৩), ইংরেজি ভাষায় ডরোথি রিচার্ডসনের 'Pilgrimage' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড (১৯১৫), জেমস জয়েসের 'A Portrait of the Artist as a Young Man' (১৯১৬) এসময়ে প্রকাশিত হয়। তখনই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)। ইংরেজি উপন্যাসে এই নূতন রীতির লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে এডোয়ার্ড অ্যালবার্ট লিখেছেন, তা প্রাকসমর-পর্বের হেনরি জেমস-এর উপন্যাস থেকে ভিন্নতর—

> প্রাক্‌নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত নিটোল সংহত কাহিনীর জায়গায় এলো আপাত শিথিল কিছুটা তরল ও সংহতি-বিহীন প্রবহমান দৃশ্যের অন্তরালে শিল্পসচেতন জীবনবীক্ষা। বহির্জীবনের বিক্ষোভ ও সংঘাত জড়িয়ে জীবনের অন্তঃবাস্তবতার সন্ধানে ঔপন্যাসিক তৎপর হয়ে ওঠেন, সন্ধান করেন অন্তঃসঞ্জাতির ফল্গুধারা। বাহিরের ফর্মহীনতার আড়ালে বহে চলে চেতনা প্রবাহ। ব্যবহৃত হয় অন্তঃসংলাপ, ভাববিভঙ্গের বিচিত্র রূপ, প্রতীক আর অসাধারণ চিত্রকল্প। ঔপন্যাসিক যেন সৃষ্ট মনের ভিতর থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখতে চান। সময়ের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত কখনো-বা থেমে যায়, মনে হয় পরিচিত দেশকাল পরিবেশের সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে; প্রথাসিদ্ধ প্লটের জায়গায় দেখা যায় আপাত-অসংলগ্ন দৃশ্যনিচয়।[৩]

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এইসব লক্ষণ নির্ভুলভাবে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ রীতিকে ভেঙেছেন। প্রাক্ 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্র-উপন্যাসে বঙ্কিমী উপন্যাসের পরিকাঠামো বজায় ছিল, এখানে তা সম্পূর্ণ বর্জিত। এ উপন্যাসের কোনো স্পষ্ট পরিণতি নেই, নিটোল উপসংহার নেই, প্রথাসিদ্ধ আদি-মধ্য-অন্ত্য নেই, কাহিনি-সূচনায় চরিত্র সমূহের উপস্থাপনা নেই, কাহিনি-ক্রম ও পরম্পরা নেই। স্বীকার্য, উপন্যাস পাঠকের অভ্যস্ত সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ নিপুণ হাতের অভ্রান্ত আঘাতে চূর্ণ করে দিয়েছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিকে লেখক আপাত-শিথিল সংহতিবিহীন দৃশ্য-নিচয়ে উপস্থিত করেছেন। চরিত্র—চরিত্রই তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট। ফলকথা, 'চতুরঙ্গ' একটি সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন তিনটি আয়ুধ অবচেতন, প্রতীক ও সংলাপ। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সংলাপে বিশেষ জোর পড়েছে। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত চলতি ভাষা-আন্দোলনের শরিক হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস লিখেছিলেন—এই অভিমত অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষা ঠিক চলতি ভাষা নয়, সাধু ভাষাও নয় তার চেয়ে কিছু বেশি। এই সংলাপ প্রধান উপন্যাসে বিবরণাত্মক গদ্য-ন্যারোটিভ প্রোজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখানে সমাজ গৌণ, বস্তুপরিবেশ গৌণ, বাহির জীবনের ক্রিয়াকলাপ গৌণ। নায়ক-নায়িকা আত্মমগ্ন, অন্তর্লোকের গভীর থেকে গভীরে তাদের যাত্রা। বাহিরের বস্তুজগৎ ও পাঠক সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো বাসনা তাদের নেই। সে দায়িত্ব পালন করেছে

তাদের বন্ধু শ্রীবিলাস, যে উপন্যাসের প্রবক্তা। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আত্মসন্ধানের পটরূপে সমাজ এখানে নেই। ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষ ব্যাপারটাই এখানে গৌণ। তাহলে যে উপন্যাসে ব্যক্তি-চরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠা ও চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন লেখকের লক্ষ্য, সেখানে চরিত্রের অন্বেষণ, আত্মসন্ধান ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কীভাবে দেখানো যাবে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সংলাপ অসাধারণ গুরুত্ব পায়। সংলাপ হয়ে ওঠে চরিত্রের প্রাণময়সত্তার উচ্চারণ, সংলাপের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় চরিত্রের পরিবর্তন—

> তাই সংলাপ প্রধান চতুরঙ্গ উপন্যাসে ভাষা খুব জরুরী হয়ে উঠেছে। এই সংলাপের সঙ্গে দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। শচীশ বস্তুলোককে আদৌ মান্য করে না, চতুরঙ্গের লেখকও উপন্যাসটির বাস্তবতা প্রতিষ্ঠায় আদৌ ব্যাকুল নন। আসলে চতুরঙ্গ অন্তঃবাস্তবতা বা Inner-reality উপন্যাস। সংলাপে তার পরিচয় পাই।[৪]

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আঙ্গিকগত নতুনত্বকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে তার ভাষা। তীক্ষ্ণ তীব্র মর্মভেদী অনুভূতিগাঢ় ভাষারীতি এই উপন্যাসের ভাষায় এনেছে হীরকদ্যুতি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ভাষা চরিত্রের অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করেছে। অবচেতন মনে আলো-আঁধারের শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে এর ভাষা, তা অন্তর্গহনের রূপ থেকে রূপান্তরের সাক্ষ্যবাহী। ফলে ভাষা এখানে বিশ্লেষণধর্মী নয়, সংকেতধর্মী। শচীশের আত্মসন্ধান, দামিনীর অন্তরের কঠিন অন্তহীন দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুর পীড়ন, শ্রীবিলাসের বুদ্ধি-প্রবুদ্ধ জীবনজিজ্ঞাসা এই ভাষায় রূপায়িত। এই সংলাপ-প্রধান উপন্যাসে ভাষা চরিত্রের প্রাণময়সত্তার উচ্চারণ, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তা তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীর আত্ম অভিজ্ঞতার সার্থক বাহন।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাস চরিত্র সমৃদ্ধ অন্তঃবাস্তবতার উপন্যাস। এদের অনুভূতি, চেতন ও অবচেতনলোকের ভাবনা, বহমান ভাবাবেগ ও স্মৃতি, অনুষঙ্গ জেগে-ওঠা নানা বিচূর্ণ ভাব প্রকাশের যোগ্য বাহন যে ভাষা তা বিশিষ্ট, প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত, গভীর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এই উপন্যাসে চরিত্র স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেছে চেতন থেকে অবচেতনে, অবচেতন থেকে চেতনে। তাদের চেতনাস্রোতে অবচেতনস্রোতে ভেসে ওঠা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তসমূহের যোগ্য বাহন এই ভাষা। শচীশের পূর্ণতা-অন্বেষণ, দামিনীর তীব্র জীবনাসক্তি, শ্রীবিলাসের আত্মগোপনকারী ভূমিকা রূপায়িত হয়েছে এই ভাষায়। এই উপন্যাসে বাস্তবতার কোনো দাবি নেই। এখানে পরিবেশ গৌণ, সমাজের ভূমিকা অপ্রধান, বহির্জগতের ঘটনা তাৎপর্যহীন, চরিত্র সংখ্যা ন্যূন। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের অন্তর্লোক। প্রধান দুই চরিত্র, শ্রীবিলাসের ভাষায় আত্মমগ্ন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের যোগ রক্ষা করে ভাষ্যকার শ্রীবিলাস।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের এইসব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সমর্থনে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। তা গ্রহণ ও বিচারের পূর্বে অবশ্য স্মর্তব্য, এই উপন্যাসে মাত্র একজনেরই দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত। সে হল শ্রীবিলাস যে কথক, দর্শক, ভাষ্যকার, প্রধান দুই পাত্র-পাত্রী থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত, কিন্তু সে নির্বিকার দর্শক মাত্র নয়, আত্মগোপনকারী এবং ধারাভাষ্যপ্রবাহে তার নিজ জীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ব্যর্থতা ও সার্থকতা, ঔদার্য ও ঈর্ষা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের মানবিক প্রতিক্রিয়া গূঢ় রেখায় মুদ্রিত। উপন্যাসের ভাষারীতির গভীরতর পরিচয় গ্রহণের পূর্বে উপন্যাসে শ্রীবিলাসের ভূমিকা অবশ্য স্মর্তব্য। এই উপন্যাসে লেখক ভাষারীতিতে সর্বাত্মক পালাবদলের জন্য উন্মুখ।

তথাপি এই উপন্যাসের ভাষা সাধুরীতির কাঠামোকেই আশ্রয় করে আছে।

'চতুরঙ্গ'-এর ভাষারীতির উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কথকের (শ্রীবিলাসের) চেতনাবাহী স্মৃতি-অনুসঙ্গে বর্ণনা কখনো উজ্জ্বল, কখনো ঝাপসা, দৃশ্যপট ও বস্তুপরিসরের বিবরণ কখনো সামান্য উপস্থিত, কখনো অনুপস্থিত। বর্ণনা কখনো অসম্বন্ধ, কখনো ইশারামাত্র, মিতকথিত। যেমন—

১. গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই, ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

এখানে দামিনীর জীবনযাত্রার তথ্য উপস্থিত, দৃশ্যপরিসর ও দৃশ্যপটের বস্তুগত বিবরণ অনুপস্থিত। এইসব বর্ণনাবাহী পংক্তি কথকের অন্ধকার চেতনায় ভাসমান। কখনো উজ্জ্বল, কখনো অনুজ্জ্বল। এখানে ভাবাবেগের চিত্রকল্প চেতনায় অনুজ্জ্বল।

২. এমন সময় শোনা গেল, চাঁটগাঁয়ের কাছে কোন এক জায়গায় শচীশ আমাদের শচীশ লীলানন্দস্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে দৃশ্যপট নিষ্প্রভ, ভৌগোলিক বিবরণ স্কেচধর্মী ও অস্পষ্ট, কিন্তু কথকের চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শচীশ-ব্যক্তি চরিত্রটি। 'শচীশ আমাদের শচীশ' অংশে জোর পড়েছে, কথকের চেতনায় তা দৃশ্যমান।

৩. এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল।...নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে শিশুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে। কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিগুলির এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে; একেবারে ফুলে ভরা বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মুলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শেলো-পড়া ইটের ঢিবিটার উপরে শিশুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

এই অংশে কথকের চেতনাবাহী স্মৃতি-অনুষঙ্গে ভেসে আসে বর্তমানে পরিত্যক্ত নীলকুঠির অতীত কালের জীবনের চিত্রমালা, সেইসঙ্গে মৃত দামিনীর উচ্ছল জীবনাসক্তির নানা ছবি। আবেগাপ্লুত কথকের মগজ ধোনেফুলের গন্ধে ভরে যায়। কথকের নিঃসঙ্গতা, বেদনা, অন্তররুদ্ধ হাহাকার, একাকিত্ব বয়ে আনে এইসব ছবি।

৪. স্বামী (লীলানন্দ) যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল অনেকক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

শচীশের প্রতি দামিনীর আত্মনিবেদন এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত।

৫. দামিনী তখনই দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের একি চেহারা। প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া

ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা। চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কো-খুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশের অন্তর্লোকের বিপন্নতা এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আভাসিত। ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজ দেখে যেমন দুর্যোগের ভয়াবহতা অনুমান করা যায় তেমনি বিধ্বস্ত অবয়ব শচীশকে দেখে তার অন্তর্লোকের বিপন্ন ইতিহাস অনুভব করা যায়। চরিত্রের শরীরী অভিব্যক্তি ও আচরণ নিয়ে এসেছে গূঢ়তর ব্যঞ্জনা।

৬. সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূরসমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।

এখানে শচীশের মনোভাব সংকেতে ও সাংগীতিকায় ব্যঞ্জিত, উচ্চারিত। এর আড়ালে রয়েছে দামিনীর বঞ্চিত নারী জীবনের আর্তি আর অভিযোগ, যা শচীশকে প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা, শব্দ ও নৈঃশব্দ্যে একাত্ম করে দিয়েছে। ব্যঞ্জনায় বেদনাময় চিত্র-মাধ্যমে চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও বেদনা এখানে আভাসিত।

৭. সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো তার ভেজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু।...

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোঁয়া নাই; কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?

এ সেই বিখ্যাত গুহাদৃশ্য। শচীশের ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত। অর্থাৎ শচীশের অবচেতনে ভাসমান চিত্রকল্পরাজি। শচীশের অন্তঃকথন (ইন্টিরিয়র মনোলোগ)।

গভীর রাতে অন্ধকার গুহায় দামিনীর আত্মসমর্পণের অভিঘাতে শচীশের অর্ধজাগ্রত চেতনায় জেগে ওঠে নানা প্রতীকীভাবনা। এখানে তারই চিত্রপুঞ্জ। প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত। গুহার আঁধারে 'আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু'। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি যৌনপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। আঁধারে অবচেতনায় তাকে মেনে নিতে আপত্তি শচীশের মনের আপত্তির প্রতীক আঁধারে অর্ধজাগ্রত শচীশের লাথি মারায়। আর শেষ তিনটি সংহত অর্থময় বাক্যে তা ব্যঞ্জিত—অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না? এই তিনটি বাক্যে ব্যঞ্জিত হয় শচীশ-প্রত্যাখ্যাত দামিনীর নারীজীবনের ট্রাজেডি—তার বেদনা, তার সার্থকতালাভের ব্যর্থপ্রয়াস, প্রত্যাখ্যানে তার অসম্মান ও অসহায়তা। চেতন-অবচেতনের সীমান্তে অবস্থিত শচীশের মননচৈতন্যের চিত্রণে এই ভাষা লাভ করেছে বিরল শিল্পসাফল্য।

৮. চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত

একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

'না' সর্বাঙ্গীণ নেতিবাচক দৃশ্যপটের বর্ণনায় পূর্ববর্তী বাক্যের শেষে একবার 'না' শব্দটির ব্যবহার। পরবর্তী পরস্পরিত দীর্ঘবাক্যে ছয়বার 'না' শব্দের ব্যবহার। এখানে জোর পড়েছে নেতির উপর। দামিনী এখানে এক লোকে উপনীত, যেখানে সবকিছুই অস্বীকৃত। তারপরই আর-একটি অনুরূপ দীর্ঘবাক্য, যেখানে পরপর দুটি উপমাচিত্র মারফৎ সেই নেতিবাচকতাকে ব্যঞ্জিত করে তোলা হয়েছে। দামিনীর রিক্ত বঞ্চিত ব্যর্থ শূন্য জীবনের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে দেখা বিশ্ব, ফ্যাকাশে সাদাও সেই নেতিবাচকতারই প্রকাশ। দামিনী চলেছে অনিবার্য ব্যর্থতায়, 'না'-এর উপর দিয়ে তার ব্যর্থতার পরিণামের দিকে গতি। আবেগ, ভাবানুষঙ্গ আর সংকেত-মণ্ডিত এই শব্দচিত্র দামিনীর শূন্য পরিণতির ইঙ্গিতবহ প্রতীকীচিত্র।

৯. যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তের এই ছবিও প্রতীকী তাৎপর্যে অন্বিত। দামিনীর জীবনপিপাসার দুর্নিবার তীব্রতা আর প্রণয়াবেগের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার অচরিতার্থ শুষ্ক দাম্পত্য অধ্যায়। 'জীবনরসের রসিক' দামিনী একদা পণ করেছিল, উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না। আজ তাকেই অচরিতার্থতার বেদনা নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। শচীশ তার আকাশ, তাকে দামিনী কোনোদিনই পাবে না, এই উপলব্ধি মেনে নিতে দামিনীর বুক ভেঙে যায়, তবু মেনে নিতে হয়, সে ফিরে আসে মর্ত্য পৃথিবীতে। এতদিনের সঙ্গী শ্রীবিলাসকে ভালো করে দেখে। পূর্ণ অসীম অসম্ভবকে না পেয়ে দামিনী পেতে চায় অপূর্ণকে, সীমাকে, সম্ভবকে। কিন্তু জীবনের পরম লগ্ন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেও তার পাওয়া হল না 'সাধ মিটিল না' দামিনী মৃত্যুমুহূর্তে পূর্ণতা প্রত্যাশী, সেই অচরিতার্থ প্রত্যাশার ব্যঞ্জনাময় চিত্র দামিনীর এই সংলাপ। 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষারীতিতে উপন্যাসের অন্তরপ্রকৃতি প্রতিভাত হয়েছে। এদিক থেকেও এই ভাষারীতি বিচার্য—

> কেবল আয়তনগত ক্ষুদ্রতার জন্যই নয়, আন্তর লক্ষণ বিচারে চতুরঙ্গের নির্মাণরীতিতে সংক্ষিপ্ত ও সংহতি-ধর্ম সুপ্রকাশ।...আবেগের অতিরেক ও ফেলিলতা বর্জন করে ভাষার সংক্ষিপ্ত ও সংহতি-সাধনে লেখক সচেতনভাবে সচেষ্ট।[৫]

এই বক্তব্যের সমর্থনে বিজ্ঞ সমালোচক যে উদাহরণ দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'সবুজপত্র'-র পাঠে 'শচীশ'-অংশের ৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদে 'আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে' এই অংশের পরে ছিল—"সকাল বেলাকার শুকতারার মত তার যে দুটি চোখ হইতে জাগরণের আলো ঠিকরাইয়া পড়িত সেই চোখে আজ স্বপ্নের গোলাপী আভা, তার উপরে ছলছল বাষ্পের পর্দা।"[৬] অপ্রয়োজনীয় আবেগমুক্ত কাব্যময় ভাষা বর্জন করে বক্তব্যকে সংহত করার জন্যই এই অংশটি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে বর্জিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্জনের অর্থ এই নয় যে 'চতুরঙ্গ' লেখক বাক্‌রীতিতে কাব্যধর্মের বিরোধী। আসলে এই কাব্যময়তা উপন্যাসটির বিষয়-বিন্যাসের সঙ্গে একাত্ম।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাষারীতি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ভাষা। প্রাত্যহিক জীবনের মালিন্য-মুক্ত ভাষা, তা গূঢ় ব্যঞ্জনাশক্তিসমৃদ্ধ ও সংকেতবাহী। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাব-পরিমণ্ডল ভরে আছে পূর্ণতার অন্বেষণে ব্যাকুল শচীশ আর জীবনের সার্থকতা অন্বেষণে অস্থির দামিনীর

আর্তিতে। 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষা হয়ে উঠেছে তার উপযুক্ত মাধ্যম। চিত্রকল্পধর্মী সংকেতবাহী ভাষার মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন শচীশ ও দামিনী নামক দুই অসামান্য পাত্রপাত্রীর মনের রুদ্ধ কামনা, অস্থির চিত্তবিক্ষোভ, হৃদয়ের তীব্র আর্তি; আরো প্রকাশ করেছেন পাত্র-পাত্রীর মনের অবচেতন স্তরের নানা রহস্য। স্মর্তব্য, জীবনের অন্তঃবাস্তবতার রহস্যময় অন্বেষণকে প্রকাশের মাধ্যম যে ভাষা, তা কাব্যময় ও রহস্যময়। কয়েকটি উদাহরণে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়—

১. সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো; সে যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু।

এখানে উপমার ব্যবহার বিশেষত্বপূর্ণ। অবচেতনের অনুভূতিকে করে তুলেছে শরীরী। এখানে সাবয়ব থেকে নিরবয়বে, নিরবয়ব থেকে সাবয়বে অনায়াস যাত্রা।

২. চারিদিকে ধু ধু করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলিও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

এখানে নিসর্গদৃশ্য পেয়েছে গূঢ় তাৎপর্য, তা এসেছে নিসর্গের উপর প্রাণীস্বভাব আরোপের ফলে। সমস্তটা মিলিয়ে সংকেতবাহী। বস্তুসংস্থান ও মনোভাবের অন্তর্বয়নে বর্ণনাংশ পেয়েছে লোকোত্তর পরিব্যাপ্তি।

৩. স্পষ্ট দেখিতেছি, শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

শচীশ চরিত্রের ও তার সাধনার অসামান্যতা এখানে গূঢ় রূপকার্থ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

৪. যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মণ্ড একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের নিপুণ ব্যবহারসমৃদ্ধ এই চিত্র সাংকেতিক তাৎপর্যবাহী। নিষ্ঠুর নিসর্গ চিত্রে দামিনীর নৈরাশ্য ব্যঞ্জিত হয়েছে।

৫. সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না।

উৎপ্রেক্ষা, উপমা-যোগে আর একটি নিসর্গচিত্র সাংকেতিক তাৎপর্যে অন্বিত হয়ে উঠেছে। স্বীকার্য, এইসব চিত্রকল্পের অন্তর্নিহিত সাংকেতিক ব্যঞ্জনাশক্তি পাত্র-পাত্রীর মনের অবচেতনের নানা রহস্যময় দিকের আভাস এনেছে। এখানেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ভাষারীতির বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর একটি বিষয়ও এখানে স্মর্তব্য। 'চতুরঙ্গ'-এর বাইরের সাধুভাষা-রূপের অন্তরালে স্পন্দিত হয়েছে চলিতরীতির প্রাণধর্ম। তার পরিচয়স্থল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, ইডিয়মের প্রয়োগে। যেমন—

১. সমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সীমিত করা অথবা লুপ্ত করা : 'পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত', 'যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর', 'শচীশের একি চেহারা', 'চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কো-খুসকো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা'।

২. চলিত সর্বনাম পদের বহুল ব্যবহার: তা, তাকে, তার, যাতে ইত্যাদি।

৩. সাধুভাষার সঙ্গে ইডিয়ম-ধর্মী কথাশব্দ বা চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার : 'ফসকরিয়া', 'পা-টেপানো', 'তামাক-সাজানো', 'পেটমোটা পুরুত পাণ্ডা', 'ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা', 'বেরো', 'গেছে'।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে লেখক ভাষাকে নানা কাজে ব্যবহার করেছেন। এ ভাষায় স্পন্দিত হয়েছে প্রাণধর্ম, চেতন ও অবচেতনের নানা গূঢ় ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনাধর্মী, সংকেতবাহী, অন্তঃবাস্তবতার প্রতীকধর্মী বাহনরূপে ভাষার ব্যবহার হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উজ্জ্বল মার্জিত প্রসাধিত ভাষার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে চরিত্র। এ উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ আধুনিকতার যোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে এই ভাষারীতি।

উৎসের সন্ধানে

১. পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জি : প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'-এর পরিশিষ্ট, প্রকাশ ১৯৫৭, পৃ. ৪৫

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৪, পৃ. ৪৮৫

৩. তদেব : পৃ. ৭-৮

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাষা', জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাকা) বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা 'কাব্য সাহিত্য পত্র'র চতুর্দশ সংখ্যায় (১৩৯৩) মুদ্রিত।

৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প', প্রতিভাস পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৯, পৃ. ২২৪

৬. তদেব : পৃ. ২২৪

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মৃত্যুভাবনা

শুভাশিস দাস

একটা জ্যামিতিক বৃত্তের মতো আমাদের জীবন। সেই বৃত্ত চক্রাকারে শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে জীবাত্মা তার পরিক্রমণ শেষ করে আবার শূন্যে মেশে। এই মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আসছে। মেলেনি উত্তর। মৃত্যু কী, কী বা তার রূপ আর স্বরূপ- এই উত্তর জানার চেষ্টা করছি। বেদ-পুরাণ-উপনিষদের একটির পর একটি গ্রন্থ পড়তে পড়তে খুঁজে পাই মৃত্যু সম্পর্কিত অজস্র আলোচনা।

আর্য সভ্যতার পূর্বে অনার্য জাতির প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাই। যেমন—E.B.Tayler-এর 'Primitive Culture', J. G. Frazer-এর 'The belief immortality and the worship of the Dead' প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি— মৃত্যু সম্পর্কে প্রাক্‌দিক যুগের ভারতীয় ধারণার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের ধারণা হুবহু একই রকম ছিল।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে মৃত্যুকে দেবতা রূপে দেখানো হয়েছে। এখানে মৃত্যু লোকের রাজা যমের কথা বলা আছে। এছাড়া পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই দুটি সূক্তে মৃত্যুর পর সৎকারের উপায় ব্যক্ত। তবে আত্মা অজেয়, অমর-অবিনশ্বর। শুধুমাত্র কর্মফলের উপর নির্ভর করে পরলোক, ভূলোক, এমনকি পুনর্জন্ম লাভ হয়ে থাকে তার।

ঋগ্‌বেদের সময় থেকেই মৃতদেহ দাহ করার কথা জেনেছি। শরীর দহনের পর আত্মার উদ্‌বাগী হওয়ার কথা মেলে। গ্রন্থের ১৮ শ কাণ্ডের ৩য় অনুবাদের ৭ম সূক্তে বলা আছে—

> হে জাতবেদা অগ্নি, এ মৃত্যুকে দগ্ধ করতে আরম্ভ কর, তোমার জ্বালাযুক্ত রসহরণশীল দহন সামর্থ্যহোক। এ মৃতের শরীর সম্যক ভস্মীভূত কর, তারপর এ পুরুষকে সুকৃত লোকে অর্থাৎ পুণ্যবানদের নিবাসস্থল স্বর্গলোকে স্থাপন কর।[১]

এই মৃত্যুর পর মৃতদেহকে সৎকার করার কথা বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা বিভিন্নভাবে

করে আসছে পঞ্চভূতে লীন করে দেওয়ার জন্য। তাঁদের ধারণা কর্ম অনুযায়ী আত্মা জীবনচক্রের স্তরকে পরিক্রমণ করে চলে শুধু। আর এই স্তর পরিক্রমণের পরিণামই আমার মনে হয় মৃত্যু। আবার 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন জন্ম-মৃত্যু,সৃষ্টি-ধ্বংস তাঁরই লীলা মাত্র। আর মৃত্যু যেন তাঁরই লীলার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পুনরায় নতুন রূপে আসার বড়ো মাধ্যম। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করে—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়/নাবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।।/তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা/ন্যান্যানি সংযতি নবানি দেহী।"[২]

খ্রিস্টধর্ম মতেও মৃত্যু প্রায় অনুরূপ। গবেষক Samuele Bacchiocchi তাঁর গ্রন্থে মৃত্যু সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন— মৃত্যু যেন দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ। দেহের মৃত্যুর সময় আত্মা বেঁচে থাকে। এই বিশ্বাসকে বিভিন্ন উপায় প্রকাশ করা যায়। যা থেকে মৃতদের জন্য প্রার্থনা, পবিত্রতা এমনকি পরকালে চিরশান্তি ইত্যাদি মতবাদের জন্ম নেয়। তাঁর গ্রন্থে আছে—

> In the history of Christianity, death has been defined generally as the survival of the immortal soul from the mortal body. This belief in the survival of the soul at the death of the body has been expressed in various ways and given rise to such corollary doctrines as prayer for the dead, indulgences, purgatory, intercession of the saints, the eternal formant of hell, etc.[৩]

অর্থাৎ মৃত্যু হল আমাদের নশ্বর দেহের সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার কেবল বিচ্ছেদ। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে এই মৃত্যুর পথান্বেষণ করতে গিয়ে তাঁদের লেখার ভিতর থেকে যে মৃত্যু ভাবনার পরিচয় পেয়েছি, আমার মনে হয় পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা উপন্যাস বা গল্প নিয়ে লিখেছেন তাঁরা এর দ্বারা অনেকখানি আলোকিত বা প্রভাবিত হয়েছেন।

বিশ শতকের শুরুতে যার কলমের দরদি ছোঁয়ায় বাঙালি জাতির চোখের জল মূল্য পেয়েছিল, উপন্যাসের ভাবধারা এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই কথাসাহিত্যিকের কলমের পরিসরে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন গোপনে করুণ রসের উদয় ঘটিয়েছে পাঠকের অন্তরে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব নব অধ্যায়ের সূচনা করেছে। যখন রবীন্দ্রনাথ দীপ্ত তেজে বিরাজমান, তখন স্নিগ্ধ আলোয় বাঙালির দুয়ারে আগমন চন্দ্রের—শরৎচন্দ্রের। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে বাহিরে আলোকে ঘরের কথা একদিকে উপনিষদ-চেতনা, অন্যদিকে বিশ্ববোধ এই দুই বিপরীত সীমার মধ্যে আমাদের অনুভূতিকে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছেন।...শরৎচন্দ্র আমাদের জীবনসমুদ্র মন্থন করিয়া উহার বিষ ও অমৃত একসঙ্গে আমাদের ওষ্ঠে তুলিয়া ধরিয়াছেন ও অভ্যস্ত জীবনের আরাম-শ্লথ পরিবেশ হইতে বিচ্যুত করিয়া নূতন জীবন-সমন্বয়ের দুরূহ কার্মে আমাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন।[৪]

দীর্ঘ ষোলো বছর পর যখন পারিবারিক বৈধ-অবৈধ সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সূচনা করলেন 'চোখের বালি' দিয়ে, তখন সবে মাত্র 'কুন্তলীন' তাঁর ঝুলিতে। সাহিত্যে পদচারণা দর্পে নয় শান্ত, ধীরে। প্রথম লেখায় চমক। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত অভিজাত সমাজ থেকে সরে এলেন প্রধান্য দিলেন সাধারণদের, অপাংতেয়দের। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উপন্যাসে প্রধানত সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির চিত্র একেছেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তবে উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণিও তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের

দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নারীজাতির উপর যারা চিরকাল শুধু দিয়েই গেছে, কোনদিন কিছু পায়নি।[৫] শরৎচন্দ্র নিজেই একবার পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছু অধিকার নাই...এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।[৬]

শরৎচন্দ্রের রচনায় নারী-পুরুষ খুব সাধারণ পরিবারের, সকলের পরিচিতির মধ্যে। কারণ তিনি তাদেরই কাছাকাছি থাকতে থাকতে তাদেরই একজন বলে মনে করতেন। তাই সেই সমাজের নানা সমস্যাগুলি তাঁর কলমের ছোঁয়ায় উঠে এসেছে পাঠকের দরবারে। ওই সমাজের কণ্ঠকাকীর্ণ দিকের কথা বলতে গিয়ে এক অর্থে তিনি সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হল সেই অস্থির সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তের কোনো উপায় বলেননি বা সেখান থেকে বেরোনোর কোনো পথ দেখাননি। দেখানোর কথাও নয়, কারণ শরৎচন্দ্র সর্বোপরি আর্টিস্ট, শিল্পী। সমাজ ও নীতি-সংক্রান্ত সমাস্যার সমাধান বা কোনো জটিল মীমাংসা তাঁর কাজ নয়— সে কাজ করবেন দেশনেতা, সমাজনেতা, দেশের-দশের মাতব্বরেরা। তাঁর কাজ মানবজীবনের সুখ-দুঃখ লিখে যাওয়া, বাস্তব কাহিনিকে অবলম্বন করে অপূর্ব শিল্পরস পরিবেশন করা। সেদিক থেকে তিনি যথার্থ পন্থাই ধরেছিলেন।[৭] তবু আমরা তাকেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর শিরোপা তাকেই দিয়ে থাকি।

সমালোচকের মতে—শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এ কারণেই যে, তিনি মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও অশ্রু-বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনি গ্রন্থন করেছেন যা, আর কেউ লিখতে পারেননি। এজন্যই পাঠকের সঙ্গে চরিত্রের একাত্মতা। ঘটনা, চরিত্রকে এর আগে কেউ পাঠকের দরবারে এতটা রিক্তবেশে আনতে পারেননি। তাই তাঁর চরিত্রগুলি দুঃখ-লাঞ্ছনা ও রিক্ততার দ্বারাই পাঠকচিত্তে আপনার অধিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

তাঁর সৃষ্টির পটভূমী আদর্শ ও রোমান্সের সংমিশ্রণ। তবে মানবজীবনের বাইরে তত্ত্ব বা নীতিকথাকে আমল দেননি তিনি। মানুষের ভাগ্যের চরম পরিণতি ব্যর্থতা তাঁর কলমের স্বক্ষেত্র। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচনার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন চোখের জলের ওপরই তাঁর প্রতিষ্ঠা, ভাবাবেগের বাষ্পাকুললোচনই তাঁর কাহিনীর একমাত্র সমঝদার। এইজন্য কোনো কোনো প্রতিকূল সমালোচক বলেন যে, বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ অশ্রুপাতপ্রবণ হৃদয়ে সুলভ করুণরসের তরঙ্গ তুলে শরৎচন্দ্র অতি সহজে বাজিমাৎ করেছেন। অবশ্য এটা শরৎচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত নয়। সমস্ত বাঙালি চরিত্রেরই এটা একটা বৈশিষ্ট্য, যাকে কেউ কেউ বলেন। যদি এ ত্রুটি থেকেও থাকে, তা হলে বাঙালির চরিত্র ও মানস থেকে একে তো আর মুছে ফেলা যাবে না। সে যাই হোক, শরৎ-সাহিত্যে মানুষের বেদনার ছবি যেভাবে ফুটেছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খাঁজে পাওয়া যায় না।[৯]

কোনো আড়ম্বরতা ছাড়াই শুধুমাত্র কল্পনার জগতের বাইরে গিয়ে পাঠকের মানসিকতার কোমল দিককে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। বাঙালির ঘরের কথা, তথা আটপৌরে জীবন কথাকেই কলমে পরিসরে সাহিত্যভূমি কর্ষণ করেছেন। সুকুমার সেন বলেন— বাঙ্গালার সিদ্ধ উপন্যাসরীতিকে সাধারণ পাঠকের মানসোপযোগী, ঘরোয়া এবং ভাবালু রূপ দিয়া উপস্থাপিত করিলেন শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়।[১০] তিনি যেখানে গিয়েছেন—তা শহর বা গ্রাম হোক না কেন তা লেখায় এনেছেন। যদিও ২৫টি উপন্যাসের মধ্যে ২০টিতে বাংলা গ্রাম্য সমাজের কথা আছে।—বাঙালির সমকালের সমাজ-জীবন দীর্ঘকাল ধরে জমে-ওঠা নানা ব্যাধিতে পঙ্গু। শরৎচন্দ্র এই সমাজকে একেবারে ভেতর থেকে খুব খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। জাতিভেদ, ধর্মীয় গোঁড়ামির আড়ালে নৈতিক অনাচার, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধ, জমিদারের প্রজাপীড়ন, মহাজনী শোষণ, কৌলিন্য, পণপ্রথা, নারীর সতীত্ব নিয়ে বিচারহীন নির্মম রক্ষণশীলতা পাশাপাশি পুরুষের চূড়ান্ত দুষ্কর্মে নির্বিকার সমর্থন, মামলাবাজি, জুয়াচুরি, দাঙ্গা ও লুঠতরাজ, ঘোঁট পাকিয়ে প্রতিপক্ষকে সমাজচ্যুত করা—এরকম একটি অতিদীর্ঘ তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। এসব প্রসঙ্গ স্বাভবাবিকভাবেই শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প ও উপন্যসের পটভূমি এবং কোথাও বা সোজাসুজি কাহিনীর বিষয়।[১১]

শরৎচন্দ্র যে-কালে লেখনী ধারণ করেছিলেন তার প্রাক্কাল এবং সমকালের এই পাঠকসমাজ ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় অনড় হয়ে পড়েছিল। কেননা রবীন্দ্রনাথের সাহসিক নিরীক্ষা এবং সৎসাহসিক সার্থকতা বাঙালি অ্যাভারেজ পাঠকমণ্ডলীর আত্মীয় ছিল না। স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার যে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দেশকালের পটে বারে বারে স্থাপিত করেছেন, তাকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধির জন্য জনজীবনের ব্যাপক রূপান্তরের প্রয়োজন ছিল। শতবন্ধন-জাল-জটিল, খিন্ন-অপরিতৃপ্ত আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনে, গ্রামে এবং শহরে, পরিবারে এবং সমাজেও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর শেষ বাঁধন সহজে ছিড়ে পড়েনি এবং পড়ে না। ফলে উপন্যাসের দর্পণে ব্যাপক পাঠকমণ্ডলী যখন আত্মপ্রতিবিম্ব দেখতে চাইতেন, তখন রবীন্দ্রনাথের দিকে চাইলে স্বভাবতই আশা মিটত না, চোখ ধাঁধিয়ে যেত।[১২] তখনই অসহায়দের প্রতিনিধি হয়ে তাদেরই পাশে স্নিগ্ধ আলো নিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রোত্তর যুগে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে একস্থানে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> তিনি বলতেন শুধু শাস্ত্র আর উপদেশ দিয়ে মানুষকে মানুষ করা যায় না...দরদ নিয়ে মানুষকে বোঝা চাই। তা ছাড়া নভেলিস্ট আর মরাল প্রাচীরদুজনের কাজ এক নয়। নভেলিষ্ট শুধু সকলের সামনে ধরবেন সমাজ বলো, ধর্মাচার বলো, নীতি বলো...এসবের দোষত্রুটির জন্য মানুষ কতখানি ব্যথা-বেদনা নিগ্রহভোগ করছে। তাই পড়ে যাঁরা সমাজতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁরা চিন্তা করুন... সে সব দোষত্রুটি কি করে দূর ক'রে মানুষকে সুখী করা যায়, তার উপায় বাৎলে দিন।
>
> এ-কথা তিনি প্রায় বলতেনযদি উপন্যাস লেখো মরালিস্ট সেজো না। দোষেগুণে মানুষ যা, সেইভাবে তার কথা লিখো এবং উপদেষ্টার আসন নিয়ো না কখনো। উপন্যাস লেখবার সময় তাঁর এ-কথা আমি পারতপক্ষে ভুলিনি।[১৩]

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মৌলিকতা প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—তিনি বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে সমস্ত উপাদানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার এই বিশেষত্বগুলির কতটা পূর্বসূচনা পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা তাঁহার অনন্যসুলভ মৌলিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিষিদ্ধ, সমাজ বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ণ-তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি

ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙালির মনের সংকীর্ণ গণ্ডি বহুদূর ছাড়াইয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে যে স্রোতোহীন, শুষ্কপ্রায় খাতের মধ্য দিয়া অলস-মন্থর গতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতেছিল, তিনি সেখানে বহিঃসমুদ্রের স্রোত বহাইয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছেন, নূতন ভাবের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে পূর্ববর্তী উপন্যাস-সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ অতি সামান্য। কিন্তু ইহাই তাঁহার উপন্যাসের একমাত্র বিষয় নহে। তাঁহার উপন্যাসের আর একটি দিক আছে যেখানে তিনি পুরাতন ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, যেখানে পুরাতন সুরেরই প্রাধান্য। তাঁহার অনেক উপন্যাসে আধুনিক প্রেম-সমস্যার আদৌ ছায়াপাত হয় নাই, কেবল আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরন্তন ঘাত প্রতিঘাতই আলোচিত হইয়াছে।[১৪]

এই কথাসাহিত্যিকের উপন্যাসগুলির পরিণতি বিষাদ ময়। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে মৃত্যু দিনে। সমাজে যা নিষিদ্ধ, তাই ঔপন্যাসিকের রচনার স্বক্ষেত্র। নিষিদ্ধ প্রেম যেন তাঁর বীক্ষাণাগার। রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতাকে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনার কাজে ব্রতী ছিলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রনাথ বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই বিগত যুগের সাহিত্যধারার পদে পুষ্পাঞ্জলী দিয়েছেন, নবীন কোনো মন্ত্র নবীন প্রজন্মের জন্য তৈরি করতে পারেননি। এই যুগ বা সময়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সাফল্য অর্জন করলেন প্রেমের বিশ্লেষণে। সমাজ বিগর্হিত প্রেমকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সহানুভূতি আকর্ষণ করা।[১৫] আর তাতেই তাঁর উপন্যাসে একাধিক মৃত্যু ঘটনা ও চরিত্রের অভিমুখ বদলে দিয়েছে বারেবারে। মৃত্যু গুলি কাঙ্খিত ছিল না। সমাজ ব্যবস্থায় অপরের মঙ্গলার্থে, দশের জন্য একের বলি দিতে ঔপন্যাসিকের কলম একবারের জন্য থামকে যায়নি। শুধু আত্মস্বার্থ চরিতার্থ নয়, চরিত্রের পতন ধ্বংস ও মৃত্যু দেখেছেন পাঠকের চোখ দিয়ে। তাতেই তিনি মানুষের সস্তা দরে চোখের জল কিনে নিয়েছেন।

তাঁর 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) উপন্যাসে নীলাম্বর ও বিরাজের মৃত্যু ঘটনার উল্লেখ আছে। তবে উপন্যাসে বিরাজের মতোই উপন্যাসের কাহিনিকে আরো বিষাদঘন করেছে। মনে হয় নীলাম্বর ও বিরাজের দাম্পত্য জীবনে সন্দেহ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি হওয়াই মৃত্যুর অগাধ প্রীতি থেকে ঈর্ষা ও অভিমানজাত সন্দেহ এবং পরিণামে বিচ্ছেদ বিরাজকে বিপথগামী করেছে। তার সমুচিত দণ্ড সে পেয়েছে ঠিকই কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার পর পুনরায় স্বামীসঙ্গ পেয়েছে। তাঁর মৃত্যুর আগে স্বামীর কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যেন সমকালীন সমাজে সতীত্ব—অসতীত্বের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে এনেছে। বিরাজের মৃত্যু আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে। স্বামী-ননদ-ভাজের সামনে সকলকে কাঁদিয়ে তার মৃত্যু হল।[১৬]

আবার 'শ্রীকান্ত-১মপর্ব'-(১৯১৭) উপন্যাসে শাহজীর মৃত্যু কী ভাবে এক নারীকে সংস্কারের দোলাচলে ফেলে দিয়েছে তা অন্নদা দিদিকে দেখলেই বোঝা যায়। শাহজী খুনী জানা সত্ত্বেও শুধু ভালোবাসার ওপর আস্থা রেখে কূলমর্যাদা ত্যাগ করে তার সাথে সংসার সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল। সে কারণেই হয়তো শাহজীর মৃত্যুর পর তিনি লোক সমাজে আর ফিরে যাননি। এমনকি ইন্দ্র তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেও অন্নদা তাতে রাজি হয়নি। আপন বৈধব্য যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়ে

নিভৃতে থাকতে চেয়েছে। আর এখানেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- কী বিশেষ অবস্থার মধ্যে তাঁহার পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহা খুব নিপুণভাবে বিবৃত করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাঠকের স্বাধীন বিচারের প্রার্থনা করেন।[১৭] এক হিন্দু নারী স্বামীর হাত ধরে জীবনের সাগরে পাড়ি দিলে তার আর ফেরার উপায় থাকে না। তাই একথা অনায়াসে বলা যায় শাহজীর মৃত্যু অন্নদাকে বিবাগি করেছে। শাহজীর মৃত্যু এই কাহিনিতে অন্নদা—উপাখ্যানের সমাপ্তি।[১৮]

তাঁর অপর 'দেবদাস' (১৯১৭) উপন্যাসে দেবদাসের মৃত্যু কতকটা ইচ্ছাকৃত মৃত্যু বরণ। প্রেম, সেবা তার জীবনে কোনটাই চিরস্থায়ী হয়নি। তাই সবকিছুকে পিছনে ফেলে অবহেলার মৃত্যুতেই তার অন্তিম স্থান নির্ধারিত হয়েছে। পার্বতীর বিয়ে মেনে নিতে পারেনি দেবদাস। কারণ তার বিয়ে হওয়ার পরেই দেবদাস উপলব্ধি করে ভালোবাসার কী উন্মাদনা। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত দেবদাসের এই মানসিকতা সম্পর্কে বলেছেন—অপ্রাপ্তবয়স্ক এক উন্মাদ প্রেমিক, চূড়ান্ত ভাবপ্রবণ, প্রেমিকা পার্বতীকে হারিয়ে সে ক্রমিক আত্মহননের দিকে চলে যায়।[১৯] পার্বতীর দুঃখ ভুলতে চন্দ্রমুখীর কাছে গিয়েছিল দেবদাস। কিন্তু অন্তরে গোপনে লালিত পার্বতীর প্রেম তাকে চন্দ্রমুখীর কাছে পৌঁছোতে দেয়নি। চন্দ্রমুখীর কাছে সে স্নেহ চেয়েছে, দেহস্পর্শ চায়নি। বারবার তার পুরোনো প্রেম তাকে অস্থির করেছে। দেবদাসের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—দেবদাস নিরাশ প্রেমের তাড়নায় নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতা-স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছে ও পরিণামে ঘৃণিত ও শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ করিয়েছে।[২০] হাতিপোতা যেন দেবদাসের কাছে ছিল মৃত্যু নিয়তি। দেবদাসের মৃত্যু পার্বতীকে এতটাই চঞ্চল করেছিল যে লোকলজ্জা উপেক্ষা করে সে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছে। দেবদাস শূন্য পার্বতী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। দেবদাকে দেখা তার হয়নি। হয়তো লেখকই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে দেবদাস ও পার্বতীকে এই সময় সামনাসামনি আনতে চায়নি।

পরবর্তী উপন্যাস 'চরিত্রহীন'(১৯১৭)-এ মৃত্যু ঘটনা আছে হারানের, সুরবালার ও উপেন্দ্রর। এই তিনটি মৃত্যু উপন্যাসে ঘটনাকে আন্দোলিত করেছে। হারানের মৃত্যুতে তাঁর মার আর কাশী যেতে যেমন বাধা থাকেনি, অপরদিকে কিরণময়ী তার কামনার জাল বিস্তার করতে পেরেছে। অন্যদিকে সুরবালার মৃত্যু উপেন্দ্র ও কিরণকে কাছাকাছি এনেছে। স্ত্রীর মৃত্যুতে কিছুটা শুরুতে দুঃখ পেলেও সেই দুঃখ মুহূর্তে সে কাটিয়ে উঠেছে কিরণের আকর্ষণে। তাই স্ত্রীর মৃত্যু ভুলে থাকতেই কয়েকদিন পর থেকে উপেন্দ্র পুনরায় কাছারি যেতে শুরু করেছিল। তবু স্ত্রীর মৃত্যুশোক কি এত সহজে ভোলা যায়। সেই শোকই উপেন্দ্রকে রোগাক্রান্ত করেছে। পরিণতি উপেন্দ্রর মৃত্যু। সুবালা আগেই মরেছে। মানুষের ভারসাম্যহীন চিত্তোদ্বেলতা, নীতিভ্রষ্ট কামনার অগ্নিশিখা শান্তিবারি বর্ষণে নিভিয়ে দিয়ে সেবা-প্রীতির একটি কল্যাণী বাতাবরণ তৈরি করে আদর্শ দম্পতি বিদায় নিয়েছে।[২১] যে সাবিত্রী আগাগোড়া উপেন্দ্রর চোখে কুলটা ছিল, অন্তিমে সেই ধারণা ভেঙ্গে যাওয়ায় উপেন্দ্র তার কোলে নিশ্চিতে মৃত্যুবরণ করেছে। তবে উপেন্দ্রর মৃত্যু সকলকে বিচলিত করলেও উন্মাদিনী কিরণময়ীকে করেছে উদাসিনী। সকলে যখন উদাস কণ্ঠে কাঁদতে থাকে, তখন উন্মাদিনী কিরণময়ী নিশ্চিতে ঘুমাতে যায়। এ ঘুম যেন প্রশান্ত পরিণতির চিহ্ন-উত্তরণের সাময়িক অবসান।

উৎসের সন্ধানে

১. প্রশান্ত প্রামাণিক : মৃত্যু : দর্শন ও বিজ্ঞান, জ্ঞান-বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ। কলকাতা বইমেলা, ২৬ জানুয়ারি, ২০০০, পৃ. ২২

২. শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৪, পৃ. ৪৭

৩. Samuele Bacchiocchi-Immorality or Resurrection' : A Biblical Study on Human Nature And Destiny-Chapter-IV, P. 123, THE BIBLICAL VIEW OF DEATH-Biblical Perspectives, 4990 Appian Way Berrien Springs Michigan-49103/2001

৪. শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য : 'সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়'গ্রন্থ থেকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-৪৭৯।

৫. তদেব : পৃ-৪৭৯-৪৮০

৬. দেবেশকুমার আচার্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ (১৮০০-১৯৬০), গ্রন্থ থেকে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ৪৫৪

৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৬-২০০৭, পৃ-৫৫১।

৮. দেবেশকুমার আচার্য : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ' (১৮০০-১৯৬০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৭ পৃ-৪৫৫।

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৬-২০০৭, পৃ. ৫৫২

১০. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৫ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১১, পৃ. ৩৩০

১১. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' ৩র্থ খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ২৭-২৮

১২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৯৬

১৩. অজিতকুমার ঘোষ : 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার—গ্রন্থ থেকে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৯, পৃ. ৪৩

১৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃ. ১২৩

১৫. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্য চট্টোপাধ্যায় : 'সাহিত্যের রূপরীতি', প্রজ্ঞাবিকাশ। কলকাতা। ২০০৯, পৃ. ৮৪

১৬. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' ৩য় খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪০

১৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮-২০১৯, পৃ. ১৩৭

১৮. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' ৩য় খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৮৯

১৯. তদেব : পৃ. ১৩৫

২০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮-২০১৯, পৃ. ১২৮

২১. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' ৩য় খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৪৮

‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাস : সংরূপ সন্ধানে

নম্রতা বিশ্বাস

আধুনিক কথাসাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে যায় ব্যোমকেশ বক্সীর কথা। কিন্তু অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস’ গ্রন্থ থেকে জানা যায়—“শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে চতুরঙ্গ বাহিনীর অধীশ্বর-ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্প, গোয়েন্দা গল্প, সামাজিক গল্প, কবিতা—চার ক্ষেত্রই তাঁর অপ্রতিহত অভিযান।”[১] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে পরে ‘কালের মন্দিরা’, ‘গৌড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’, ‘কুমারসম্ভবের কবি’, ও ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’। লেখক ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ (নভেম্বর ১৯৬৫/অগ্রাহায়ণ ১৩৭২) উপন্যাসটি ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দের সমকালিক বিজয়নগর রাজ্যকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে তিনটি নৌকা বয়ে চলেছে সামনের দিকে এইভাবে। উপন্যাসের নাম নদীকেন্দ্রিক যদিও কিন্তু এই উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি রোমান্টিসিজম। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় ঐতিহাসিক চরিত্র যদিও কিন্তু মুখ্য উপন্যাসে গুলবর্গার অধিবাসী অর্জুনবর্মা ও কলিঙ্গ রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার প্রেমকাহিনী বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মার প্রেমকাহিনি মোটেই সহজ ছিল না অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁদের প্রেম সফলতা পায়।

কলিঙ্গারাজ ভানুদেব তার কন্যা বিদ্যুন্মালাকে যুদ্ধের পরে শান্তির শর্তানুসারে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের সাথে বিবাহর্থে পাঠালেও বিদ্যুন্মালা নিজে থেকে দেবরায়ের সাথে বিবাহ করতে চায়নি। বিদ্যুন্মালার কাছে প্রতিপত্তি থেকেও বেশি গুরুত্ব ছিল ভালোবাসা এই কারণে বিদ্যুন্মালাকে বলতে শোনা যায়—“যে স্বামীর তিনটে বৌ আছে তাকে কোনদিন ভালবাসতে পারবো না।”[২] বিদ্যুন্মালার কাছে দ্বিতীয় দেবরায়ের থেকেও বেশি প্রিয় ছিল অর্জুনবর্মা।

উপন্যাসের কিছু দূর গিয়েই দেখা যায় ঝড়ের প্রসঙ্গ, বলা যেতেই পারে ঔপন্যাসিক বিদ্যুন্মালার সঙ্গে অর্জুনবর্মার প্রেমকাহিনির বীজ রোপণ করার জন্যই ঝড়কে মাঝে নিয়ে এসেছেন। ঝড়ের প্রভাবেই বিদুৎমালা ও অর্জুনবর্মা মাত্র এই দুইজনই অজ্ঞাত এক দ্বীপে গিয়ে পরেছিল। এবং অন্ধকারের মধ্যে ধুনীর আলোতে তাঁদের নৌকাতে আশ্রয় প্রাপ্ত এই যুবকটিকে দেখে বিদুৎমালা আনন্দিতই হয়েছিল—

> সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিদ্যুৎমালা অর্জুনবর্মার দিকে চাহিলেন মনে হইল যেন সুদূর ধনীর আলোকে অর্জুনবর্মার আকৃতি ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে। এতক্ষণ বিদুৎমালার অন্তরের সমস্ত আবেগ যেন মূর্ছিত হইয়া ছিল, এখন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় একটু আনন্দ স্ফুরিত হইল—অর্জুনবর্মা! আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি।[৩]

বিদ্যুন্মালা কোনোভাবেই চাইছিল না দ্বিতীয় দেবরায়ের সাথে বিবাহ করতে, এই কারণে যখন সে জানতে পারল বিবাহ হতে তিন মাস বাকী তখন তিনি একটু খুশিই হয়েছিল—"বিদ্যুন্মালা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিলেন। শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন অন্তত তিন মাসের জন্য পরিত্রাণ।"[৪] বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মার প্রায় রোজই দেখা হতো পম্পাপতিস্বামীর মন্দিরে, যাওয়ার সময়, কোনোদিন দেখা না হলে বিদুৎমালা যেন ছটফট করে উঠত। অন্যদিকে অর্জুনবর্মারও যে বিদুৎমালার প্রতি আন্তরিকতা জন্মেছিল সেটি ঔপন্যাসিকের উক্তি থেকেই বোঝা যায়—"আজ বিদুৎমালা ও মণিকঙ্কণা কখন পম্পাপতিস্বামীর মন্দিরে, গিয়েছেন দেখা হয় নাই।"[৫]

বিজয়নগরের রাজা যতই কলিঙ্গ রাজকুমারীদের জন্য যত্নের ব্যবস্থা করুক আর বিবাহে উপস্থিত বাঁধা দূর করার জন্য বিদুৎমালাকে পম্পাপতিস্বামীর মন্দিরে পূজা দিতে পাঠাক, বিদুৎমালা সবসময় যেন অর্জুনবর্মাকে খুঁজে বেরাতো। বিজয়নগরে এসে বিদুৎমালার বৈমাত্রেয় বোন রূপ বান্ধবী মণিকঙ্কণার যতটা না রাজা ও রাজগৃহের সমস্ত কিছু নিয়ে কৌতুহল দেখা গিয়েছে বিদুৎমালার মধ্যে তার সিকি অংশও দেখা যায়নি। রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের যে তিনজন রানি ছিল তাদের নিয়েও বিদুৎমালার মধ্যে দেখা দিয়েছিল উদাসীনতা। বেশকিছু দিন ধরে অর্জুনবর্মার সাথে কোনো সাক্ষাৎও হচ্ছিল না, সে যে কারও কাছে কিছু শুনবে সে সাহসও আসছিল না ফলে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পরছিল রাজকুমারী। রাজার অবর্তমানে এইরকম মনোকষ্ট নিয়েই একদিন বিদুৎমালা দাসীর সাথে রাজগৃহের বাইরে বেরিয়ে পরেন। অনেক দূরে গিয়ে ফিরে আসেন যদিও, পরদিন তিনি নিজেই যান ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই তাঁর অর্জুনবর্মার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়—"বিদ্যুন্মালা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর কোনো কথা না বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উদ্বেগের সঞ্চিত বাষ্প অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া আসিল।"[৬] এরপরই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় বিদুৎমালা মনঃস্থির করে অর্জুনবর্মার কাছে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করবে—

> বিদ্যুৎমালা একটি রাত্রি এবং একটি দিন দুঃসহ অধীরতার মধ্যে কাটিল কিন্তু তিনি মনঃস্থির করিয়া দিয়াছেন বায়ুতাড়ির হালভাঙ্গা নৌকায় ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে কোনো ফল হইবে না; নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপিইয়া পড়িয়া তীরের দিকে যাইতে হইবে। এবার অগাধ জলে সাঁতার।[৭]

অন্যদিকে বিদ্যুন্মালার কাছ থেকে অর্জুনবর্মা প্রেমের প্রস্তাব পেয়ে খুশি হবেন, নাকি দ্বিতীয় দেবরায় যিনি এক অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকে তাঁর দেশ রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর সাথে প্রতারণা করার ভয়ে দুঃখ বোধ করবে। ফলে অর্জুনবর্মার মধ্যে দেখা দিয়েছিল এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব—

> গভীর দুঃখ ও বিজয়োল্লাস একসঙ্গে অনুভব করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার তাহার জীবনে কেন ঘটিল। বিদ্যুন্মালাকে সে দেখিয়াছে শ্রদ্ধার চোখে, সম্ভ্রমের চোখে। কিন্তু তিনি মনে মনে তাহাকে কামনা করিয়াছেন। তিনি রাজকন্যা, রাজার বাগদত্তা বধূ; আর অর্জুন অতি সামান্য মানুষ কী করিয়া ইহা সম্ভব হইল। তারপর এখন কী হইবে ইহার—পরিণাম কোথায়?[৮]

অনেক দোলাচল নিয়ে অর্জুনবর্মা বিদুন্মালাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসলেও রাজার সাথে তিনি যে কোথাও একটা প্রতারণা করছে এই অনুভূতি তাঁকে পীড়ন দিতে লাগলো—

> কিন্তু প্রেম যতই গভীর হোক, তাহার স্বারা অপরাধ বোধ তো দূর হয় না। প্রেম তখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে তখন মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার করিয়া চলিয়াছে-আমি রাজার সহিত কৃতঘ্নতা করিয়াছি; তিনি আমার অন্নদাতা, যিনি আমার প্রভু, তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি।[৯]

অর্জুনবর্মার এই পীড়নের কারণেই সে বিদুন্মালাকে ভালোবাসলেও তাঁর কাছে ব্যক্ত করতে পারতো না এবং তার মুখে একটা কথাই ছিল সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে রাজার সঙ্গে। উপন্যাসে দেখা যায় অর্জুনবর্মার ভয়ই একদিন সত্যি হয়ে যায়। বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মাকে একসাথে দেখে ও তাঁদের কথা শুনে ফেলে পিঙ্গালা, সে সব কথা রাজাকে গিয়ে জানায়—"তখন পিঙ্গালা যাহা দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল, রাজাকে শুনাইল। বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রাখিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিল।"[১০] এরপরই উপন্যাসের আসল ক্লাইম্যাক্স লক্ষ করা যায়, বিদুৎমালার ভালোবাসা অর্জুনবর্মা গ্রহণ করেও যেন করছিল না কারণ তার ভালোবাসার মাঝে ছিল ভয়। কিন্তু যেদিন বিদ্যুন্মালা বলরামের অনুপস্থিতিতে অর্জুনকে নিজের বাহুতে বেষ্টন করল সেইদিন সে সব ভুলে বিদ্যুন্মালাকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করল—"হিয়ে হিয়ে রাখনু। যুগ কাটিল কি মুহূর্ত কাটিল ধারণা নাই। হৃদয় কোন অতলস্পর্শ অমৃতসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রতি অঙ্গে রোমহর্ষণ।"[১১] এই অবস্থায়ই তাঁরা দেখতে পেল রাজা দ্বিতীয় দেবরায় তাদের সামনে দাঁড়ানো। অর্জুনবর্মার জীবনে যেন প্রেম ও ভয় দুইই একদিন সার্থকতা পেল। রাজা নির্বাসন দিলেন অর্জুনবর্মাকে ও বিজয়নগরে যদি তাঁকে দেখেন তো মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত। রাজা বলিলেন—

> মৃত্যুদণ্ডই তোমার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে, আমিও তোমার প্রাণরক্ষা করলাম। তাও এই দণ্ডে আমার রাজ্য ত্যাগ কর। অহোরাত্র পরে যদি তোমাকে বিজয়নগর রাজ্যে পাওয়া যায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে। বিজয়নগরে তোমার স্থান নেই।[১২]

কিন্তু ঔপন্যাসিক হয়তো বিদ্যুন্মামালা ও অর্জুনবর্মার প্রেমকাহিনি এইভাবে সমাপ্ত করতে চাননি এই কারণে অর্জুনবর্মা বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েও পুনরায় ফিরে আসেন বাহমণী সৈন্যদলের আক্রমণের বার্তা নিয়ে। অর্জুনবর্মার জন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্য রক্ষা পাওয়ার হেতু তাঁর প্রতি ক্রোধ রুদ্ধ করে তাঁকে পুরষ্কারস্বরূপ বিদ্যুন্মালার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানোর সম্মতি দেন রাজা দ্বিতীয় দেবরায় এবং তুরঙ্গবাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন—

> আমার আদেশে তুমি বিজয়নগর থেকে নির্বাসিত হয়েছিলে। সে আদেশ আমি প্রত্যাহার করলাম। তুমি দেশভক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছ। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে মাতৃভূমিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। তোমাকে আমার তুরঙ্গ বাহিনীর সেনানী নিযুক্ত করলাম। এই নাও তরবারি।[১৩]

রাজা দ্বিতীয় দেবরায় সত্যিই ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কারণে বিদ্যুন্মালার উদ্যত আচরণে তিনি তাকে কোনো শাস্তি দেননি এবং উপন্যাসের শেষ পর্যায় এসে দেখা যায় রাজা বিদ্যুন্মালাকে প্রশ্ন করেন তাঁকে তিনি বিবাহ করতে চান কি না। কিন্তু বিদ্যুন্মালা প্রশ্নের উত্তর ঠিক ভাবে না দিতে

পারলেও রাজা তাঁর মনোভাব বুঝে বলেন—"যাহোক, তুমি যখন পণ করেছে অর্জুনকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না তখন তাই হবে, অর্জুনের সঙ্গেই তোমার বিবাহ দেব।"[১৪]

রাজা দ্বিতীয় দেবরায় সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস গ্রন্থে বলেছেন—"মহারাজ দেবরায়-চরিত্রটিকে লেখক নিপুণতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন। তিনি স্থিতধী, তিনি—প্রজাবৎসল, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, তিনি বিচারপরায়ণ।"[১৫] রাজা দ্বিতীয় দেবরায় বিদ্যুন্মালার আচরণে ও অর্জুনবর্মার বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হলেও বিদ্যুন্মালার বৈমাত্রেয় বোন রূপ সঙ্গীর প্রেমলাভে আনন্দিতই ছিলেন—"মণিকঙ্কণার সহিত রাজা একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন। ইহা পতি-পত্নীর স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ নয় যেন তদপেক্ষা নিগূঢ়-ঘনিষ্ঠ একটি রসোল্লাস।"[১৬]

উপন্যাসের মধ্যে মণিকঙ্কণা ও দ্বিতীয় দেবরায়ের মধ্যে এক নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বলা যেতে পারে রাজার অন্য তিন রানিদের থেকে মণিকঙ্কণাই হয়ে উঠেছিল অধিক প্রিয়, রাজার তিন রানি থাকলেও তাদের প্রতি রাজার শুধু কর্তব্য ছিল আর যে ভালোবাসা ছিল তা মণিকঙ্কণার প্রতি যে অনুভূতি থেকে ভালোবাসা জন্মেছিল সেই রকম ছিল না। মণিকঙ্কণা রাজাকে প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়—"সে মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া পলকের মধ্যে হৃদয় হারাইয়াছে এবং হৃদয় হারানোর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আছে।"[১৭] মণিকঙ্কণা সত্যিই সরল প্রকৃতির মেয়ে এই কারণেই তার মুখে শোনা যায়—

> পারব না! বলিস কি তুই! তাঁকে অন্য বৌরা যতখানি ভালোবাসবে আমি তার চেয়ে ঢের বেশি ভালোবাসব। আমার বুকে ভালোবাসা ভরা আছে। যিনিই আমার স্বামী হবেন তাঁকেই আমি প্রাণভরে ভালবাসব।[১৮]

মণিকঙ্কণা বৈমাত্রেয় ভগ্নী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দুই অন্তরঙ্গ সঙ্গী অতীত আর কিছু না কিন্তু দুইজনের মন ভিন্ন ভিন্ন। একজনের কথায় যে পুরুষই তাঁকে গ্রহণ করবে তাকে সে নিজের করে নেবে তার অগাধ ভালোবাসা দিয়ে। মণিকঙ্কণা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিজের ভালোবাসার উপর আস্থা রেখে নিজের করে নিতে চায় তাঁর স্বামীকে—"পুরোপুরি পাওয়া কাকে বলে ভাই স্বামী তো স্ত্রীর সম্পত্তি নয় যে কাউকে ভাগ দেবে না। বরং স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তি।"[১৯]

অন্যজন কোনোভাবেই চায় না যে তাঁর মনের মানুষ তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসুক। এই কারণে বিদ্যুন্মালা বলে ওঠে—"স্ত্রী যদি স্বামীকে পুরোপুরি না পায় তাহলে বিয়ের কোনো মানেই হয় না।"[২০] কোনো মেয়েই নিশ্চই চাইবে না তার ভালোবাসার মানুষটি তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসুক। এই দুই প্রেমকাহিনির পাশাপাশি উপন্যাসে বলরাম ও মঞ্জিরার প্রেমকাহিনিও চোখে পরে, এই দুই চরিত্রও ভাগক্রমে রাজবাড়ির অংশ। কলিঙ্গ রাজকন্যাদের সঙ্গে বলরামও যাচ্ছিল বিজয়নগরে, যাওয়ার পথেই অর্জুনবর্মার সাথে বলরামের পরিচয় ঘটে, এরপর থেকে বলরাম কোনোভাবেই অর্জুনবর্মার সঙ্গ ছাড়েনি যতই বিপদ আসুক না কেন। বলরামকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রেক্ষণ বলা যায়, তাঁর নাম শুনেই বোঝা যায় তিনি বাঙালি। বলরাম জাতিতে ছিল কর্মকার এবং তিনি লোহার জিনিস তৈরিতেও ছিল নিপুণ। তাঁর তৈরি জিনিসের মধ্যে আশ্চর্য বস্তু ছিল ছোটো কামান অর্থাৎ পিস্তল, বর্তমান সময় এই জিনিসের যত না প্রচলন আছে তখনকার দিনে এই রকম ছোটোকামান যে হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না, রাজা এই আশ্চর্য বস্তু

দেখে বলরামকে এই কামান বানানোর কাজে নিযুক্ত করেন।

রাজা অর্জুনবর্মা ও বলরামকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়ায় তাদের থাকার ব্যবস্থা অতিথিশালা থেকে গুহার মধ্যে করেন। গুহায় থাকলেও তাঁদের আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি ছিল না, রাজবাড়ি থেকে তাদের জন্য খাদ্য দ্রব্য আসত, আর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসত এক দাসী। সে আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকত শেষ হলে উচ্ছিষ্ট নিয়ে চলে যেত, প্রথম দুই তিন দিন ভালোভাবে না দেখলেও একদিন বলরামই তাঁর সঙ্গে আগবাড়িয়ে কথা বলে এবং জানা যায় মেয়েটর নাম মঞ্জিরা এবং এই নামের অধিকারী হয়ে সে বাঁশি বাজাত ও জানে। এরপর মঞ্জিরা খাদ্য নিয়ে আসার সাথে বাঁশিও নিয়ে আসত, সে বাঁশি বাজাতো আর বলরামের গান করতো। বলরাম লোহার জিনিস বানানোতে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি গান করতেও জানত। উপন্যাসের বেশিরভাগ গান বলরামের কণ্ঠেই গীত হয়েছে—"সা বিরহে তবে দীনা/মাধব মনসিজ—বিশিখভয়াদিব/ভাবনায় জুয়ি লীলা।"[২১]

যখনই বললাম গান করত তখন সে মঞ্জিরার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে হাসত। এখান থেকেই তাদের প্রেমের সূচনা হয়। এইভাবে কিছুদিন চলার পরেই ঔপন্যাসিক তাদের প্রেমকাহিনি কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যান মঞ্জিরার দাদাকে অসুস্থ দেখিয়ে, মঞ্জিরা বাড়ি চলে যায় সেই সূত্রে বলরাম ও মঞ্জিরার মধ্যে আসে দূরত্ব। মঞ্জিরার অনুপস্থিতি বলরামকে বিচলিত করে তোলে, একদিন বললাম মঞ্জিরার বাড়ির খোঁজ নিয়ে সেখানে যায়। এরপর থেকে বলরাম প্রায়ই যেত মঞ্জিরার বাড়ি, একদিন মঞ্জিরার বাবা বীরভদ্রের সঙ্গে দেখাও হয়ে যায়। বলরাম সুযোগ বুঝে তার মনের কথা বীরভদ্রকে বলে বসে—"আপনার কন্যা মঞ্জিরাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।"[২২]

বীরভদ্রের অনুমতি থাকলেও তিনি বলেন মঞ্জিরা ও রাজা যাঁর গৃহে মঞ্জিরা কর্মধীন তিনি রাজি থাকলেই এই বিবাহ সম্ভব। বীরভদ্র বলিলেন—"তা ভাল। কিন্তু এ বিষয় মঞ্জিরার মন জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা, মঞ্জিরা রাজপুরীতে কাজ করে, রাজাই তার প্রকৃত অভিভাবক। তিনি যদি অনুমতি দেন আমার আপত্তি হবে না।"[২৩] আর মঞ্জিরা তাঁর অবস্থা ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন এইভাবে—"মঞ্জিরা আড়াল হইতে সব শুনিয়াছিল। তাহার দেহ ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হইল, মন আশার আনন্দে দূর দূর করিতে লাগিল।"[২৪]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সব উপন্যাসই শেষ হয় Happy Endings দিয়ে, 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসেও একই নিয়ম প্রয়োগ করেছেন লেখক। শেষপর্যন্ত উপন্যাসে সমস্ত কূট কৌশল, প্রেম বিদ্বেষ নিঃশেষ হয়ে শিষ্টের পালন হয়েছে। উপন্যাসের শেষে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথির দিন একসাথে তিনটি বিবাহ হতে দেখা যায়। যদিও বিবাহের পূর্বে বিদ্যুন্মালার কাছে রাজা শর্ত দিয়েছিলেন বিবাহের আগে বিদ্যুন্মালাকে তাঁর পরিচয় গোপন করতে হবে, কারণ বিজয়নগরের প্রজারা জানত রাজার সঙ্গে কলিঙ্গ রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার বিবাহ হবে, বিদ্যুন্মালা তাঁর ভালোবাসার মানুষটির জন্য এই শর্ত মাথা পেতে নেন আর অর্জুনবর্মাকে বিবাহ করেন মণিকঙ্কণার নাম নিয়ে। আর রাজা মণিকঙ্কণার নাম রাখেন বিদুৎমালা এবং তাঁকে বিবাহ করেন। অন্যদিকে বলরামের সঙ্গেও মঞ্জিরার বিবাহ হয় রাজার অনুমতিতে। ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েও 'ভুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের মধ্যে প্রেমের সার্থকতার জন্য যেসকল কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তাতে সত্যিই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে রোমান্টিক উপন্যাসের দ্যোতক।

উৎসের সন্ধানে

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের : 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং., প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৪, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২১৩

২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৬, পৃ. ১০

৩. তদেব : পৃ. ৩৩; ৪. তদেব : পৃ. ৬০

৫. তদেব : পৃ. ৭৪; ৬. তদেব : পৃ. ৯৯

৭. তদেব : পৃ. ১০০; ৮. তদেব : পৃ. ১০২

৯. তদেব : পৃ. ১০৪

১০. তদেব : পৃ. ১২২

১১. তদেব : পৃ. ১২৩

১২. তদেব : পৃ. ১২৪

১৩. তদেব : পৃ. ১৪৮

১৪. তদেব : পৃ. ১৪৩

১৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৪, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২২১

১৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', বুকল্যাও প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৬, পৃ. ১১৪

১৭. তদেব : পৃ. ৬৮

১৮. তদেব : পৃ. ১০

১৯. তদেব : পৃ. ১০

২০. তদেব : পৃ. ১০

২১. তদেব : পৃ. ৯৪

২২. তদেব : পৃ. ১১৮

২৩. তদেব : পৃ. ১১৮

২৪. তদেব : পৃ. ১১৮-১১৯

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ সমকালীন সমাজভাবনা

মনিকা মহাপাত্র

ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও তার রচনায় ফুটে উঠেছে দলিত বঞ্চিত মানুষগুলোর কথা। তাদের হাহাকারগুলি কেই কবি শান দিয়ে তৈরি করেছেন তার সাহিত্যক্ষেত্র। তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে সমাজের গভীর ক্ষতে। শৈশব থেকেই গ্রাম্য জীবনের দারিদ্রতা, অনাহার, কঠোর পরিশ্রম, শাসক গোষ্ঠীর অন্যায় অবিচার তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর উপন্যাসে দারিদ্রতাকে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রের আঁতের কথা বিশ্লেষণ করে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ যে ‘পথের পাঁচালী’ উপস্থাপন করেছেন পাঠক মহলে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এই উপন্যাসের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজ চেতনার সম্মুখীন হওয়া যায়।

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে হরিহরের সেইরকম আয় হত না। তিনি পূজা-অর্চনা করে এবং কথকতা করে যেটুকু আয় করতেন সেখানে সংসার চলছে না। বিভূতিভূষণ এই সমকালে দাঁড়িয়ে যে দরিদ্রতা অসহায়তা দেখিয়েছেন তা একটা নিম্নমুখীনতার ছাপ রয়েছে। অপু-দুর্গা কখনও জিলিপি সন্দেশ খায়নি তারা গাছের ফল খেয়েই মিষ্টি তেতো স্বাদ অনুভব করেছে। সময়কালটা এতটাই নিম্নবিত্ত, দরিদ্র সেটা এই উপন্যাস পড়ে উপলব্ধি করা যায়।

কিছু বেশি টাকা উপার্জনের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরমুখীনতা বা একটা পলায়নবাদের চিত্রণ ও দেখা যায় এই সময়কালে। গ্রামীণ অর্থনীতির এত বড়ো সংকট সেটা মেটানোর জন্য গ্রামের মানুষ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হরিহরের কাশীতে গিয়েও একই অবস্থা শুধু কথকতা করে চলছে না তখন সে ভাবে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে তার কাশীখণ্ডের বই থেকে পুরাণ পাঠ করবেন। এক পদের সঙ্গে আর এক পদ মিশিয়ে কীভাবে শোনানো যায় সেটার চেষ্টা করলেন।

জীবিকার জন্য যে লড়াই সেটাই একটা আর্থসামাজিক দিক হয়ে রয়েছে। তবুও যার দুঃখ তার সারাজীবনই দুঃখ থেকেই যায় দারিদ্রতা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয় গ্রাম থেকে শহরে গিয়েও সেই আশা পূর্ণ হয় না।

নিপীড়িতদের দুঃখ যন্ত্রণা সমকাল ধরে রয়েই গেছে। সমাজের যারা উঁচুশ্রেণির মানুষ তারা কেবল নিম্নবিত্তের ওপর শোষণ করবে। তমরেজের স্ত্রীর চরম হেনস্থা এই শ্রেণীর শোষণের রূপটি প্রকাশ করে। তমরেজের ধানগোলা থাকলেও তমরেজের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সেটা পায় না। জমিদারের কাছে সে নিপীড়িত। অন্নদা রায়ের যে সমাজতান্ত্রিক শোষণ তা এই সমকালে দাঁড়িয়ে বোঝা যায়—

> রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ফ্যাচফ্যাচকরিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্ছে তার সঙ্গে খোঁজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরত দাও—গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে? ও পাঁচ টাকাও উসুল হয়ে রেল, আমার টাকা দেখবো না! ওঁর ছেলে কি খাবে বলে দাও ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা পারিস তো নালিশ করে খোলাগে যা—

সেই সময় নিম্নবিত্ত অসহায় মানুষদের ওপর যে অত্যাচার, নিপীড়ন করেছে শোষকশ্রেণির মানুষ তা এই সমকালে দাঁড়িয়ে বোঝা যায়।

বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে সমকালকে বোঝানোর জন্য এমন ছোটো ছোটো দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলেছেন যেটা সত্যি অনবদ্য। 'পথের পাঁচালী' মানুষের মনে পথের মতো সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলছে।

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পল্লি প্রকৃতি, সামাজিক দাঙ্গা, দরিদ্র, অসহায়, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে লিখলেও বিভিন্ন সমালোচক তাকে নিয়ে নানা মতামত পোষণ করেছেন। বিভূতিভূষণের সময়কালে সাহিত্য,ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ জমজমাট পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকরা সবটাই দখল করে নিয়েছেন। কিন্তু সেখান থেকে উঠে এসে তিনি যে ধরনের উপন্যাস, ছোটোগল্প লিখেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণের উপস্থিতি ও টের পাওয়া যায়। তবুও বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

অনেক সমালোচক বলেন—"বিভূতিভূষণের লেখনীর ভাষা উচ্চাঙ্গের নয়। রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষা মানানসই নয় নিতান্তই সাধারণ সহজ সরল ভাষা।" তার প্রকাশশৈলীর মধ্যে—"কোনো বুদ্ধিমত্তা, বৈদগ্ধতা নেই।" তিনি সাধারণ মানুষের জন্য লেখেন তার সরলতা, তার পল্লি প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা তিনি তার উপন্যাসে স্থাপন করেছেন। যে ভাষা সবাই ভালো ভাবে পড়তে এবং বুঝতে পারবে সেইরকম লেখনীই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা উচিত। অনেক সমালোচক বলেন—বিষয়বস্তু গত ত্রুটি আছে, আদর্শায়িত করার প্রয়োজন আছে। সবার লেখন ভঙ্গিমা যে সমান হবে এমন কোনো কথা নেই। যে যার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এবং অভিনব। 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে সমালোচকরা দুটি অভিমত পোষণ করেছেন—

১. পথের পাঁচালীর কাহিনী অসম্পূর্ণ।
২. প্লট বা কাহিনী নির্মানে শিথিলতা।

'পথের পাঁচালী' কাহিনিগত অসম্পূর্ণতা। আদি-মধ্য মিললেও অন্তের হদিস পাওয়া যায় না। শেষের মধ্যে অবশেষের বাণী ধ্বনিত('চল এগিয়ে যাই') পথদেবতার নির্দেশ বা অনন্তপথ যাত্রী পথিক মানুষ বললে উপন্যাস সম্পূর্ণতা পেত। অপু একটা বড়ো জায়গা দখল করে থাকলেও সে চালিত হয়েছে পথ দেবতার নিদের্শে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটি থামার কাহিনি নয় পূর্ণতর হতে তাকে এগিয়ে চলতেই হয়। অপুকে চলতে হয়েছে অপরাজিত পর্যন্ত। এই অর্থে 'পথের পাঁচালী' অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় না কারণ সবটা মিলে এটা একটা Epic ধর্মী রচনা।

প্লট নির্মানে শিথিলতা বা অসংলগ্নতা। আম আঁটির ভেঁপু অতুলনীয় শিল্পগত প্রয়োজনীয়তা 'পথের পাঁচালী'র সম্পদ বলে মনে করেন। প্রকৃতির সঙ্গে অপুর মনের সাজুয্যতা বিভূতিভূষণের অনন্যতা বলে মনে করা হয়। বিশেষত 'বল্লালী বালাই'কে ছেঁটে ফেলার কথা বলা হয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—'বল্লালী বালাই' অংশটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। 'প্রধান চরিত্র ইন্দিরা ঠাকুরন। সমালোচকরা বলেছেন—তিনি শুধু দরিদ্রতা অবলম্বন করেছেন। দারিদ্রতা দূর করার কোনো পন্থা অবলম্বন করেননি কোনো বিদ্রোহ করেননি। চরিত্রের আঁতের কথা বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু মনোবিশ্লেষণ করেননি।

সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন—"বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনার রহস্যময় পথ পরিক্রমায় অভিযানের আনন্দ আছে। সে পথ রুপ লোক থেকে অতীন্দ্রিয় অরূপ বিশ্বের দিকে দূরবিসপৃত। সেই ব্যপক অথচ গভীর এক বিস্ময়কর চেতনার বিশিষ্টতায় একদিকে বিভূতিভূষণ মহৎ কবি অন্যদিকে নরনারীর প্রাত্যাহিক সুখ—দুঃখ, আশা আনন্দের আপাত তুচ্ছ কাহিনীর সঙ্গে প্রকৃতির রসমাধুর্যের সমন্বয় সাধনে তিনি এক অসাধারণ কথাশিল্পী। বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র গ্রন্থের ভূমিকায় সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গল্পকার বিভূতিভূষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> বিভূতিভূষণের সমকক্ষ অথবা তার চেয়েও নিপুণতর গদ্যশিল্পী হয়তো বাংলা সাহিত্যে আরও দু-একজন ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন কিন্তু তার পরিণত বয়সে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গল্পগুলিতে তিনি যে জাতীয় রসসমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সেই শ্রেণীর রসসৃষ্টি আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে করতে পারবেন এমন আশাও পোষণ করি না।

অনেক সমালোচক বলেন তিনি সমকালের লেখক নন তাঁর লেখনীতে সেই সময়ের কাহিনী বিবৃত হয়নি। আমার মনে হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সমকালীন লেখক। তাঁর চিন্তা-ভাবনায় তার লেখনীতে সেই সময়ের বিষয়বস্তু উঠে এসেছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে যে দারিদ্রতা, অসহায়তা, শেষ জীবনে সর্বজয়ার দাসী বৃত্তি করে খেটে খাওয়া আত্মসম্মান বিকিয়ে না দেওয়া, বিভিন্ন জমিদার, মহাজনদের শোষণ, আর্থিক সংকট, খাদ্যের অভাব এগুলো সবই তো সমকালীন বিষয়। সমকালকে বাদ দিয়ে কোনো উপন্যাস, ছোটোগল্প রচনা হয় না। তার সমস্ত উপন্যাস বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। নারী পুরুষের প্রতি নির্মম অত্যাচার,গ্রামীণ জীবনের চিত্র সবকিছুই তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেছেন। তাহলে কোথায় তিনি সমকালীন লেখক নন সমালোচকদের এই অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করি। কোনো কোনো সমালোচক বলেন তিনি—'Nostalgic' যার বাংলা অর্থ—গৃহাকুল, স্মৃতিবেদনাতুর, অতীত-আর্ত, স্বদেশে ফেরার

আকুলতা সংক্রান্ত। বিভূতিভূষণ ঘরমুখো, তিনি পুরোনো স্মৃতি নিয়ে, পল্লি প্রকৃতি, গ্রামের মানুষদের নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন তার মানে তো এটা নয় যে তিনি যুগের প্রতি বিমূখ। অনেকে বলেন—তিনি যুগপযোগী নয় কিন্তু তিনি এই সময়ে দাঁড়িয়ে সমকালকে নিয়েই লিখেছেন। সমকালকে উপেক্ষা করে তো কিছু লেখা যায় না। তিনি বাস্তব জীবনে যাই দেখেছেন সেটাই তিনি তাঁর লেখার ভাষায় প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন অভিমত পোষণ করলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সমকালীন লেখক নন এই কথাটা স্বীকার করা যায় না বরং দৃঢ়তার সঙ্গে বলা উচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সমকালীন লেখক।

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। তার লেখনশৈলী আমাদের মনের গভীরে গিয়ে পৌঁছায়, আমাদের জাগিয়ে তোলে আর আমাদের মনের অবচেতনায় আদিম যুগ থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যের একটা অব্যক্ত আকাঙ্খা আছে সেইটা আবার যেন জাগিয়ে তোলে। বিভূতিভূষণের গল্প, উপন্যাস এবং সমকালীন চিন্তাধারাকে পাঠক সারাজীবন তার অন্তরে গেঁথে রাখবে। 'পথের পাঁচালী' যেন সবার ঘরে ঘরে পঠিত হয় এই আশা তিনি রাখেন। সবাই সব শিল্পের প্রতি, সবার ভাষার প্রতি, সব মানুষের প্রতি যেন সমান কদর দেখান এটা তিনি করতে চেয়েছেন। বিভূতিভূষণ বলেছেন—

> গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন।এর সকল বাস্তবতাকে,এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতা কে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে মানুষের হট্টগোল,কলকোলাহল যেখানে বেশি; মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে; তাদের সুখ দুঃখ কে বুঝতে হবে।যে বাড়ির পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবন চিত্রই এঁকেছে- চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য।

তথ্যের সন্ধানে

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উপন্যাস সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রথম খণ্ড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২০

২. শ্রী গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : 'বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন ১৯৯৬

২. অধ্যাপক দূর্গাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুনীল কুমার দে : 'পথের পাঁচালী যুগ্ম সমীক্ষা', গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা,প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯

৩. রতন কুমার নন্দী : 'পথের পাঁচালী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শুভ মহালয়া ২০০২, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯

৪. সমরেশ মজুমদার : 'পথের পাঁচালী জীবন দৃষ্টি ও শিল্প রূপ', বিদ্যা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৯

ডাক্তার বনফুলের নির্বাচিত উপন্যাসে ডাক্তারি জীবিকার সংকট

রাকেশ জানা

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান পুর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে। পূর্ণিয়া তখন বাংলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাঁর বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় ডাক্তার। তিনি পূর্ণিয়া মণিহারী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতালে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে ডাক্তারি করেছিলেন। এই পরিবেশে মানুষ হয়ে, ঘরের বড়োছেলে বনফুল ডাক্তারিকেই পেশারূপে বেছে নেন। পরবর্তীকালে তাঁর মেজভাই ভোলানাথ ও তৃতীয় ভাই গৌরমোহন এই ডাক্তারি পেশাকেই গ্রহণ করেছিলেন। ভাগলপুরে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে বসে তিনি ডাক্তারি করতেন। ডাক্তারি তাঁর পেশা হলেও নেশা ছিল সাহিত্য রচনা। তবে তাঁর পূর্বে বাংলায় একজন ডাক্তার সাহিত্যিক এসেছিলেন যিনি বঙ্কিম যুগে 'স্বর্ণলতা' নামক বিখ্যাত উপন্যাসের স্রষ্টা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়তে এসে তিনি মেসে কিছুকাল কাটান। এই মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় গুরুস্থানীয় একজন আদর্শ সাহিত্যিক ডাক্তারের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে তিনি হলেন—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। যার প্রভাব তাঁর জীবনে অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে ষষ্ঠবর্ষে পড়ার সময় বিহারের অধিবাসীদের জন্য নতুন নিয়ম অনুসারে মেডিক্যাল কলেজ খুললে সেখানে ছাত্ররূপে যোগ দেন। বিহারে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার পর তিনি ব্যাঙ্গালোরে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে প্রসূতিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এম. বি. বি. এস পাশ করেন। ড. চারুব্রত রায়ের অধীনে প্যাথলজি ট্রেনিং নিয়ে আজিমগঞ্জের মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি পান। এরপর চাকরি ছেড়ে ভাগলপুরেই নিজস্ব সেরো ব্যাকট্রো ক্লিনিক স্থাপন করে প্র্যাকটিস শুরু করে দেন। বস্তুত কলকাতা ও তার পাশাপাশি অঞ্চলের বিচিত্র মানুষের জীবন তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে থাকে। সাহিত্যে তাঁর হাত

মকশো কবিতা দিয়ে হলেও এই সময়ের মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসরুমে বসে চার-পাঁচটি গল্প লিখে ফেলেন। তিনি মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন রঙের shade-এর প্রকাশে তিনি unpredictable মানুষকেই চিত্রিত করেছেন। তাছাড়া চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণকে অসাধারণ করে বা আপাত অসাধারণকে সাধারণে নামিয়ে বহু চরিত্রের নির্মাণ করেছেন। তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে সংক্ষিপ্ত কায়া হলেও তার কাহিনি শেষ হত নাটকীয় এক সত্যের উন্মোচনে।

ডাক্তার হিসেবে গরীব লোকেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ, তাদের জীবনকে কাছ থেকে দেখবার অভিজ্ঞতা সাহিত্য সৃষ্টিতে যে তাঁর সহায়ক হয়েছে একথা না বললেও উপলব্ধি করা যায়। তাঁর নির্বাচিত উপন্যাসে আমরা শুধু ডাক্তারি পেশার সংকট খোঁজার চেষ্টা করব। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দুটি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'তৃণখণ্ড' ও বৈতরণী তীরে'। যা বনফুলের ডাক্তারি অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ রচনা; তবে রচনার আঙ্গিকে প্লটে স্বতন্ত্রতা লক্ষ করা যায়। বনফুলের লেখনী শক্তির পরিচয় গল্পে পাঠকরা যে ভাবে পেয়েছে এখানেও তিনি সমান শক্তিধর শিল্পী। আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নিরাসক্ত দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর সাহিত্যেও প্রভাব ফেলেছিল। যা রবীন্দ্রনাথ বনফুল প্রসঙ্গে বনফুলকে লেখা চিঠিতে খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন—

> বর্তমান যুগ সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা পরগাছা বনস্পতি সব কিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে সে কৌতূহলের দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে, তাইতো, এতো আমি দেখিনি কিংবা ঠিকটি দেখলুম। আগেকার সাহিত্য চোখ-ভোলানো সাহিত্য নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে, তাতেও রস আছে, সে হচ্ছে কৌতূহলের রস।[১]

বনফুলের প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসে ডাক্তারি জীবনে নানা রোগীর প্রসঙ্গ এসেছে; তারা প্রত্যেকটিই যেন এক-একটি স্বতন্ত্র গল্প। উপন্যাসে গরীব কেরানি হরিশবাবু ডাক্তারের কাছে মাঝে মধ্যেই আসেন পরিবারের অসুখের চিকিৎসা করতে। তিনি গল্পকথক আদর্শবাদী ডাক্তারের কাছে একটি কেস এনে মিথ্যে সার্টিফিকেট দেওয়ার আবেদন জানান। আদর্শবাদী ডাক্তার জাল সার্টিফিকেট দেওয়ার নিষেধ জানালে, হরিশবাবু খগেন ডাক্তারকে দিয়ে মিথ্যে সার্টিফিকেট তৈরি করিয়েছেন। তবে খগেন ডাক্তারের চার্জটা একটু চড়া এই যা। বনফুল ডাক্তারের পেশায় এই চাতুরী ও অর্থলোভী দিকটি সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে শুধু চরিত্রবান আদর্শবাদী ডাক্তার নেই, আছে আরেকদল ডাক্তার যারা আইন বাঁচিয়ে মিথ্যে সার্টিফিকেট দেন, বিধবা কুমারীর গোপনে গর্ভপাত করান, অকারণে ফরসেপসলাগিয়ে তড়িঘড়ি প্রসব করান, মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভদের নতুন পেটেন্ট ওষুধ রুগীদের প্রেসক্রাইব করে কমিশন পান।

আলোচ্য উপন্যাসে যেসব চরিত্র ফুটে উঠেছে তাঁরা সকলেই কোনো না কোনো রোগের শিকার। এই উপন্যাসে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগ্নের চিকিৎসা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন ডাক্তারের অসহায়তা—"সত্য কথা বলিতে হইলে, বিশেষ কিছুই বুঝিলাম না। আন্দাজে ম্যালেরিয়ার ঔষধ দিয়াছি। রোগীর এবং আমার কপাল ভালো হয় উহাতেই সারিয়া যাইবে।"[২] আসলে ডাক্তারের ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে—"কি অসহায় আমরা ডাক্তারেরা! কতকগুলো অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া রোগীর হাটে তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। বিবেক বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা আর কিছুই নয়, ফাঁকি!"[৩] ডাক্তারি জীবনে যত দিন চলে যাচ্ছে তাঁর উপলব্ধি ওই একই রয়ে

গেছে—

> যতই দিন যাইতেছে, ততই নিজের অসারতা নিজের কাছে ধরা পড়িতেছে। ছদ্মবেশ খুলিয়া খসিয়া যাইতেছে। জ্ঞানের অহংকার! কতটুকু আমাদের জ্ঞান এযেন সামান্য শঙ্কিত দীপশিখা জ্বালিয়া বিশ্ব-ব্যাপী অন্ধকারকে আলোকিত করিবার চেষ্টা! অনেকের প্রদীপে আবার শিখাও নাই, শুধুই প্রদীপটা লইয়া ঘুরিতেছি।[৪]

এই সীমাবদ্ধতা নিয়েও গল্পকথক ডাক্তার গরিবদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতে গিয়ে এক শিক্ষা পেয়েছেন। দেখেছেন বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে গেলে গরীবদের ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনের উপর ভক্তি কমে যায়। তাই তিনি বলেছেন—

> বিনা পয়সায় চিকিতা করা হয় না। ওটা একটা সস্তায় নাম কেনবার উপায়—আহা অমুক ডাক্তার দয়ার অবতার। কিন্তু আশ্চর্য, অসুখ একটু শক্ত হলেও লোকে অবতারকে ত্যাগ করে, চামারের আশ্রয় গ্রহণ করে! এই মনুষ্যধর্ম![৫]

এখানে ডাক্তার আর একটি বিষয় উপলব্ধি করেন—ডাক্তারীতে রুগীর চেয়ে রুগীর বাড়ীর লোকজনদের দিকেই বেশি লক্ষ রাখতে হয়। পসার জমাবার এই মূলমন্ত্র। তবে রুগীর বাড়ীর আত্মীয়স্বজনের কাছে সত্যটি গোপন রাখতে হয়—"রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে সরল সত্য কথা বলা চলে না, অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়।"[৬]

আলোচ্য উপন্যাসে গল্পকথক ডাক্তারের কাছে মৃত জমিদারের বিধবা স্ত্রীর ব্যভিচারে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ার গোপনীয় সংবাদ ধরা পড়লে, গর্ভপাত করানোর প্রস্তাব আসে। কিন্তু আদর্শবাদী ডাক্তার গর্ভপাত করাতে না চাইলে, এক দাইকে দিয়ে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে গর্ভপাত করানোর চেষ্টায় জমিদারের বিধবা স্ত্রীর প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে ডাক্তারকে আবার কল করা হলে, তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় বিধবা রক্ষা পান। আসলে সে সময় গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের অভাবে অশিক্ষিত নিম্ন সম্প্রদায়ের দাই-রাই প্রসব করাতেন, ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রসূতির প্রাণহানির সম্ভাবনা ঘটত। পরবর্তীকালে গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের আবির্ভাবে ডাক্তার ও নার্স এলে, এদের ব্যবসায় ভাটা পড়ে।

ডাক্তারদের কাছে মেডিসিন কোম্পানির এজেন্ট বা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এসে তাদের কোম্পানির পেটেন্ট ওষুধ বাজারে চালাতে চায়। ওষুধ বিক্রির উপর ডাক্তারদের বিশেষ কমিশন থাকে, তাছাড়া ডাক্তারদের তারা ফ্রী-তে নানা ওষুধের স্যাম্পল দিয়ে যায়। আলোচ্য উপন্যাসে এই মেডিসিন কোম্পানির এজেন্টদের উপর গল্পকথক ডাক্তার খুব চটেছেন। তিনি ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে সরব। তাই মেডিসিনের এজেন্ট কলকাতার নামী ডাক্তারের view দিয়ে তার কোম্পানির ওষুধকে যখন ভাল বলে প্রচার করে, তখন তিনি রেগে গিয়ে বলেছেন—

> ওঁরা হাতুড়ে ডাক্তার। ডাক্তারি খেতাব ধারী পেটেন্ট মেডিসিনের ভেণ্ডার। ওঁরা দেশের দুঃখ বোঝেন না, রোগীর ভালো মন্দ বিচার করেন না, যে ওষুধের বিজ্ঞাপন পান, সঙ্গে সঙ্গে তাই লিখে দেন। যাঁর প্রেসক্রিপশন যত দুষ্প্রাপ্য তিনি তত বড় ডাক্তার!—সুতরাং ওদের কথার উপর সত্যিকারের ডাক্তার যারা, তাঁরা মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয় রোগীর খাতিরে। দায়ে প'ড়ে। স্বেচ্ছায় নয়![৭]

তাই কলকাতার ব্যবসাদার, বুদ্ধিমান, ধনবান নামী ডাক্তারকে তিনি শ্রদ্ধা করেন না। মেডিসিন কোম্পানির এজেন্ট একথা বুঝতে পেরে তাঁর জীবিকা সমস্যার অসহায়তার কথা ব্যক্ত

করেছেন—"কি করব বলুন মশাই, আমাদের চাকরি করতে হয় পেটের দায়ে। কোন ওষুধ ভাল—কোন্‌টা মন্দ সে আপনারাই বোঝেন। তবে এটা ঠিক, এই অঞ্চলে যদি এ ওষুধটার সেল না বাড়ে তাহলে হয় আমাকে আসাম অঞ্চলে বদলি করবে—না হয় দূর করে দেবে।"[৮]

বনফুলের দ্বিতীয় উপন্যাস বৈতরণী তীরে' (১৯৩৬)। শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের জবানীতে মড়াদের জীবন ও মৃত্যুর কাহিনি নিয়েই আলোচ্য উপন্যাসটি রচিত। একথা সত্যি যে আলোচ্য উপন্যাসে গল্পকথক শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের ভূমিকা কম, তবুও তাঁর অতীত জীবন ও ডাক্তার হয়ে ওঠার কাহিনিটি বেশ করুণাদায়ক। তিনি ছোটোবেলায় গরীব ছিলেন, কিন্তু 'সরস্বতীর দরবারে ধনী দরিদ্রের জাতিভেদ নাই' বলে, তাঁর মেধার জোরে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। পড়াশোনায় ভাল বলে এব্যাপারে তাঁকে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন তাঁর পিতার এক বন্ধু। কিন্তু তাঁরও অকাল মৃত্যুতে, তিনি দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হলেন। তবুও টিউশনি করে স্কলারশিপ পেয়ে তিনি ডাক্তারি পাশ করেন।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় ছোটোবেলাতে কলেরায় মড়ক লাগলে চিকিৎসা করার সামর্থ না থাকায় ডাক্তারের ছোটো ছোটো ভাইদের মৃত্যু ঘটে। তিনি দেখেছিলেন সরকারি চিকিৎসালয়ে ডাক্তারেরা শুধু ধনীদের চিকিৎসা নিয়েই ব্যস্ত। হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময়সীমায় ধনী রুগীদের তোষামদ ও চিকিৎসা সেরে গরীব রুগীদের দিকে ফিরে চাওয়ার ও কথা শোনার তাদের সময় হত না। মোটকথা "এই ভিখারীর দলকে এগারোটার মধ্যে বিদায় করিতে হইবে—এই তাঁহাদের লক্ষ্য। এই যাহার লক্ষ্য, সমাগত দেড়শত লোকের নানাবিধ ব্যাধির বিস্তৃত ইতিহাস শুনিবার ধৈর্য তাঁহার থাকিবার কথা নয়।"[৯] তাই ছোটো ভাইয়ের মতো আর কোন গরিবের চিকিতার অভাবে যাতে মৃত্যু না হয়, তাই তিনি ডাক্তারীবৃত্তি বেছে নেন। সরকারি চিকিৎসালয়ে এই দুরবস্থার চিত্র সর্বত্রই সমান, বর্তমানেও এই অবস্থার উন্নতি হয়নি। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে একবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'গণমিত্র' (২০২১) উপন্যাসের ডাক্তার জীবকের কথা। যে সারাটা জীবন অন্যায় ভাবেই চিকিৎসা করেছে। রোগীদের অযথা টেস্ট করতে দিয়ে প্যাথলজিতে পাঠানো, কমিশন নেওয়া, অন্যায়ভাবে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট লিখে দেওয়া, অন্যায়ভাবে অ্যাবরশন করানো; এভাবেই মহৎ চিকিৎসা পেশাকে সে ব্যবসায় পরিণত করেছে। গণমিত্র হতে গিয়ে গণশত্রুতে পরিণত হয়েছে।

বনফুলের 'নির্মোক'(১৯৪০) উপন্যাসে বিমল ডাক্তারের আত্মজীবনী শোনাতে গিয়ে যেন বনফুল নিজের আত্মজীবনী শুনিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক বিমল চাটুজ্জে বড়ো সাহেবের সুপারিশে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে স্থান পান। পরবর্তীকালে তিনি সরকারি ডাক্তার হয়ে এক মফঃস্বলের হাসপাতালে এসে হাজির হন। এখানে রয়েছেন হাসপাতলের কমিটির চেয়ারম্যান রাখাল নন্দী, ধার্মিক পাটের ব্যবসায়ী। লোকে তাঁকে 'টাকার কুমীর' বললেও হাসপাতালের রুগীদের খাওয়ার খরচ উনি একাই দেন। এছাড়াও রয়েছেন জগদীশ ডাক্তার, ডাক্তার ভূধর চৌধুরী, রেলওয়ে ডাক্তার জগমোহন মিত্র, হাসপাতালের কর্মী গুপী কম্পাউণ্ডার, অ্যাপ্রেন্টিস, ড্রেসার দুলু, ভৈরব চাকর, শিবু ঠাকুর, জানকী মেথর, রুকমী মেথরানী, মথুরবাবু, অমর, সুব্রত-সুপ্রিয়া, পোস্টঅফিসের পিওন হরেনের ভাই যোগেন প্রমূখ নানা চরিত্রের ভিড়।

উপন্যাসে বিমল মফঃস্বলে ডাক্তারী করতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিমলের

সততায় ও কর্মে একনিষ্ঠতায় হাসপাতালের কম্পাউন্ডার গুপীবাবু তার উপর চটেছেন, কারণ তাঁকে সময়মতো ডাক্তারখানা আসতে হবে। ডাক্তারখানায় চাকরি ছাড়া তিনি পৌরোহিত্য করতেন, তাছাড়া সামান্য ডাক্তারী বিদ্যাকে সম্বল করে তিনি বাগদি পাড়া, কুলী পাড়া, মুসলমান পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্র্যাক্টিস করে কিছু উপার্জন করতেন। আসলে—"তাঁহাকে দুই-চারি আনা পয়সা দিলে হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ ভালো করিয়া 'মন দিয়া' তিনি প্রস্তুত করিয়া দিবেন এই ভরসায় অনেক গরীব লোকই তাঁহাকে ডাকিত!"[১০] বিমল ডাক্তারের কড়া নিয়মের গেরোতে তাঁর ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। চিকিৎসা করতে গিয়ে বিমল ডাক্তার অশিক্ষিত, অনাড়ম্বর, অক্ষরপরিচয়হীন মানুষজনের জীবনাচরণ দেখে মুগ্ধ হন। সেইসঙ্গে চিকিৎসক পেশার সঙ্গে যুক্ত অর্থগৃধু মানুষদের দেখে তিনি মর্মাহত হন। 'বৈতরণী তীরে' উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও গরীবদের সরকারি চিকিৎসালয়ে ব্রাত্য হয়ে পড়ার কাহিনি রয়েছে—

> গরীবদের জন্যই হাসপাতাল, কিন্তু গরীবদের সেখানে স্থান কোথায় হাসপাতালের ভাল ভাল ঔষধ ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট রুগীদের জন্য খরচ হয় এবং তাহাদের অধিকাংশই ধনী। গরীবেরা সেখানে দুইবেলা ভিড় করে এবং কাঙালী বিদায় করার মত তাহাদের রোজ বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, আর কিছু হয় না।[১১]

আলোচ্য উপন্যাসে বিমল ডাক্তারি করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন—ডাক্তারিতে রোগীর অপেক্ষা রোগীর আত্মীয়স্বজনের দিকেই বেশি লক্ষ রাখতে হয়। পশার জমাবার পূর্বে এক সুদূরপসারী ব্যবসায়ী কৌশলের দ্বারা তিনি নিজের প্রথম মাসের বেতন দিয়ে কালাজ্বরের ইঞ্জেকশন কিনে হাসপাতালে রুগীদের ব্যবহার করেন—

> বিমল ভাবিয়া দেখিল যে চাকরি না পাইলে কোথাও না কোথাও তাহাকে ডিসপেনসারি খুলিয়া তো বসিতে হইত এবং অনিবার্যভাবে কিছু অর্থব্যয় হইতই। প্র্যাকটিস জমাইবার জন্য প্রথম প্রথম কিছু খরচ করিতেই হয়, সুতরাং এই খরচটা করা এমন কিছু অবিবেচনার কার্য হয় নাই। হাসপাতালের এই দরিদ্র রোগীরা মুক্ত কণ্ঠে তাহার নাম চতুর্দিকে বিজ্ঞাপিত করিবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের জন্যও তো একটি প্রয়োজনীয় খরচ আছে।[১২]

তবুও ডাক্তারি করতে গিয়ে বিমল পদে পদে উপলব্ধি করেছে—"ডাক্তারি করিতে কত প্রবঞ্চনা যে করিতে হয়! দুঃস্থ লোককে সান্ত্বনা দেওয়াই যখন পেশা তখন প্রবঞ্চনা করিতে হবে বইকি! কয়টা লোককে সত্য কথা বলিয়া আশ্বস্ত করা যায়।"[১৩] তারপরও ডাক্তারেরা ডাক্তারদের খুঁত ধরবার জন্য সর্বদা ব্যগ্র হয়ে থাকে তাই বিমল উপলব্ধি করে শত্রুপক্ষকে জব্দ করতে গেলে প্রথমে শত্রুকে মিত্র করতে হবে। তাই সে নিজে ডাক্তার হয়েও অন্যান্য ডাক্তারকে কেস পাইয়ে দেয়। তাছাড়া চিকিৎসার ব্যাপারে দায়িত্ব যত ভাগাভাগি হয়ে যাবে ততই সবার পক্ষে মঙ্গল। তাই জগদীশ ডাক্তার বিমলকে রক্তপরীক্ষা করতে দেন। বিমলও টাইফয়েড পেসেন্ট থাকলে জগদীশবাবুকে কনসালটেন্ট হিসেবে ডাকে এভাবে তাদের মধ্যে দূরত্ব কমে। সে ডাক্তারখানার ওষুধ কেনার জন্য নিজের বেতন দেয়, থিয়েটারে অভিনয় করে হাসপাতালের চিকিৎসা খরচের ওষুধ কেনে। কলেরায় মড়ক লাগলে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন বিপন্ন করে রুগীদের যতটা সম্ভব সুস্থ করে তোলে। শত্রুপক্ষের স্বজন অসুস্থ হলে তাকে সারিয়ে মিত্র করে ফেলে। এভাবে সে সকলের মনেই শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছে। এখানকার সিভিল সার্জেন ও তাঁর পরিশ্রম ও উদ্যমে মৃতপ্রায় হাসপাতালের উন্নতি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এতে তাঁর প্রসারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য ডাক্তারেরাও জটিল রোগের জন্য তাঁর পরামর্শ চেয়ে কল করেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে ডাক্তার ভূধর চৌধুরী বিমলকে অর্থসর্বস্ব সমাজের তথা পুঁজিবাদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে, ডাক্তারি বৃত্তিটি টিকিয়ে রাখতে ডাক্তাররা কী কী পন্থা অবলম্বন করছেন তার বিস্তৃত বর্ণণা করেছেন—

> যা ভীষণ সময় পড়েছে মশাই, আজকাল রোজগারের নতুন নতুন পন্থা বার না করতে পারলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না।...পৃথিবীর চারিদিকে টাকা ছড়ানো রয়েছে, কোন ফন্দি-ফিকিরে সেগুলোকে কুড়িয়ে ঘরে তোলার নামই ব্যবসা! কোন ফন্দি-ফিকির করব না অথচ টাকাগুলো আপনা আপনি এসে ট্যাঁকে ঢুকে পড়বে তা কি কখনও হয়।[১৪]

এই ভূধরের কথাতেই উঠে এসেছে বিভিন্ন ডাক্তারি বৃত্তিতে (এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজ) সমস্যার প্রসঙ্গ—

> শুধু ডাক্তারি করে আর পেট ভরবে না মশাই, সেদিন গেছে! আজকাল কমপিটিশন কত, চারিদিকে ডাক্তার তো গিজগিজ করছেই, তার উপর কবরেজ আছে, হোমিওপ্যাথ আছে, হাকিম আছে, হাতুড়ে আছে, মাদুলি আছে, জলপড়া আছে। ...ডাক্তারদের রোজগার বাইরে থেকে খুব বেশী মনে হয়, কারও বাড়ির সামনে দিয়ে বার-দুই যাতায়াত করলেই সে মনে করে উঃ খুব কামাচ্ছে সে জানে পকেটে কটা টাকা ঢুকল—তাও আবার সবগুলো সচল থাকে না।...এই কমপিটিশনের জন্যেই তো মশাই আমি হোমিওপ্যাথ, কবরেজি সব করি, যখন যা সুবিধে। রুগী হাতছাড়া করি কেন! যখন দেখি আমাদের ওষুধে বিশেষ বাগ মানছে না রুগীর বাড়ীর লোকেরাও একটু দোনা-মোনা করছে তখন তাকে বুঝে তাদের মনোমত ব্যবস্থা করে ফেলি। হোমিওপ্যাথি চাও, চলে এস আমিই দিয়ে দিচ্ছি—এক ফোঁটা কবিরাজি চাও তা-ও দিচ্ছি—অপরের কাছে যাবার দরকার কি! হোমিওপ্যাথির একটা মস্ত সুবিধে খেতে খারাপ নয়, সস্তা, রুগীর ইস্ট না হোক অনিষ্ট হয় না, আর যখন লেগে যায় অদ্ভুত ফল! ...কবরেজরা কি জোচ্চুরি করে না মনে করেন! অধিকাংশই আজকাল কুইনিন ব্যবহার করে, অ্যালকহল ব্যবহার করে। পয়সা রোজগার করতে হলে এ-সব না করে উপায় কি! সেদিন তো দেখলাম এক কোবরেজ এমটিন ইনজেকশন দিচ্ছে।[১৫]

এ প্রসঙ্গে আবার একবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'চারডাক্তার' (২০১৮) উপন্যাসের কথা মাথায় আসে। যা চারটি কাহিনি খণ্ড নিয়ে গড়ে উঠেছে যথা—হাতুড়ে, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, ডাক্তার বিশেষণহীন।

কাহিনির অগ্রগতিতে আমরা দেখি বাইরে বেশি কল বা প্র্যাক্টিসে বেরিয়ে বিমল হাসপাতালের চিকিৎসার গাফিলতি দিতে শুরু করে, বন্ধু অমরের পিতা মথুরবাবু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। কিন্তু অতিপরিচিতির কারণে বিমল সেই বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এরপর বিমল নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। রোগীরা তার কুষ্ঠ হয়েছে বলে ধারণা করে আর হাসপাতালে আসে না। অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বিমল চলে যায় স্বগ্রামে, সেখানে শম্ভুকাকা নিষ্ঠাভরে তার চিকিৎসা করেন। বিমলের রোগ সেরে যায়। আসলে বিমলের কুষ্ট হয়নি হয়েছিল 'ডারমাল লিসম্যানিয়াসিস' যা কালাজ্বরের রোগের জীবাণু। শেষপর্যন্ত বিমল মিউনিসিপ্যালটির চাকরি ছেড়ে পৈতৃক গ্রামেই রয়ে যায়। এখানে সে চাষবাস করে, সঙ্গে গরীবদের চিকিৎসাও করে কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসা করে না। কারণ তার মতে চিকিৎসা— "বিদ্যায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ব্যবসায়ী হইলে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না।"[১৬] তাই বড়োলোকেরা তাকে ডাকে না—

> কারণ বড়লোকেরা ডাক্তার ডাকে সেই মনোবৃত্তি লইয়া যে মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা মোটর কেনে, বাড়ি করে। মোটর এবং বাড়ি যেমন পছন্দসই হওয়া দরকার, ডাক্তারও তেমন পছন্দসই হওয়া চাই। শুধু চিকিতা করলেই চলিবে না, বাড়ির লোকেদের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নানা ডাক্তার নানা কৌশলে ইহা করিয়া থাকে। জগদীশবাবু, ভূধরবাবু, গাঙ্গুলী মহাশয়, মহাদেববাবু সকলেই ইহা করিতেছেন, প্রত্যেকের ধরণ শুধু আলাদা রকমের। আজকাল ডাক্তারির মত গুরুগিরিও একটা পেশা হইয়াছে এবং গুরুরাও শিষ্যদের মনোরঞ্জন করিয়াই নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখিতেছেন—প্রত্যেক ব্যবসায়েই ক্রেতার মনোরঞ্জন না করিলে চলে না।[১৭]

ডাক্তারি করতে গিয়ে 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসের ডাক্তারের মতো বিমল ডাক্তারও তাদের জীবনের অসহায়তা ও অপূর্ণজ্ঞানের কথা বলে—"নিজে অসুখে পড়িয়া একটা জিনিস মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি—আমার এত আড়ম্বর সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যা অতিশয় অল্প। এই অল্প বিদ্যার সহিত যদি সহৃদয়তা না থাকে তবে ইহা লইয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা জুয়াচুরির নামান্তর মাত্র।"[১৮] ডাক্তারিতে এই একনিষ্ঠতার পরিচয় তিনি পেয়েছেন গ্রাম্য আত্মীয় ডাক্তার শম্ভু কাকার মধ্যে। তিনি তাই বলেছেন "আমরা ঔষধ দিই দ্বিধা ভ'রে, যদি ফল হয় ভালই, না যদি হয় কি করিব! শম্ভুকাকা ঔষধ দেন নিষ্ঠাভরে ভক্ত দেবতার সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করে।"[১৯]

আলোচ্য উপন্যাসে গ্রামের ডাক্তার ও শহরের ডাক্তারের পার্থক্য ধরা পড়েছে জনৈক ব্যক্তির কথায়—'তোমরা (গ্রামের ডাক্তাররা) খালি প্রাণে মার, আর কলকাতার ডাক্তাররা ধনে প্রাণে মারেন'—তাই গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোকেদের কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনীহা দেখা গেছে। যদিও কলকাতায় রয়েছে আপ-টু-ডেট চিকিতা পদ্ধতি, তবুও রোগী মরে। তাই চিকিতকের হাতযশের চেয়ে রোগীর জীবনীশক্তির উপর বনফুলের বিশ্বাস বেশি। তিনি বহুক্ষেত্রেই দেখেছেন গরীবদের অসুখ সহজেই সারে ইমিউনিটির জোরে, সে তুলনায় বড়লোকের অসুখ ইমিউনিটির অভাবে সারতে দেরি হয়।

'জঙ্গম' (১৯৪৩-৪৫) উপন্যাসটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৩৫০ সাল থেকে ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। উপন্যাসের নায়ক শঙ্কর, তাকে মধ্যে রেখে বিচিত্র চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। এখানে এসেছে ইঞ্জেকশন বিশারদ প্রমথ ডাক্তারের কথা। যার সঙ্গে ইঞ্জেকশন দেওয়া নিয়ে তাঁর 'নির্মোক' উপন্যাসের বিমল ডাক্তারের মিল রয়েছে। তবে অর্থের বিনিময়ে বিমল ডাক্তার মিথ্যে সার্টিফিকেট দেন না যা প্রমথ ডাক্তার দিয়ে থাকেন। এসেছে নটবর ডাক্তারের প্রসঙ্গ, যিনি প্রথাগত ভাবে মেডিক্যালে ডিগ্রীধারী না হয়েও ডাক্তারি করেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় অর্জুন কম্পাউণ্ডারের কথা। তা যাই হোক ইনি জনদরদী। গ্রামে কলেরার সময় মড়ক লাগলে তিনি অক্লান্ত সেবা করেছেন। অনেক সময় বিনা পারিশ্রমিকে ইনি দুঃস্থ মানুষদের চিকিৎসা করে থাকেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকাকারে বনফুলের আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় যার নাম 'মানদণ্ড'। এই উপন্যাসের সময়কাল স্বাধীনতা উত্তরপর্ব। আলোচ্য উপন্যাসে হিরণীগর্ভ উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদার, তেমনি উনি বিজ্ঞানী ও ডাক্তার। তাঁর ল্যাবেটারিতে তৈরি ওষুধের পেটেন্ট বিক্রির টাকা দিয়েই তিনি জনহিতৈষী কাজ করতেন। তাছাড়া জমিদারির টাকা প্রজাদের কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হত। এখানে তাঁতির মেধাবী ছেলে নরেনের কথাও রয়েছে, যাকে হিরণ্য তার ল্যাব-সহায়ক হিসেবে কাজে রেখেছে। সঠিক শিক্ষার দ্বারা নিম্নসম্প্রদায় থেকেও যে যোগ্যতম ব্যক্তি সমাজে

মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পেতে পারে আলোচ্য উপন্যাসে তার বর্ণনা রয়েছে। তাঁর 'নব দিগন্ত' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রের জন্য লেখা হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। বনফুল আবার রোমান্সে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই উপন্যাসের কাহিনিতে রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মগ্ন এক সংগ্রামরত যুবক —দিবসের কথা। আলোচ্য উপন্যাসে এসেছে আদর্শবাদী সৌরিন ডাক্তারের কথা। স্ত্রী ও শাশুড়ির যক্ষ্মায় মৃত্যু তাঁকে এই মারণ রোগের প্রতি সচেতন করেছিল। তাই যক্ষ্মারোগীদের সেবাধর্মে তিনি তাঁর প্র্যাকটিসের টাকায় 'অতসী ক্লিনিক' বলে গরীবদের জন্য নামমাত্র খরচে এক ডিসপেনসারী খোলেন। বস্তিবাসী পটলের যক্ষ্মাগ্রস্ত স্বামী হরুকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেছেন। দিবসের কাছে রঙ্গনা যখন ঘর ছেড়ে এসেছিল তখন দিবস তাকে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে বন্ধু সৌরিনের ক্লিনিকে নার্স রূপে কাজ করতে বলে। কিন্তু এই মারণ রোগের ভয়ে সে এই সেবাধর্মের কাজ করতে অস্বীকৃত হয়। আসলে সে সময় ভদ্র বাড়ির মহিলারা সেবাধর্মের আদর্শে নার্সের পেশায় এলেও, অনেকেই ছোঁয়াচে রুগীর সংস্পর্শে মৃত্যুর ভয়ে এই পেশা নিতে চাইতেন না।

উৎসের সন্ধানে

১. শ্রীভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' ০৭/১০/১৯৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথের বনফুলকে লেখা চিঠি, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০১০-২০১১। পৃ. ৫৩৬
২. 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র' প্রথম খণ্ড, তৃণখণ্ড, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা, ১৯ জুলাই ১৯৬০, পৃ. ১০
৩. তদেব : পৃ. ২৯
৪. তদেব : পৃ. ৪৮
৫. তদেব : পৃ. ৩৪
৬ তদেব : পৃ. ১০
৭. তদেব : পৃ. ৩৫
৮. তদেব : পৃ. ৩৫
৯. 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', প্রথম খণ্ড, বৈতরণী তীরে, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ১৯ জুলাই ১৯৬০, পৃ. ৯৬
১০. 'বনফুল উপন্যাস সমগ্র', চতুর্থ খণ্ড, নির্মোক, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩০
১১. তদেব : পৃ. ৩০৭
১২. তদেব : পৃ. ২৪৮
১৩. তদেব : পৃ. ২৪৯
১৪. তদেব : পৃ. ২৮২
১৫. তদেব : পৃ. ২৮৩
১৬. তদেব : পৃ. ৩২৭
১৭. তদেব : পৃ. ৩২৭
১৮. তদেব : পৃ. ৩২৬
১৯. তদেব : পৃ. ৩২৫

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’-এ নিম্নবর্গের সমাজ-চেতনার পর্যালোচনা

প্রেমাঙ্কুর মিশ্র

মানুষের সমগ্র জীবন বহুমাত্রিক। তার অসংখ্য দিক, মাত্রা, বিভাগ, অগণিত ক্রিয়া-কলাপ রয়েছে। এইসবের মধ্য দিয়ে মানবজীবন সতত সঞ্চরণ মান। সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই পর্যায়ের কয়েকটি বিষয় মাত্র। কিন্তু মানব জীবনে কোথায় এদের প্রকৃত অবস্থান তা নির্ণয় করা কঠিন। সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি এগুলো একে অপরের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে সাহিত্য সঙ্গে একদিকে সমাজের সম্পর্ক যেমন রয়েছে তেমনি আবার সংস্কৃতির সম্পর্ক ও রয়েছে অন্যদিকে সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজ যেমন জড়িত তেমন সাহিত্যও। একই রকমভাবে সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছাড়া অচল। তাই সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি কতটা এবং কীভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত তা এই আলোচনা আমাদের খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

সমাজের সৃষ্টি যে কবে তা দিনক্ষণ মেপে বলা কঠিন। তবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্বে যে সমাজের সৃষ্টি তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে ঘিরেই তার জন্ম মৃত্যু লয় আবর্তিত হয়। একাধিক সমাজ বিজ্ঞানী সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিলেও সমাজ সম্পর্কিত সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাটি হল-সমাজ মূলত এমন এক ব্যবস্থা যেখানে একাধিক মানুষ একত্রে কিছু নিয়ম-কানুন রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করে একত্রে বসবাস উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। তবে শুধু মানুষ নয়, সমাজে সর্বশ্রেণির প্রাণীও বাস করে। সমাজ এবং মানুষ একে অপরের সঙ্গে এতটাই সম্পর্কিত যে তাদের পৃথক সত্তা হিসেবে কখনোই বিবেচনা করা হয় না। তবে এই সৌহার্দ্য বিষয়ে সহযোগিতা, মমত্ত্ব, হিংসা, লোভ ঘৃণা সমাজের সহজাত বৈশিষ্ট্য।

এবার আসা যাক সাহিত্যের প্রসঙ্গে। সাহিত্য মানব জীবন ও বিশ্বজগতের

প্রতিবিম্ব সাহিত্যে আমাদের জগৎ ও জীবনের প্রতিটি অনু পরমানুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মানব সমাজ তথা বিশ্বজগতের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানব জীবন ও জগতে এমন কোনো দিক নেই যেখানে সাহিত্যের অবাধে প্রবেশ নেই। সাহিত্যের সঙ্গে মানব জীবনের নারীর বন্ধন আবদ্ধ।

সাহিত্য শব্দটি ভাঙলে যে ধাতুগত অর্থ সামনে আসে তা হল মিলন। তাই সাহিত্যের মধ্যে মিলনের ভাব দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। তবে এ মিলনে পুথিপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তার পরিধি ব্যাপক। তা হল মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের, ভাবের সঙ্গে ভাবনার, দেশের সঙ্গে জাতির, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতে। যা অত্যন্ত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ঠিক যেন নারীর বন্ধন।

১৯২২ সালে সংস্কৃতি শব্দটি বাংলায় প্রথম ব্যবহৃত হয় ইংরেজি culture শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে। যদি শব্দটি উৎস সম্পন্নরূপে বাংলা নয়, শব্দটি মারাঠা শব্দ জাত। সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎস সাধন। সংস্কৃত শব্দটির আভিধানিক অর্থ যাই থাক না কেন মূল্য বিচারে ছক বাধা নিয়মে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেওয়া বেশ মুশকিল। এক এক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভাব এক একরকম। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোনো জাতি গোষ্ঠী সমাজের দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ণই ওই জাতি বা গোষ্ঠী তথা সমাজের সংস্কৃতি নামে অভিহিত। সুতরাং কোনো জাতির সংস্কৃতি নির্ণয়ে ভৌগোলিক সীমারেখা ও দেশ কালের অবস্থানের যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। সংস্কৃতির দুটি রূপ একটি অন্তরঙ্গ রূপ অন্যটি বাইরঙ্গ রূপ। কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি প্রধানত এই রূপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অন্তরঙ্গ রূপের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন ভাস্য ধরা পড়ে। বহিঙ্গের মধ্যে থাকে যে-কোনো জাতির সাংস্কৃতির মূল নির্যাস। বাই রঙ্গের মধ্যে থাকে সামাজিক উৎসব-লোকাচার, পূজা, পার্বণ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, অন্নপ্রাশন জন্মদিন, অন্তেষ্টিক্রিয়া।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় সমাজ চেতনা পর্যালোচনায় পূর্বে আমাদের নিম্নবর্গের ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা থাকা জরুরি। এই কারণে আমরা আলোচনা শুরুর পূর্বে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নেব।

বর্তমানে আধুনিক সময়ে সমাজের নিম্নবর্গের ইতিহাস বিষয়টি বহুল চর্চিত এক বিষয়। যেখানে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তবে এই বিষয়ে ১৯৮২ সালে রণজিৎ গুহ ভারতবর্ষের প্রথম আলোকপাত করেন।

সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষের চোখ দিয়ে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এক নতুন ইতিহাস রচনা করা হচ্ছে এই নতুন ইতিহাস চর্চার নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বা সাবলটার্ন স্টাডিজ বলা হয়। রণজিৎ গুহ প্রথমে এগিয়ে আসলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক এই বিষয়টি সমর্থন করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ড. গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, সুসিত সরকার প্রমুখ। অর্থাৎ গত তিন দশক জুড়ে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে যে ইতিহাস চর্চা শুরু হয় তাকেই বলা হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস। সমাজে যারা নিম্ন অন্ত্যজ, দলিত শ্রেণি নামে পরিচিত সেই সব শ্রেণির কথা ও কাহিনি এই ধরনের ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু। এই ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রচলিত ইতিহাস চর্চায়

সমাজের উচ্চবর্গের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত কিন্তু এই ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গ অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক-জনতা আদিবাসী এবং সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষ ও মহিলা বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আলোচনার শুরুতেই একবার দেখে নেওয়া যাক বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ চেতনা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলা সাহিত্যে সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের নানা চেহারা ধরা পড়েছে। চর্যাপদে তৎকালীন সমাজজীবনের বিন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের চিত্র বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। এরা নগরের বাইরেপর্বতের টিলায় বসবাস করত এদের তাঁত বোনা, বেত ও বাঁশের চুপড়ি বোনা এই শ্রমসাধ্য উপকরণগুলো সমাজে গৃহীত হলেও এরা কোন ভাবে গৃহীত হয়নি বা গ্রহণীয় হয়নি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ সাহিত্য মঙ্গালকাব্য, লোকগীতিকা, বৈষ্ণব সাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মুসলমান সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য সর্বত্রই এই ধরনের চরিত্রের সন্ধান মিলবে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গালকাব্য গুলো সৃষ্টি হয়েছিল আর্য-অনার্য মিলন প্রচেষ্টার কাহিনিকে বাস্তবায়নের জন্য। আর সেখানে সফলতা আনতে কাহিনির মধ্যে নিম্নবর্গের চরিত্র সৃষ্টি করতে দেখা যায়। কবিকঙ্কণের কালকেতু নিম্নবর্গের মানুষের এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্রায়ন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে নিষাদরাজ গুহক, কাশীরাম দাসের মহাভারতে দাস দুহিতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতী, দাসীপুত্র বিদুর, একলব্য, সূতপুত্র রূপে পরিচিত আছেন কর্ণ-এই দলের মধ্যে পড়ে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও নিম্নবর্গের মানুষের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার নানাভাবে।

অধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এর দিকে তাকালে দেখা যাবে কোথাও পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমি, কোথাও কলকাতার নগর জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিম্নবর্গের মানুষের ছবি, অথবা গ্রামীণ মানুষের নিষ্ক্রিয় পরিবেশ অথবা নিম্নবর্গীয় কৃষকের ছবি ফুটে উঠেছে। প্রথম দিকের উপন্যাসে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলো বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের গাথায় পরিনিত হয়েছে। যেমন—'আলালের ঘরের দুলাল' পরবর্তী ক্ষেত্রে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' খণ্ড খণ্ড চিত্র পাওয়া যাবে যা সেই সময়ে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন সম্বন্ধে ধারণা দেয়। উপন্যাস যত এগিইয়েছে বিকাশ পর্বের দিকে তত দেখা যায় নিম্নবর্গের দিকে কোনো কোনো কাহিনিকার দৃষ্টিপাত করেছেন কিন্তু সে দেখাতে সমাজে ধনী অভিজাত সম্প্রদায় এর পাশাপাশি নিম্নবর্গের মানুষকে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নিম্নবর্গীয় সমাজ চেতনা শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ, শরতচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের লেখায় বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গ অন্য মাত্রা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' 'গোরা' উপন্যাসের কথা এই বিষয়ে উল্লেখ করতে হয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাসও সেই গোত্রের মাঝে পড়ে। কল্লোল গোষ্ঠী পরিচালিত লেখকদের মধ্যে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তবে এই ধারার লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম অগ্রগণ্য। তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসে নিম্নবর্গ জীবন নিয়ে লেখা সার্থক উপন্যাস। এছাড়াও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'কবি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক' নিম্নবর্গের চেতনা ব্যাপক ভাবে ফুটে উঠেছে। ঢোঁড়াই চরিত মানস নিম্নবর্গ প্রধান উপন্যাস। নিম্নবর্গ মানুষের সমাজ, তাদের

জীবনযাত্রা এখানে বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত। বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে এই ধরনের লেখা সম্ভবত পাওয়া যায়নি বলেই মনে হয়। অন্তত স্বাধীনতাপূর্ব উপন্যাসের আলোচনা এই মন্তব্য করা যায়। সে দিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসটির গুরুত্ব অপরিসীম। সতীনাথ ভাদুড়ীর রচিত ছয়টি উপন্যাসের মধ্যে এটি অন্যতম। কিন্তু উপন্যাসটি নানা কারণে ঐতিহাসিক।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ঘটেছিল কল্লোল গোষ্ঠীর হাত ধরে। যে সকল তরুণ লেখক সাহিত্যে বাস্তবতা আনার চেষ্টায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, খেটে খাওয়া মানুষের কথা যারা তুলে আনতে চাই ছিলেন সে প্রচেষ্টার মধ্যে অবশ্যই সতীনাথ ভাদুড়ী পড়ে না কিন্তু তিনি তার 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে অন্য এক আবেদন নিয়ে পাঠকসমাজে হাজির হয়েছিলেন।উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে এক বিদ্রোহাত্মক চিন্তাভাবনার পরিচয় বহন করে নিয়ে আসে ঢোড়াই চরিত্র মধ্যে দিয়ে, যেখানে নিম্নবর্গের মানুষ নিয়ে লেখা এই উপন্যাস।

এই উপন্যাসের একদিকে আছে তো তাতমা পাড়ার বিবরণ। তাঁতমারা জাতে তাঁতি। এদের নানাধরনের কাজ করে উপার্জন করতে হয়। এদের ছেলেরা ঘরের ছাউনি দেয়,কুয়ো তৈরি করে বা পরিস্কার করে। তাতমাদের মেয়েরাও রোজগার করে তাঁরা। ঘাস বিক্রি করে বলে জানা যায়। তারা অঘ্রানে ধান কাটতে পুবে যায়। মাঘ মাসে বুনো কুল বিক্রি করে, ফাল্গুন-চৈত্র শিমুল তুলো আর কচি আম বিক্রি করে উপার্জন করে। এদের জীবনে কষ্ট অনেক। প্রত্যেকে এরা কোনো না কোনো সমস্যার মধ্যে রয়েছে। বিকৃত চেহারার জন্য ফুলঝুরিয়াকে অন্য ছেলেরা অনেক জ্বালাতন করে এবং তাকে সমাজের অনেকর ঠাট্টা তামাশার পাত্র হতে হয়। এছাড়াও রয়েছে লম্বি গোয়ালিনী যাকে দেখে লোকে ডাইনির অবতার বলে মনে করে।মানুষ তাকে দেখে ভয় পায়, রাস্তাঘাটে অযাত্রা বলে মনে করে, মনে মনে গালি দেয়। রয়েছে তেতরের শারীরিক সমস্যা, সব সময় তার বুকে শ্লেষ্মা জমে থাকে, যখন তখন কাঁশতে গিয়ে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়। এছাড়াও রয়েছে মহতোগিন্নী ধনিয়া মহতোর মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। অন্যদিকে ঢোড়াই জীবনকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক বর্ধিষ্ণু অঞ্চল এর চিত্র পাওয়া যায়, আবার শহরের শিলিগুড়ি কোশী পাকা রাস্তায় কাজ করে সে এবং তাকে কেন্দ্র করে মজুরদের জীবন কাহিনি লিপিবদ্ধ হয় এই উপন্যাসে।

তাতমাদের পাশাপাশি অন্য একটি সমাজের বিবরণ পাওয়া যায় যা হল ধাঙরটোলার বিবরণ। ধাঙরদের পূর্বপুরুষেরা আসলে ওরাওঁ। সাঁওতাল পরগনা থেকে গঙ্গার এপারে এসেছে।কোন কাজেই এদের বাছবিচার নেই, এরা মালির কাজ করে, কুলের ডাল কাটে, মৌচাক কাটে এবং এদের গায়ে অসীম শক্তি বলে এদেরকে সবাই জনমজুর হিসেবে রাখতে চায়।

তাতমাদের সঙ্গে ধাঙরদের রেষারেষির সম্পর্ক। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকে। কিন্তু ঝগড়া লেগে থাকলেও কারো কোন জায়গায় পালানোর উপায় নেই বলে এরা এখানে থেকে যায়। শিল্পী খুব কাছ থেকে এদের জীবনযাত্রা দেখেছিলেন তাই খুব বাস্তবসম্মতভাবে এদের জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই সমসাময়িক জীবনে যেমন বেঁচে থাকার ভয়াবহ সংগ্রামের চিত্র ধরা পড়ে তেমনি নর-নারীর বিচিত্র জীবনের ছবিও দৃষ্টিগোচর হয়। আবার এই নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে নিজেদের উন্নতিকল্পে অনেক সময় অনেক প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তবে সেই প্রচেষ্টা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন থেকে যায়। সতীনাথ ভাদুড়ী ত

এমন একজন মানুষের সৃষ্টি করেছেন তার এ উপন্যাসে যে মানুষটি হলো সমস্যায় জর্জরিত মানুষগুলোর শেষ আশ্রয়স্থল। তাই এই উপন্যাসে সমস্যা সংকুল নিম্নবর্গ পাওয়া যায় না এই সমস্যা থেকে উদ্ধারের স্বপ্ন সৃষ্টি করে এক মহান চরিত্রও পাওয়া যায়। সে চরিত্র আর কেউ নয় সে হল ঢোড়াই। নিম্নবর্গ মানুষের জীবন যাত্রার নিত্যদিনের ঘটনা এই উপন্যাসের প্রথম থেকেই পাঠকের কাছে তুলে ধরেন সাহিত্যিক সতীনাথ।

এখানে নিম্নবর্গের উল্লেখযোগ্য কতগুলো চরিত্র রয়েছে। যেমন—শুক্রা ধাঙর, শনিচরা ধাঙর, রতিয়া ছড়িদার, নুনুলাল মহতো, ধনুয়া মহতো, হরিয়া, রাম পিয়ারী প্রমুখ। এদের মধ্যে ঢোডাই পূর্ণাঙ্গ চরিত্র। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়ঘটিত দিকটিও প্রতিফলিত। এছাড়াও কানোহা মুসর, বিল্টা অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের অনবদ্যভাবে আঁকা হয়েছে।

সতীনাথ সাব-অল্টার্ন চেতনা এত সুন্দর ভাবে এত আন্তরিকতার সঙ্গে অসহায় দরিদ্র মানুষদের চেতনা তুলে ধরেছেন এর আগে তা আর কেউ করতে পারেনি। সতীনাথ আশ্চর্য দক্ষতায় নিম্নবর্গের আবেদন, নিম্নবর্গের মানুষের ছোটো ছোটো কথা, ছোট-ছোট দুঃখ ব্যথাকে পরিপূর্ণ অবয়ব দিয়েছেন। ঐতিহাসিকরা সাব অলটার্ন বা নিম্নবর্গের কোনো সংজ্ঞা দেননি। বোধহয় কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না বলেই দেননি। সতীনাথ দেখিয়েছেন তাতমা, বা কোয়ারীদের নিম্নবর্গ কোনো নির্দিষ্ট আনুভূমিক শ্রেণি অবস্থান নেই। তাতমাটুলির যে স্তর থেকে ঢোডোইকে সংগ্রহ করেছেন সতীনাথ সেখানকার সামাজিক বাস্তবতা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্যাটার্নে ধৃত নয়। তাতমা আর ধাঙরদের জীবনযাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থার মিল পাওয়া গেলেও তাতমাটুলি আর বিসকান্ধায় জীবনযাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর, উন্নত মাত্রায়ব সংযুক্ত। তাতমাটুলিতে দেখা যায় জমিজমার গল্প হয় কালেভদ্রে, কিন্তু বিসকান্ধায় পরিবেশ একদম অন্যরকম এখানকার রক্তে মিশে আছে জমিজমার গল্প। এখানকার হাসি-কান্না গল্পগুজব সবই জমিদারকে নিয়ে। আবার এদের নিজেদের অন্তঃকলহ অন্তর্দ্বন্দ্ব শ্রেণির মধ্যেও শ্রেণির রচনা করেছে। মন ও মানসিকতা এদের যেখানে অবস্থান এরাএক অর্থে সকলেই একই শ্রেণিভুক্ত। এরা সকলেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার, ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা আইন শিকার, ওদরিদ্র, হতমান বঞ্চিত সাধারণ নিম্ন কোটি মানুষ এদের জীবন ও জগতের নানা ভাবে স্পর্ষ করে আছে গান্ধি ফ্যাক্টর। এদের মধ্যে কেউ বা ছলে-বলে-কৌশলে ছরিদারের মতনই ভকত বনে যায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এরা সকলকেই পাঠক প্রথম থেকেই চিনতে পারেন, বুঝতে পারেন কারণ পাঠকদের চেনাবার দায়িত্ব নিয়েছেন সতীনাথ অনেকখানি।

দুটি ঘটনা ঢোঁড়াইয়ের রাজনৈতিক বুদ্ধি ও সামাজিক বোধকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা দেয়। চৌত্রিশ সালে বিহারের ভূমিকম্প আর বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই দুটি ঘটনায় ঢোঁড়াই তার আশেপাশের পরিচিত লোকজনদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়। বিহারের ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি হয় সাধারণ গরিব মানুষের কিন্তু ভাগ্যের বিরম্বনা অথবা উচ্চবর্গের মানুষের চক্রান্তে তারা রিলিফ বা সরকারি সাহায্য পায়না বরং তা পেয়ে যায় লাডলীবাবুর পরিবার। ঢোডাই স্পষ্ট বুঝতে পারে যে কলিযুগে মানব সভ্যতা কেমন মহাত্মাজির চেলাদের কারসাজিতে শ্রেনি স্বার্থের চালে চলে। জমি থেকে বালি সরাবার কাজ ঢোঁড়াই নিজের মাথায় নিয়েছিল বলে, পরোক্ষভাবে রিলিফ না পাওয়া দোষও নিজের মাথায় নিতে হয়। নিম্নবর্গের উদ্দীপনাকে লাডলীবাবু বৃহত্তর

সর্বভারতীয় উদ্দীপনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেনি পারেনি তেমনি তাকে ব্যবহার করতে। গান্ধীজীর ভারত তরঙ্গ জনমানসে যে ঢেউ তোলে তা আবার মিলিয়ে যায়। তাতমা-কোয়ারীদের প্রতিবাদের যে নিজস্ব ভাষা ছিল, আন্দোলনের নিজস্ব প্রকরন ছিল, গণসংযোগের স্বতন্ত্র ইডিয়ম ছিল তা-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ঐতিহাসিকরা বলেছেন বিহারে গান্ধীর পেছনে ছিলেন শহুরে উকিল,ছোট জমিদার ও ধনী কৃষক—এই অভিমতের পুরোটাই ঠিক নয় তা সতীনাথ আমাদের বেশ ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। তাতমাদের ইংরেজদের সরকারের জন্য রোজগার নেই বহুদিন আগে বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া কাপড় বুনতে পারে না তারা। ফলে ছোটো ছোটো উকিল, জমিদার এদের নেতৃত্বে যখন দিয়েছে তখন সেই নেতৃত্ব, তাতমা কখনো মেনেছে কখনো মানেনি। মেনেছে যখন গান্ধী ভাবনা তাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। আর মানেনি যখন এই আন্দোলন বা আন্দোলনের নেতৃত্বে তাদের রুজি রোজগার ক্ষুন্ন হয়েছে। বিহারে সতীনাথ গান্ধীর ভাবাদর্শ গড়ে তুলেছিল নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্গের স্বপ্ন-কল্পনা সাব অলর্টান চেতনা।

গান্ধী ভাবাদর্শ কেমন করে বিহারের নিম্নবর্গীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় কামনা-বাসনায় দোলা দিয়েছিল কেমন করে তারা গান্ধীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভাবনার সঙ্গে নিজেদের উচ্চবর্গীয় শোষণমুক্তির ভাবনায় যোগ দিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত কেমন করে মহাত্মাজীর ব্রিটিশের শক্তি পরীক্ষার সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার খেলায় মেতে ছিল তার সাণুপঙ্খ বিবরণ আছে ইতিহাসে। কিন্তু যা ইতিহাসে নেই কিংবা তেমন করে নেই তা হল গান্ধী ভাবাদর্শ যা নিম্নবর্গীয় কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল তা নিম্নবর্গের মধ্যেই কেমন করে ভেঙে পড়ল তার বিবরণ। গান্ধীর ভাবাদর্শের বিস্ফোরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত একটি বাক্যে সংহত করা যায় তা হলো কংগ্রেসি আন্দোলনে নিজেদের সংযুক্ত করে নিম্নবর্গের আশাভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু এই আশাভঙ্গের বেদনা এবং এই বেদনার অন্তর্দর্শী সংবেদনশীলতা এই সংবেদনশীলতা সংহত গভীর মর্মস্পর্শী অনুভব করতে ঢোঁড়াই ছাড়া বিকল্প নেই। সেখানে সতীনাথ অসাধারণ সাহিত্যিক অসাধারণ ঐতিহাসিক।

এই সামগ্রিক সার্বজনীন হতাশার পাশাপাশি ঢোডাইয়ের হতাশাও সংযুক্ত হয়েছে। ঢোঁড়াই এই উপন্যাসে নিম্নবর্গ নায়ক। এখানে সে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি চরিত্র। এই চরিত্রের নায়কোচিত গুণের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। সাহস, বীরত্ব, শক্তিতে চরিত্রটি একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে ধরা দিয়েছে। চরিত্রটি কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ'-এর বাঙালি রামের আদলে পরিকল্পিত।সতীনাথের ঢোঁড়াই আত্মসমর্পণের জন্য থানার দিকে এগিয়ে যায়। ইতিহাসের গণ-আন্দোলনের ব্যর্থতা ও আত্মসমর্পণের সঙ্গে ধরায় আত্মসমর্পণের একটি প্রতীকী চিত্র সম্পূর্ণতা পায়। কাহিনির অন্তিমে ভারতছাড়ো আন্দোলনের ব্যর্থতা আর পাঁচজন বিপ্লবীদের আশাভঙ্গের আর্তি, কিছুটা তার ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতা বেশিরভাগ রাজনৈতিক জীবনের আজাদ বিপ্লবী সংগঠনের অন্তঃকলহ, ঈর্ষা, ক্ষমতা লিপ্সা ওপর জোর দেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী এই চরিত্রটি সৃষ্টি করে সমাজের ত্রুটির দিকটিকে তুলে ধরেছেন। চরিত্রটি সৃষ্টি করে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন লেখকক সে কথা স্পষ্ট। শুধু সমস্যা নয়, সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে ঢোড়াই। সেই জন্য বোধহয় এই সমস্যার সমাধান কল্পে আজাদদস্তা সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসের মূল অংশের সঙ্গে তার যোগ নিবিড়। সে দিক দিয়ে বিচার করলে ঢোঁড়াই সত্যি নিম্নবর্গের জীবনের স্বপ্নের মানুষ, তাদের ভগবান,তাদের

ত্রাতা। আসলে নিম্নবর্গের মানুষের সমস্যা নিরসন করা, সমস্যা না থাকায় এই বিষয়টি স্বাভাবিক নয়। এই সমস্যা চিরকালই ছিল ও চিরকালই থাকবে। বিষয়টি গুরত্ব এখানেই যে নিম্ন বর্গের মানুষের দুঃখ ঘোচাতে তার পাশে দাঁড়ানো মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া বিরল। তাই বাংলা উপন্যাসের ঢোরাই চরিত্রটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যে নতুন ধারা প্রবর্তন হয়েছিল সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' তার মধ্যে অন্যতম। এখানে নিম্নবর্গের মানুষের এক বাস্তব জগৎ তৈরি হয়েছে। নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন লেখক। সেই বাস্তব জগতের মানুষগুলিকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বলে এদের নিয়ে যখন কাহিনি নির্মাণ করেছেন তা এত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই উপন্যাসটি ঢোঁড়াইয়ের স্বপ্নভঙ্গের দিয়ে শেষ হলেও তা সার্থক হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের বাস্তবতার গুণে। সব মিলিয়ে নিম্নবর্গের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা
২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়ান্য', দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা
৩. সমরেশ মজুমদার : বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৪. তরুণ মুখোপাধ্যায় : 'সতীনাথ ভাদুড়ী অন্বেষণে ও অনুভবে', পাণ্ডুলিপি
৫. অশ্রুকুমার সিকদার : 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অরুণা প্রকাশনী
৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৭. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৮. অরবিন্দ সামন্ত : 'সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য', প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা
৯. পবিত্র সরকার : 'বঙ্গাদর্পণ', প্রথম খণ্ড
১০. পবিত্র সরকার : বঙ্গাদর্পণ, তৃতীয় খণ্ড

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বনাম পুরুষতান্ত্রিকতা
প্রেক্ষিত 'সুবর্ণলতা'

অস্মিতা মিত্র

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার/হে বিধাতা?[১]

কবিগুরুর এই প্রশ্নেরই যেন উত্তর খুঁজেছেন আশাপূর্ণা দেবী সমগ্র 'সুবর্ণলতা' উপন্যাস জুড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের আকাশে আশাপূর্ণা দেবী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই তাঁর সমগ্র লেখক জীবন অতিবাহিত করেন। ফলে বিংশ শতকের যাবতীয় সামাজিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলন এবং তাদের প্রতিক্রিয়া অথবা সামন্ততান্ত্রিক রুদ্ধ অচলায়তনে প্রতিক্রিয়াহীনতা সবই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, অর্থনৈতিক মন্দা ও তার পরবর্তী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভাঙন, বিশ্বাসের অপমৃত্যু এছাড়াও নানা বিষয় সম্পর্কে উদাসীন নিরাসক্তিকেও। আশাপূর্ণা দেবীই আমাদের নতুন করে শেখালেন ব্যক্তি হিসেবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই গুরুত্ব আছে।

আশাপূর্ণা দেবীর 'ত্রয়ী' উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'(১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৬), 'বকুলকথা'(১৯৭০) বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম। ঔপন্যাসিক এখানে ভাষ্যকার কথকের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল---'মিত্তির বাড়ি'(১৯৪৭), 'বলয়গ্রাস'(১৯৫২), 'অগ্নিপরীক্ষা'(১৯৫২), কল্যাণী (১৯৫৪), 'সমুদ্র নীল আকাশ নীল'(১৯৬০), 'নবজন্ম'(১৯৬০) ইত্যাদি। নারী মন মানসিকতা, প্রেম, ভালোবাসা, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন মধ্যবিত্ত জীবন সমস্যা, নারীমুক্তি ইত্যাদি সবকিছুই স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে দুই উল্লেখযোগ্য নারীব্যক্তিত্ব হলেন সুবর্ণলতা ও মুক্তকেশী। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চরিত্র দুটি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী তবুও নিজ নিজ দিক থেকে উভয় চরিত্রই সমগ্র উপন্যাসে বিশেষ

গুরুত্বের দাবি রাখে। ঔপন্যাসিক 'সুবর্ণলতা' চরিত্রটিকে দেখিয়েছেন এক নতুন সময়ের মানুষ হিসেবে। চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণে সে তাঁর সময় থেকে অনেকটা এগিয়ে। তাই মুক্তকেশীর সংসারে মেজো বউ হিসেবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সংঘাতও অনিবার্য হয়ে উঠল সুবর্ণের জীবনে। ছেলে-বউদের সঙ্গে মুক্তকেশীর অন্যায়-আচরণের প্রতিবাদ করে সুবর্ণ।

নয় বছর বয়সে বিয়ে হওয়া সুবর্ণলতা ত্রিশটা বছর কাটিয়েছে স্বামী-সংসারের মধ্যে। শাশুড়ি মুক্তকেশী, ভাসুর সুবোধ, বড়ো জা উমাশশী, দুই দেওর, ননদ, স্বামী-সন্তানদের নিয়ে এতোবড়ো সংসারের মাঝেও সুবর্ণলতা একাকীত্ব বোধ করে কারণ সে সুগৃহিণী কিংবা পতি অনুগামিনী সতীর ছাঁচে গড়া পুতুল নারী নয়। সে আত্মসচেতন এক নারী। এই নারীসত্তাকে সচেতন করতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে নাটক-নভেলও। একদিকে সুবর্ণের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং যুক্তিবাদিতা আবার অন্যদিকে শাশুড়ি ও তার পুত্রদের কেবল প্রথাগত নিয়ম-নীতির প্রতি আনুগত্য; যেখানে মা মুক্তকেশী 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' এবং তার কথাই নিয়ম, সে ভ্রান্ত হোক আর অন্যায়ই হোক না কেন সেখানে আধুনিক মনস্ক সুবর্ণলতার সবেতেই প্রশ্ন 'কেন' অর্থাৎ সবকিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রবণতা দেখা যায় তার মধ্যে। ফলে স্বামী ও সংসারের সবার কাছেই সে 'সৃষ্টিছাড়া', 'লক্ষ্মীছাড়া', 'দজ্জাল', স্পর্ধা থাকা বিরোধী শক্তি ও সাহসের অধিকারী এক নারী। এখানেই আর পাঁচটা সাধারণ নারীর থেকে আলাদা রূপে ধরা পড়েছে সুবর্ণ।

বিবাহিত জীবনে প্রথম সে স্বামীর কাছ থেকে শাড়ি, গয়না নয় বরং চেয়েছিল নতুন ঘরে একটি বারান্দা যেন থাকে। অর্থাৎ চেয়েছিল একটু স্বাধীনতা। এরকম একটা বায়না স্বামী প্রবোধের কাছে ছিল অস্বাভাবিক এবং সন্দেহজনক। মেয়েরা সুগৃহিণী ও সুমাতা হয়ে সারাদিন শারীরিক পরিশ্রম করে সবার মন জুগিয়ে চলবে, শাড়ি গয়না পরে স্বামীর ভোগের পাত্রী হয়ে কেবল বাচ্চা প্রসব করবে তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক ভাবনায় নারীর মূল্য ছিল তাই। কিন্তু এসবকেই একমাত্র নারীর মূল্য বলে মনে করে না সুবর্ণ; এখানেই তার স্বতন্ত্রতা।

সুবর্ণই মুক্তকেশীর বাড়িতে পড়াশুনার চল শুরু করে। মুক্তকেশী ছেলেদের পড়াশুনার অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও মেয়েদের পড়াশুনার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ—"মেয়েদের পড়ার ওপর দস্তুরমত খাপ্পা মুক্তকেশী। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বাচাল, আর ম্লেচ্ছ ভাষা শিখলে বিধবা হয়, এটা যে অবধারিত, তা তাঁর জানা আছে। কাজেই ওদের পড়ার বালাই নেই।"[২]

সুবর্ণ সকলকে ফাঁকি দিয়ে তার মায়ের শিখিয়ে দেওয়া বিদ্যাকে লালন করে চলে। সেই সময় দাঁড়িয়ে এরূপ স্বতন্ত্রতা দেখানোর ফলে সুবর্ণলতা চরিত্রটি স্বাভাবিকভাবেই নজর কাড়ে সকলের। সুবর্ণ সংসারে অনেক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অপমান সহ্য করেও স্বপ্ন দেখে দক্ষিণের বারান্দার। যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে স্বাদ নিতে চায় নতুন কালের, দেখতে চায় স্বদেশি করা মানুষের মিছিল, দেখতে চায় মানুষের মুখ। মুক্তকেশীর সংসারে যারা যুক্তি বোঝে না যাদের চিন্তাশক্তি নেই তাদের দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে ওঠে সুবর্ণ। দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুক্ত আলো মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে চায় সে। তবে সুবর্ণের স্বামী প্রবোধের মতে মেয়েরা থাকবে অন্দরে, বাইরে তার মুখ দেখাবার জো নেই। কিন্তু সুবর্ণ একথা জেনে বড়ো হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয় মতবিরোধের। অন্য কেউ যা কল্পনা করতে পারে না তাই পারে সুবর্ণ। এখানেই তার স্বতন্ত্রতা। সুবর্ণের মতে ঘরকন্নার কাজটি জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়, মানুষ হয়ে ওঠার কাজটিই হল সবচেয়ে বড়ো কাজ। এতেই আছে মেয়েদের মুক্তি। বর্তমান একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে একজন নারী একথা ভাবতে পারলেও 'সুবর্ণলতা'-র সমকালে একজন নারীর পক্ষে একথা ভাবা সহজ ছিল না। সুবর্ণ ছিল রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। নারী স্বাতন্ত্র্যবাদের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল হয়তো

এ কারণেই বারবার সুবর্ণলতার মাধ্যমে কথা বলে। অবশ্য স্বদেশি মেলায় যোগদান এবং দোকান দিতে আগ্রহী সুবর্ণের মনে ছিল না সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচিত পৃথিবীর আমেরু ব্যবধানের কথা। বিশাল জন-সমাজরূপী সমুদ্রে সে যেন এক ভাসমান নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো। আশাপূর্ণা দেবীর সুবর্ণলতা এক বাস্তব নারী। নারীর অন্তরকে এক নারী ঔপন্যাসিক দেখেছেন স্বচ্ছভাবে। তাই তাঁর কলমেই মেজ বৌ সুবর্ণ বাড়িতে ঢোকাতে পেরেছে একালের হাওয়াকে। বহু বছর ধরে চলে আসা মেয়েদের ওপর যে বাধা-নিষেধের শৃঙ্খল এবং নিয়ম-নীতির নামে কুসংস্কারের জঞ্জাল আর অজ্ঞানতায় জীর্ণ হয়েছে নারীসমাজ তাকে প্রশ্নবাণে বিদীর্ণ করার সাহস দেখাতে পেরেছে একমাত্র সুবর্ণ। ধিক্কৃত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপে জর্জরিত হয়েও নিজের জেদ ছাড়ে না সুবর্ণ। পরিস্থিতির কাছে হেরে যাওয়া নয় বরং প্রতিকূল পরিস্থিতে প্রতিবাদ করে টিকে থাকার কারণেই সুবর্ণ স্বতন্ত্র।

মুক্তকেশীর ধারণা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে সুবর্ণ। তাই আঁতুড় ঘরে মুক্তকেশীকে অবাক করে চরম প্রসব যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেও অনাগত শিশুটির জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় চায় সুবর্ণ। তবে 'যমে মানুষে টানাটানির পর' সুবর্ণলতা জন্ম দেয় এক শিশু কন্যার। জন্মেই 'ছি ছি' শব্দে তার অভ্যর্থনা জোটে শঙ্খধ্বনির পরিবর্তে। তবে বর্তমানে শিশুকন্যারা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটাই এই 'ছি ছি' ধিক্কার থেকে রেহাই পেয়েছে। মুক্তকেশী তাকে 'মাটির ঢিপি'-র চেয়ে বেশি কিছুই ভাবতে পারে না। কিন্তু সদ্যোজাত সন্তানের মা সুবর্ণর সেই চেতন-অচেতন মানসিকতার মাঝামাঝিই তার মা সত্যবতী এসে হাজির হয়ে নারী-পুরুষের এই বিভাজন রেখাকে অসার চিহ্নিত করে উচ্চারণ করেন— "ছেলেমেয়ে দুই-ই সমান সুবর্ণ, হেলা করিস না।"[৩] আলোচ্য উপন্যাসে সুবর্ণলতা নিজের বিচার-বুদ্ধিতেই বলতে পেরেছে—মেয়েমানুষ জাতটা যে অপমানের পঙ্ককুণ্ডে পড়ে ছটফট করছে তার প্রধান কারণ হল তারা রোজগার করেনা, অপরের ভাত খায়। যাতে সারাজীবন তাদের অপরেরই ভাত খেতে হয়, যাতে তাদের চিরজন্ম পরাধীন থাকতে হয় তাই তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে আপত্তি সমাজের। সুবর্ণলতা তার খাতায় লিখেছিল—মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শিখে ফেলে তবে পুরুষরা তাদের 'পায়ের বেড়ি', 'গলগ্রহ', 'পিঠের বোঝা' বলার সুখ পাবে না। এই সহজ কথাগুলি সুবর্ণ যেভাবে বুঝেছিল উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের কাছে তা সহজে বোধগম্য হয়নি। আবার সুবর্ণের মতো এত সহজে কেউ কথাগুলো বলতেও পারেনি। এখানেই সুবর্ণের স্বতন্ত্রতা।

সুবর্ণলতার বাস প্রতিকূল পরিবেশে। তবুও সে আত্মসচেতনাকে বিসর্জন দিতে পারেনি। বাইরের দিক থেকে দেখলে তার জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। ছেলে মেয়েদের ঠিক ঠিক সময় বিয়ে হয়েছে, ছেলেরা ভালো চাকরি পেয়েছে, নিজের বাড়িতে তার একান্ত কাম্য দক্ষিণের বারান্দাটি পর্যন্ত পেয়ে গেছে সে। তাদের যৌথ পরিবারের বাড়ি তৈরি হবার সময় সেই বারান্দা পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েই প্রতারিত হতে হয়েছিল তাকে। এই সাফল্যের অন্তরালে তার আত্মস্বরূপের প্রতি পদে লাঞ্ছিত হওয়ার হাহাকার সংসারে কারও কানে পৌঁছায়নি, পৌঁছাবার কথাও নয়; সে হাহাকারের মর্ম বোঝা তার পরিবারের সদস্যদের সাধ্যের বাইরে। তবে সুবর্ণলতা চরিত্রটির ট্রাজেডি এখানেই সবচেয়ে গভীর যে তার নিজের হাতে গড়ে তোলা আত্মজারাও তার মানসিক যন্ত্রণাকে বুঝতে পারে না, মায়ের প্রতি সমবেদনার পরিবর্তে মায়ের বিরুদ্ধেই তারা গর্জে ওঠে—"আমি বাবা মেয়েমানুষকে নিয়ে কোথাও যেতে-টেতে পারবো না। সাধে তোমায় পাগল বলে লোকে! যত সব কিম্ভূতকিমাকার ইচ্ছে!"[৪] সুবর্ণলতা Liberal feminism-এর প্রতীক। তার নারীমনস্কতার মূলে কাজ করেছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার আদর্শ। এই বোঝাপড়া সে সমাজের

মধ্যে থেকেই করতে চেয়েছে। এরূপ চাওয়া সেই সময়কার অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় না। এখানেই সুবর্ণলতার স্বতন্ত্রতা। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সুবর্ণলতা চরিত্রটির পরই যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে সেটি হল মুক্তকেশী। মুক্তকেশী চরিত্রটিকে আঁকতে গিয়ে ঔপন্যাসিক সময় ও সমাজভাবনা দুটি বিষয়কেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুবর্ণলতার শাশুড়ি মুক্তকেশী এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে—বেটাছেলে জাতটা পুরুষের বাচ্চা তাই ভেড়ুয়ার মতো পরিবারের কথায় তারা ওঠবোস করে না—"এরা জানে মাকে ভক্তি করতে হয়, স্ত্রীকে শাসন করতে হয় এবং সর্ব বিষয়ে মেয়েমানুষ জাতটাকে তাঁবে রাখতে হয়।"[৫]

মুক্তকেশী সমাজ অনুশাসনের বাইরে হাঁটতে নারাজ। তাই সমাজ অনুশাসনের সামান্য ব্যতিক্রমেই সে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী, বোধ করে অসহায়তা। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন পুরোনো ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে। প্রতিনিয়ত তাই তার দ্বন্দ্ব শুরু হয় নতুন কালের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। মুক্তকেশী তার সংসারের মূল নিয়ন্ত্রক। তাঁর ছেলেরা সুউপায়ী, পরিণত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও মাতৃ নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। পুত্রবধূরাও মায়ের নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলে। কিন্তু সুবর্ণলতা মুক্তকেশীর সংসারে মূর্তিমান উপদ্রব। বিয়ের পর থেকে সে মুক্তকেশীর সংসারে একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে তোলে। সুবর্ণলতার হাত ধরেই মুক্তকেশীর সংসারে প্রবেশ করে নতুন যুগের আলো। মুক্তকেশীর শাসন ও স্বামী প্রবোধের শারীরিক নির্যাতন সুবর্ণলতার স্বভাবকে দমিয়ে রাখতে পারে না। সব কিছুকে ছাপিয়ে নতুন সময়ের হাতছানি সুবর্ণলতার হাত ধরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদিও তাকে লড়াই করতে হয় অনেক। কারণ এটি শুধু কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব নয় এটি আসলে দুই যুগ ও দুই কালের ভাবনার দ্বন্দ্ব। ফলে একটি ভাবনা বা ধারণার শিকড় উপড়ে ফেলে নতুন করে সেখানে চারা বসানোর কাজটা সহজ ছিল না।

সুবর্ণ মুক্তকেশীর প্রায় সব শখ আহ্লাদই মিটিয়েছে। মুক্তকেশী সুবর্ণের আচার-আচরণ সম্পর্কে নিন্দা করলেও সুবর্ণের স্বভাব উদারতার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিতও হয়েছেন। তিনি বোঝেন সুবর্ণের কারণেই প্রবোধের সংসারে কোনো অনাচার নেই। কিন্তু সমস্যাটা এখানেই যে সুবর্ণের এত গুণ সত্ত্বেও সুবর্ণকে সমর্থন করতে পারে না মুক্তকেশী। এখানেই বলা যায় মুক্তকেশী পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

মুক্তকেশীর চরিত্রটিকে আঁকতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন গাঢ় রঙের। মুক্তকেশী উচ্চকিত তাই সুবর্ণের সাথে তার সংঘাতও অনিবার্য কিন্তু শেষপর্যন্ত আশাপূর্ণা যেভাবে মুক্তকেশীকে রূপ দিলেন তাতে একদিকে তাঁর পুরোনো মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্যদিকে পুরোনো মূল্যবোধকে অস্বীকার না করার নির্দেশটিও ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর সময় মুক্তকেশী আত্মজ-আত্মজাদের নয় সুবর্ণের মাথায় হাত রেখেই আশীর্বাদ করে যান। এভাবেই মুক্তকেশীর আশীর্বাদ নিয়েই এগিয়ে চলে সুবর্ণ। পুরোনোকে ধ্বংস করে নয় বরং পুরোনোকে নিয়েই শুরু হয় নতুনের যাত্রা। মুক্তকেশীর পরিবার যে শিক্ষায় শিক্ষিত তাতে গড়ে ওঠে এক পিতৃতান্ত্রিক পরিবেশ। এই পরিবেশে নারী ও পুরুষের পৃথিবী সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের জন্য আইনও আলাদা। সুবর্ণর দেওর প্রভাসের কথায়—

> ওকালতি করছি, কোর্ট-কাছারি দেখছি, ভদ্রঘরের মেয়ে যে এমন বেসহবৎ হয়, এ ধারণা ছিল না। এ সমস্তই মেজদার বুদ্ধিহীনতার ফল! মেয়েমানুষকে কখনো আস্কারা দিতে আছে সর্বদা চোখরাঙানির নিচে রাখলে তবে শায়েস্তা থাকে।[৬]

পুরুষরা চালক, মেয়েরা চলবে তাদের নির্দেশমতো। পুরুষরা উপার্জনকারী আর মেয়েরা তাদের আশ্রিত। তবে মুক্তকেশী একজন নারী হয়েও ছেলে প্রভাসের ওইরূপ কথাকেই সমর্থন করেন। তাঁর এরূপ আচরণই প্রমাণ করে একজন নারী হয়েও তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই প্রতিনিধিত্ব

করছেন। মুক্তকেশীর পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক চেতনা মেয়েদের আক্রমণ করতে যে সব ভাষা ব্যবহার করেছিল সেগুলো মূলত ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের ভাষা। এটি প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি দক্ষ ছিল মুক্তকেশীর তৃতীয় পুত্র প্রভাসচন্দ্র। আর তার এই সুলভ গুণগুলি চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছিল সুবর্ণের সন্তান চাঁপা, ভানু ও কানু। পারুল ও বকুলের স্কুলে ভরতি হওয়ার ব্যাপারে ভানু বোনকে বিদ্রুপ করে বলে—"বিদ্যেবতীর আর বাড়ির বিদ্যেয় কুলোচ্ছে না।"[৭] আবার কানু বলে—"নাটক-নভেলের তো শ্রাদ্ধ করেছো, ওই মাথায় আর যোগবিয়োগ গুণভাগ ঢুকবে?"[৮] এই কথাগুলোর বক্তা পুরুষ হলেও মুক্তকেশী একজন নারী হয়েও সর্বদা সমর্থন করেন এই কথাগুলোকে। পুরুষজাতির নারীর প্রতি এরূপ বিদ্রুপসূচক কথার মধ্যে যে মুক্তকেশীর নারীসত্তারও অপমান হয় তা বোঝার ক্ষমতা নেই মুক্তকেশীর। পরাশ্রয়ী পরান্নভোজী বিধবা মুক্তকেশীর সংসারে এত দাপট ও দম্ভের উৎস বা প্রেক্ষাপট যদি অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাবে পরনির্ভরশীল এই নারীর সংসারে প্রভুত্বের বা আধিপত্য বিস্তারে সমাজ-অর্থনীতিগত কোনো ক্ষমতাই ছিল না। কিন্তু তার জীবনে নেমে আসা বঞ্চনা, অবহেলা, অত্যাচারই তার ওইরূপ আচরণের কারণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বলা যায় নিরাপত্তাহীনতাই মুক্তকেশীর দম্ভের ও দাপটের প্রধান উৎস। এখানে রয়েছে বর্তমান অস্তিত্বের বিপন্নতার ভয়। আর এই বিপন্নতাই পুরুষতন্ত্রের অলিখিত সুবিধাবাদী আইন রক্ষার বড়ো হাতিয়ার। তাই লেখাপড়া শেখা মেয়েদের বৈধব্যের কারণ বলে প্রতিপন্ন হলেও নিজের বৈধব্যের সঠিক কারণ কী তা মুক্তকেশী জানে না।

তবে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিপরীত মনের নারী সুবর্ণই মুক্তকেশীর কাছে খুব কাছের হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সমস্ত নারী এভাবেই হয়তো অবস্থানগত ভিন্নতা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত এক হয়ে যায়। তাই মনে হয় বর্তমান একুশ শতক যে নারীকে বোরখা পরায় আবার যে নারীকে সামান্য সুতো পরিয়ে র‍্যাম্পে হাঁটায় এরা সকলেই শেষ বিচারে কোথাও না কোথাও এক হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে সুবর্ণলতা ও মুক্তকেশীর মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য চেতনার যে বিভাজনরেখা কায়েম ছিল শেষপর্যন্ত সেই রেখা মুছে গিয়ে তারা আর মুখোমুখি দাঁড়ায় না বরং তারা দাঁড়ায় পাশাপাশি। লিঙ্গ পরিচয় জন্মগত নয়, সামাজিকভাবে নির্মিত এক বিষয়; যাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে মুক্তকেশী ও সুবর্ণর পাশাপাশি অবস্থান। এই পাশাপাশি অবস্থান করার পথটা হয়তো মসৃণ নয়, বার বার সেই পথে বাধা এসেছে, এসেছে অনেক ব্যর্থতাও কিন্তু রাতের অন্ধকারের পর যেমন দিনের আলো ফুটে ওঠে তেমনই ব্যর্থতার পরে এসেছে সফলতাও। তাই মুক্তকেশীরাও আরও বেশ কিছুকাল হেঁটে চলবে উপন্যাসের পাতায় এবং সুবর্ণলতারাও চালিয়ে যাবে তাদের আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার লড়াই।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "সঞ্চয়িতা", 'সবলা', বিশ্বভারতী, ১৩৬২ আশ্বিন, পৃ. ৬৩১
২. আশাপূর্ণা দেবী : 'সুবর্ণলতা', সৃষ্টি প্রকাশালয়, বইমেলা ২০০৮, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৯২
৩. তদেব : পৃ. ৩৫
৪. তদেব : পৃ. ২২২
৫. তদেব : পৃ. ১৪
৬. তদেব : পৃ. ৭০
৭. তদেব : পৃ. ২২৬
৮. তদেব : পৃ. ২২৬

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ : আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে

রিয়ালী বসু

কোনো একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গল্প বা উপন্যাস গড়ে উঠলেই তাকে আঞ্চলিক সাহিত্যের আখ্যা দেওয়া যায় না। আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম তখনই হয় যখন কোনো বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিতে সেখানকার মানুষের জীবন চিত্রিত হয় বা একটা বিশেষ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সেখানকার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে ওই বিশেষ অঞ্চলই গুরুত্বপূর্ণ। সেই অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, পাত্র-পাত্রী, সংস্কৃতি, নানা আচার-আচরণ উপন্যাসের পরিণাম সমস্ত কিছুই সেই পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জনগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। আর সেই ধারায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের রচিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। নানামাত্রিক সামাজিক অবজ্ঞা আর উদাসীনতায় কেটেছে তার শৈশব জীবন। যে পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছেন, সেই জীবনকেই তিনি এই উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে অঙ্কন করেছেন। আঞ্চলিক উপন্যাস হচ্ছে একটি অজ্ঞাত কৌতুহলোদ্দীপক জনজীবনের অন্তরঙ্গ রূপায়ণ। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো অপরিচিত রহস্যমণ্ডিত সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাস সংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন, অথবা কোন বিশেষ ধরনের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী জীবনবোধের পরিস্ফুটন।[১]

তিতাস নদীকেই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা হয়। এই নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার মালোদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের কাহিনি। রাইন, টেমসের মতো ক্ষুদ্র নদীর তীরে যেমন গড়ে উঠেছিল নদীকেন্দ্রিক ইউরোপীয় সভ্যতা, তেমনি তিতাসের তীরেও গড়ে উঠেছিল এক সৃষ্টিশীল জীবন ও সংস্কৃতিক

ঐতিহ্য। তিতাস শাহী মেজাজে চলে। ঔপন্যাসিক এই নদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"তিতাসের কূল জোড়া জল, বুকভরা ঢেউ প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়া তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে কিন্তু পারে না।"[২] তিতাস সাধারণ একটি নদী মাত্র। কোনো ইতিহাসের কেতাবে বা কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এই নদীর নাম কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যিই কি এর কোনো ইতিহাস নেই, এর উত্তরে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

> পুঁথির পাতা পরিয়া গর্ভে ফুলিবার মতো এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বউ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে আঁকা রয়েছে। সেই ইতিহাস হয়তো কেউ জানে বা জানেন না কেউ। তবু সেই ইতিহাস সত্য।[৩]

এই উপন্যাসের মধ্যেই শ্রমজীবী মালোদের চিরায়ত চিত্র বর্ণিত আছে। তিতাসের বুকে তারা নৌকা চালায়। এই তিতাসের মাছ ধরেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এই নদীর তীরেই তাদের বাস। ঘাটে বাঁধানো নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি ঘরে ঘরে চড়কি, টেকো, তোকলি সূতা কাটার, জালবোনার সরঞ্জাম এইসব নিয়েই মালোদের সংসার। এই তিতাস নদীর উৎসস্থল থেকে মোহনার মাঝামাঝি বিভিন্ন গ্রাম যেমন সাদেকপুর, নবীনগর, গোকনঘাট, আমিনপুর, বিরামপুর, ভৈরববাজার, নয়াকান্দা, শুকদেবপুর, উজানিনগর পর্যন্ত এই উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিবেশ।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিভিন্ন সংস্কৃতি যে মানুষের মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে সেই রকম বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাই আমরা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনি ও ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছে যে পূজাকে কেন্দ্র করে সেটি হল মাঘ মণ্ডলের ব্রত উপলক্ষ্যে দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তীর চৌয়ারি বানানো ও ভাসানো নিয়ে। শত দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়েও তারা এই পূজা করে। এই পূজা কুমারী মেয়েরা উপযুক্ত বর পাওয়ার জন্য করে থাকে। আসলে এই ধরনের পূজা-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক যোগাযোগ ঘটে তা এখানে সূচিত হয়েছে।

মালোদের নৌকা নিয়ে প্রবাস যাত্রার যে বর্ণনা উপন্যাসে আছে তা সুবল ও কিশোরের প্রবাস যাত্রার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। সুবল ও কিশোরের লেখাপড়ার পাঠ চুকে যায় বাল্য বয়সেই। তাই তারা জীবিকা আরোহণের জন্য প্রবাসযাত্রা করে। তাদের সংগ্রাম শুরু হয় এখান থেকেই। নৌকা চালানোর পথে ভৈরব বন্দরে গিয়ে সন্ধ্যা হলে তারা ওখানে রাত্তিরে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে তাদের চোখে ধরা পড়ে মালো জীবনের আরেক বাস্তবচিত্র। তারা আবিষ্কার করে যান্ত্রিক পৃথিবী ও নাগরিক জীবনের সুবিধাপ্রাপ্ত ভৈরবের মালোরা তাদের থেকেও অগ্রগামী। তাদের না পাওয়ার কথাকে ঔপন্যাসিক এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—"এ গায়ের মালোরা গরীব নয়। তারা বড় নদীতে মাছ ধরে। রেল বাবুদের পাশে থাকে। গাড়িতে করিয়া মাছ চালান দেয়। তারা আছে মন্দ না।"[৪] ভৈরব মালোসমাজে এই অবস্থার পিছনে যে একটি অশুভ শক্তি লুকিয়ে আছে তা বুঝতে বাকি থাকে না কারোর।

প্রবাস যাত্রার শেষে কিশোর ও সুবল উপস্থিত হয় উজানিনগরের খলায় বাশিরাম মোড়লের বাড়িতে। মোড়লের গিন্নি খুব যত্ন সহকারে তাদেরকে খাবার পরিবেশন করেন। খাবার প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন তারা জেলে হলেও বড়ো মাছের স্বাদ খুব একটা পায়নি। বড়ো মাছ তারা

ধরলেও তা পয়সার জন্য বেঁচে দিতে বাধ্য হয় তারা। জেলেদের পাশাপাশি যে চাষিরা এখানে বাস করত তাদের জীবন ও জীবিকার কথাও লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। ঘরে ধান থাকলেও তাদের কোমরে গামছা জোটে না। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক চাষি জমি পর্যন্ত বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়। জলের ওপর তাদের ভরসা কম ফলে মাটি তাদের কাছে খাঁটি। জেলেদের সঙ্গে চাষিদের যে এই আর্থসামাজিক দৈন্যতা ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন।

শুধু মালোরাই নয় তিতাস তীরের মুসলমানদের জীবনের সঙ্গেও নদী গভীরভাবে যুক্ত। কাদির মিয়া, ছাদির মিয়ার মাধ্যমে সেই নির্ভরশীলতার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য আলু বাজারে যায় এই নদী পথেই।

মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই তিনটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন বিষয়ে তাদের সামর্থ্য থাকলে তারা যথেষ্ট পয়সা খরচ করে। তবে তাদের জীবনে অবশ্য এমন সৌভাগ্য আসে না। মাছের ঝাঁকের মতো তারা জন্মায় আবার কেউ কেউ মাছের পোনার মতোই অজান্তেই হারিয়ে যায়। তবুও প্রেমের দেবতা কখন কার জন্য ফাঁদ পেতে রাখে তাকেও বলতে পারে না। উজানিনগরের প্রবাসে কিশোরের সঙ্গে ভাব হয় পঞ্চাদশী এক মেয়ের। কিশোর ও প্রেমের ফাঁদে পড়ে বিয়ে করে সেই মেয়েটিকে। সুতরাং বলা যেতে পারে নদী যেন তাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই নদী পথেই তারা এসেছে উজানি নগরে, সেখানে লাভ করেছে সুন্দরী স্ত্রী। আবার এই নদী পথেই বাড়ি ফেরার সময় ডাকাতরা লুট করে তাদের সমস্ত মুনাফা নগদ দুইশত টাকা এবং কিশোর তার সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলে পাগল হয়ে যায়। ঔপন্যাসিক এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—"রাতের ঝড়ে যে পাখির ডানা ভাঙিলো, সে ডানা আর জোড়া লাগিল না।"[৫] অর্থাৎ নদী পথ বা নদী নির্ভর জীবন যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

এরপর নয়াবসত খণ্ডে দেখা যায় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের আশ্রয় থাকার পর অনন্তর মা এসে পৌঁছায় গোকর্ণ ঘাটে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের ভয়ে অনন্তর মা কাউকে কিছু বলেনা। মালোপাড়া নিয়ম অনুযায়ী নতুন কেউ বসতি স্থাপন করলে সমাজ ভাগ করে দেওয়া হয়, এর জন্য দশজনের সভা হয়। অনন্তর মাকে নিয়েও সেই সভা হয়, যা সামাজিক রীতিনীতির অংশ। বুদ্ধির জোরে যারা জিতে যায় তারাই মালো সমাজে প্রতিনিধিত্ব করে। ভরতের বাড়ির সভার মধ্যে সেই সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যেমন কালীপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, নৌকাবাইচ, হোলি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ইত্যাদি।

আঞ্চলিক উপন্যাসের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জনপদের নিজস্ব ভাষা। মালোদের মুখে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন যেমন ডোল, খেউ, চড়কি, টেকো, চৌয়ারি প্রভৃতি। এছাড়াও আছে বহু প্রবাদ-প্রবচন এর ব্যবহার যেগুলি তিতাসের তীরবর্তী মানুষের মনোভাব বিশ্বাস-সংস্কারের দীপ্ত উদ্বোধক।

কিন্তু চতুর্থ খণ্ডে দেখা যায় মালোদের সমাজচিত্র অনেকটা কৌতূহলোদ্দীপক। এতে আমরা মালোসম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি, আধুনিক চটুল বর্ণসংকর, রুচি ও আমোদের ওপর বিপর্যয় ও বর্ণবিলুপ্তির একটি গভীর জীবনবোধ সমৃদ্ধ পরিচয় পাই। প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব, উন্নত রুচি ও অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল বিশুদ্ধ আবেগের যে সমন্বিত রূপ দেখি, তা

নিম্নবর্ণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অভাবনীয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত এর আবেদন সঞ্চারিত করে দিয়ে সর্বসাধারণকে রুচি ও অনুভূতির এক মহিমান্বিত পর্যায়ে উন্নত করেছিল, তা অসাধারণ প্রাণশক্তির নিদর্শন। আধুনিকতার মোহে এই বাংলা সমাজের বিপর্যয় একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত। এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল বর্জ্যের মতো দৃঢ়। তাদের সেই ঐতিহ্য ফাটল ধরল যাত্রাপালাকে কেন্দ্র করে। তারা দুটি দলে ভাগ হয়ে গেল একদল কালোবরনের বাড়িতে অন্য দল মোহনের বাড়িতে আসর জমায়। অবশ্য মোহোনের বাড়ির গানেই মালোদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা হয়। কৃষ্ণভক্তির গান, দেহতত্ত্ব, হরিবংশ, নামগান, সহচরী গান, গোষ্ঠ, প্রভৃতি গানের উল্লেখ পাওয়া যায় উপন্যাস। কিন্তু এই সব গানে তেমন আর দর্শক হয় না। এ থেকেই বোঝা যায় যে মালোদের সংস্কৃতির আবরণ কতটা খসে গেছে। কেবল মোহনই মালোদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু কালোরবাড়ির গতিকে ফেরানোর ক্ষমতা মোহনের নেই। এভাবেই পরাজয় হয় মালোসংস্কৃতির। মোহনের চোখের জল শুধু তার একার কষ্ট নয়, তিতাসপারের নিম্নজীবী আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষের যে বেদনা তা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। এই সংস্কৃতি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংহতি, সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, জীবনের মর্যাদাবোধ ও বাঁচিবার ইচ্ছা সবই একে একে বিলুপ্ত হয়েছে।

মালোদের এই সামাজিক ভাঙন, সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি, প্রাকৃতিক পরিবর্তন কোনো কিছুর থেকে কম নয় এই তিতাসের শুকিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। আসলে প্রথাগত নিয়ম মেনে ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেননি। বাংলাদেশ কিংবা অন্যান্য দেশে হাজারো মালোপাড়া আছে। তাদের হাসি কান্নার হিসেব কেউ রাখে না ফলে বলা যেতে পারে লেখক যদি ওই জনগোষ্ঠীতে না জন্মাত তাহলে এদের জীবনের ইতিহাসও কারো জানা হত না। তাই বলা যেতে পারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মন মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় যে জীবনকে অঙ্কন করেছেন সে জীবন নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানুষের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত। মালোদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। তিতাসের জনপদের বর্ণনার সঙ্গে সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়ণে, এই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সার্বিকবিচারে বলা যায় বিষয়-নির্বাচন, সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য, ভাষাব্যবহার, চরিত্র নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি দিক থেকে বিচারে উপন্যাসটি যথাযথ আঞ্চলিক উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', সপ্তম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
২. তদেব : পৃ. ৭৬৩
৩. অদ্বৈত মল্লবর্মন, তিতাস একটি নদীর নাম, পুথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ২০০৬।
৪. তদেব : ১৩
৫. তদেব : ২৬
৬. তদেব : ৪১
৭. তদেব : ৮৭

বিমল করের ‘যদুবংশ’ : ষাটের দশকের অস্থির সময়ের আলোকে

সুতনু দাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম রূপকার বিমল কর পদার্পণ করেন। তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শঙ্খচূড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জ্যোতিশচন্দ্র কর এবং মাতা নিশিবালা কর। ধানবাদে বাল্যশিক্ষা শেষ করে আসানসোলে এসে তিনি রেল স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। এরপর বরাকরে সেজকাকার কাছে থেকে কুলটি ম্যাকমিলান ইনস্টিটিউশানে পড়বার সময় কাকা কাকিমার সাহিত্যপ্রীতি তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশের পর দেশি-বিদেশি নানা সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত প্রথম গল্প ‘অম্বিকানাথের মুক্তি’ প্রবর্তক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত প্রথম ছোটোগল্প সংকলন ‘বরফ সাহেবের মেয়ে’ প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি ‘ছোটগল্প : নতুন রীতি’ পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটোগল্পে নতুন রীতির প্রবর্তন করেন।

ছোটোগল্পকার রূপে বাংলা সাহিত্যে আর্বিভূত হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিন পর্বে বিন্যস্ত ‘দেওয়াল’ তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। এরপর তিনি একে একে রচনা করেছেন ‘অপরাহ্ণ’, ‘খোয়াই’, ‘খড়কুটো’, ‘বালিকাবধূ’, ‘পূর্ণ-অপূর্ণ’, ‘যদুবংশ’, ‘অসময়’, ‘নিমফুলের গন্ধ’ প্রভৃতি উপন্যাস। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ‘অসময়’ উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য একাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর বেশিরভাগ রচনায় কলকাতা শহর থেকে দূরে কোনো মফস্বল এলাকার নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি ফুটে ওঠে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বিমল কর সম্পর্কে বলেছেন—

> মানুষের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন অনুসন্ধানই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর উপন্যাসে সেই জীবনের রহস্য, জটিলতা, ব্যর্থতার হতাশা, শান্তি শুচিতার অন্বেষণ ও ক্ষোভের অবসান। জীবনের নিষ্টুর বাস্তব সত্য (যা আপাত দুঃসহ) তাঁর লেখায় রূপায়িত। জীবনের জ্বালা বিকারকে তিনি নিরাসক্তভাবে উপস্থিত করেন।[১]

বিমল কর তাঁর 'যদুবংশ' (১৯৬৭) উপন্যাসে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী দুই দশকে মূল্যবোধের ক্রমবিনাশ কীভাবে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে, তা মফস্‌সল শহরে বসবাসকারী চার যুবকের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্‌বাস্তু সমস্যা থেকে শুরু করে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত—চিন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির বিভাজন, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি নানান ঘটনা স্বপ্নবিলাসী বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে চরম আঘাত হানে। বেঁচে থাকবার জন্য প্রতিনিয়ত যেখানে সংগ্রাম করতে হয়, সেখানে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখা নিছকই বিলাসিতা। এমনই এক ক্ষয়িষ্ণু সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজ, পরিবার সমস্ত দিক থেকে অবহেলিত হয়ে আদর্শচ্যুত, স্বপ্নভ্রষ্ট চার যুবক—সূর্য, বুললি, অভয়, কৃপাময় এর মধ্যে দিয়ে লেখক সমকালীন সমাজকে তুলে ধরেছেন।

চার বন্ধুর মধ্যে সূর্য, বুললির পরিবার আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল। সূর্যর বাবা কামাখ্যাবাবু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ভালো মানুষ হিসেবে তিনি খুব একটা সুনাম অর্জন করতে পারেননি। বুললির বাবাকে থানার বড়ো দারোগা। শহরের দাগী আসামীরা মাসিক পাঁচ টাকা বুললির বাবা খোরাকি দেয়। কৃপাময়ের পরিবার একসময়ের বনেদি পরিবার হলেও নানান অভিঘাতে বাড়ির অন্দরমহলে বনেদিয়ানার তিলমাত্র আর বেঁচে নেই। অপর তিন বন্ধুর থেকে আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই দুর্বল অভয়ের পরিবার। তার বাবা কয়লা বয়লারের ইনচার্জ।

অর্থনৈতিক দিক থেকে অসাম্যতা থাকলেও চার বন্ধুর অন্তরে পরস্পরের প্রতি মমতা ছিল। অভয়ের চাকরির জন্য দলবেঁধে চারু দত্তের বাড়ি যাওয়া কিংবা কৃপাময়ের বুকে পিঠে সর্দি জমলে কৃপাময়ের জন্য অভয় তার বাবার মালিশের ঔষুধ নিয়ে আসবার ঘটনায় সেই মমত্ববোধের প্রকাশ পেয়েছে। বন্ধুদের প্রতি অন্তরঙ্গতা থাকলেও সূর্য বা বুললির বাবার প্রতি অভয়ের মনে কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। সূর্য বা বুললির বাবা সমাজের যে স্তরের প্রতিনিধি ছিলেন তার প্রতি অভয়ের মনে বিতৃষ্ণা ছিল। সরাসরি কখনও তেমনভাবে না বললেও আকার ইঙ্গিতে অভয় তার মনের বক্তব্য তুলে ধরত। বুললির উদ্দেশ্যে, "এই শহরে যত জুয়ার আড্ডা আছে, পুলিশ জানে, তোর বাবাকে আর বলতে হবে না।" অভয়ের এই বলা কথা সমকালীন সমাজের উচ্চস্তরের প্রতি নিম্নস্তরের মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

ষাটের দশকের অন্তঃসারশূন্য সমাজের প্রতিনিধি সূর্য, বুললি, কৃপাময়, অভয়রা। রোজকার নিউ কাফেতে চা, সিগারেটের আড্ডা, পিনকির দোকানে মদের আসর, শহরের ফাঁকা নিরিবিলি রাস্তায় একটু রাত হলেই বাজি ধরে বিজলি বাতি ফাটানো, এমনকি স্টেশনের জুয়ার আড্ডায় অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যাওয়া যুবসমাজের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সমাজের প্রতি ছিল তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। তাদের যৌন ইঙ্গিতবাহী কথাবার্তা, সূর্য তার দিদি বিজয়ার ঘর থেকে অশ্লীল ছবির বই চুরি নিজের কাছে রাখে, মালার বিকৃতকামী লালসা, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জগন্নাথ নয়নার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে, পাল কোম্পানীর মেজ বাবুর

সাথে নয়নার অবৈধ সম্পর্ক প্রভৃতি টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

সমাজের প্রতি নীতিহীন, স্বপ্নভ্রষ্ট চার যুবকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের মানসিকতা জন্ম নিয়েছে তাদের নিজ নিজ পরিবার দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে। আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল সূর্য বন্ধুমহলে তোয়াজ পেলেও বাড়িতে সে সম্পূর্ণ একা। বাড়িতে বাবা, দিদির যে জগত সে জগতে সূর্য প্রবেশ করতে পারে না। কখনও কখনও তার মনে হয় বাড়ির অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মতো তাকেও কেবল রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর দিদি বিজয়া তাদের বাড়িতে এসে সংসারের রাশ নিজের হাতে তুলে নেয়। দিদির প্রতি সূর্যর আন্তরিকতার অভাব তো ছিলই, উপরন্তু দিদির চালচলন, মুরুব্বিয়ানা সূর্যকে সংসার বিমুখ করে তুলেছে। ছোটোবেলায় মায়ের মৃত্যুর পর পরিবার থেকে কোনো স্নেহ সূর্যর কপালে জোটেনি। চারপাশের স্বার্থপর জগত তার মধ্যে যে রুক্ষতার জন্ম দিয়েছিল, তা থেকে উত্তরণের জন্য মাঝেমধ্যেই সে স্বপ্নে মাকে খুঁজে বেড়াত। বাড়িতে একমাত্র বিজয়ার পোলিও আক্রান্ত ছোটো ছেলে ছোকনুর প্রতি তার অপত্য স্নেহ ছিল। ছোকনুর এই রোগের জন্য সূর্য দিদির করে আসা নানারকম পাপকেই দায়ী করত। তার মনে হত, "সে যখন মরে যাবে, তখন এই বাড়িটাড়ি, টাকা—পয়সা, যেখানে যা কিছু তার থাকবে, সব ছোকনুকে দিয়ে যাবে, শুধু ছোকনুকেই।"

বুললির বাড়িতে তার মা, বাবা আর বৌদি মৃদুলা আছে। দাদা কর্মসূত্রে অন্যত্র বসবাস করে। বড়োছেলে সাধনের সাথে মৃদুলার বিয়েতে বুললির মা-বাবা দুজনেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু মৃদুলার পেটে সন্তান চলে আসায় এবং মৃদুলার বাড়ি থেকে মোটা পণ পাওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে বিয়েটাকে মেনে নেয়। বিয়ের পর মৃদুলার সন্তান পেটেই নষ্ট হলে বুললির মা-বাবার সঙ্গে মৃদুলার সর্মক আরও তিক্ত হয়। বুললি সংসারের এই পাঁকে কোনোদিনই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনি। তার মা-বাবা মৃদুলাকে যতটা অপছন্দ করত বুললি ততটা করত না। বরং প্রায় সমবয়সী হওয়ার কারণে প্রথম প্রথম দুজনের মধ্যে সখ্যতা ছিল। কিন্তু মৃদুলা যখন নিজের বাপের বাড়ি নিয়ে অহংকার করত, তিন-চার বার পরীক্ষা দিয়ে স্কুলের গণ্ডী পেরোনো বুললিকে নিজের বি.এ. পড়ার গল্প শোনাত, বুললিকে ভালো মানুষ হওয়ার জ্ঞান দিত তখন বুললির অসহ্য লাগত। ফলে তাদের সম্পর্ক কখনোই মধুরতর হয়ে ওঠেনি। বরং সেই সম্পর্কে বিতৃষ্ণার জন্ম নেয়। সেই বিতৃষ্ণা পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে ওঠে মৃদুলার প্রতি বুললির কদর্য ভাষায় আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

একদা বনেদী পরিবার হিসেবে খ্যাত মুখুজ্জ্যে বাড়ির ছেলে কৃপাময় মুখুজ্জ্যে বাড়ির ভেতরকার আবর্জনার মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর তার বাবা সংসারের হাল ধরে। কৃপাময়ের অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, অর্থপিশাচ কাকারা তার বাবাকে সমস্ত দিক থেকে শোষণ করে নিয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর তার মা নিঃস্ব হয়ে সন্তানদের প্রতি কোনো কর্তব্য না করে ধম্মকম্মের প্রতি মন দেয়। কৃপাময়ের মাঝে মাঝে মনে হয় সে তার মায়ের অবৈধ সন্তান। সেই মা কেও সংসারের বাকিরা পাগল করে দিয়েছে। দিদি বেঁচে থাকাকালীন কৃপাময়ের জীবনে একটা অবলম্বন ছিল, কিন্তু আজ আর কেউ নেই। কাকা-কাকীরা তাদের সন্তানকে কৃপাময়ের সাথে মিশতে দেয় না পাছে নষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র ছোটোকাকি প্রতিমা কৃপাময়ের ভালোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। মা, বাবা, দুই বোন এই নিয়ে অভয়দের টানাটানির সংসার। তার দাদা বিয়ে করে বৌ নিয়ে

মোঘলসরাই চলে গেছে। সংসারে একমাত্র রোজগেরে অভয়ের বাবা। আর্থিক-অনটনে বেড়ে ওঠা অভয় কলেজে বছর দেড়েকের বেশি পড়তে পারেনি। চাকরির জন্য সে নানা চেষ্টা করলেও তাতে কোনো সুরাহা হয়নি। অভয়ের মনে হয়, সংসারে বাবা, মা একে অপরকে ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সূর্য বা বুললি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও অভয় আর তারা যে সমগোত্রীয় নয় সেটা অভয়ের বারবার মনে হয়। মানসিকভাবে বির্পযস্ত অভয়ের অন্তরে মাঝে মধ্যেই তার আর সূর্য বা বুললির মধ্যেকার ব্যবধান স্মরণের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি একরাশ ঘৃণার জন্ম নেয়।

অস্থির পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই চার যুবকই সামাজিক, পারিবারিক দিক থাকে অবহেলিত, লাঞ্ছিত হয়ে রুক্ষ, নীতিহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। অথচ একসময় এদের মধ্যেও স্বপ্ন বেঁচে ছিল, আদর্শতার ছোঁয়া ছিল। তরুণ বয়সে তাদের কনসার্ট ক্লাব ছিল। সেখানে অভয় বাঁশি, কৃপাময় গিটার, বুললি অ্যাকরডিয়ান, সূর্য ম্যারাকাস বাজাত। এখন সে ক্লাব আর নেই। যন্ত্রগুলো প্রত্যেকের ঘরে অযত্নে, ধূলোমাখা হয়ে পড়ে আছে—

> আসলে এরা Sick society-তে বাস করে একধরণের দুরারোগ্য Insanity-তে ভুগছে। সংসার এদের দু-মুঠো অন্ন দিলেও সেই অধিকার দেয়নি যাতে এদের বিপন্নতাবোধ এবং 'রাগী তরুণ' হিসেবে অসুস্থ চিন্তা চেতনার মোড় ফিরতে পারে।[২]

উপন্যাসটিতে লেখক তুলসী, গণনাথের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে আদর্শহীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আদর্শবাদী চিন্তাধারার এক অসম লড়াই দেখিয়েছেন। বাবা, সৎ মার সংসারে বড়ো হয়ে ওঠা তুলসীর স্বপ্ন ছিল জ্যোর্তিবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার। বি.এস-সি পাশ করে বাবার অমতে সে কলকাতায় পড়তে যায়। কলকাতায় মেসে থাকাকালীন কবি ও কবিতার প্রতি তার আগ্রহ জন্মায়। সেখানকার একটি কবিদের দলেও সে যোগদান করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশার পর তার মনে হয়—

> ওরা আড়ালে পরস্পরকে কুকুরের মতন কামড়ায়, দল বাঁধতে পারলে ঘেউ ঘেউ করে, একে অন্যের কুৎসা রটায়, প্রশস্তি গাইবার জন্য ভাড়াটে গাইয়ে রাখে। সম্পাদকদের রাতারাতি দাদা তৈরী করে ফেলে, বাড়িতে বেনামা খিস্তির চিঠি দেয়, টেলিফোনে ডেকে মুখ খারাপ করে।

আবার তুলসীর এক কবি বন্ধু মায়ের অপারেশনের রক্ত কেনার জন্য তুলসীর থেকে পঁচিশ টাকা ধার নেয়, যা আজও তুলসী ফেরত পায়নি। উত্তর পাবে না জেনেও সেই বন্ধুকে তুলসী প্রতি বছর ধারের কথা স্মরণ করিয়ে চিঠি লেখে। সূর্যদের মতো তুলসীও অস্থির সময়ের শিকার। কিন্তু সে তার কর্তব্যবোধে বিচলিত হয়নি। বাড়ি ছাড়লেও কর্তব্যের খাতিরে তুলসী প্রতিবছর সৎ মা ও ভাই বোনেদের জন্য পূজোর কাপড় কিনে নিয়ে যায়। তুলসীর এই আচরণে কৃপাময় বুঝতে পারে তাদের এই রাস্তা তুলসীর জন্য নয়। কৃপাময়ের চোখ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন সময়ের দাবিতে আদর্শবোধের কোনো স্থান না থাকলেও তুলসী নিজের ভেতরকার আদর্শবোধকে জলাঞ্জলি দেয়নি—"পিছনে তাকিয়ে কোথাও তুলসীকে দেখা না গেলেও কৃপাময় যেন অনুভব করতে পারছিল তুলসী আর তাদের মধ্যে কোথাও নেই, একলা রুগ্ন শরীরটা টেনে নিয়ে নিয়ে তার নিজের রাস্তায় সে চলে গেছে।"

বছর চল্লিশের গণনাথ মূল্যবোধের দিক থেকে উপন্যাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র। বরাবরই ভালো, পরোপকারী ছেলে হিসেবে খ্যাত সূর্যদের গণাদা জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও

মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়নি। নৈতিকতার খাতিরেই রেলের সুখের চাকরি ছেড়ে নানারকম অনামী কোম্পানীর এজেন্সি নিয়ে সে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে। সেখানে সে কোনো সাফল্য পায়নি। আর্থিক অনটনে জর্জরিত গণনাথ সূর্যদের মধ্যেও বিবেকবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছিল। তাই নিজের ঘর থেকে চুরি করে সোনার জন্মসুখী প্রদীপ সূর্য বিক্রি করতে চাইলেও গণনাথ তাতে বাধা দেয়, নিজের কাছে প্রদীপটি রেখে সে সূর্যকে বারবার টাকা দিয়ে গেছে। টাকার জন্য সূর্য তাকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করলেও সে তা মুখ বুজে সহ্য করেছে। মেসে খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়মের জন্য গণনাথের পেটে আলসার হয়। সে মেস ছেড়ে চলে আসে নয়নাদের বাড়ি। কেবল নিজের জন্য নয়, নয়নাদেরও প্রয়োজন ছিল বাড়িতে নিরাপত্তার খাতিরে একজন পুরুষ মানুষের থাকা। একদা নয়নাকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানো গণনাথ নয়নাকে দিদি বলে সম্বোধন করে। দুই বোন নিয়ে নয়নার টানাটানির সংসারে গণনাথ কোনো বাড়তি বোঝা নয়, বরং গণনাথ তার সমস্ত উপার্জন এই সংসারের পিছনে খরচ করেছে। প্যারা টাইফয়রডে ভোগা নয়নার মেজ বোন যমুনার প্রতি গণনাথ উদ্বিগ্ন ছিল। তা নিয়ে সূর্য তাকে বিদ্রূপ করেছে। অথচ সেই যমুনাই ভবিষ্যৎ জীবন সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে গণনাথের কাছে থাকা সোনার জন্মসুখী প্রদীপটি চুরি করে বাড়ি ছাড়া হয়। প্রদীপটি হারিয়ে যাওয়ার জন্য সূর্যরা গণনাথকে দায়ী করে। তাদের মনে হয় গণনাথ সূর্যকে ঠকিয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ করতে চায়। এককালে চার বন্ধুর থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা পাওয়া গণাদা আজ তাদের চোখেই চোর। কেবল মুখের কদর্য ভাষা নয়, তারা গণনাথকে শারীরিক ভাবেও আক্রমণ করে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই, সূর্যদের দ্বারা অপমানিত গণনাথ জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে। গণনাথের সৎকারে সূর্য প্রথম যেতে না চাইলেও মদের নেশায় অপর তিন বন্ধুকে নিয়ে সে গণনাথের শেষযাত্রার সঙ্গী হয়। চার বন্ধুর কাঁধে গণনাথের দেহ শ্মশানে পৌঁছায়। গণনাথের মৃত্যু যে সূর্যদের চেতনায় নতুন করে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়, তা সূর্যের কথায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে—

> ও পিদ্দিমে আমার দরকার নেই, আমি শালা বেচেই দিতাম।কিন্তু তুমি কেন রেখেছিলে কি লাভ হল তোমার যে মারবার সে মেরে বেচে দিয়েছে। তুমি শালা মাঝখান থেকে কলা চুষলে। গণাদা, মাইরি গণাদা, আমরা তোমায় মারিনি। মেরেছি? আমাদের জন্য তুমি মরলে? কেন মরলে? মানে লেগেছিল? সম্মানে লেগেছিল? আমাদের কাছে চোট্টা বনে গিয়ে সহ্য করতে পারনি! বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তুমি মাইরি, আজব মাল! কেন যে এই পিদ্দিমটা রেখেছিলে কে জানে! ওটা গেল তো কি হল তোমার, তা বলে আফিং খাবে গণাদা, গণাদা, এই শালা গণাদা।

উপন্যাসের শুরুতে গণনাথের উদ্দেশ্যে সূর্যদের কদর্য আক্রমণের চিত্র লেখক দেখিয়েছেন আর শেষে সূর্যদের কাঁধে গণনাথের শেষযাত্রা 'যদুবংশ'-এর যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল', দে'জ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৯৫

২. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় : 'যদুবংশ', 'তীব্র কুঠার', 'বিমল কর বিশেষ সংখ্যা', কলকাতা, বইমেলা ১৪১০, পৃ. ৯৬

‘লালসালু’ : প্রসঙ্গ ধর্মীয় অন্ধ বেড়াজাল ও জীবনজীবিকা

চিত্ততোষ পৈড়া

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ চট্টগ্রাম জেলার এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ (১৯২২) করেন। তাঁর পিতা আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে তাঁর স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি আনন্দমোহন কলেজ থেকে স্নাতক হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার জন্য ভর্তি হন কিন্তু ডিগ্রি লাভের আগেই ১৯৪৫ সালে বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ‘দি স্টেটসম্যান’ এর সাংবাদিকতার কাজে যুক্ত হন। সাংবাদিকতার সূত্রে তিনি কলকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ার সময় তাঁর লেখা প্রথম গল্প ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ (১৯৪১) কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ (১৯৪৮) তাঁকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। তাঁর লেখা অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪), ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮)। নাটকগুলি হল ‘বহিপীর’ (১৯৬০), ‘উজানে মৃত্যু’ (১৯৬৪), ‘সুড়ঙ্গ’ (১৯৬৪), ‘তরঙ্গভঙ্গ’ (১৯৬৫)। তিনি দুটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন ‘নয়নচাঁপা’ (১৯৫১) ও ‘দুইতীর’ (১৯৬৫)। তাঁর রচিত সাহিত্য কর্মের সংখ্যা বেশি না হলেও তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বিশেষত তাঁর রচনায় ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বহির্লোক ও অন্তর্লোকের সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য যেভাবে উদ্ঘাটন হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি একদিকে যেমন কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবনের ছবি এঁকেছেন তেমনি অন্যদিকে মানুষের মনের ভিতরকার লোভ, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্রও এঁকেছেন। তিনি কখনও লেখার জন্য লেখনি ধারণ করেননি। তিনি চেয়েছেন মানবজীবনের জটিল

ও মৌলিক সমস্যাগুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। প্যারিসে বসবাসকালীন সময়ে তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

আমাদের আলোচনার বিষয় তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু'। ১৯৪৮ সালে লেখা এই উপন্যাসে তিনি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র না করে সরাসরি গ্রামীণ জীবনের এক জটিল ও দ্বন্দ্বময় বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কথা। যেখানকার মানুষজনেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মভীরু ও দারিদ্র্যপীড়িত। এদেরকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মানুষ রয়েছে যারা শঠ, প্রতারক ও ধর্মব্যবসায়ী। লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যুগযুগ ব্যাপী চলতে থাকা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে দূর করে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী ভাবনার উদয় ঘটাতে চেয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমালোচক মুস্তাফা-নুরউল-ইসলাম এই উপন্যাসটিকে বাংলাদেশের উপন্যাস সীমার প্রথম মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত হল—

> সমকালীন (আজাদীর পরবর্তী দশকে) আরেক ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ—তিনি এলেন 'লালসালু' নিয়ে। সে উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রাম-জীবন কথা কয়। বলতে গেলে আমাদের সমগ্র দেশটাই ত' গ্রাম। সেই গ্রামকে, দেশকে পেলাম 'লালসালু'তে সেখানকার দ্বন্দ্ব, বঞ্চনা-শোষণ-প্রবঞ্চনা-প্রতিবাদ, আর উজ্জ্বল জীবন চরিত্রগুলি, বলিষ্ঠ স্বতোৎসারিত সংলাপ মালা। বাংলাদেশের উপন্যাসের পথ যাত্রায় 'লালসালু' একটি মাইলস্টোন।[১]

উপন্যাসটিতে বাংলাদেশের অতি পরিচিত মানুষ ও সামাজিক পটভূমি চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটি নায়ক প্রধান। নায়ক মজিদ গ্রামীণ সমাজের অশিক্ষিত মানুষদের বোকা বানিয়ে পরিত্যক্ত একটা প্রাচীন কবরকে লালসালু দিয়ে আবৃত করে মাজার বানিয়ে তোলে এবং এই মাজারকে কেন্দ্র করে সে গ্রামীণ সমাজের মানুষদের বোকা বানিয়ে শোষণ ও অত্যাচারে নেমে পড়ে। সঙ্গী হিসেবে পায় ধনী খালেক ব্যাপারীকে। মহব্বত নগর গ্রামের অধিবাসীদেরকে সে নিয়ন্ত্রণ করে মাজারকেন্দ্রিক ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে। যে গ্রামের মানুষেরা—"চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ।"[২]

এই সমস্ত মানুষদেরকে বোঝায় যে, খোদার নির্দেশেই সে এখানে এসেছে তাদের মধ্যে আলো ছড়াবার জন্যই। আস্তে আস্তে সে ওই গ্রামের মানুষদের কাছে এক মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে সবাইকে বেঁধে ফেলে নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু করে। চক্রান্ত করে তাহের ও কাদেরের বাপকে নিরুদ্দেশ হতে বাধ্য করে। খালেক ব্যাপারীর প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ানো, যুবক আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার আয়োজনকে বিদ্রুপ করে তাকে অধার্মিক বলে বিবেচিত করা এ সবের মধ্যে দিয়েই সে নিজের প্রভাব নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠা করে। মজিদ জানতে পারে মহব্বত নগর এবং তার লাগাও গ্রামগুলোর মান্য এক পীর আছেন। প্রতিবছর ফসল ওঠার পর তিনি আসেন কিছুকাল সেবা ও অর্থ আদায় করতে। তিনিও ধর্মব্যবসায়ী, অসাধু, বুজরুকিবান। মজিদ একথা বুঝতে পেরে তাকে তার পথ থেকে হঠানোর জন্য মহব্বতনগরের মানুষদেরকে বোঝায়—

> আওয়ালপুরে তথাকথিত যে পির সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে—যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তাঁর কবলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ

থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সেই উদ্দেশ্যই তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরূহ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ—যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ ক্বাজা করেননি তাঁরা খোদার কাছে গুণাহ করছেন।[৩]

প্রথম বিয়ের পর মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে করে জমিলাকে। প্রথম স্ত্রী রহিমা তার অনুগত থাকলেও দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা তাকে মানতে নারাজ। প্রতিনিয়তই তার কথাকে সে অমান্য করে চলে। নির্যাতন করতে চাইলে তার যোগ্য জবাবস্বরূপ গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেয় এবং সে বোঝাতে চায় মজিদ তার কাছে ঘৃণ্য। মজিদের প্রতি রহিমার পর্বতের মতো অটল এবং ধ্রুবতারার মতো অনড় যে বিশ্বাস ছিল তাও একদিন ভেঙে যায়। শিলাবৃষ্টিতে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হলে গ্রামবাসীরা প্রতিকার চাইলে সে ধমকের সুরে জানায়—"নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো।"[৪] এভাবেই মজিদের ধূর্ততার মধ্যে দিয়ে বিপর্যস্ত হয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন এবং সেইসঙ্গে শিলাবৃষ্টির কবলে ব্যাপক চাষের ক্ষতিতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের হাহাকারের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদ। সে ধূর্ত, শঠ, প্রতারক ও ধর্মব্যবসায়ী। ধর্মকে ব্যবসায় পরিণত করে অর্থ উপার্জনের মধ্যে দিয়ে সমাজে সে টিকে থাকতে চেয়েছে। আসলে ও যে দেশের মানুষ সেখানে শস্য নেই, নিরন্তর টানাটানি ও মরার খরা। তাই সে নিজের দেশ ছেড়ে মহব্বতনগরে প্রবেশ করে। ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয় অর্থ উপার্জনের জন্য। এর জন্য তার ভয়ও কম ছিল না—

> গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গালের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত- খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু'বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।[৫]

বৃহৎ বাঁশঝাড় ও পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে টালখাওয়া ভাঙা এক প্রাচীন কবর আবিষ্কার করে তাতে লালসালু জড়িয়ে মাজার বানিয়ে তোলে এবং ঘোষণা করে ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার। এর ফলে—

> এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগল। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।[৬]

ফলস্বরূপ তার অবস্থা রাতারাতি পালটে যেতে শুরু করে—"ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা ঘর। জমি হল, গৃহস্থালী হল।"[৭] আর এই অন্যায় কাজে সে অনুশোচনাগ্রস্ত। গারো পাহাড়ে কাটানো শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা দিনের কথা স্মরণ হলে তার গা শিউরে ওঠে এবং সেইসঙ্গে ভাবে—"খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্যে অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।"[৮]

হঠাৎ করেই এই মাজারকে কেন্দ্র করে সে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। সে আস্তে আস্তে অর্থের ও ক্ষমতার আধিপত্যে অন্ধ ধর্মীয় মোহের বশে সে জড়িয়ে পড়ে জানে না হলে তার বাঁচার আর কোনো পথ নেই। সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে পায় খালেক ব্যাপারীকে। জানে সে সমাজের একজন বড়ো মাথা এবং সেও গরিব মানুষকে শোষণ করে। তাই তাকে হাতে রাখলে রাজত্ব চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। মজিদের উপার্জনের পথে পীরসাহেবকে কাঁটা বলে মনে হলে তাকে পথ থেকে সরানোর জন্য তাকে ভণ্ড বলে প্রমাণিত করে মারামারি লাগিয়ে দেয়। বৃদ্ধ পীরসাহেব বয়সজনিত কারণে আর দাঙ্গাবাজি, হৈ- হাঙ্গামাতে না গিয়ে তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। মাজারের দৌলতে মজিদের অবস্থা বর্তমানে—"আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলি ভালোই কেটেছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে-চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।"[৯] মজিদের মতো ধর্মকে জীবিকা করে পীরসাহেবরাও অর্থ উপার্জনে নেমে পড়ে। তারা—"গৃহস্থদের গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির-যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলসা থাকে।"[১০] উপন্যাসে আমরা গারো পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী মানুষদের জীবিকা হিসেবে পাই চাষবাসকে। খরার প্রভাবে তাদের অবস্থা যখন ভয়াবহরূপে উপস্থাপিত হয়, তখন তারা জমি-জমা চাষবাস ছেড়ে দেশ ত্যাগ করে সদলবলে উপার্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ে যত্র-তত্র। জীবিকা হিসেবে বেছে নেয়—

> নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিন-ম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ এমন কী গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে।[১১]

মহব্বত নগরের মানুষদের জীবিকাও চাষবাস। বংশপরম্পরায় তারাও জমিকে কেন্দ্র করে বেঁচে আছে। তারা—

> জোতজমি করেছে, বাড়িঘর করে গরু-ছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানখেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লীদের গলা আকাশে ভাসে না।[১২]

এই গ্রামের মানুষজনেরা চাষবাসকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেও তাহের ও কাদেরকে আমরা মাছ ধরার কাজে লিপ্ত থাকতে দেখেছি। তারা মাছ ধরার মধ্যে দিয়ে জীবন নির্বাহ করে থাকে। শিলাবৃষ্টিতে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে গেলে মহব্বতনগর গ্রামের মানুষদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তাদের কারও মুখে কথা থাকে না। মর্মন্তুদ হৃদয় নিয়ে তারা—"সামনে খেতে খেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।"[১৩] 'লালসালু' উপনাসটি একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। উপন্যাসে গ্রামীণ সভ্যতার নিরক্ষর, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের কথা এসেছে। সেইসঙ্গে এসেছে গ্রামীণ অর্থনীতির ভয়াবহ করুণ দৃশ্যও। দরিদ্র সাধারণ মানুষদের অন্ধ ধর্মের জালে জড়িয়ে এক ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ী কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের বেড়াজাল প্রতিষ্ঠা করেছে তার বিবরণ রয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুধাংশুকুমার সরকার : 'চতুর্থবার্তা', মুস্তাফা-নুরউল-ইসলাম লিখিত 'বাংলাদেশের উপন্যাস', বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মার্চ ২০২১, পৃ. ১৩৮
২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : 'লালসালু', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, দশম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২, মে ২০১৫, পৃ. ১৯
৩. পূর্বোক্ত : পৃ. ৫৬-৫৭
৪. পূর্বোক্ত : পৃ. ১২৮
৫. পূর্বোক্ত : পৃ. ১৬
৬. পূর্বোক্ত : পৃ. ১৭
৭. তদেব
৮. তদেব
৯. পূর্বোক্ত : পৃ. ৯২
১০. পূর্বোক্ত : পৃ. ৪৮
১১. পূর্বোক্ত : পৃ. ১১
১২. পূর্বোক্ত : পৃ. ১৬
১৩. পূর্বোক্ত : পৃ. ১২৮

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস 'অরণ্য আদিম' এক প্রাচীন জনজাতির ইতিবৃত্ত

প্রশান্ত কুম্ভকার

'অরণ্য আদিম'(১৯৫৭) উপন্যাসটি রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য জীবনের একেবারে প্রথম দিকে লেখা। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক আদিবাসী মুণ্ডা জনজাতির একটি সামগ্রিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাদের বাসস্থান, জীবন-জীবিকা, ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নীতি প্রভৃতি বিষয় লেখক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। মুণ্ডা জনজাতির ইতিহাসের ভিতরে প্রবেশ করে লেখক যেমন তাঁর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি কাহিনি গ্রন্থনেও কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। বলা ভালো, ইতিহাস ও কল্পনার অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সভ্য মানুষের পৃথিবীতে যখন যন্ত্রসভ্যতার আগমনী সুর বেজে উঠেছে, তখন বাংলার পশ্চিম সীমান্তের পারে পাহাড়-অরণ্য-লালমাটির যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চলে গেছে রামগড় আরগাড়া হয়ে খালারি লাতেহারের দিকে, সেখানে তখনও আধুনিক সভ্যতার আলো পৌঁছয়নি। তখওন সভ্যতার সব স্রোত উপেক্ষা করে আদিম আরণ্যক রীতিতে নিজেদের জীবনধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল একদল মানুষ। সেই তাদের কথাই লেখক এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

সিল্লি, তামাড়, বুণ্ডু, বরণ্ড, রাহে—এই পাঁচ পরগনার অরণ্যবাসীদের কাছে শহর-সভ্যতার কোনো ধারণাই ছিল না। সেরমা চাঁদোর দেওয়া মাটি-জল-বাতাস আর শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তারা ছড়ানো বীজের ফসল ফলাত। মাটিতে লাঙল দিত না। কারণ তাদের মধ্যে বহু বছরের সংস্কার ছিল যে লাঙলের ফলায় মাটির কৌমার্য ভাঙা পাপ। তাই তারা রোপণ করত না, ছড়ানো বীজের ঝুম-ফসলকে ভাবত চাঁদো বোঙার আশীর্বাদ।[১] মুণ্ডা বীরহড় দলের সান্ডি পুরুষেরা নিজের নিজের পছন্দের মেয়ের সঙ্গে নাচ-গান করত সেঙ্গোল আগুন ঘিরে। তুমদা মাদল আর বাঁশের বাঁশির সুর বাজত তিরিতিরি। এই ছিল তাদের স্বাভাবিক

জীবন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারা দেখল বন কাঁপিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কয়েকজন সিপাই সাত্রী বরকন্দাজ হাতিয়ার নিয়ে একটি বার বেহারার পালকিকে ঘিরে তাদের সীমানায় প্রবেশ করল। পালকি থেকে নেমে একজন খাজনা দাবি করল। তার বক্তব্য, রাজার জমি চাষ করতে হলে খাজনা দিতে হবে। ওঁরাও আর মুণ্ডার দল অবাক হয়ে গেল। সিঞ বোঙা, বুড়াবুড়ি, সেরমা চাঁদোর দেওয়া মাটি-জল আর শরীরের রক্ত রোদে তাতিয়ে ঘাম ঝরিয়ে তারা চাষ করে। পাঁচ পরবে পুজা দেয় সেরমা চাঁদোর, মোরগ বলি দেয়। তাহলে আবার খাজনার কথা আসে কোথা থেকে গাসি মুণ্ডা ও পানা মান্‌কি পরস্পর মুখের দিকে তাকাল। তারপর দুজনেই বলল যে, মালগুজারি বা খাজনা দেওয়া পাপ। মুণ্ডা যুবক সুখন খাজনাবাবুদের মারতে উদ্যত হলে গাসি মুণ্ডা ও পানা মানকি নিষেধ করে এবং বলে যে তারা খাজনা দেবে না বরং এই ক্ষেতজমি ছেড়ে অন্য কোথাও নতুন জায়গায় তারা ক্ষেতজমি ও ঘর বানাবে। দলের সবাই গাসি মুণ্ডার কথা মেনে নিল।

গাসি মুণ্ডা হল মুণ্ডাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। সাধারণত যে কুল বা বংশ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করত, সেই বংশেরই কোনো বয়স্ক ব্যক্তি গ্রাম প্রধান নিযুক্ত হত এবং তাকেই মুণ্ডা নামে অভিহিত করা হত। মুণ্ডাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান, নিরপেক্ষ, সুপরিচালক এবং সুবিবেচক হতে হবে। গ্রামের যাবতীয় সামাজিক সমস্যা, ঝগড়া-বিবাদ পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের পরামর্শে মুণ্ডাই সমাধান করবে।[২] তবে ভূমিস্বত্বের ব্যাপারে মুণ্ডার কোনো বিশেষ অধিকার ছিল না। ভূমির মালিকানা স্বত্ব সমবেতভাবে সমগ্র খুঁটকাট্টিদারদের ওপর ন্যস্ত থাকত।[৩] উপন্যাসে এবং বাস্তবে এই মুণ্ডার পদ যে অলংকৃত করছিল তার নাম গাসি। কারণ ইতিহাস বলে ছোটোনাগপুরের রাজা ঐশ্বর্য বিস্তারের চেষ্টায় নিজের সভাকে রাউতিয়া, ভাইয়া, বৃত্তিয়া, পান্ডেয়, জমাদার, ওহদার প্রভৃতি পদবীধারী ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ পার্শচরের দ্বারা সুশোভিত করতে লাগলেন এবং উল্লিখিত সভ্য আগন্তুকদের ভরণপোষণের জন্য জায়গিরপ্রথা প্রচলিত করে দেশে এক নতুন আর্থিক বন্দোবস্ত চালু করলেন। যে সব ব্যক্তিকে খুঁটকাট্টি গ্রামের উপরে জায়গিরদার নিযুক্ত করা হয়েছিল, ঐ গ্রামের উপর তাদের মালিকানা স্বত্ব জন্মেছে ভেবে প্রজার কাছ থেকে নগদ খাজনা আদায় করতে লাগল। ফলে মুণ্ডাজাতির জমির উপর একাধিপত্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং আর্থিক অবস্থাও ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। এমনই এক সময়ে খুঁটির নিকটবর্তী হেসাগ্রামের অধিবাসী গাসি মুণ্ডা নামে জনৈক ব্যক্তি রাঁচি জেলার পশ্চিমাংশে গভীর অরণ্যের মধ্যে সরে গিয়ে পুনরায় খুঁটকাট্টি প্রথা অনুসারে নতুন এক গ্রামের প্রতিষ্ঠা করে।[৪] সুতরাং দেখা গেল গাসি মুণ্ডা একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লেখক বলেছেন—

> লক্ষ লক্ষ আদিম অরণ্যচর মানুষ বন পুড়িয়ে গাড়ার জল ছিটিয়ে বীজ ছড়িয়ে ফসল ফলিয়েছে, গ্রাম বেঁধেছে মনের সুখে। তারপর জমিদারের চোখ পড়েছে সে জমির ওপর। খাজনা চেয়েছে। তারপর খাজনার নাম শুনে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে তারা। আরও গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে।[৫]

তেমনি গাসি মুণ্ডার দল তাদের পুরাতন বাসস্থান ছেড়ে দিল। পিঁপড়ের সারির মতো তারা পথ খুঁজতে খুঁজতে আরও গভীর অরণ্যের দিকে চলতে লাগল এক নতুন বাসস্থানের সন্ধানে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বন-পাহাড় অতিক্রম করে এক পাহাড়ি উপত্যকায় এসে থামল গাসি মুণ্ডার দল। চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কোথাও জনমনিষ্যির দেখা নেই। এখানেই

তারা খুঁটি গাড়বে এবং ডেরা বাঁধবে। একটা পাহাড়ের পাদদেশে ঢালু জমি পরিষ্কার করে নিল। তারপর জঙ্গল পুড়িয়ে মুরগি বলি দিল এবং ওড়া বোঙা, সেরমা চাঁদো ও মাদেওয়ের পুজো দিল। রুকুন ওঝা মন্ত্র পড়ে জমি থেকে ভূতপ্রেত তাড়াল এবং বাঁশি বাজিয়ে চারিদিকে নাগমন্তর ছড়াল। শেষে খড়ি গুনে বলল যে চুড়িন, চুরকিন সব চলে গেছে, নাগও বশীভূত হয়েছে। এরপর গাসি মুণ্ডার নির্দেশে তারা ওড়া অর্থাৎ ঘর বানাতে লাগল। শালকাঠি ও কাদা দিয়ে দেওয়াল উঠল, পাতা দিয়ে ছাওয়া হল দুটো গিতিওড়া অর্থাৎ ঘুম-ঘর। একটা কুড়ি অর্থাৎ যুবতী মেয়েদের জন্য অন্যটি যুবকদের জন্য। মেয়েদের ঘুম-ঘর হল গ্রামের মাঝে আর ছেলেদের গ্রামের মুখে। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, মুণ্ডা গ্রামের একপ্রান্তে অবিবাহিত ছেলেদের ঘুমাবার জন্য একটা ছোটো ঘুম-ঘর থাকে যাকে তারা বলে গিতি-ওড়া। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেরা সেখানে একত্র হয়ে রাত্রি যাপন করে এবং সমাজের রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। কুমারী মেয়েরা কোনো বয়স্কা বিধবার বাড়িতে অতিরিক্ত ঘর থাকলে সেখানে শোয় এবং পাঁচমেশালী উপদেশের মাধ্যমে সাংসারিক জ্ঞান অর্জন করে।[৬] সুতরাং বয়স্ক মহিলার অতিরিক্ত ঘরই মেয়েদের জন্য গিতি-ওড়া।

ঘর বাঁধার পর বনশুয়োর শিকার করা হল। হুড়ু চোলাই করে হাঁড়ি ভরিয়ে নাচগান শুরু হল। এরপর দলের সকলে প্রস্তাব দিল যে 'আস্থানটার' নাম গাসি মুণ্ডার বউয়ের নামে হোক। গাসি মুণ্ডা তাই মেনে নিল এবং সেদিন থেকে স্থানটির নাম হল লাপ্‌রা। গাসি মুণ্ডার 'ঘর গমকে' অর্থাৎ গৃহিণীর নাম লাপ্‌রা। লাপ্‌রার নামে জায়গার নামকরণ হওয়ায় পানা মানকির বউ রাইবার রাগ হয়ে গেল। কারণ মানকির পদ মুণ্ডার থেকেও উপরে।[৭] মুণ্ডাদের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'পাড়হা' তৈরি হত। গ্রাম-পঞ্চায়েতের থেকে এটা বৃহত্তর সংগঠন। এই 'পাড়হা'র প্রধানকে বলা হত মানকি।[৮] উপন্যাসে এই মানকির নাম পানা।

লাপ্‌রার ছোট্ট পাহাড়ি নদীটার নাম রাখা হল 'মারাং গাড়া'। যদিও এর মানে বড়ো নদী। এই নদীর পাড়ে ছিল এক বড়ো পুরাতন বটবৃক্ষ যাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটা শাল, মহুয়া ও আমলকীর গাছ। গাসি মুণ্ডা, পানা মানকি ও গ্রামের অন্য সদস্যদের নিয়ে বটবৃক্ষের তলায় পঞ্চায়েত ডাকা হল। সেখানে গাসি মুণ্ডা সেরমা চাঁদোর দেওয়া স্বপ্নের কথা জানাল। নদীর জল ছুঁয়ে যে বটের ঝুরি নেমেছে, শাল গাছের মাথা উঠেছে আকাশে, এখানেই হবে লাপ্‌রার গ্রামদেবতার 'সারনা'। এ গাছের গায়ে হাত দেওয়া পাপ। জারার আগুন (চাষাবাদ শুরু করার আগে বন পুড়ানোর জন্য যে আগুন লাগানো হয়) যেন এ গাছে না ছোঁয়। মুণ্ডাদের ভগবান এই সারনায় প্রতিষ্ঠা নেবেন। 'সারনা' হল একটা পবিত্র জায়গা। গ্রামের এক প্রান্তে গাছপালায় ঘেরা একটা জায়গা যেখানে গ্রামের দেবতা অধিষ্ঠান করেন। এই দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো ও বলিদান হয়ে থাকে।[৯] স্বপ্নের কথা জানানোর পরেই গাসি জ্ঞান হারাল। পঞ্চায়েতের সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল 'ভর হইছে'। জ্ঞান ফেরার পর গাসি দেখল 'মেয়েমরদ' সবাই ঢোলক বাজিয়ে নাচতে শুরু করেছে, গাইছে চাঁদো বোঙা আর মাদেওয়ের গান। মাদেওয়ের হলেন মহাদেব। লেখক বলেছন সুবর্ণরেখার ওপারের 'ডেকো' অর্থাৎ হিন্দুদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মালামেশায় বোঙাদের পাশে কখন যে হিন্দুর দেবদেবী মুণ্ডাদের মনে স্থান করে নিয়েছেন কে জানে।[১০] যাইহোক, নাচগান থামিয়ে যুবতীর দল গাড়ার জল এনে ঢালল বটগাছের গুঁড়িতে। তারপর ঘাস পাতা পরিষ্কার করে সার্নার বেদী তৈরি করা

হল। এখন সারনায় দেবতা বসেছেন। এরপর ভাবতে হবে চাষবাসের কথা। খুঁটকাটিদার বাছতে হবে যারা খুঁটি পুঁতে এলাকার হিসেব রাখবে এবং তারাই ঠিক করবে কোন পরিবার কত চাষের জমি পাবে। খুঁটিদার নির্বাচন করা হল। কিন্তু খুঁটিদার নির্বাচনে গাসির সঙ্গে পানার মতবিরোধ দেখা গেল। 'একটো গাঁয়ের মুণ্ডা হল গাসি, সে কিনা পাঁচ গাঁয়ের মান্‌কিকে অপমান করে। পাপের আগুনে ধ্বংস হবে লাপ্‌রা। যুগিন এসে রক্ত চুষে নেবে গাসির' এ কথা বলতে বলতে পানা পঞ্চায়েত ছড়ে চলে গেল।

পানা চলে গেলেও গাসি জঙ্গালে 'জারার' হুকুম দিল। জঙ্গালের চারকোণে খুঁটি পুঁতে পুজো-পার্বণ, মোরগবলি সেরে গাছে গাছে আগুন ধরানো হল। সমস্ত বন-বনান্ত জুড়ে আগুন আর আগুন। সঙ্গে তুমদা মাদলের তালে তালে সমবেত গান আর নাচ। হাতে টাঙি, পিঠে ধনুক নিয়ে এক সারি সমর্থ পুরুষ গলা ছেড়ে চিৎকার করে, আর মেয়েদের নাচ আর গানের তালে মাদল ও বাঁশি বাজে। যতক্ষণ জারার আগুন জ্বলে ততক্ষণ নাচগান চলতে থাকে। শুধু পানা মান্‌কি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি।

ওদিকে গাসি মুণ্ডার মেয়ে রাঙিনা আর টারাংটির ছেলে আকুম একে অপরকে লোকচক্ষুর আড়ালে ভালোবাসে। জারার অনুষ্ঠানে সবাই মত্ত থাকলে আকুম ও রাঙিনা নদীর পাড়ে এসে দেখা করে। প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আকুম বাঁশি বাজায় আর রাঙিনা বাঁশির সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে—

> তিরিরিরি রুতু সারিতানা/মাদ সোকোম চোরোরোরো,/সোবেন হাইকো নির-তা না!/
> তিরিরিরি রুতু সারি-তা-না!/যমুনা গাড়া জপা/বুরু গিতিল কদম সুবা/তিরিরিরি রুতু সারি-তা-না।[১১]

গানটির বাংলা অর্থ হল বাঁশের বাঁশি তিরি-রিরি করে বাজছে। বাঁশপাতি মাছ, চ্যাং, মাগুর, সব মাছ (আনন্দে) দৌড়াচ্ছে। যমুনা নদীর কাছে, বালির পাহাড়ের উপর, কদম গাছের মূলে বাঁশের বাঁশি তিরি-রিরি করে বাজছে।[১২] কিন্তু পানা মান্‌কির কাছে তাদের এই গোপন প্রেম ধরা পড়ে যায়। এদিকে সুখন বলে এক যুবক রঙিনাকে ভালোবাসে। পানা গাসির উপর প্রতিশোধ নেওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। সুখনকে দিয়ে গাসির মেয়ের 'ধরম' নষ্ট করাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সুখন তা পারে না। আকুম ও রাঙিনা পরস্পর ভালোবাসলেও তাদের গোত্র আলাদা বলে বিয়ে হওয়া ধর্মসঙ্গত নয়। ফলে আকুম ও রাঙিনা একদিন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল।

মুণ্ডাদের সংস্কার ছিল জমিতে লাঙল দেওয়া পাপ, খাদানে কাজ করতে যাওয়া পাপ। যেসব মুণ্ডারা এই কাজগুলি করত তাদের একঘরে করা হত। শেষে দেখা গেল পানা মান্‌কি লাঙল দিচ্ছে। গাসির ভক্তরা এই দৃশ্য দেখে রাগে ফেটে পড়ল। কিন্তু গাসি বলল বোঙারা আছেন, তাঁরাই পানাকে শাস্তি দেবেন। দিনের পর দিন চলে যায়, কিন্তু পানার ওপর কোনো অভিশাপেই নেমে এল না। উপরন্তু পানার ক্ষেতিজমি ভরে উঠেছে সোনালি ধানের শিষে। গাসি দেখে রাগে জ্বলে উঠল। আর জোয়ানরা কানাঘুষো করতে লাগল যে, পানা হল পাঁচ মুণ্ডার মান্‌কি, বুদ্ধিতে গাসির থেকে কম নয়। বড়োবুড়িরা বলল ধর্ম অধর্মের বিচারটা যখন পানা দেয়, তখন তার কাজটা পাপ হবে কেন। ধীরে ধীরে সারা লাপ্‌রাই জমিতে লাঙল দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠল। ফলে গাসি কাকেই বা শাস্তি দেবে। এরপর বিচার করতে গেলে তাকেই সবাই একঘরে করবে।

একরাত্রে সকলেই অবাক হয়ে দেখল যে দূরে অন্ধকারে আগুন জ্বলছে। এই আগুন জ্বালার কথা শুনে সুখন চলে গিয়েছিল পাহাড় পার হয়ে ব্যাপারটা দেখতে। গিয়ে দেখল একদল লোক ছাউনি ফেলেছে। অবশেষে আগন্তুকের দল স্পষ্ট হল সবার কাছে। পানা মান্‌কি বলল, 'হঁ, দেকো বটেক।' দেকো অর্থাৎ হিন্দু। সমতলভূমির সভ্য মানুষ মাত্রেই তাদের কাছে দেকো। তাদের সাজসরঞ্জাম, কাঠে কেরোসিন তেল ঢেলে দেশলাই কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালানো ইত্যাদি দেখে গাসি মুণ্ডার দল ভয় পেয়ে যায়। আসলে এই সভ্য মানুষের দলটি বোরিং এক্সক্যাভেশনে বেরিয়েছে। মাটির তলায় কোথায় কতখানি কয়লা লুকিয়ে আছে তার সন্ধান করতে। মাস ছয়েক পর দেখা গেল নদীর ওপারে ব্যানার্জিবাবুর সাথে একরাশ মুণ্ডা, ওঁরাও ও সাঁওতাল জমা হয়েছে। কয়েকদিন পর আরোও কুলি-মজুর এবং সাহেবরা এল। তারপর গাসি মুণ্ডার দলের মানুষ দেখল পয়সার বিনিময়ে জিনিস কেনা-বেচা চলছে এইসমস্ত লোকেদের মধ্যে। লাপ্‌রার মুণ্ডাপল্লীর সামনে গড়ে উঠল রোপওয়ে, জ্বলে উঠল আলো, নতুন রাস্তা দিয়ে এঁকে বেঁকে লরির পর লরি এল, ডাইনামো বসল। আর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল তারা। ঐ কয়লা অঞ্চলটিকে ঘিরে তারা স্বপ্ন দেখতে লাগল। যেন ওখানে দুঃখ নেই, দুর্দশা নেই আছে শুধু আনন্দ আর শান্তি। ক্রমশ তাদের সাহস বাড়ল। দুয়েকজন কুলি-কামিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এমন সময় শোনা গেল আরও লোক চাই। একেকটা কুলি জোগাড় করে দিলে পাঁচ টাকা করে দেবে সিন্ডিকেট। বুধন সর্দার ছুটল মুণ্ডাপল্লীতে। খাদানে কাজ করলে নগদ তামার পয়সা পাওয়া যাবে। তাদের দুর্দশা ঘুচে যাবে। কিন্তু গাসি মুণ্ডা বলেছে- 'না, খাদানে কাজ করা পাপ। খাদানে ওঁরাও আছে, জুয়াং আছে, সাঁওতাল আছে। তা ছাড়া খাদানের বাবুরা সব দেকো নয়তো তুড়ুক। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা পাপ। দোকানে জিনিস কেনা পাপ।'

রাঙিনা ও আকুম লাপ্‌রা ছেড়ে খাদানে গিয়ে কাজ নিয়েছে। গাসি মুণ্ডা মেয়ের এই অকৃতজ্ঞতায় রাগে ফুসতে লাগল। এদিকে সুখন আর সোমরীও বিয়ে হয়ে গেছে। লাপ্‌রায় এতদিন হাটে যাওয়া নিষেধ ছিল। আজ কেউ গোপনে কেউবা স্বেচ্ছায় হাটে গিয়ে জিনিস কেনাবেচা করে নগদ টাকায়। কয়েকমাস পর দেখা গেল লাপ্‌রা ছেড়ে একে একে উঠে এল খাদের ধাওড়ায়। প্রথমে এসেছিল আকুম ও রাঙিনা; তারপর এল লোহার আর তাঁতি; এবার এল সুখন, সোমরী, পানা মানকি। খাদের কাজে অনেক সুখ, অনেক আনন্দ। নগদ মজুরি মিলবে, সাথে ধাওড়ায় মিলবে ঘর। গাসির বউ মারা গেল। রাঙিনা ও আকুম দেখতে এসেছিল। কিন্তু গাসি দেখতে দেয়নি তার মরা বউকে। গাসি পাগল হয়ে গেল। টাঙি নিয়ে রাঙিনা ও আকুমকে মারতে এল। তারা কোনোরকমে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। গাসি এখন সব সময় টাঙি হাতে ঘুরে বেড়ায় আর বলে-'সব কুপায় দিবো, পাপীগুলাকে কুপায় দিবো।' যে ক-জন তখনো লাপ্‌রায় ছিল তারাও ভয়ে খাদানে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগল।

গ্রাম ভেঙে গেল। শহর গড়ে উঠল। দেহাতি গাঁ থেকে সবাই উঠে এল খনি-শহরে। পাগলা গাসি টাঙি নিয়ে নেচেকুঁদে বেড়ায় বনে বনে। কখনো গুম হয়ে বসে থাকে। কেউ তার খবর রাখে না, কেউ ভয়ও করে না। যারা ধাওড়ায় ঘর পেল তারা লাপ্‌রা থেকে উঠে গেল, বাকি সবাই গ্রামে থেকেই খাদানের কাজে যোগ দিল। ভোরের ভোঁ বাজার একপ্রহর আগে থেকেই ছুটতে শুরু করে খাদের দিকে। খাদানে ম্যাথুস নামে এক পাদরি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন, ঔষধ দেন, খৃষ্টান

ধর্মের উদারতার কথা বলেন, ছেলে-মেয়েদের একটা স্কুলও করেছেন। সেখানে কুলি-কামিনদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালও রয়েছে। ফলে খাদান ছড়ে গ্রামের আর বন্যজীবনে ফিরতে চায় না মুণ্ডা যুবক-যুবতীরা। এতদিনে তারা বুঝে গেছে যে, চাষের মাটি ও খাদের মাটি—দুই তো মা, তবে খাদের মাটি বিষ হবে কেন কারণ খাদানের মাটিতে আছে হাসি, আছে আলো।

উৎসের সন্ধানে

১. রমাপদ চৌধুরী : 'দশটি উপন্যাস', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ২০২২, পৃ. ৩৩৫
২. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' ১ম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৫২
৩. নির্মল কুমার বসু : 'হিন্দু সমাজের গড়ন', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ১৯
৪. তদেব : পৃ. ২৪-২৫
৫. উৎস-১, পৃ. ৩৩৬
৬. উৎস-২, পৃ. ১৪৯
৭. উৎস-৩, পৃ. ২২
৮. উৎস-২, পৃ. ১৫৩
৯. তদেব : পৃ. ১৪৯
১০. উৎস-১, পৃ. ৩৩৮
১১. তদেব : পৃ. ৩৪৪
১২. উৎস-৩, পৃ. ৩৭

সমরেশ বসু 'টানাপোড়েন' উপন্যাসের পেশাগত সমাজভাষিক আলোচনা

যমুনা ধাড়া

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার মূল বিষয় হল ভাষা ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার। সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চা শুরুর আগে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজ ও সামাজিক শ্রেণির বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথম বললেন সামাজিক শ্রেণি, পরিবেশ ও পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষীর ভাষা বদলে যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চা। এর আলোচনার বিষয় ছিল সমাজভাষা বা সমাজ-উপভাষা। ভাষার আলোচনায় তারা গুরুত্ব দিলেন সমাজের ভূমিকাকে। সমাজতত্ত্বের ভাবনাকে সামনে রেখে শুরু হল ভাষার সঙ্গে সমাজকে মিলিয়ে দেখা। তাদের মতে সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। ভাষা-সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সমাজ-সংগঠন। ভাষীর সামাজিক শ্রেণি বা সংগঠন বদলে গেলে বদল আসে তার ভাষাতেও। বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় ভাষীর ভাষায়।

সমাজ-উপভাষা নিয়ে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে ভাষার বৈচিত্র্য। তারা ভাষা ও সমাজ প্রত্যেকটি উপাদানকে দেখেছেন এক-একটি সংগঠন রূপে। সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণি (সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা যাকে বলেছেন সামাজিক ভেদরূপ বা Social Variable), তার সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রভাব ফেলে ভাষার ওপর। সৃষ্টি হয় ভাষা বৈচিত্র্য। এই সামাজিক ভেদরূপগুলি (Variable) যে ভাষা পার্থক্য বা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা তাকেই বলেছেন সমাজ-উপভাষা। অধ্যাপক পবিত্র সরকার সমাজ-উপভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বক্তা-শ্রোতার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন

বক্তার সামাজিক পরিচয়টি সর্বাগ্রে জানতে হবে। সে সমাজের কোন্ স্তরের

মানুষ? তার শিক্ষাদীক্ষা কীরকম? সে কী কাজ করে? সে পুরুষ, না নারী? তার বয়স কত, এবং বয়স-হিসেবে পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ছকটি কী ধরনের? সে উঁচু জাত বা নিচু জাত, হিন্দু না মুসলমানভারতবর্ষে কখনও এসব প্রশ্নও উঠে পড়বে, কারণ এর উপরেও তার "সোশিয়োলেক্ট" (Sociolect) বা সামাজিক উপভাষার বৈশিষ্ট্য কখনও কখনও নির্ভর করবে।[১]

অর্থাৎ সমাজ-উপভাষার প্রধান ভেদরূপগুলি হল ভাষিক ব্যক্তির সামাজিক শ্রেণি, শিক্ষা, পেশা, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম ইত্যাদি ভিত্তিক পরিচয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানী Peter Trudgill তার 'Sociolinguistics : an introduction to language and society' বইয়ে সমাজ-উপভাষার ভেদরূপ (Variable) প্রসঙ্গে বলেছেন—

> The development of social varieties can perhaps be explained in the same sort of way-in terms of social barriers and social distance. The diffusion of a linguistic feature through a society may be halted by barriers of social class, age, race, religion or other factors. And social distance may have the same sort of effect as geographical distanceõ for example, a linguistic innovation that begins amongst the highest social group will affect the lowest social group last, if at all. (৫৭)

এই ভেদরূপগুলি (Variables) অনুযায়ী ভাষায় বৈচিত্র্য আসে। বদলে যায় সমাজ-উপভাষার ব্যবহার, যাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন বুলি। ভাষীর পৃথক পৃথক বুলি নির্ধারণের ভেদরূপগুলির মধ্যে প্রধান হল সামাজিক শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম, বয়স, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি। একথা আগেও বলেছি। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষীর সামাজিক শ্রেণি নির্ধারণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন সমাজতত্ত্বের সামাজিক শ্রেণির নির্ধারণের মানদণ্ডগুলিকে। সেখানে ভাষীর সামাজিক শ্রেণি নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড হল তার আয়, শিক্ষা, পেশা, সামাজিক অবস্থান, ঘরবাড়ি, গাড়ি ইত্যাদির বিবরণ। সমাজভাষাবিজ্ঞানী লেবোভ সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে প্রধান তিনটি সূচকের কথা বলেছেন, সেগুলি হল শিক্ষা, পেশা ও আয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানী Ronald wardhaugh-ও বলেছেন সামাজিক শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আয়ের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করতে হবে তার আয়ের উৎস নিয়েও। তার কথায়—

> Income level as well as source of income are important factors in any classification system that focuses on how much money people have.[৩]

সমাজভাষাবিজ্ঞানী Miriam Meyerhoff তাঁর 'Introducing Sociolinguistics' গ্রন্থে সামাজিক শ্রেণির আলোচনায় পেশাগত বিভাজনের গুরুত্বের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ভাষীর সামাজিক শ্রেণি নির্ধারণের অনেকগুলি সূচকের মধ্যে একটি সূচক হল পেশা বা জীবিকা।

তবে সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষীর ভাষা-বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে পেশাভিত্তিক পৃথক ভাষার সন্ধান পেয়েছেন। পৃথক পৃথক পেশার সঙ্গে যুক্ত ভাষীর ভাষায় তাদের নির্দিষ্ট পেশাগত বুলির সন্ধান পাওয়া যায়। পেশাগত ভাষাবৈচিত্র্য সামাজিক শ্রেণি বা লিঙ্গগত ভাষা পার্থক্যের থেকেও অনেক স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। আধুনিক সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ফলে শ্রেণি-লিঙ্গ-ধর্মগত ভাষা বৈচিত্র্য ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু পেশাগত ভাষা-বৈচিত্র্য আজও বজায় আছে। অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> একজন মহিলা ডাক্তার মেয়েলি ভাষায় রোগীকে জিজ্ঞাসা করবেন না—হ্যাঁগা তোমার অসুখ করেছে? শিক্ষিকা ক্লাসে গিয়ে বলবেন না—ওলো তোরা এখনো লিখতে শুরু কচ্ছিস নি! যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রবণতায় নানা সামাজিক শ্রেণীর ভাষা প্রকাশ-পার্থক্য হারিয়ে ফেলছে বা দূরে সরিয়ে রাখছে। কিন্তু প্রফেশন বা জীবিকা বা বৃত্তি এবং এডুকেশন বা শিক্ষা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য তৈরি করে রেখেছে।[৪]

এখানে মহিলা ডাক্তার বা শিক্ষিকা কেউই তাদের লিঙ্গগত সামাজিক বুলি ব্যবহার করেনি। বরং তারা উভয়েই পেশার জায়গায় তাদের পেশাগত বুলিই উচ্চারণ করেছে। অর্থাৎ পেশা একজন ভাষীর ভাষায় স্পষ্ট রূপে ভাষাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা পেশার জগতকে প্রফেশনাল, ব্যবসায়ী, দক্ষ-অদক্ষ ইত্যাদি শ্রেণিতে এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে গ্র্যাজুয়েট, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, স্কুল ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এর বাইরেও আরও বহু পেশা এবং পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সন্ধান পাই। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব পেশাগত ভাষা আছে। যেমন—ব্যবসায়ী, চাকুরী, শিক্ষক/অধ্যাপক, মজুর, শ্রমিক, কৃষক, বাস-রিক্সা-অটো চালক, কৃষক, মৎস্যজীবী, পুরোহিত, জ্যোতিষী, দালাল, পকেটমার, চোর, মেয়ে পাচারকারী, পুরোহিত, আইন-আদালত, পুলিশ, ডাক্তার, তাঁতি ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের নিজের নিজের পেশাগত ভাষা আছে। ভিন্ন ভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ভাষীর ভাষায় দেখা যায় সেই পেশার সঙ্গে যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বুলির ব্যবহার। একজন শিক্ষকের ভাষায় দেখা যায় শিক্ষকতার পেশার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক বুলি বা সমাজ-উপভাষার ব্যবহার। একইভাবে একজন তাঁতি, জেলে, রেলের কুলি, চাষি, বেদে, ডাক্তারের ভাষায় উঠে আসে তাদের নিজের নিজের পেশার সঙ্গে যুক্ত উপযুক্ত সামাজিক বুলি। আর এই পৃথক পৃথক পেশাগত সামাজিক বুলির ব্যবহার ভাষীর ভাষায় সৃষ্টি করে ভাষা-বৈচিত্র্যের। যেমন—শিক্ষকের পেশাগত বুলির মধ্যে দেখি—লেকচার, ক্লাস, ক্লাস নোটস্, টিউটোরিয়াল, হোমটাস্ক, পড়ানো, টিচার, অধ্যাপক ইত্যাদির ব্যবহার। আবার জেলেদের পেশার ভাষা হিসেবে বিভিন্ন জালের নাম, মাছের নাম, জাল বোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বুলি, মাছের খেউ দেওয়া, নৌকা, বুলানি, জাল লাগানো ইত্যাদি।

উপন্যাসের চরিত্রের মুখের ভাষাতেও এরূপ পেশাভিত্তিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ঔপন্যাসিক যখন কোনো চরিত্র নির্মাণ করেন, তখন চরিত্রটিকে অধিক বাস্তবসম্মত করে তুলতে তাদের মুখে বসান উপযুক্ত ভাষা। চরিত্রের পেশাগত পরিচয়কে স্পষ্ট করতে তাদের সংলাপে ব্যবহার করেন পেশাগত বুলিকে। সমরেশ বসুর 'টানা পোড়েন' উপন্যাসের এমনই তাঁতশিল্পীদের পেশাভিত্তিক ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই স্পষ্ট রূপে। উপন্যাসটি বিষ্ণুপুরের তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁতিদের জীবন নিয়ে লেখা। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু বিষ্ণুপুরের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য 'বালুচর' শাড়ির কথা প্রসঙ্গে 'লেখকের কথা' অংশে বলেছেন—

> বাদশাহী আমলের রেশম শিল্পের অতুলনীয় সৃষ্টি 'বালুচর' শাড়ি। সেই যুগে তাঁত-শিল্পীদের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি 'বালুচর' যা বাদশাহী আমলেই সারা বিশ্ব মোহিনীদের মন জয় করে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা তাদের কলের কাজে মনমোহিনী শাড়ি আমদানি করে, একটা গোটা শিল্পী গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিল।[৫]

বিষ্ণুপুর-সোনামুখীর সেই ঐতিহ্য 'বালুচর' শাড়ির শিল্পীদের জীবনের কাহিনিকে গেঁথেছেন তাঁর

উপন্যাসে। ব্যবহার করেছেন তাদের অঞ্চলের মুখের ভাষা। ঔপন্যাসিক নিজেই বলেছেন—'আমি চেষ্টা করেছি, বিষ্ণুপুরের তাঁত-শিল্পীদের জীবনযাপনের ছবি, মুখের ভাষা, ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিতে।'

উপন্যাসের শুরুতেই শাড়ি বোনা, তার জমিন, রঙ ইত্যাদি অনুষঙ্গের বারবার ব্যবহারে বুঝতে পারি উপন্যাসটি তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের জীবন নিয়ে লেখা। উপন্যাসের শুরুতেই পেয়ে যাই জীবনের সঙ্গে পেশার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকার বিষয়টি। উপন্যাসের চরিত্র জগতের দেহের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—"জগতের খালি গা, পুরনো কালো ফিতা পাড় কোঁচকানো তসরের মতো গা। পুরনো হলেও, খাঁটি তসরের যেমন একটা জেল্লা থাকে, তার বুড়ো রেখায় সে রকম জেল্লা।"[৬] এখানে 'কালো ফিতে', 'পাড়', 'তসর', 'তসরের জেল্লা' ইত্যাদি তাঁতির পেশাগত বুলি। একইভাবে তার দুই মেয়ের জামাইয়ের সাংসারিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গেও ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন তাঁতির পেশার জগতকে। লেখকের কথায়—

> এক জামাইয়ের মনোহারি, আর এক জামাইয়ের মুদি দোকান। জমির আয়ে চললে কেউ দোকানদারিতে যায় না। দোকানদারিও যদি তেমন রমরমা গদিঘর হতো, তার একটা কথা ছিল। না, সে সব নেই। দোকানদারির ছিরি হল টিমটিমে ঝিমঝিমে। টানায় বিস্তর ফাঁক, ভরনায়-পোড়েনেও আঁট নেই। অমন কাপড়ের বাইরে নজর-কাড়া ঠাট থাকতে পারে, টেনে মেলে ধরলে জাল। না এদিক, না ওদিক। বড় আর মেজো মেয়ের সংসারের জমিন মোটে খাপি না।...কিন্তু তাঁতির সংসারে কে কবে খাপি জমিনের মতো ঘর দেখেছে! টানায় বাঁধে, ভরনায় মারে, মজুরি ছাড়া কোনও স্বত্ব তার নেই।[৭]

এখানেও 'টানায় বিস্তর ফাঁক', 'ভরনায়-পোড়েনে আঁট', 'নজর-কাড়া ঠাট', 'মেলে ধরলে জাল', 'জমিন মোটে খাপি না', 'খাপি', 'জমিন', 'ঘর', 'টানায় বাঁধে', 'ভরনায় মারে', 'মজুরি' ইত্যাদি শব্দ ও শব্দবন্ধগুলি তাদের পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যা তাদের জীবনেও প্রযুক্ত। তাঁতিরা তাদের পেশার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এই পেশাগত সমাজ-উপভাষাগুলি। এখানে শাড়ির 'জমিন' হল মেঝে। 'খাপি' হল শাড়ির মেঝের ভরাট বুনন। এগুলি সবই তাঁতিদের পেশাগত সামাজিক বুলি।

উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন, তাঁতির তাঁত বোনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। বাদশাহি আমল থেকে বিষ্ণুপুরের তাঁতের বিখ্যাত পসার। তখন ছিল 'জালা পদ্ধতি'। এখন এসেছে 'জেকার্ড মেশিন'। আগে একটা শাড়ি বুনতে সময় লাগত কয়েক মাস। হাতে শাড়ি বোনার পদ্ধতির কথা পাই কথকের বাচনে—

> তবে হ্যাঁ, বাদশাহি আমলে এখনকার মতো জেকার্ড মেশিন ছিল না। তখন ছিল ওপরে জাঁক, নীচে পাখি। তার নাম জালা পদ্ধতি। সুপারির মাঝখানে ছিদ্র করে, তার মধ্যে রেশম পরিয়ে নকশা করা হত আর নকশার হিসাব ফুটে উঠত শিকলানে। তবে হুঁ, লরাজে তখনও ছিল, এখনও আছে। একটা লরাজে সুতো গোটানো থাকত, ওটা হল টানা। সেই টানার সঙ্গেই থাকত ছুঁচ কাটি, সুপারির সঙ্গে সুতোর গায়ে থাকত খাচান দড়ি, দড়ির গায়ে মৌরি—যাকে বলে ছুঁচের ফুটো। তার সঙ্গে মোটা তারের ছুঁচ-কাটির ওজন রেখে, বুনটের সমতা রাখা হতো। কাজ বড় ভজকট।[৮]

জেকার্ড হল নকশার মেশিন। 'জাঁক', 'পাখি', 'জালা পদ্ধতি', সুপারির মাঝে ছিদ্র করে রেশম

পরানো, 'নকশা', 'শিকলান', 'লরাজ' (লম্বা কাঠের দণ্ড, যাতে সুতো ও কাপড় দুটোই গুটিয়ে রাখা হয়), 'সুতো', 'টানা', 'ছুঁচ কাঠি', 'খাচান দড়ি', 'মৌরি' (ছুঁচের ফুটো), 'ছুঁচ-কাটি', 'বুনট' ইত্যাদি শব্দগুলি তাঁত বোনার সঙ্গে যুক্ত বুলি। এই বুলির ব্যবহার একমাত্র তাঁতিরাই করে।

উপন্যাসকার শাড়ির বুননের কথা প্রসঙ্গেও ব্যবহার করেছেন আরও কতকগুলি এমন বুলির। যেমন—'জালিপাটা' (পাঞ্চিং কার্ড), 'পিস-বোর্ডের পাটা', 'বিধ বিধানো', 'রঙিন রেশম', 'খাচান দড়ির ছুঁচ', 'জমিন', 'জমিনের বুটি', 'আঁচলের নকশা', 'কাপড়ের পাড়' ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও বালুচরি বা তাঁত বোনার সময় তাঁতিরা ব্যবহার করে আরও বহু পেশাগত সমাজ-উপভাষার। তেমনি কতকগুলি শব্দ বা বুলির তালিকা এখানে তুলে ধরা হল। 'বানিদার' (তাঁতে বসে যে তাঁত বোনে), 'মাকু' (তাঁত বোনার যন্ত্র বিশেষ), 'মীনা' (রঙ করা রেশম), 'টানা' ও 'ভরনা' (আড় ও লম্বার সুতো), 'গলানি' (ছেলে বা মেয়ে, যারা আঁচলের নকশা অনুযায়ী মাকু ভরে ভরনায়; এটি মূলত আঁচল বোনার ক্ষেত্রে), 'চালানি' (গলানির মতোই কাজ, তবে এটি পাড়ের ক্ষেত্রে), 'পারডোব' (তাঁতির পা ডুবিয়ে রাখার মতো গর্ত), 'পাষাণলড়ির ঝাঁপ', 'চরকা', 'লাটাই', 'ফাঁদালি' (লম্বা সুতো জড়ানোর কাঠের দণ্ড), 'পাছাড়কাটি', 'সানা' (লম্বা কাঠের জিনিস, যেখানে বহু ভাগ থাকে), 'তাশন' (সুতো প্রস্তুতের পদ্ধতি), 'পুল' (রেশম গুটি), সুতো 'ভাঙতি' করা (মহাজনের কাছে সুতোর পরিবর্তে সমান পরিমাণ শাড়ি দিতে না পারা), 'পাড়ের ডাং' (শক্ত বুনটের জন্যে মেশিনের সঙ্গে ঝোলানো বালির পুঁটলি), 'চিট' (সুতোকে মার দেওয়া) ইত্যাদি। এগুলি সবই তাঁত শিল্প বা কাপড় বোনার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক বুলি।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পাঁচুর জীবন জুড়েও আছে শুধু নকশা আর বুনন। সে ওস্তাদ অভয় খানের শিষ্য। ওস্তাদ অনেক বড়ো 'লসকাদার'। কতবার ওস্তাদ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে নকশা। ওস্তাদের 'লসকা' পছন্দ হওয়া ভার। 'লসকা' হল শাড়ির নকশা। ওস্তাদ অভয় খান নিজের জীবনের কথা বলেছেন পাঁচুর কাছে। উঠে এসেছে বংশীলালের সঙ্গে মাধবদাসের বালুচরি শাড়ির বুননের লড়াই। উপন্যাসের এক জায়গায় এই প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে তাদের পেশার সংলাপ। উঠে এসেছে অভয় খানের জবানীতে তাঁত বোনার গান—'হুঁ, পাষাণলড়িতে চাপ দিয়া কর, ঝাঁপ ছাড় ঢেকিতে মার, ক্যারেংঝট। দড়ি টানো জমিন খাপি কর।' গানের লাইনে উঠে এসেছে বুননের পদ্ধতি। বুননের সমাজ-উপভাষা। 'পাষাণলড়ি', 'ঝাঁপ ছাড়', 'ঢেকিতে মার', 'ক্যারেং—ঝট', 'দড়ি টানো', 'জমিন', 'খাপি' ইত্যাদি সবই তাঁত বা 'বালুচরি' বুননের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাষা।

পাঁচুও শিখেছে তার ওস্তাদ অভয় খানের কাছে। উপন্যাসে এক জায়গায় দেখি 'লসকাদার' পাঁচু নকশা নিয়ে এসেছে ওস্তাদকে দেখাতে। সেখানে শাড়িতে নকশা আঁকা নিয়ে পাঁচু ও ওস্তাদের কথোপকথনের কিছু অংশ—

> ইয়া! ওস্তাদের গলা থেকে শব্দও বেরুল, 'মনসার পিতিমে আঁকিস নাই ক্যানে পাঁচু?'
>
> পাঁচুর বুকের টানায় যেন চৌতারের জট পাকিয়ে গেল, 'আজ্ঞা উটি আপনার কাছকে শিখা করেচি, লসকাতে দেবদেবীর মুততি তুলা করতে নাই। মা-ঠানদের গায়ের শাড়ি পায়ে লাগে, উটির ভয়ে দেবদেবীর লসকা শাড়ি কেউ পরতে চান নাই।'[৯]

শাড়িতে 'মনসার পিতিমে' আঁকতে চায়নি পাঁচু। দেবতার 'মুততি' (মূর্তি) পায়ে লাগলে পাপ হয়। তাই নকশাদারেরা কখনো দেবতার মূর্তি শাড়িতে অঙ্কন করে না। এখানে পাঁচু নিজের

হৃদয়ের জট পাকানো অনুভবকে বর্ণনা করেছে 'চৌতারের জট' শব্দ প্রয়োগ করে। 'চৌতারের জট' লাগে শাড়ি বোনার সময় সুতোতে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক চরিত্রের অনুভবের বর্ণনা প্রসঙ্গেও ব্যবহার করেছেন তাদের পেশাগত বুলিকে। এছাড়া 'লসকা', 'দেবদেবীর মুততি তুলা', 'দেবদেবীর লসকা'—এ সবকিছুই তাঁতিদের পেশাগত সমাজ-উপভাষা।

উপন্যাসেই দেখি নকশা আঁকার পর আসে রঙের প্রসঙ্গ। শাড়ির জমিনের রং নিয়ে ওস্তাদ ও পাঁচুর আলোচনায় দেখতে পাই সেই ভাবনার ছবি—

> তারপরে জিজ্ঞেস করলে, 'জমিন-লসকার রং কিছু ভেবেচু?'
> পাঁচুর গায়ের ঘাম এখন ঠাণ্ডায় জুড়াচ্ছে। বলল, 'আঁজ্ঞা জাম রঙের জমিন—'
> 'না।' ওস্তাদ মাথা নাড়ল, বাঁধের মাঝখানকের জলের যেমন রং জমিনটা সেই রং হবেক।'
> পাঁচু বলল, 'তবে উটিই হবে আঁজ্ঞা। লসকা হবেক আমাদিগের বিষ্টুপুরের লাল মাটি রং, আর উয়ার সঙ্গে মেজান্টা।'[১০]

এখানে উভয়ের সংলাপে ব্যবহৃত শাড়ির 'জমিন', 'জমিন-লসকা', 'জাম রঙের জমিন', 'রং জমিন', 'লসকা', 'লসকার রং' 'বিষ্টুপুরের লাল মাটি রং', 'মেজান্টা' সবগুলিই তাঁতিদের পেশাগত সামাজিক বুলি। শাড়ির 'জমিন' হল মেঝে। পাঁচু বলেছে জমিন হবে জাম রঙের। ওস্তাদ নিষেধ করে বলেছে বাঁধের মাঝখানে জলের মতো রঙ হবে জমিন। আর জমিনের নকশার রং হবে বিষ্ণুপুরের লাল মাটির রং এবং মেজেন্টা রং। এইভাবে শাড়ি রং করার পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের পেশাগত বুলি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে।

শাড়ি বুননের আগে ও পরে আছে বাজারের বিষয়। চাষিদের থেকে কেউ পলু সংগ্রহ করে। কেউ পলুর বদলে বাজার থেকে সংগ্রহ করে রেশম-পাট। পাটের মানের ভালো-মন্দ বিচারের প্রসঙ্গেও ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন তাদের পেশাগত বুলিকে। উপন্যাসে দেখি—

> কিন্তু সেবা মণ্ডলের মাল থেকে মড়ার গ্রামের মালটি নিকষ। বলো নিকৃষ্ট। তুমি যদি লসকাদারের মতো লসকাদার হও বুনাটির ব্যাপারে মন খুঁতখুঁতানি বানিদার হও, তবে উ নিকষ মালটি তুমি কিনা করবেক নাই।'[১১]

নিকৃষ্ট রেশমকে তাঁতিরা বলে 'নিকষ'। রেশম বা সুতো অথবা বোনা শাড়িকে তারা নিজের নামে না বলে, বলে 'মাল'। এগুলি শিল্পী বা ব্যাপারী মানুষের ব্যবসার রীতি ও তাঁতিদের পেশাগত সমাজ-উপভাষা।

উপন্যাসের এক জায়গায় দেখি মোতি হাটে গিয়েছে 'তসরের লাড়ো' বিক্রি করতে। হাটের মধ্যে 'লাড়ো'র ক্রেতা ও মোতির মধ্যে দরদাম চলছে। মোতিকে একটি বউ 'লাড়ো'র দরদামের সূত্রে বলেছে—"মাল ত আমরাও বিকা করিগ তাঁতিদিদি। লাড়ো পিছু দশ পাইসা কেউ দিবেক নাই। কততে দিবে, ঠিক ঠাক বুলা কর।"[১২]

এখানে তাঁতিদের পেশাগত বুলির সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই তাদের সুতো, শাড়ি বিক্রি সংক্রান্ত ক্রেতা-বিক্রেতার পেশাগত বুলিও। এখানে দেখি মোতি হাটে এসেছে 'তসরের লাড়ো' বিক্রি করতে। সেই কারণে অন্য ক্রেতারা তাকে সম্বোধন করেছে 'তাঁতিদিদি' বলে। এইরূপ সম্বোধন তাদের পেশাগত পরিচয়কে তুলে ধরে। একেবারে উপন্যাসের শেষে দেখি হাতে বোনা বালুচরির দিন শেষ হয়ে আসছে। পাঁচু তার জীবন-প্রাণ দিয়ে যে তাজমহল নকশার শাড়িখানি বুনছিল, সেটা আর বিক্রি হয় না। উদয়ভিলা থেকে শাড়িটা চেয়ে পাঠায় মিউজিয়ামে রাখবে বলে। ব্যাপারী

ঈশ্বরদাস হাতে বোনা তাঁত শিল্পের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে বলেছে—

> হ্যাঁ আর ওই নতুন যে নকশাটা করছ ওটা আর কোরো না। বন্ধ করে দাও।
> পাঁচুর বুকে যেন সাপে দংশন করল, 'আঁজ্ঞা?'
> 'হ্যাঁ, ও সব বালুচরি শাড়িটাড়ি আজকাল আর লোকে কিনতে চায় না।' ঈশ্বরদাস মশলা চিবোতে চিবোতে বলল, 'পড়তায় আসে না, দাম বেশি। ছোটখাটো নকশা হলে আজকাল ম্যাকসির জন্য বোনা যায়। ও কাজটা তুমি বন্ধ করে দাও, আর দরকার নেই।[৪৪]

বালুচরি শাড়ির জামানা শেষ হয়। শেষ হয় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু বুলির। আসে নতুন শব্দাবলী 'ম্যাকসি'। এইভাবে একটি পেশা ধারণ করে থাকে নির্দিষ্ট কিছু শব্দাবলী। যেগুলি তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ভাষীর পেশাগত বুলি বা সমাজ-উপভাষা বলেই চিহ্নিত।

উৎসের সন্ধানে

১. পবিত্র সরকার : 'ভাষা দেশ কাল', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫, পৃ. ১৫৬
২. Peter Trudgill. 'Sociolinguistic : An Introduction to Language and society', England : Penguin Group, 2000, P. 24
৩. Ronald wardhaugh : 'An Introduction to Sociolinguistics', United Kingdomõ Blackwell Publishing, 2006, P. 148
৪. উদয়কুমার চক্রবর্তী : 'নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', কলকাতা: ইন্দাস পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ১৬৮
৫. সমরেশ বসু : 'টানাপোড়েন', কলকাতা, অঞ্জলি প্রকাশনী, ২০০৭, লেখকের কথা অংশ।
৬. তদেব : পৃ. ১০
৭. তদেব : পৃ. ১০
৮. তদেব : পৃ. ১৭
৯. তদেব : পৃ. ৭৫
১০. তদেব : পৃ. ৭৬
১১. তদেব : পৃ. ৮৯
১২. তদেব : পৃ. ৫০
১৩. তদেব

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ : মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্বেষণ

অরূপ সিং

ভারতবর্ষের প্রাচীন জাতিরূপে আদিবাসীদের একটা বিশেষ অবদান আছে, যাদের বিচরণ ক্ষেত্র সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে পার্বত্য অধ্যুষিত অরণ্য অঞ্চল জুড়ে। সরকার তাদের অবহেলার চোখে দেখলেও কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের চোখে তারা স্বমহিমায় ধরা দিয়েছে। তাই তো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভীল, ওঁরাও, হো, বিরহড় প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতির জীবনচিত্র শিল্পীর চিত্রকলা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিল্পী রামকিংকর বেইজ ‘সাঁওতাল দম্পতি’র স্থাপত্য চিত্র অঙ্কন করে অমরত্বের আসন গ্রহণ করে আছেন। তাছাড়া শতসহস্র কবি সাহিত্যিকরাও তাঁদের রচনায় আদিবাসীদের জীবনচিত্র অঙ্কনে তৎপর হয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতাবোধ পোষণ করেছেন। তবে এই সহমর্মিতাবোধ আজকের নয়, প্রাচীনকাল থেকে এর সাক্ষ্য মেলে। তাই আজ এই অরণ্যচারীরা সভ্যসমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েও বাংলা সাহিত্যের অঙ্গানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পশ্চিমবাংলায় ৩৮ টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ১৬টি গোষ্ঠী অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুণ্ডা, বিরহড়, পাহাড়িয়া, নাগেশিয়া, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী এবং দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ওঁরাও এবং মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠীর নাগা, আদিম জনজাতির অবস্থান, জীবনযাত্রা বা কোনো কোনো উপজাতির প্রব্রজনের ইতিহাস, তাদের জীবনচেতনার স্বরূপ তুলে ধরেছেন অসীম দক্ষতায়। মূলত আদিবাসীদের ইতিহাস বলতে বোঝায় তাদের দুর্ভিক্ষ, মহামারি, মড়ক, বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, স্থানান্তরকরণ বা বাস্তুত্যাগ, তাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস। কিন্তু আর্যজাতি ভারতের প্রকৃত অধিবাসী তথা অনার্য আদিজাতির জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেননি, কেবল প্রাচীন উপাদান হিসাবে চিহ্নিত তাদের বসত গিরি-কন্দর, গুহাঙ্কিতচিত্র, যুদ্ধাস্ত্র, শিকার-সরঞ্জাম, অস্থি-কঙ্কাল,

শ্মশানডিরি (সমাধি প্রস্তর), দেবস্থান ইত্যাদি থেকে ভারতের প্রাগার্য আদিজাতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যজাতিরা তাঁদের আদর্শায়িত জগৎ ও জীবনের কথা বেদ-পুরাণ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তাদের যেটুকু ইতিহাস তা তাদের পঙ্কিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন জগত ও জীবনযাত্রা প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত অধম অনাদর্শ তথা সভ্যজগত বহির্ভূত, হিংসুক চেহারা বা বর্বরতার নগ্নচিত্র ছাড়া অধিক কিছু নয়। আর্যসাহিত্যে, অনার্যদের নীচতা-স্বার্থপরতা, পরপীড়ার মতো হীনবাসনা, বিভৎস চেতনা তথা অনার্য জাতির উপর আর্যজাতির অত্যাচার-শোষণ, বঞ্চণা-প্রতারণার কথা প্রকাশ পেলেও বিপরীতে অনার্যদের ক্ষোভ-প্রতিবাদ ও গৌরবের দিকগুলি প্রকাশ পায়নি। এই অনার্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম একটি সম্প্রদায় হল মুণ্ডা সম্প্রদায়। সাঁওতাল উপজাতির মতো মুণ্ডা উপজাতিও অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি প্রত্যেক গোষ্ঠী তার নিজস্ব সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতিতে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। অরণ্য অধ্যুষিত বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডারা সভ্যতার চোখে অশিক্ষিত বর্বর, বন্য বলে পরিগণিত হলেও অন্যান্য সভ্যজাতির মতো তারাও তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, নিজস্ব আঙ্গিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম আদিবাসী সমাজজীবনের প্রভাব দেখা যায় তিরিশের দশকে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এ। চল্লিশের দশকে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'তে আর সত্তরের দশকে মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডা সমাজের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তার মধ্যেই পরিচয় মেলে মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন ও তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির। যে সংস্কৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবের দ্বারা অভিষিক্ত। তাছাড়া, অন্যান্য জাতির মতো মুণ্ডাদেরও আছে সামাজিক পরিকাঠামো, আছে নির্দিষ্ট আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পুরাণ, ঈশ্বর। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস পাঠে উপন্যাসে বর্ণিত মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন বা পরিকাঠামো ও ধর্মীয় সংস্কৃতির যেটুকু অনুসন্ধান করেছি তাই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলের একটি ছোটো গ্রাম খুঁটকাট্রি। মুণ্ডাদের বাসস্থান এই গ্রামে। খুঁটি পুঁতে মুণ্ডারা তাদের বসতি স্থাপন নির্ধারণ করত বলে তাঁরা তাদের গ্রামকে খুঁটকাট্রি গ্রাম রূপে চিহ্নিত করেন। গ্রামের মানুষদের ধর্ম-কর্ম-আচার-আচরণ-উৎসব-অনুষ্ঠান দেখভালের জন্য একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হত তাকে বলা হয় 'পহান'। মূলত পহান ছিল মুণ্ডাদের পুরোহিত শ্রেণিভুক্ত। আবার প্রতি গ্রাম দেখভালের জন্য যেমন একজন করে মুণ্ডাকে নির্বাচন করা হত, তেমনি একসঙ্গে দশ পনেরোটি গ্রাম দেখভালের জন্য যাকে নির্বাচন করা হত তাকে 'মানকি' বলা হয়। মুণ্ডা সমাজে মানকির প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই মানকিদের উপরে থাকত একজন করে জমিদার, আর তার উপরে থাকতো রাজা। মুণ্ডা সমাজে চারটি সামাজিক রীতির প্রচলন ছিল। খুঁটি দ্বারা চিহ্নিত গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে মুণ্ডা জাতি প্রতিনিয়ত একটা বিষয় সযত্নে রক্ষা করে চলত তা হল 'সারণা'। প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক মুণ্ডারা আদিম অরণ্যের পুরাতন কয়েকটি বৃক্ষের ওপর কখনোই হস্তক্ষেপ করতেন না। কারণ এই পুরাতন বৃক্ষগুলিকে তাদের দেবতারা অধিষ্ঠান করে আছে এমন একটা আমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সেই বৃহৎ বৃক্ষের তলায় দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা ও বলিদান করত। মুণ্ডারি ভাষায় এই চিহ্নিত বৃক্ষগুলিকে বলা হয় 'সারনা'। মুণ্ডা জাতির মধ্যে কেউ মারা গেলে নির্দিষ্ট স্থানে সমাধিস্থ করতো মুণ্ডারা, সেই স্থানকে বলা হত 'সসান'। সমাধিস্থ স্থানের উপর বড়ো বড়ো চওড়া পাথর খাড়াভাবে বা

মাটির উপর শুইয়ে রাখা হত। আর যারা ছিল সম্মানীয় ব্যক্তি বস্তুত তাদের সমাধির উপর বড়ো বড়ো আকারের পাথর রাখা হত। এই সকল পাথর 'সসান-দিরি' বা 'শ্মশানের পাথর' নামে চিহ্নিত ছিল। মুণ্ডারি সমাজে যে মৃতদেহকে কবর দেওয়ার রীতির প্রচলন আছে তার প্রমাণ মেলে জেলখানায় বীরসার মৃত্যু হলে সরকারি নির্দেশে তাকে দাহ করতে বলা হয়, তখন শিবন মেথর চিৎকার করে বলেছিল—"এ কি রকম হয়ে গেল হে জাতের মানুষ, ধর্মের মানুষ, কাঁধ দিবে, কবর দিবে, না কি হয়ে গেল?"[১] আবার মুণ্ডারি সমাজের কোনও ব্যক্তি দূর দেশে গিয়ে মারা গেলে তাদের আত্মীয় স্বজনেরা তার অস্থি সংগ্রহ করে গোত্রের সমানে তাঁর সমাধিস্থ করতেন।

প্রত্যেক জাতির মতো মুণ্ডাজাতির মধ্যেও ছিল কিছু সামাজিক নিয়ম। সন্ধ্যাবেলা মুণ্ডারা একটা নির্দিষ্ট ফাঁকা স্থানে সম্মিলিত হত। সেই স্থানকে বলা হয় 'আখড়া'। এই আখড়াকে নেতৃত্ব দান করত 'মানকি'। এই আখড়াতে সম্মিলিত মুণ্ডারা আলোচনা করত তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, জীবন-জীবিকা, ভবিষ্যৎ-কর্মপদ্ধতি, জাতির ইতিহাস সবকিছু। এই আখড়ার নেতা অর্থাৎ এক এক মানকির অধীন এলাকাকে 'পট্টি', 'পাঢ়া' বা 'পিড়' বলা হয়। যাত্রা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যখন বিভিন্ন পাড়ার আখড়াগুলি সমবেত হয়, তখন প্রতি পাড়ার এক একটি পতাকা শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হত। কোনো পতাকার ব্যবহৃত চিহ্ন যদি অন্য কেউ তাদের পতাকায় ব্যবহার করে তাহলে পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা বেঁধে যেত এবং এরজন্য মাঝে মধ্যে দু-চারজন মারাও যেত। আবার মুণ্ডারি সমাজে একটা বিশেষ রীতি ছিল, গ্রামের অবিবাহিত যুবকগণ রাত্রে তাদের বড়িতে শোয় না। যুবকেরা একত্রিত হয়ে একটা নির্দিষ্ট ঘরে শয়ন করে। মুণ্ডারি ভাষায় সেই ঘরটিকে বলা হয় 'গিতিওড়া' বা শোবার ঘর।

অন্যদিকে যুবতী মেয়েদেরও রাতের জন্য নির্দিষ্ট হত কোনো বিধবা বা বর্ষীয়সী মেয়ের বাড়ি। তবে 'গিতিওড়া'তে গ্রামের যুবকেরা শয়ন করে কেবল তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে না। তারা পরস্পরের মধ্যে 'নুতুম-কা-আনে' বা ধাঁধার আলোচনা করে বুদ্ধির খেলায় প্রমত্ত হত। আবার গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট যুবকেরা 'কাজি-কা-আনি' বা পুরাণের গল্প শুনে তাদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন। এইভাবে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে সুখ-দুঃখের দোলায় দুলতে দুলতে তাদের জীবন অতিবাহিত হত।

মুণ্ডা সমাজের কিছু উৎসব অনুষ্ঠান উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। তাদের উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল নৃত্য। ঋতু বৈচিত্র্যের বিভিন্ন ঋতুতে তারা নানা ধরনের পরব পালন করে থাকে। যেমন বাহা পরব বা ফুল উৎসব, হোন-বা-পরব, করম বা গবাদি পশুর পরব, নাওয়া জোম, কোলাম- সিংবোঙা বা খারিহান পূজা, মাঘে পরব, ফাগু, দাশাই, সোহারাই ইতাদি। মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা সিংবোঙা। প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠানে তারা সিংবোঙার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে থাকেন। এঁরা পূর্বপুরুষদের মৃত আত্মার প্রতি বিশ্বাস করে। পাশাপাশি জাহের বুড়ি, দাশুনা বোঙা, চন্ডি বোঙাতেও বিশ্বাস করেন। এঁরা সবাই মুণ্ডাদের গ্রাম্য দেবতা। মুণ্ডারা প্রাকৃতিক শক্তিকেও দেবতার মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করে থাকে।

উপন্যাসের নায়ক বিরসা এইসব আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে ধর্মের শুদ্ধিকরণে সে হয়ে ওঠেন একজন জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল নেতা। অরণ্যের অধিকার স্থাপনে অতীতকে ভুলে সে হয়ে উঠলেন 'ধরতি আবা' ভগবান। প্রচার করলেন নতুন ধর্মাদেশ। যে আদর্শে মুণ্ডাদের

জীবন থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল যাবতীয় কুসংস্কার। যেমন অসুর পূজা, দেওঁয়া, পহানের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস, হায়জা, চেকক-এর মতো প্রাণঘাতী রোগ ইতাদি। বিরসা তার বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে সকল বিদ্রোহী মুণ্ডাদের করে তুলেছিল বিজ্ঞানমনস্ক। তাই বিরসা বলেছিল আপাং গাছের শিকড় বেটে খেলে হায়জা হবে না, চেকক হলে সকলে নিম পাতা সিজে জল খাবে, নিমপাতা জলে সিজে সেই জলে গা মুছবে। আর চেকক ধরেছে অথচ গুটি বেরায়নি, সাদা তুলসী পাতার রস, আদার রস তারে খাওয়াও গুটি বেরাবে এবং বাকী সকলের উদ্দেশ্যে সে করলা পাতা আর হলুদের রস মিশিয়ে খাওয়ানোর কথা বলেছিল। তবে মুণ্ডারা হায়জাচেককসাপকাটা বাঘধরা এরকম মরণ ভাগ্যের লিখন বলে বিশ্বাস করত। মুণ্ডাদের অতীতে ধর্মে যে লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস ছিল তার স্বরূপ বিরসার মা করমির ভাবনায় সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে—

> আগে মুণ্ডারা যা যা করত এখন কিছুই করে না। হোলিতে 'জাপি' নাচগান হয় না, শিকার করতে যায় না মুণ্ডারা। পৌষ পূর্ণিমায় মাঘে উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির বাস্তুদেবতা, পিতৃপুরুষ সকলকে অর্ঘ্য দেওয়া বন্ধ করতে করমি ভয় পেয়েছিল কিন্তু বিরসার ধর্মে 'মাঘে' পরব নেই।[২]

অর্থাৎ বিরসার নতুন ধর্ম মুণ্ডারি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুণ্ডারা পালন করত হোলিতে জাপি, নাচ ও গান, হোলিতে শিকার করতে যাওয়া, পৌষ পূর্ণিমায় 'মাঘে' উৎসব পালন করা, পৌষপূর্ণিমায় বাড়ির বাস্তুদেবতা ও পিতৃপুরুষকে অর্ঘ্য দেওয়া। করমি আরও পরিবর্তন লক্ষ করেছে শালগাছে ফুল ফুটলে যৌবনে করমিরা 'বাপরব' করেছে, মাথায় ফুল পরে মেয়ে পুরুষ নেচেছে। বিরসা তাও তুলে দিল। যত পারবে বোঙাবুঙির পুজো, বলিদান, হাঁড়িয়া পান বিরসা সব তুলে দিল। করম পুজোর নাচ, পাইকা নাচ সব বিরসা বন্ধ করে দিল। কারণ হিসাবে সে তার মা করমিকে জানিয়েছিল—

> মুণ্ডার জীবনে সুখ-দুঃখ। এত বোঙাবুঙি পুজো, নেচে গেয়ে সে দুঃখের আসান হয় কিছু 'করম' তাদের পুজো নয়, হাঁড়িয়া তারা আদিতে খায় নাই, আমার নতুন ধর্ম যে অন্যরকম মা! আমি তাদের দুলাই না, ভুলাই না। তাদের বাচতে শিখাব, মরতে শিখাব। আবার মারতেও শিখাব। তবে নতুন রীতিকরণ হবে না মোর ধর্মে।[৩]

বিরসার ধর্ম সত্যিকারের মানবধর্ম। বহিরাগতের কাছ থেকে নেওয়া 'করম পুজো', অন্যান্য রীতিনীতি, প্রাচীন অসুর ধর্মের যাদুক্রিয়া রক্তোৎসব সমস্তই কুসংস্কার মাত্র। সেগুলি বর্জন করে বিরসা ভগবান হয়ে ধর্মে বিপ্লব আনার চেষ্টা করেছে মাত্র। তবে তাদের সমাজেও কিছু কিছু লোকবিশ্বাস, ট্যাবু বা মানার প্রচলন ছিল। যেমন বৃহস্পতিবার বিরসার জন্মদিন বলে সেদিন কেউ জীব হত্যা করত না। বিরসার জেলে যাবার পর দুবছর অনাবৃষ্টি, গুনিনওঝা ও জাদুমন্ত্রের প্রভাব তাদের সমাজে দেখা যায়।

মুণ্ডারা নাচে-গানে খুব পটু ছিল। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে তারা নাচ-গানে মেতে উঠত। মাদলের তালে, নাগরা বাদ্যে, টুইলা ও বাঁশির সুরে গান বেশ ভালো লাগত। তবে মুণ্ডারি ভাষার গান কান্নার মতো সুর, মন্ত্রের মতো গভীর। ভরমির কণ্ঠে শোনা যায়—"হে ওতে দিসুম সিরজাও/নি' আলিয়া আনাসি/আলম আনদুলিয়া/বিশ্বাস মেনা!!"[৪] এ গানের আক্ষরিক অর্থ হল—"হে পৃথিবীর স্রষ্টা, আমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ করো না। তোমাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।"[৫] ভরমির কণ্ঠের এ গান কোনো আনন্দের আবেগ মথিত ধারা নয়, ও যেন মহান আত্মার প্রতি ঈশ্বরের শান্তি প্রার্থনা।

উপন্যাসে এরকম একাধিক জনের কণ্ঠে গান গীত হয়েছে। জেলখানায় ধানী মুণ্ডার কণ্ঠে গীত গান আমাদের হৃদয়কে সত্যই আন্দোলিত করে—

> বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোনকো।/হোইও ডুডুগার হিজতানা/বোলোপে।/ওতে রে ডুডুগার সিরমা রে কোআন্সি।/দিসুম তাবু বুআল তানা/বোলোপে।[৬]

অবহেলিত, অসহায়, নির্যাতিত মুণ্ডারা দিকু এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কটাক্ষ করে এই ধরনের গান গাইত। অর্থাৎ মুণ্ডারি ভাষার গান মুণ্ডা-সমাজজীবনকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে। মুণ্ডা সংস্কৃতির বেশ কিছু বস্তুকেন্দ্রিক উপাদান উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। যেমন—

খাদ্যদ্রব্য : মুণ্ডাদের জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। ঘাটো (ঘাসের দানা) একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেত। এছাড়া কুল, অম্লকষায় আমলকি, বনকচু, জই ভাজা, বনধুঁধুলের তরকারী, যব, কড়ুয়ার তেল, কন্দ শাক, উদুখলে জোয়ার ভেঙে ছাতু, বাঁশকোড়, চিনাদানা, গোটা মুসুর, জংলী বরবটী, সিমের দানা, মেটে আলু, তেতুল পাতা সিজিয়ে তারা খেত। খরা-সজারু-হরিণ-শশাঙ-মুরগী-নীলপাখি-তিতির প্রভৃতির মাংস ও কুম্ভীর মাছ তারা খাদ্য হিসাবে খেত। নেশাদ্রব্য হিসাবে দেশি মদ ছাড়াও মৌয়া, হাঁড়িয়া, তাড়ি তারা পান করত।

বাসস্থান : মাটির দেওয়াল ও পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর নির্মাণ করত। রাঙা-মাটি, ছাই রঙা খড়ের কুচি মিশিয়ে বাড়ির দেওয়াল লেপত এবং দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের চিত্র নির্মাণ করত। চকমকি পাথর দিয়ে তারা আগুন জ্বালাত এবং মহুয়া বীজের তেল বের করে তা দিয়ে ঘরে বাতি জ্বালাত।

পোশাক-প্রসাধন : মুণ্ডা পুরুষেরা পরনে সাদা ধুতি, হাঁটু অবদি ঝুলিয়ে পরত। পায়ে ঘরে তৈরি কাঁচা কাঠের খড়ম, খড়মে অভ্যেস নেই বলে দড়ি জড়িয়ে বাঁধা। প্রত্যেকের গলায় উপবীত, কপালে তিলক, মাথায় পাগড়ী বা কাঁকই, গায়ে পিরাণ। মেয়েরা মোটা সুতির কপড় পরত, গায়ে রিঠা ফলের ক্বাথ মেয়েরা মাখত। চুলে মহুয়া তেল ও কুচ তেল ব্যবহার করত। ধুঁধুলের খোসা দিয়ে গা-হাত-মুখ মার্জন করত। মেয়েরা সাজিমাটিতে কাপড় কাচত। আর সুঁই দিয়ে কাপড় সিয়ানোর কাজ করত। শীতকালে প্রত্যেকেই গায়ে রজাই ব্যবহার করত। তুলো না থাকলে তুষ দিয়ে রজাই বানাত।

অস্ত্রশস্ত্র : তীর, বলোয়া, বল্লম, ধনুক, বর্শা, কুড়াল ববহার করত। কুচফল থেকে বিষ বের করে কুচিলা, সাপের বিষ বের করে তীরের ফলায় মাখিয়ে তা ব্যবহার করত।

বাদ্যযন্ত্র : মাদল, নাগরা, বাঁশি, লাউয়ের খোলে তৈরি টুইলা, পাতা ছিঁড়ে ডুলি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত।

উৎপাদন সরঞ্জাম : ঝুড়ি-কোদাল-ঝাঁটা-খন্ডা-শাবল ইত্যাদি।

আমার বিশ্বাস 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের পাঠে যারা লোকসংস্কৃতির চেনা ছক অন্বেষণ করে থাকেন; তারা মুণ্ডাসংস্কৃতির পাঠকে একই গোষ্ঠীমানুষের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু এ উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি নয় মুণ্ডা সংস্কৃতির বিবিধ অঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর মুণ্ডারি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুনিবিড় সখ্যতা ও আন্তরিকতার ছাপ এ উপন্যাসের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। এইভাবে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে

মুণ্ডাদের সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির নানান পরিচয় অপূর্ব মহিমান্বিতভাবে ফুটে উঠেছে এবং মুণ্ডারা যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল তা অবশ্য স্বীকার্য।

উৎসের সন্ধানে

১. দেবী মহাশ্বেতা : 'অরণ্যের অধিকার', করুণা প্রকাশনী, পঞ্চবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০, পৃ. ২৫
২. তদেব : পৃ. ১৩৩
৩. তদেব : পৃ. ১৩৩
৪. তদেব : পৃ. ১৯-২০
৫. তদেব : পৃ. ২০
৬. তদেব : পৃ. ৩১

তথ্যের সন্ধানে

১. দীপঙ্কর মল্লিক : 'বাংলা উপন্যাসে জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি', দিয়া পাবলিকেশন
২. সুধাংশুশেখর মণ্ডল : 'উপন্যাস পরিক্রমা' (অরণ্যের অধিকার), বামা পুস্তকালয়
৩. সুবোধ দেবসেন : 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ', পুস্তক বিপণী
৪. রতন কুমার নন্দী : 'অরণ্যের অধিকার মানুষের উত্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৫. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' প্রথম খণ্ড, সুবর্ণরেখা, তৃতীয় প্রকাশন

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি

সুদীপা সাধু

সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে স্রষ্টাকে নিবিড়ভাবে জানা এবং চেনা আবশ্যক। তেমনই এক অনন্যসাধক সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী যাঁর উপন্যাসের বিরাট জায়গা জুড়ে আছে আদিবাসী জনজীবনের কথা। কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আদিবাসী জীবনকথা এসেছে তাঁর বেশ কয়েকটি কালজয়ী উপন্যাসে।

মহাশ্বেতা দেবীর বেশ কিছু উপন্যাস প্রকৃতিঘনিষ্ঠ আদিবাসী জীবনযাত্রার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি চলচ্চিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা সাদামাটা আচরণ, তাদের শোষণ-বঞ্চনা-উপেক্ষিত জীবনের হাহাকার যথাযথভাবে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাদের চাওয়া-পাওয়া, না-পাওয়া, বাধা-বিঘ্ন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ঘোষিত হয়েছে। নাগরিক শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে প্রতিবাদী সত্তা জয়ী হয়ে উঠেছে। এমনই দুটি উপন্যাস হল—'অরণ্যের অধিকার' ও 'ব্যাধখণ্ড'। উপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয় অপরাধপ্রবণ জাতি বলে চিহ্নিত আদিবাসী সমাজের উপরে তথাকথিত নাগরিক শিষ্ট সমাজ চোর-দস্যুর অপরাধ দিয়ে থাকে। এদেরকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে 'বুনো', 'অসভ্য' জাতি হিসেবে। মহেশ্বতাদেবী এই জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন-সংস্কৃতির সামূহিক কৃতিকে যথাযোগ্য বিশ্বস্ততায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। আদিবাসী জীবনে বঞ্চনা-হতাশা-নিপীড়ন এবং তাদের-স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার আখ্যান উঠে এসেছে আমাদের আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে।

বাংলা উপন্যাসে অরণ্যক জীবন সংগ্রামের বিষয়কে ভিন্ন মাত্রায় তুলে এনেছেন মহাশ্বেতা দেবী। রোমান্টিক ভাবালুতা কাব্যিক উচ্ছ্বাস ও অফুরান প্রকৃতির বর্ণনা নয়, মহাশ্বেতার কলমে অরণ্য হয়ে উঠেছে বঞ্চিত আরণ্যক মানুষদের সংগ্রামস্থল।

'ব্যাধখণ্ড'-এ দেখি, নগর সংস্কৃতির মানুষরা আদিবাসীর বেঁচে থাকার অবলম্বনস্বরূপ যে জঙ্গালমহল রয়েছে, সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে আদিবাসীরা জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখন্ড' উপন্যাস যাযাবর সমাজের জীবিকা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও নানা কথা উঠে এসেছে। আরাড়া গ্রামে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতের মানুষ বসবাস করে। মহাশ্বেতার 'ব্যাধখণ্ড' পুরাণ নয়, এখানে ইতিহাসই সক্রিয় থেকেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমকালীন জীবনবোধ। এই উপন্যাসের কাল্যা অসামান্য একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য রচনার সূচনা লগ্ন থেকে মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসকে উপজীব্য করেছেন তাঁর লেখনীতে। ইতিহাসকে তিনি খুঁজে নিয়েছেন মাটি ও মানুষের কাছ থেকে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রেমী মহাশ্বেতা বারংবার সাধারণ শোষিত নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিবাদ, বিদ্রোহকে তাঁর রচনায় স্থান দিয়েছেন। ঠিক তেমনই মুণ্ডা বিদ্রোহের আধারে তিনি রচনা করেছেন 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি।

এই উপন্যাসে প্রাচীন ঐতিহ্য-বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও রীতি-নীতিতে না থেকে মুণ্ডাদের আধুনিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে আনতে চেয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। ফলে বিরসা প্রচলিত সমাজকে সরিয়ে দিয়ে প্রকৃত বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে জাগাতে চেয়েছে বারংবার। ফলে অশিক্ষিত, সহজ-সরল যাপিত জীবনে বিশ্বাসী মুণ্ডাদের কাছে নিজেকে ভগবান প্রতিপন্ন করা দ্বিতীয় কোনো পথ বিরসার সামনে খোলা ছিল না। সে দেখেছিল মুণ্ডাদের জীবনে শুধু ইংরেজরা নয়, পাশাপাশি বিত্তভোগী শ্রেণির সুবিধাবাদীরা সর্বস্ব কেড়ে নিতে উদ্যত। মুণ্ডাদের জীবনে ক্রিশ্চান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এমনভাবে আরোপিত হয়েছে যে, মূল আদিবাসী ধর্ম থেকে মুণ্ডারা বিচ্যুত হয়েছে। সুতরাং, বিরসা এই মুণ্ডাদের স্রোতের অনুগামী না করে বিজ্ঞাননিষ্ঠ যাপিত জীবনে ফেরাতে চেয়েছে। যে ভূখণ্ডে এতদিন মুণ্ডারা ছিল, সেই ভূখণ্ড থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফলে তারা উদ্বাস্তু হয়েছে। ছোটোনাগপুরের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মুণ্ডাদের অবস্থান ছিল, সেই জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে সকল জমি জমিদারদের দখলে এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে তারা সে জমি বণ্টন করেছিল বহিরাগত মহাজন শ্রেণির মধ্যে। বিরসার বাবা সুগনা মুণ্ডার যাযাবর জীবন বৃত্তের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

মুণ্ডারা লেখাপড়া জানত না। ফলে তারা সব দিক থেকে বঞ্চিত হত। বিরসার বাবা চেয়েছিল বিরসা লেখাপড়া শিখুক, যাতে সে দলিল পড়তে পারে বা হাকিমকে তাদের কথা বোঝাতে পারে। সুগানা বিরসাকে লেখাপড়া শেখানোর মধ্যে দিয়ে বস্তুত জমির অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসের প্রথম দিকে ভূমির জন্য মুণ্ডাদের লড়াইকে গুরুত্ব দিলেও শেষাবধি তাঁর উপন্যাসে লড়াই হয়ে পড়েছে অরণ্যকেন্দ্রিক। বিরসার কাছে অরণ্য হয়ে উঠেছে মায়ের মতো। অরণ্যকে তাই বিরসা জননী বলে চিহ্নিত করেছে। সে জানে এই অরণ্য জননীই মুণ্ডাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। দিকু বা বহিরাগতদের কাছ থেকে অরণ্যকে বাঁচানোর দায় তুলে নিয়েছে বিরসা।

অত্যাচার, অবিচার, আরণ্যক আদিবাসীদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার এবং আগামী একলব্যদের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়; নিজের জাতি, ধর্ম, সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকার নিয়েছে বিরসা। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস এদিক থেকে সমগ্র পৃথিবীর বঞ্চিত নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতিনিধি। এই নিম্নবর্গের লড়াই কখনও শেষ হওয়ার নয়। বিরসা সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, পরাজয়ে কখনও সংগ্রাম শেষ হয় না।

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সংস্কৃতির পটরেখা অঙ্কনে সমতল ভূমির কৃষিকেন্দ্রিক চেনামহল থেকে সরে এসেছেন এবং তিনি মুণ্ডাদের সঙ্গে আদিম আরণ্যক সভ্যতার গভীর মেলবন্ধন দেখতে পেয়েছেন বলে বিরসার অনুভূতিকে নতজানু সমর্থন করেছেন। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বেশ কিছু লোককথা, রূপকথা, মিথ এসেছে। করমির মুখে বাক্‌কেন্দ্রিক আদিবাসী সংস্কৃতির একাধিক কিংবদন্তি শোনা গিয়েছে। উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে পেয়েছি, আদিবাসী নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রসঙ্গ। যেমন—"আবার মুণ্ডাগ্রামে গ্রামে মাদল বাজলে মেয়ে পুরুষে নাচল, গান গাইল।" মাদল ব্যতীত 'নাগরা' বাদ্যের কথাও পেয়েছি।

আদিবাসী জীবনের অন্যতম অঙ্গ বা বৈচিত্র্য শিকার পরব। আদিকাল থেকে অরণ্যচারী মানুষেরা বনের হিংস্র পশুদের তীর বা বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করে নিরাপদ করেছে নিজেদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। অন্যদিকে হরিণ, বরা, খরগোশ ইত্যাদি শিকার করে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণ করেছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, শিকার তাদের জীবনে আবশ্যক এবং অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

আরণ্যক মানুষদের কাছে ভগবান হয়ে উঠেছে বিরসা। একটা সমগ্র শোষিত অবহেলিত আরণ্যক জাতিকে বিরসা জানিয়ে দিয়েছে, তাদের অধিকার আসলে কি এবং কতটা। অরণ্যকে দিকুরা কলুষিত করছে, করায়ত্ত করেছে। অরণ্য ও আরণ্যক মানুষের আজন্ম চিনবার সুযোগ নিয়েই বিরসা তাদের সংস্কার, বিশ্বাস ও সারল্যকে অবলম্বন করে সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। আরণ্যক মানুষেরা স্বভাবত সহজ, সরল হয়ে থাকে। ফলে তাদের উপরে অন্য ধর্মাবলম্বীরা দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। বিরসা তার নিজের অধিত বিদ্যার দ্বারা সবার কাছে ভগবানপ্রতিম হয়ে ওঠে।

একদিকে সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে ভগবান করে তোলা, অন্যদিকে প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুণ্ডারের সরিয়ে আনা এই আপাত বিরোধী কাজটা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের খাদ্য তালিকায় দেখা গেছে, অতি সাধারণ ঘাসের দানা, পাঁঠার মাংস, মুরগি, দেশি মদ ছাড়াও ফুল, বেল, আমলকি, কচু, শাক, সজারু। এই উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের বাসস্থান কেমন ছিল সেই বিষয়েও মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন। মাটির দেওয়াল ও পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর নির্মাণ করতেন। দেওয়ালে চিত্র নির্মাণ করা ঘরে এরা থাকে। পরাধীন ভারতের ইংরেজদের ছত্রছায়া থেকে আদিবাসী সমাজে নিজেদের মুক্ত করতে হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত মুণ্ডারা। তীর, ধনুক, বর্ষা, বল্লম ইত্যাদি ব্যবহার করত তারা। সমগ্র উপন্যাসের বিভিন্ন প্রান্তে চূড়ান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে জোড়া দেওয়া রয়েছে বেশ কিছু Tabu বা নিষেধ। যেমন—বৃহস্পতিবার বিরসার জন্ম বলে, সেদিন জীব হত্যা নিষিদ্ধ।

অরণ্যকে একটা মানবিক চেতনায় উন্নীত করে মহাশ্বেতা দেবী বলতে চেয়েছেন, অরণ্যের আসল অধিকার এই অসহায় মানুষগুলোরই। তারা আসলে জন্মসূত্রে অরণ্যের সন্তান। অরণ্য ও আরণ্যক জনগোষ্ঠীর প্রতি দরদ থাকলে এই জাতীয় উপন্যাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায়। মূলত নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে শুনিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের প্রয়োজনমতো লোকভাষা, লোকগান ব্যবহার করেছেন। মুণ্ডা ও শবর সমাজ সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী যে ধারণা রাখতেন, সেই ধারণাকেই তিনি এখানে যথাযথ সত্যতায় তুলে ধরেছেন। ব্যধ খণ্ডের ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, "ব্যাধ জীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের অন্তরঙ্গ পরিচয়

তো তাঁর 'অভয়মঙ্গাল' পাঞ্চালীর 'ব্যাধখণ্ড' অংশেই বিধৃত।" মুকুন্দ চক্রবর্তীর আখ্যান থেকে যখন মহাশ্বেতা দেবী নতুন করে আর একটি আখ্যান নির্মাণ করতে চাইছিলেন, তখন দেশ-কাল-পরিবেশের প্রভাব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ লেখিকা বাস্তবানুগ করেই প্রতিনির্মাণ করেছেন ব্যাধখণ্ডের কাহিনি। মধ্যযুগের আখ্যানকে তিনি নামিয়ে এনেছেন ইতিহাসের মাটিতে। ফলে কালকেতু ও ফুল্লরা এই উপন্যাসে ষোড়শ শতকের এক ব্যাধ দম্পতিতে পরিণত হয়েছে। মুকুন্দ তাদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে 'জামাইদাদা' নামে। কিংবদন্তির ছলে এক পুরাকল্পিত প্রসঙ্গাও আছে এই উপন্যাসে। শবরদের কৌম জীবনকে মহাশ্বেতা দেবী মঙ্গালকাব্যের ফ্রেমে উপস্থাপন করেছেন।

'অরণ্যের অধিকার' এবং 'ব্যাধখণ্ড' এই দুটি উপন্যাস আসলে গোষ্ঠীজীবনের কথা বলেছে। নাগরিক সমাজজীবনকে মহাশ্বেতা দেবী সেই অর্থে তাঁর উপন্যাসে বিরাট বিস্তৃত ক্যানভাস রূপে তুলে আনেননি। সেই দায়িত্বও তাঁর ছিল না। কিন্তু ইতিহাস ও মিথের জগৎ থেকে মুণ্ডা ও খেরিয়া শবরদের আখ্যানকে তুলে এনে উপন্যাসের ফ্রেমে তুলে দেবার এক অনবদ্য দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। যে কারণে এই দুটি উপন্যাস মিথ ও ইতিহাসের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন-সাধনে অনন্য-আখ্যানের মর্যাদা পেয়েছে।

তথ্যের সন্ধানে

১. মহাশ্বেতা দেবী : 'পছন্দের পাঁচ', দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৪
২. দীপঙ্কর মল্লিক : 'বাংলা উপন্যাসে জনজাতি সমাজ সংস্কৃতি', দিয়া পাবলিকেশন
৩. তবু একলব্য, মহাশ্বেতা সংখ্যা, ১৩বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১৮

‘গামহারডুংরী’ : সবুজায়নের এক বিপ্লবময় আখ্যান

কাকলি মোদক

পরিবেশগত সংকট বর্তমান শতাব্দীর কাছে এক অত্যন্ত বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই অবক্ষয়ের সম্মুখীন। পরিবেশগত সংকট সৃষ্টি হয় যখন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এর কারণস্বরূপ বলা যায়—Abiotic Ecological Factor-এর অবনমন অর্থাৎ নিরন্তর তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৃক্ষছেদন, বনভূমি ধ্বংস, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের স্বল্পাধিক্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি। মানুষ যত সভ্য হয়েছে প্রকৃতি ততই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রমশ মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করেছে। যেহেতু বাস্তুতন্ত্র একাধিক আন্তর-নির্ভরশীল সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত, সেই কারণে পরিবেশের কিছু উপাদানের ভারসাম্যহীনতা বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র জীবজগতের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন বাস্তুতন্ত্রের ওপর বড়ো প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে তুষারপাতের অপ্রতুলতায় ক্রমশ সমুদ্রপৃষ্ঠের জলস্থল বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন প্রজাতির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ের বৃক্ষছেদন কিংবা বনভূমি ধ্বংসের কারণে গ্রীণ হাউস গ্যাসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে নিরন্তর বিশ্বউষ্ণায়ন, হিমবাহের গলন কিংবা সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি সমগ্র মানবজাতির কাছে গভীর সংকটের কারণ হয়ে উঠেছে। সেই কারণে আমাদের বিশ্ব পরিবেশ আজ সংকটের মুখোমুখি। সেই সংকট আমাদের সমাজ-সাহিত্য, শিক্ষাকেও প্রভাবিত করেছে। যেহেতু সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সাহিত্যে প্রাকৃতিক সংকট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগাতে পরিবেশ সংকটের বিভিন্ন চিত্র অনেক সাহিত্যিকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

বিশ শতকের এমনই এক প্রথিতযশা সাহিত্যিক হলেন বুদ্ধদেব গুহ। একাধারে সংগীতজ্ঞ ও চিত্রকলার পারদর্শী এই সাহিত্যিক উপন্যাস রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর বহু উপন্যাসের বিষয়ে হিসেবে অরণ্য প্রকৃতি ও অরণ্য সংলগ্ন মানুষের জীবন জড়িয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আহরিত জ্ঞান তাঁর উপন্যাসগুলিকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অরণ্য ও অরণ্য সংলগ্ন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর পরিচয় তিনি একজন অরণ্যপ্রেমী লেখক। বুদ্ধদেব গুহ বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার ব্যতিক্রমী লেখকদের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁর সৃজনকর্ম মূলধারার প্রেক্ষিতে অভিনব। তাঁর অন্যোন্য সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন থেকে তার সাহিত্যের ভুবন খানিকটা দূরে। ট্যাঁড়ে, বনে, অরণ্যে বাঘের গায়ের ডোরায় সেসব কাহিনি ছায়াময়। তাঁর নায়কের নাম ঋজুদা, রুরু, পৃথু। নায়িকাদের নাম টিটি, টুঁই, কুর্চি, তারা ছাপোসা মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের চৌহদ্দিতে নেই।[১]

'গামহারডুংরী'-র ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত হয় ক্লান্ত কবির ব্যাকুল আবেদন "ফিরিয়ে দাও হে অরণ্য/লও এ নগর" বর্তমান শতাব্দীর নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় বিশ্বপরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত। সৃষ্টির আদিতে স্থলভাগ ছিল অরণ্যে আচ্ছাদিত কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর এই ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রভাব অরণ্য পরিবেশে ওপর সব থেকে বেশি। বনভূমি টিকিয়ে রাখতে এবং এর সম্প্রসারণের উদ্যোগে উৎসব পালিত হচ্ছে। পরিমিত বৃক্ষছেদন ও নতুন চারা গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জনসচেতন গড়ে তোলাই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। উক্ত উপন্যাসে বর্তমান পরিস্থিতির প্রাকৃতিক সংকটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে একদল যুবকের সংগ্রামের কথা। উপন্যাসের পটভূমি ছোটোনাগপুরকেন্দ্রিক কোনো এক লালমাটির অঞ্চল। সেখানে অধিকাংশ অধিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের ভুক্ত। গ্রামের নাম গামহারডুংরী, এমন নামকরণের মূলেও রয়েছে ডুংরীর মাথায় পঁচিশটি বড়ো বড়ো গামহার গাছ। স্থানীয় মানুষেরাই অঞ্চলটিকে এই নামে চিহ্নিত করেছে। ডুংরীর এই গাছগুলো মূলত লাগিয়েছিল সেখানকার স্থানীয় মানুষেরা। বৃষ্টি যে প্রাণদায়িনী, তা গামহারডুংরীর এই হাজার হাজার গাছগুলির বেড়ে ওঠার সাক্ষী হিসেবে স্থানীয় মানুষেরা অনুভব করেছে। নিরন্তর বিশ্বউষ্ণায়ন রোধে গাছে যে একমাত্র প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারে, সে বিষয়ে বনবিভাগ সচেতন হলেও শহরের মানুষেরা গাছের ভূমিকা নিয়ে এখনও সচেতন হতে পারেনি। তাই পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ শ্লোগানে আর পোস্টারে ক্রমাগত মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস করে চলেছে। গামহারডুংরীর মানুষেরাও এই নীরব আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠেছে। তমালদার মতন মানুষেরা নিরন্তর লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের নিজের বিশ্বাসকে লালমাটির বহিরাবরণে বৃদ্ধ করে গাছের মতন প্রোথিত করেছে। তাকে নিরন্তর জল সিঞ্চন করেছে। তমালদা ও তার সঙ্গীরা গামহারডুংরীতে জনসচেতনতার পোস্টার লাগিয়ে চলেছে—"গাছ বাঁচালে বাঁচবে তুমি, /বন বাঁচালে সুখ/সবুজে সবুজ হোক/বাংলার মুখ।"[২]

উপন্যাসের সূচনা অংশেই লেখক দেখিয়েছেন, এই গামহার গাছ কাটা নিয়ে করাতলের মালিক যোগীন্দর সিং-এর সঙ্গে তমালদার দ্বন্দ্বের কথা। নিরন্তর বৃক্ষছেদনে প্রায় শূন্য হয়ে যায় বনাঞ্চল। ঠিকাদারদের 'ক্লিয়ার ফেলিং'-এর কারণে পুরো অঞ্চলটাই একসময় ন্যাড়া হয়ে গিয়েছিল। যোগীন্দর সিং খুঁটি থেকে ভাড়া করা গুন্ডা নিয়ে আসে তমালদা ও তার সঙ্গীদের ভয় দেখানোর জন্য। করাতিরা মুহূর্তের মধ্যে ৪-৫টি গাছ কেটে ফেলে। যোগীন্দর সিং-এর এই প্ররোচনায় কোনো না কোনোভাবে স্থানীয় মানুষেরাও সামিল হয়ে পড়ে। ক্ষমতাবান শ্রেণির রক্তচক্ষুর আড়ালে স্থানীয় মানুষেরাও আইনশৃঙ্খলা অমান্য করে বনবিনাশের সামিল হয়েছিল। এমনকি মুণ্ডাদের

বসতবাড়িতেও যে কটা আম কাঁঠালের গাছ ছিল তাও তাদের মেয়ের বিয়ের সময় মোটা অঙ্কের টাকার লোভ দেখিয়ে যোগীন্দর ,সিং-এর প্ররোচনায় কেটে ফেলা হয়। এই শৃঙ্খলাবিহীন বৃক্ষছেদন রুখতে সেদিন এগিয়ে আসে কিছু তরুণ হাত যারা আগলে রাখে বনাঞ্চল, তাদের মধ্যে অন্যতম হল—বাগবাজারের পাখি, সিলেটের গৈরিকা, রাঁচির সুনয়নী এবং রিদ্ধির মতন তরুণেরা। তারা তমালদার সাহচর্য্যে নিরন্তর আগলে রাখে বনাঞ্চল। উপন্যাসে আমরা দেখি, তমালদা তার সঙ্গীদের নিয়ে এই লাগামহীন বৃক্ষছেদন রুখতে ফতোয়া জারি করে—"যে একটাও গাছ কাটবে তার হাত কেটে দেবে"[৩] কোনো পুরস্কারের উদ্দেশ্য নয় কিংবা লোক দেখানো ভড়ং নয় কালোপাহাড়ের কমলদা ও গামহারডুংরীর তমালদা বিশ্বের সবুজায়নে নিজেদের নিঃস্বার্থভাবে উল্লেখ উৎসর্গ করেছেন।

যোগীন্দর সিং-এর সঙ্গে তমালদার বিরোধের অন্তর হয় যোগীন্দর সিংয়ের প্রাণের বিনিময়। গাছ কাটা যে মানুষ মারার মতোই অপরাধ তা তার রাঁচি থেকে আসা তরুণ সঙ্গীরা স্থানীয় মুণ্ডাদের বুঝিয়ে দেয়। এখন মুণ্ডারা নতুন ট্যাঁড়ে গাছ লাগায়। বনদপ্তর থেকে তাদের গাছের চারা প্রেরণ করে। তমালদা ও তার সঙ্গীরা গাছ লাগায় ও তাদের পরিচর্যা করে, যাকে বলা হয় সামাজিক বনসৃজন। তাদের এই সংগ্রামে যোগীন্দর সিং-এর হত্যার অপরাধে তমালদাকে ফেরার হতে হয়। পুলিশ তমালদাকে এরেস্ট করে নিয়ে যায়। তমালদাকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা থানা ঘেরাও করলে রাঁচি থেকে বড়ো ফোর্স আসে কিন্তু তমালদাকে তার এই কাজে পরিণতিতে ফেরার হতে হয়। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী থানার দারোগাকে জানিয়ে দেয় ওই অঞ্চল বীরসামুণ্ডার অঞ্চল। ইতিহাসের বিরসা মুণ্ডার আন্দোলন সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত। বিরসা মুণ্ডা ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেছিল স্বাধীনতার জন্য। আর তার উত্তরসূরিরা তমালদার নেতৃত্বে লড়াই করেছে মুনাফাবাজ ঠিকাদার আর অসৎ পুলিশদের সঙ্গে। তাই এও এক 'উলগুলান'। সবুজায়নের জন্য 'উলগুলান' গাছ না বাজালে যে তারা নিজেরাও বাঁচবে না এই সত্যই তারা গ্রামে গ্রামে রাতের অন্ধকারে প্রচার করেছে। মিটিং মিছিল করেছে প্রতিটা মানুষকে তারাই সবুজায়নের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। তমালদার প্রতিজ্ঞা করে গামহারডুংরীকে সবুজ করে তুলবেই নিরন্তর বৃক্ষরোপণ এবং তার পরিচর্যায় তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

বর্তমানে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিশ্বের মানুষকে প্রকৃতির এই সংকটপূর্ণ অবস্থা জন্য ভাবতে বাধ্য করেছে। ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা চেরনোবিল ফুকুসিমার দুর্ঘটনার পর বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিভিন্ন দেশ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, গড়ে উঠেছে একের পর এক এমভারমেন্ট প্রোটেকশন আইন। 'গামহারডুরী' উপন্যাসে সেই কথাই উঠে এসেছে। গামহারডুংরীর বনসৃজনকে সহায়তা করতে কানাডার মণ্ডয়ল থেকে আগত ফরাসি দম্পতি তমালদা ও তার সঙ্গীদের মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করে দেয়। বিশ্বজুড়ে এমনকী কলকাতার মানুষেরাও বনসৃজনকে যখন সামাজিক করে তুলেছে তা দেখে খুশি হয় ঋদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে পালিত হয় অরণ্য সপ্তাহ। পোস্টারে পোস্টারে বনবিভাগের কর্মীরা সেই শ্লোগান প্রচার করে। বিশ্ব পরিবেশকে সংকট থেকে রক্ষা করবার অভিপ্রায় কানাডার মন্ট্রিয়লে মন্ট্রিয়ল প্রোটকল স্বাক্ষরিত হয় যা একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসেবে বিবেচিত। মন্ট্রিয়লে প্রোটকল স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ৪৬টি। চুক্তির মূল উদ্দেশ্য করা এই চুক্তির ফলে এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে আন্টার্কটিকায় ওজোন স্তরের ক্ষত ক্রমশ হ্রাস পায়। তাই বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তোলায় তারা প্রধান ভূমিকা নেয়। মন্ট্রিয়ল থেকে আগত শুধু যে তমালদার উদ্যোগে বনসৃজনের কাজেই নয় তারা স্থানীয় মুণ্ডারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তেজনা নদীর ধারে প্রাইমারি স্কুলের

ব্যবস্থাও করেন। বিদেশি ও ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে তারা তমালদার অনুগামীরা অর্থাৎ ঋদ্ধি, রেবতী, রুবু, সুনয়নী, গৈরিকাদের মাসিক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থাও করেন। ডুংরীর নীচের ফাঁকা উপত্যকায় রুক্ষ অনাবাদি জমিতে চলে নিরন্তর বৃক্ষরোপণ রেবতী, ঋদ্ধিরা নতুন ট্যাঁড়ে গাছ লাগায় এবং ধীরে ধীরে গামহারডুংরী এক অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরে ওঠে, ঋদ্ধিরা ছ'জন মিলে গামহারডুংরীর বিভিন্ন এলাকায় চারা গাছ লাগিয়ে তাদের পরিচর্যা করে। ট্যাঁড়ের ওপরের গাছগুলি ৫৭ বছরের যত্নে বেড়ে উঠে নবীন জঙ্গালের পরিণত হয়েছে।

নিরন্তর বৃক্ষছেদনের প্রতিরোধ ও সামাজিক বনসৃজন ব্যতীত জনসচেতনা গড়ে তোলার বিষয়টি উপন্যাসে নিপুণভাবে বর্ণিত। ক্রমাগত বিশ্বউষ্ণায়নের আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে আষাঢ় মাস কেও ভাদ্র মাসের মতোন মনে হয় গামহারডুংরীর মানুষদের। রেবতীর সঙ্গো কাকাবাবুর কথোপকথনে ইকোলজির বর্তমান পরিস্থিতির কথা উঠে আসে বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিতে—

> ইকোলজির এমন সর্বনাশ তো আগে হয়নি কখনো হিমবাহ গলে যাচ্ছে, অমরনাথের শিবলিঙ্গা গলে যাচ্ছে, চারিদিকে বন্যা ভূমিকম্প। আমার পিসি কানাডার মন্টিল থেকে কলকাতাতে লিখেছেন, এবছর সেখানে নাকি ৪০ ডিগ্রী গরম। অভাবনীয় এর সবই আমাদেরই কৃতকর্মের ফল।[৪]

প্রবল বিশ্বউষ্ণায়নের জেরে নিরন্তর হিমবাহের গলন এবং সমুদ্রের জল বৃদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে একাধিক গবেষণা চলছে চারিদিকে বন্যা ভূমিকম্প উষ্ণতা বৃদ্ধি সবকিছুই মনুষ্যসৃষ্ট অপকর্মেরই ফল। মানবজাতির আধুনিক থেকে আধুনিকতর হওয়ার অভিপ্রায়ই আজ বিশ্বকে সংকটের মুখে এগিয়ে দিয়েছে।

উপন্যাসে কাকাবাবুর বয়ানে ইকোলজি সংক্রান্ত একাধিক বিষয়, রুবু কিংবা ঋদ্ধির মতোই পাঠককেও সচেতন করে তোলে। বর্তমানে 'ইকোলজি' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। ১৮৬৯ সালে বিজ্ঞানী হ্যাকেল সর্বপ্রথম 'ইকোলজি' শব্দটির ব্যবহার করেন। এটি একটি গ্রিক শব্দ, অর্থাৎ এটি দুটি গ্রিক শব্দের গাটছড়া। OIKOS অর্থে বাড়ি বা বাস্তু এবং OLOGY অর্থে STUDY বিজ্ঞানী হ্যাকেল বলেছেন—"The investigation of the total relations of the animal in its organic and inorganic environment."[৫] পরবর্তীকালে অবশ্য ড. পবিত্র সরকার তাদের দু'টি প্রতিশব্দ বাস্তুসংস্থান ও যৌথ বসবাস নীতিকে আভিধানিক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন যা নির্ভর করে পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদান ও জীবজগতের একত্র অবস্থানের ওপর। পরিবেশগত সংকট তখনই হয়, যখন একটি প্রজাতি বা জনসংখ্যার পরিবর্তন তার অব্যাহত বেঁচে থাকাকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এর প্রধান কারণ, বৃক্ষছেদন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। গ্রীণ হাউস গ্যাসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশের এই নিদারুণ সংকটে বৃক্ষরোপণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নেই একথা উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। এমনকী সংকট শব্দটি ও বর্তমান শতাব্দীতে মনুষ্য সৃষ্ট কারণগুলির ওপর নির্ভর করেই ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় যে ত্যাজনা নদী বালির জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু সেই নদীতে ঠিকাদারেরা বছরের পর বছর নদীগর্ভ খুঁড়ে বালি ভরে ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে গেছে শহরে বহুতল নির্মাণের কাজে। এছাড়াও গরমের দিনে নদীর বুকময় ছড়ানো অজস্র পাথর ডিনামাইট দিয়ে টুকরো টুকরো করে মানুষেরা ব্যবহার করেছে। মুণ্ডারি ভাষায় মানুষের লোভী হল 'খম্বুরু জুম্বুরি'। তাই ঔপন্যাসিক লিখেছেন প্রকৃতিকে এভাবে ধ্বংস করার শাস্তি তাকে পেতেই হবে সব গাছ কেটে ফেলা, নদীর বুক থেকে পাথর তুলে তাকে রিক্ত করা, এইসবের শোধ প্রকৃতি একদিন নেবেই কাকাবাবুর বয়ানে—"আমাদের প্রকৃতিকে এইভাবে ধর্ষণ করার শাস্তি তাকে পেতেই হবে,

সব কাজ কেটে ফেলা নদীর বুক থেকে পাথর তুলে তাকে রিক্ত করা এসব শোধ প্রকৃতিতে একদিন নেবেই।"[৬] গামহারডুংরীর এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাকৃতিক সংকটের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। উপন্যাসের মূল ঘটনা প্রাকৃতিক সংকটকে কেন্দ্র করে কাকাবাবুর কাহিনি সম্পৃক্ত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় তমালদা ও তার তরুণ বাহিনীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গামহারডুংরীর সবুজ হয়ে ওঠে। ত্যজনা নদীর স্বচ্ছ জলে পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিফলন যেন সমগ্র পরিবেশকে কোনো এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মোহময়ী করে তোলে। কাকাবাবু নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও উপন্যাসটিকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। তার প্রিয় কাকাবাবুকে খুঁজতে খুঁজতে তার উপলব্ধি ঘটে এক গভীর সত্যের—"এই প্রকৃতির মধ্যে প্রাণীর আসা-যাওয়া সব রহস্যের কথা প্রকৃতি জানে। তিনি এইসব প্রাণ জাগান, ঘুম পাড়ান তিনি। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অদৃশ্য থেকে চালিত করেন। তার এই লীলা না যায় দেখা না যায় বোঝা।"[৭] শেষপর্যন্ত কাকাবাবু অনন্ত প্রকৃতির কোলেই তার পরম আশ্রয় খুঁজে পায়। ত্যাজনা নদীর পাড়ে শেষবেলায় কাকাবাবুর অনন্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মানুষ যত উন্নততর হয়েছে ততই তাদের ক্রিয়া-কলাপ প্রকৃতিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। যে আবিষ্কার মানুষের নাগরিক জীবনকে অতি সুখকর করে তোলে। তাতে হয়তো পরোক্ষভাবে অসুখের মাত্রাই বেশি যেখানে মাতৃতুল্য প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত সেই উন্নতির কোনো সাম্য নেই। উপন্যাসের প্রথমে লেখকের বয়ানে তাই আক্ষেপ স্পষ্ট—"শহরের মানুষের কাছে গাছের ভূমিকা সম্ভবত এখনো স্পষ্ট নয়, গাছের ভূমিকা সম্বন্ধে ওরা হয়তো অবহিত হবেন এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর।"[৮]

এই শহরে স্বার্থপর মানুষদের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন তমালদা কিংবা ওদের মতন মানুষজন গামহারডুংরীর মতন একটি ছোট্ট গ্রামে যারা জনসচেতনতা জাগাতে নিজেদের প্রাণকে সংশয়ের মুখে ঠেলে দিতেও পিছপা হননি। যারা প্রিন্ট মিডিয়া কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারের উদ্দেশ্যে নয় কিংবা রাতারাতি ঈশ্বর-ঈশ্বরী হয়ে ওঠার সংকল্পে নয়, তারা বিশ্বের সংকটের সময় দেশকে বাঁচানোর মতন সংকল্প নিয়ে নিজেদের প্রাণ এমন করে নিঃশেষ করে নিবেদন করছেন। না, ঋদ্ধির মতো ছেলেমেয়েরা অর্থ উপার্জনের বিলাসবহুল জীবন কাটানোকে জীবনের মূল মন্ত্র বলে মেনে নেয়নি, তারা উপলব্ধি করেছে প্রকৃত সত্যের। তারা এই নীরব আন্দোলনে শরিক। লেখকের উপলব্ধিতে—"শুধু প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস নেওয়াটাই তো বেঁচে থাকা নয়, বেঁচে থাকা মানে তার চেয়ে বড় কিছু। অথচ এই মূল সত্য নিয়ে ক'জনেরই মাথাব্যথা আছে।"[৯]

উৎসের সন্ধানে

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, নিবন্ধন
২. বুদ্ধদেব গুহ : 'গামহারডুংরী', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৭২, পৃ. ২৪
৩. তদেব : পৃ. ২৫
৪. তদেব : পৃ. ২৬
৫. তদেব : পৃ. ৬৪
৬. তদেব : পৃ. ৬৪
৭. তদেব : পৃ. ১৭২
৮. তদেব : পৃ. ৯
৯. তদেব : পৃ. ১১

শোক থেকে শ্লোক : হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি'

অভি দাস

বাংলা কথাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সময়কাল হল ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ। এই সময় দাঁড়িয়ে বহু সাহিত্যিকের লেখা আমরা পেয়েছি। কথাসাহিত্য বলতে মূলত উপন্যাস, ছোটোগল্প বোঝানো হয়। এই সময় বহু উপন্যাস, ছোটোগল্পের মধ্যে আমরা ওই অগ্নিগর্ভকালের কথা জানতে পারি। আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়। কান্নায় ভেঙে পড়ি। শোক-তাপ বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে। কিন্তু আমাদের মরমী লেখক হাসান আজিজুল হক কিন্তু ওই সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এই 'আগুন পাখি' উপন্যাস রচনা করেননি। তিনি ওই সময়ের প্রেক্ষাপট অবলম্বন করে লিখলেন এই উপন্যাস। উপন্যাসটির অর্ধেক অংশ প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে 'প্রথম আলো' ঈদ সংখ্যায় 'অপ-রূপকথা' নামে। তারপর ২০০৬ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

লেখকের জন্মভিটা হল বর্ধমান জেলা। তিনি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন বর্ধমানে আমার যে ফেলে আসা বসতবাড়ি, শৈশব-তারুণ্যের স্মৃতি, পারিবারিক-সাংসারিক চালচিত্র, রাঢ়ের গ্রাম্য মুসলমান গৃহস্থ পরিবারের উত্থান-পতন, মা-বাবার কথা, দেশভাগের নির্মমতা, সাধারণ মানুষের ওপর এর অভিঘাত এই সবকিছু প্রেক্ষাপটে রেখে একটি উপন্যাস আমার লেখা উচিত। এভাবেই 'আগুন পাখি' লেখার শুরু। তবে এর আগে একটা গল্প লিখেছিলাম, 'একটি নির্জলা কথা' নামে। ছাপা হয়েছিল প্রথম আলোতে, সেখানে এর কাহিনির বীজ সুপ্ত ছিল; তবে পুরোটা নয়।

'আগুন পাখি' উপন্যাসের প্রধান যে চরিত্র তা হল মেজ বউ। একজন নারীর বয়ানে উপন্যাসটি অগ্রগতি লাভ করেছে। উপন্যাসের একপ্রান্ত থেকে আরেক

প্রান্তে ধ্বনিত হয়েছে নারী কণ্ঠের আওয়াজ। পুরো উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে মূলত উত্তম পুরুষে। আর যে ভাষা তা হল রাঢ়বঙ্গের। ভাষার নিরিখে 'আগুন পাখি' উপন্যাসটি যেমন জ্বলজ্বল করবে পাঠক সমাজে। আবেগ-মানবতা-প্রীতি-ভালোবাসো-শোক-শ্লোক ইত্যাদি যেন আজিজুলের এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটি হল একটি 'আত্মসমীক্ষণ মূলক উপন্যাস'। যে আত্মসমীক্ষণের মধ্যে রয়েছে হাসি-ঠাট্টা, দুঃখ-যন্ত্রনা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, বিভেদ-মৃত্যু। উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে একটি একান্নবর্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়ে। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম হল "ভাই কাঁকালে পুঁটুলি হলো"। আর শেষ পরিচ্ছেদের নাম হল "আর কেউ নাই, এইবার আমি একা"। আমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে কী এমন ঘটল যে একটি একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি মূলত চেষ্টা করব লেখকের রূপক অলংকারের দ্বারা ভূষিত 'আগুন পাখি'কে সমালোচনা করে দেখানোর।

উপন্যাসের কথক চরিত্র অর্থাৎ মেজো বউ একটি রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারের মেয়ে এবং একান্নবর্তী পরিবারের বউ। তার স্বামীরা পাঁচ ভাই, সঙ্গে তাদের স্ত্রী-সন্তান এবং একটি বিধবা বোন নিয়ে তার পরিবার। তার জীবনটা মূলত ওই অন্দরমহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, উপন্যাসের প্রথম দিকে লেখক দেখালেও উপন্যাস যত এগিয়েছে তার সেই জীবন আস্তে আস্তে ভেঙে অগ্রগতি লাভ করেছে। স্বামীর কাছ থেকেই তার অক্ষর পরিচয়। কারণ তার স্বামী মনে করতেন আলো আর অন্ধকারে যেমন তফাৎ অক্ষর জানা আর না জানার মধ্যেও তেমন তফাৎ। শ্বশুর বাড়িতে এসে পরিবার পরিজনের সঙ্গে মিলে সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে তার একটি সন্তান হল। কিন্তু সন্তান তার নাড়ি ছেঁড়া ধন অপেক্ষা বংশপ্রদীপ হিসেবে চর্চিত হল বেশি। স্বামী সংসার নিয়ে তার খুব অহংকার হল। প্রথম সন্তান হওয়ায় পরিবারে তার আদর আপ্যায়ন বেড়ে গেল। মুখে মুখে প্রচার হতে লাগল মেজো বউ এর কল্যাণে বাড়ির সুখ সমৃদ্ধি বাড়ছে। এরপর ছেলে বড়ো হয়ে উঠল। পড়াশোনার জন্যে ছেলেকে শহরে পাঠানো হল। হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল মধুর। ভেদাভেদ—রেষারেষি কিছুই ছিল না। উপন্যাস পড়তে শুরু করলে আমার একটি কবিতার কথা মনে পড়ে যাই, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের—"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।" ঠিক এই সময়ের পর থেকে শুরু হচ্ছে দাঙ্গার উপক্রম। ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসা হল। ছেলের রোগ ধরা পড়ল "সন্নিপাতিক জ্বর"। ছেলেকে শত চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না। ঠিক এমন সময় আমাদের মনে পড়ে যায় মায়ের মরমী হৃদয়ের আকুতি। যেমন আমরা দেখেছে মধ্যযুগের মনসামঙ্গাল কাব্যে লখিন্দরের মৃত্যুতে মা সনকার ক্রন্দন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে একাধিক মৃত্যুর পদধ্বনী। সাহিত্যে মৃত্যু মর্মান্তিক, এখান থেকে হাসান আজিজুল হক ও সরে আসেননি কিন্তু দ্রষ্টব্যের বিষয় হল আমরা পুরাণে যেমন দেখেছি শোক থেকে জন্ম নেয় শ্লোক ঠিক এখানেও তেমন— "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ/তয় কৌঞ্চমিথুনাদেবকমবধীঃ কামমোহিতম"

কিংবা ইংরেজিতে—

You will find no rest for the long years of eternity
For you killed a bird in love and unsuspecting

নিহত পাখির শোক থেকে শ্লোকের জন্ম, উৎসারিত বাক্যই হল শ্লোক। কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম ঠিক তেমনি একটি ঘটনা। বড়ো ছেলের মৃত্যুতে শোকাতুরা মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে শোক থেকে জন্ম নেওয়া শ্লোক। ধীরে ধীরে মেজ বউ এর মুখ থেকে প্রশ্ন আসছে। সে ভাবছে। আত্মবলে বলীয়ান হচ্ছে। সে বুঝছে, দেখছে, শুনছে, ভাবছে।

অন্দরমহল থেকে সেই মেজ বউ বেরিয়ে আসছে। এবং ফিনিক্স পাখির মতো ডানা মেলে ধরেছে আকাশে। উত্তপ্ত-উবিগ্ন সময়ে মেজো বউ এর এই প্রশ্নগুলো আমাদের মনকে নাড়া দেয়। নজরুলের কবিতা চাপা পড়ে যাচ্ছে শুরু হচ্ছে হানাহানি-রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। হিন্দু- মুসলমান উভয়ের সম্পর্কে ছেদ পড়ছে। কিছু রাজনৈতিক দলের নেতা বারবার বলে দিয়ে যাচ্ছে হিন্দু-মুসলমান এক নয়। তারা আলাদা। হিন্দুরা মুসলমানের শত্রু আর মুসলমানরা হিন্দুদের শত্রু। রাজনীতির নানা মানুষের চক্রান্তে শুরু হয়েছে দেশজুড়ে ভেদাভেদ। লেখক লিখেছেন—"মোসলমানদের লেগে একটো আলেদা দ্যাশ করার বন্দোবস্ত হচে।"

শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে, ফজলুল হক, জিন্না, নেহেরু, গান্ধী, নাজিমুদ্দিন, লেয়াকত আলি, সোরাবর্দী প্রমুখের হিন্দু নেতা আর মুসলমান নেতাদের প্ররোচনায় দেশভাগ হওয়ার উপক্রম। শোনা যাচ্ছে হুংকার—"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" লেখক খুব সুচারুভাবে সময়টাকে ধরার চেষ্টা করেছেন, এবং ছবিটা আঁকছেন এভাবে—"দিন আর রেতের মতুন হিঁদু-মোসলমানও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেয়েছে।" আমরা যাঁরা এই উপন্যাসটি পাঠ করেছি বা করব তাঁরা খুব সহজেই দেখতে পারি যে মেজো বউ বা মেতর বউয়ের কথা উল্লিখিত আলোচ্য উপন্যাসে সেই মেজ বউ ছিল উপন্যাসের কথায় অশিক্ষিত বোধ বুদ্ধিহীন। সে যেটুকু লেখাপড়া শিখেছিল তাও তার স্বামীর দৌলতে। প্রথমদিকে উপন্যাসটি মেজ বউ সম্পর্কে যে ছবি মনে এঁকে দেয়, সেই ছবি কিন্তু আমরা শেষমেশ পাই না। তুলির টানে যে ছবিটা আঁকা হয়েছিল আমাদের মনে সেই ছবিটির উপর যেন কেউ এক কাপ কালি ঢেলে দিয়ে ছবিটাকে হিজিবিজি করে দিয়ে যায় ঠিক তেমনি একটা ঘরোয়া সুন্দর চিত্রকে সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক প্রতিবাদিনী কিংবা আরও সহজ করে বলতে গেলে নেত্রী করে তুলেছেন।

যে মেজ বউ চার দেওয়ালের গন্ডিতে আটক ছিলেন, বড়ো ছেলের মৃত্যুতে সেই মানুষটি হয়ে উঠছে ডানা ঝাপটানো ফিনিক্স পাখির মতো। কিন্তু এখানে ছেলের মৃত্যুতে মায়ের শোকে ভেঙে পড়ার অবস্থা যতটা দেখানো হয়েছে তার থেকে বেশি দেখানো হয়েছে মায়ের প্রতিবাদী রূপটি। পুরুষশাসিত সমাজে, যে নারীরা ছিল পদানত; তাদের কাছে সংসার ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। সেই সংসার তথা সেই দেশ যখন কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তখন সেই মেজ বউয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে মন্ত্র আমরা মন্ত্র বলতে বুঝি যা তা হল আমাদের মননের উৎস থেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত, উপন্যাসেও তদনুরূপ। উপন্যাসটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে বোঝা যাবে যে মেজো বউ যে কথাগুলি বলেছে বা মেজো বউয়ের মুখনিঃসৃত বাণী তা যেন মন্ত্রস্বরূপ। আর এই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে শোক থেকে; যে শোক সে পেয়েছে বড়ো ছেলের মৃত্যুতে এবং শোকের ফলশ্রুতিতে শ্লোকের জন্ম। আমরা উপন্যাসে দেখব কথক মেজ বউ বলছে—"কলকেতার রাস্তায় ডেরেন দিয়ে কলকল করে মানুষের রক্ত বয়ে যেছে। মোসলমানের রক্ত, হিঁদুর রক্ত ঐ ডেরেনে হিঁদু-মোসলমান এক।"

"যা ভয় করছিলাম তা-ই হলো, ই সান্নিপাতিক জ্বর" এই অংশের শেষ দিকে বড়ো ছেলের মৃত্যুর চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে এভাবে—"আমার কোলে ছিল মাথা, শুদু দেখলম, কাত হয়ে কোল থেকে গড়িয়ে পড়ল। ঐ শেষ। খোঁকা চলে গেল! সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল বাড়িতে।"

ঠিক এই অংশ পর্যন্ত একটা রূপ। আর এই অংশের পর থেকে আরেকটি রূপ। অর্থাৎ আমার শিরোনামের সঙ্গে সাযুজ্য বিধানে পরবর্তী অংশটিই প্রাধান্য পাবে। উপন্যাস এরপর থেকে পেয়েছে গতি। উপন্যাস যত এগিয়েছে মেজো বউয়ের বয়ান হয়েছে তত তীক্ষ্ণ। উপন্যাসের শেষদিকে মেজ বউ বলছে—"ওটো মোসলমানদের দ্যাশ আর এটো হিঁদুদের দ্যাশ ই-কথা বলে আমার কাছে আর পার পাবে না।" এতদিন যে মেজো বউ নিজের একটা আমিত্ব আছে সেটা বুঝত না। কিন্তু শেষে আমিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সন্ধেবেলা হিন্দু পাড়ার শঙ্খধ্বনি আর মুসলমান পাড়ার আজানের শব্দে যেন মিলে গেছে মেজ বউয়ের রব। মেজ বউ বলছে—"একই দ্যাশ, একইরকম মানুষ, একইরকম কথা শুদু ধম্মো আলাদাই কুনোদিন হয় ইদিকে একটি আমগাছ একটি তালগাছ, উদিকেও তেমনি একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল।"

আবার যে কখনো স্বামীর মুখের উপর কথা বলেনি কোনোদিন, সেই স্বামীর ব্যাপারে বলেছে—"আমি আর আমার সোয়ামী তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন/ মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।" উপন্যাসের শেষে মেজ বউ বলছে 'একা'। এই কথাটির মাধ্যমে একটি বাণী দিলেন মরমী লেখক। যে মেজ বউ একান্নবর্তী সংসার নিয়ে ছিল, সে আজ একা। অর্থাৎ এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গর্জিয়ে ওঠা নারীর পাশে কেউ থাকে না, থাকেনি। যে নারীর চিত্র লেখক তুলেছেন সেই নারী অর্থাৎ মেজ বউ না জানে রাজনীতি, না জানে ভেদাভেদ। কিন্তু সেই রাজনৈতিক বাতাবরণে পিষ্ট হয়ে, তেজ দিয়ে ধর্ম ও মানুষের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এবং সেই দেশ-কাল-সমাজের নিরিখে হানাহানির তীব্রতায় যেন মনে করিয়েছে—"তোমরাই হলে বিভেদকারীর দল,/লড়াইকারী দাঙ্গাকারী কালপীটের দল/যারা কিনা শুধু ধর্ম দেখে বিচার করে,/মানুষ দেখে নয়।।" (তামিমা মল্লিক : প্রতিবাদী নারী)

ফলে ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি' উপন্যাস একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস। আমাদের ভাবতে হয় যে এইরকম একটি চরিত্রের কথা যা লেখকের কলমে পেয়েছে প্রাণ। উপন্যাসটিকে যদি আমরা দুটি পর্বে ভাগ করি, তাহলে দেখব—

শোক পূর্ববর্তী মেজ বউ
শোক পরবর্তী মেজ বউ

শোক পূর্ববর্তী মেজ বউ হল আটপৌরে জীবনে অভ্যস্ত একজন একান্নবর্তী পরিবারের গৃহবধূ। যে কিনা পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা অবনমিত। আর একটি অংশে লেখক শোকপরবর্তী মেজো বউ আর্থাৎ বড়ো ছেলের মৃত্যুকে ঘিরে তার যে আর্তনাদ তা যেন দেশ কাল সীমানার গণ্ডিকে অতিক্রম করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উচ্চারিত শোকাতুর রব থেকে জন্ম নিয়েছে শ্লোক এবং যে শ্লোক মেজ বউয়ের বয়ানে আমরা দেখেছি।

তথ্যের সন্ধানে

১. হাসান আজিজুল হক : 'আগুন পাখি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

শৈবাল মিত্রের ‘গোরা’ ও চৈতন্যজীবনী’র গোরা

সৌমিলি দেবনাথ

শৈবাল মিত্রের ‘গোরা’ উপন্যাসটি একবিংশ শতাব্দীতে কথাসাহিত্যের মাধ্যমে চৈতন্যজীবনীর পুনর্নির্মাণ। শুধু চৈতন্যজীবনীই নয়, চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্ব আর সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকেও শৈবাল মিত্র যতটা সম্ভব এই উপন্যাসে নতুনভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অভিজিৎ সেন-এর ‘রাজপাট ধর্মপাট’ উপন্যাসটিতে চৈতন্যদেবের জীবনের একটি বিশেষ পর্ব থেকে গল্প শুরু হয়েছে। গৌড়ের সুলতান তাঁকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করেছিলেন। এই উপন্যাসে সে কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু ‘গোরা’ উপন্যাসে শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবনকেই একুশ শতকের একদা অতি বামপন্থায় বিশ্বাসী একজন কথাসাহিত্যিক তাঁর নিজের মূল্যায়নে ধরতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যের জীবনের ঘটনা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়নি। এতে আছে গল্পের ভিতরে গল্প। সেই ভিতরের গল্পটিই চৈতন্যবীক্ষণ। কিন্তু বাইরের গল্পের সঙ্গে বলাবাহুল্য তার সংযোগও নিবিড়।

উপন্যাসের আরম্ভেই উচ্চবিত্ত সমাজের উজ্জ্বল তরুণ-তরুণীর আনন্দযাপনের ছবি। তাদেরই একজন গোরা বা স্বয়ম্ভর রায়। ‘মন্ত্র’ থেকে আমোদ-প্রমোদের শেষে মধ্য যামিনীর পর বন্ধু বৈভবের বাইকে করে সে বাড়ি ফেরে। কিন্তু এই উদ্দাম গোরার মধ্যে আছে আর একটি সত্তা, সে উচ্চাঙ্গ সংগীত ভালোবাসে। তার দাপুটে আইনজীবী বাবা কেজরিওয়াল-এর মতো খুনিকে বাঁচিয়েছেন। তারই সম্বর্ধনার পার্টিতে মা গোরাকে যাওয়ার অনুরোধ করলে তীব্র ঘৃণায় ক্রুদ্ধ গোরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। গোরার কাকা নভোবিজ্ঞানী ত্রিদিবনাথ চৈতন্যদেবের জীবন নিয়ে একটি টিভি সিরিয়াল তৈরি করেন। সেই সিরিয়ালের নাম গোরা। সিরিয়ালের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য বাঙালি জাতির প্রথম নবজাগরণের অধিনেতা।

এই গোরা এপিসোড তৈরির কাহিনিটিই কাকা ত্রিদিবনাথ তাঁর ভাইপো গোরাকে বলেন। গোরা বা চৈতন্যকে নিয়ে টিভি সিরিয়াল তৈরির যৌক্তিকতা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন— "ভক্তের চোখে চৈতন্য আর ইতিহাসের চৈতন্য-চৈতন্যজীবনের দু'রকম ব্যাখ্যার গভীরে যে অজানা চৈতন্য, যাঁকে বৈষ্ণবভক্তরা দেখেনি ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে গেছে দু'তরফের বিবরণের মাঝখানে যে অন্তর্মিল, অচেনা চৈতন্য তাঁকেই আমি খোঁজ করেছি।" এই এপিসোডের গল্প বলার সূত্রেই চৈতন্যজীবনী বলা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে শৈবাল মিত্র মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আভাস মাত্র নিয়ে একটি দুঃসাহসিক পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন চৈতন্যের জন্মকে কেন্দ্র করে। এই ঘটনায় বলা হয়েছে যে, মৃত বৎস্যা জননী শচীদেবী একদা শ্রীহট্টে গিয়ে বুরহানউদ্দিনের মাজারে সন্তানের দীর্ঘ জীবন কামনায় ধরনা দিয়েছিলেন এবং সেই মাজারের যিনি মুজাভির, তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর স্ত্রী, ছেলে আর অপূর্ব রূপসী দিনেমার স্ত্রীলোক। শচী এই ধর্নার সময়েই সন্তানসম্ভবা হন। অর্থাৎ শৈবাল বলতে চেয়েছেন, গোরা বা নিমাই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নয়। সদ্য কৈশোরে দুরন্ত নিমাই পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পৈতে ছিঁড়ে দিলে ক্রুদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র বলেছেন—

> এ ছেলে আমার নয়, ব্রাহ্মণের রক্ত নেই এর শরীরে। আমাদের কুলভ্রষ্ট করে দেবে ও। যবন আর পাষন্ডিদের চেয়েও সাংঘাতিক। প্রতিলোমজাত সন্তানের অধম এই ছেলে যেন কোনওভাবে আমার পারলৌকিক কাজে অংশ না নেয়।[১]

শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ সৌন্দর্য, দীর্ঘ এবং অতিবিস্তৃত অবয়ব, আজানুলম্বিত বাহু, অত্যধিক উজ্জ্বল গৌরবর্ণই হয়তো বা শৈবালকে এই ধরনের কাহিনির পুনর্গঠনে প্ররোচিত করেছে। নিমাই মাতৃগর্ভে ১৩ মাস পর্যন্ত ছিলেন। শৈবাল এই প্রসঙ্গটিকে গ্রহণ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি কাল্পনিক নয়, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ জন্মানোর আগে নিমাইয়ের ১৩ মাস গর্ভবাসের কথা বলা হয়েছে।

উপন্যাসে 'গোরা'-র জন্মমুহূর্তকে বর্ণনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন যে, নিমাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে আকাশে আস্ত চাঁদ জেগে উঠেছিল, শুরু হয়েছিল ঘন কালো মেঘের আনাগোনা। দুর্ভিক্ষ ও খরাগ্রস্ত বাংলাদেশে তারপর মাঠঘাট ভাসিয়ে বৃষ্টি নেমেছিল। এই প্রসঙ্গটি একেবারেই বলাবাহুল্য বৃন্দাবন দাসের চৈতনভাগবত'-এর তৃতীয় অধ্যায় থেকে নেওয়া এবং এইজন্যই যে তাঁর বিশ্বম্ভর নাম, সেটিও বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

> এ শিশু জন্মিলে মাস সর্ব দেশে দেশে।/দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে।।/জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।/পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে।।/অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।

গঙ্গার ঘাটে বালক গোরার যে অত্যাচারের বর্ণনা শৈবাল মিত্র তাঁর উপন্যাসে দিয়েছেন, তাও একেবারে বৃন্দাবন দাসের 'আদিখণ্ড' থেকেই নেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ কাজীদলনের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তার আগে থেকেই শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপের কৃষ্ণনাম সংকীর্তন শুরু করেছিলেন এবং এই সংকীর্তনে নিষেধাজ্ঞা এলে বিপুল সংকীর্তনবাহিনী নিয়ে তিনি কাজীর বাসস্থানে যান। এমনকী কাজীর ঘরবাড়ি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেবার উপক্রম করেন। নিত্যানন্দের নিষেধে তিনি সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত হন। কিন্তু এটা ঠিক যে, শ্রীচৈতন্যের এই নামসংকীর্তন মধ্যযুগের বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কৃষ্ণভক্ত এই একটি মাত্র পরিচয়ে হাজার হাজার মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একত্র হয়েছিল। শৈবাল মিত্র তাঁর উপন্যাসে

সংকীর্তনের এই মহিমাকে খুবই চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে রূপকথার বাঁশিবাদকের মতো সাংগীতিক গণঅভ্যুত্থান যে ঘটিয়েছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল স্ত্রী-পুরুষের প্রেমকে যাবতীয় সম্পর্কের 'মডেল' হিসেবে। জলে-স্থলে, পাহাড়ে, অরণ্যে, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গে এমনকী রাস্তার ধূলিকণায় প্রেমের বাঁশি বাজতে শুনেছিল সে।[২]

শ্রীচৈতন্যদেব নিজেও যে ভালো নাচতে পারতেন, গান করতে পারতেন এবং অভিনয় করতে পারতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃ'তে', অন্যান্য মধ্যযুগীয় চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ আছে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে 'রুক্মিণীহরণ' নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন। এছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর দানলীলা ও নৌকালীলা নিয়ে অভিনয় প্রসঙ্গ 'চৈতন্যভাগবতে'ই পাওয়া যায়। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলায় জানিয়েছেন যে, চৈতন্যদেব নীলাচলে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের পদাবলী নিজে গান করতেন। আবার অন্যের কণ্ঠ থেকেও শ্রবণ করতেন। এই তথ্যগুলি মনে রেখে শৈবাল মিত্র তাঁর গোরা চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন—

> গোরা ছিল প্রধানত ভালো নর্তক, গায়ক, অভিনেতা। তখন 'কানু ছাড়া গীত' না থাকার জন্যে সে কৃষ্ণলীলার নানা গান, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, মান, অভিমান, মিলনের গান গাইত। তার কাছে কৃষ্ণ তখন ছিল সুর আর গানের প্রতীক, যাত্রাপালার নায়ক দুঃশাসক সুলতানদের ভয় দেখানোর মাধ্যম।[৩]

শ্রীচৈতন্যদেব যে অলৌকিক ঈশ্বর নন, রক্তমাংসেরই এক অসাধারণ প্রভাবশালী মানুষ, শৈবাল মিত্র মধ্যযুগের বাংলা চৈতন্যজীবনী সাহিত্য থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে সেই বিষয়টিকে নতুনভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে তিনি বলেছেন স্নায়ু বিশারদ অলিভার স্যাকস-এর কথা। এই অলিভার স্যাকস-এর একটি গ্রন্থের নাম—'সিউজিকো ফিলিয়াটেলস অফ মিউজিক অ্যান্ড দি ব্রেন'। এই বইতে তিনি বলেছেন সুর, সংগীত ও নৃত্য মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানুষকে তার অতিন্দ্রিয় প্রভাবে আবিষ্ট করে। মানুষ আত্মপরিচয় ভুলে যায় এবং সে নিজেকে ঈশ্বর ভাবতে শুরু করে। আর সেই উচ্চতায় পৌঁছেও যায়। এইভাবে শৈবাল মিত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, চৈতন্যের ব্যাপারে সবটাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যুক্তিসহও বটে। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে, শৈবাল মিত্র তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে চৈতন্যদেবকে একজন Perfect Personality হিসেবে একবিংশ শতকের পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন। মধ্যযুগের চৈতন্যদেব ছিলেন অলৌকিকতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। লেখক এখানেই পার্থক্য করেছেন যে, তিনি একজন আমাদের মতো সাধারণ মানুষ হয়েও অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। চৈতন্যদেব যে পজিটিভ চিন্তাভাবনার দ্বারা সাধারণ মানুষকে জীবনের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত করেছিলেন, সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই প্রতিষ্ঠা করেন ঔপন্যাসিক।

শৈবাল মিত্রের উপন্যাসে ইতিহাসের প্রসঙ্গ মাঝেমাঝে বিস্তৃতভাবে এসেছে। মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনীগুলিতেও ইতিহাস প্রসঙ্গ আছে, তবে তা একেবারে নির্বাচিত। শৈবাল মিত্র

চৈতন্যজীবনের ঘটনাগুলির বর্ণনায় মধ্যযুগের জীবনীকাব্যকে অনুসরণ করলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনায় ইতিহাস গ্রন্থ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন—হোসেন শাহ-র রামচন্দ্র খান-কে ধর্মান্তরিত করার নিষ্ঠুর ঘটনা, কামতাপুর কামরূপের খান বংশীয় রাজা নীলাম্বরকে অন্যায় ভাবে পরাজিত করার কাহিনি মুকুন্দ দাস (হোসেন শাহের বৈদ্য)-এর মুখ দিয়ে বলিয়ে দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ঔপন্যাসিক গোরার সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ অবধূত নিত্যানন্দের সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হলেও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় সেভাবে নেই। কিন্তু শৈবাল মিত্র তাঁর উপন্যাসে নিত্যানন্দের ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সারা ভারতের যুদ্ধ উন্মত্ত অস্থির রাজনৈতিক আবর্তের পরিচয় রেখেছেন। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যজীবনীর আদিখন্ডে সমকালীন ধর্মীয় উৎসব ও আমোদ-প্রমোদ হিসেবে মনসাপূজা, চণ্ডীপূজা, যক্ষপূজার কথা বলেছেন। মঙ্গলকাব্য যে গাওয়া হতো তারও প্রমাণ আছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ- 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে'। শৈবাল মিত্র এর সাথে যুক্ত করেছেন 'শবর' উৎসবের মতো লোক-উৎসবকে। বিনোদনের এই সমস্ত মাধ্যমগুলি শৈবাল মিত্রের মতে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর উচ্চস্তরে মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে অমার্জিত বিনোদনগুলির হাত থেকে নবদ্বীপবাসীকে উদ্ধার করলেন। অর্থাৎ নাট্যচর্চাকারী চৈতন্যদেবকেও শৈবাল গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে তথ্যও কিন্তু তিনি মূলত বৃন্দাবন দাসের কাব্য থেকে সংগ্রহ করেছেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ আদিখন্ড ও মধ্যখন্ডের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হল গোরা-গদাধর সম্পর্ক। নবদ্বীপের নাট্যাভিনয়ের সময়ে নিমাই বিষ্ণু বা কৃষ্ণ হলে গদাধর অভিনয় করতেন রুক্মিণী বা লক্ষ্মীর ভূমিকায়। এই সম্পর্কটিকেও শৈবাল মিত্র তাঁর উপন্যাসে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি এর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের গোরা-বিনয়ের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস বা দীক্ষাগুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী। পান্ডিত্যাভিমানী গোরাকে ঈশ্বরপুরী কিভাবে অহংবোধশূন্য কৃষ্ণভক্তে পরিণত করলেন, সেই বিষয় সম্পর্কিত একটি ঘটনা শৈবাল মিত্রের উপন্যাসে খুব চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ঈশ্বরপুরী-র 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'-এ কর্তব্য কর্মবোধক ক্রিয়ায় গোরা আত্মনেপদ-এর পরিবর্তে পরস্মৈপদী ক্রিয়া ব্যবহারের কথা বলেন—

> পুথিতে শ্রোতার জন্যে কর্তব্যনির্দেশক ধাতু ব্যবহারের অনুপস্থিতি যে একটি বড় ত্রুটি, গোরা একথা পুরীগোঁসাইকে শত চেষ্টাতেও বোঝাতে পারল না। নিজের পান্ডিত্যাভিমানে গোরা যখন অনড় হয়ে উঠেছে, ঈশ্বরপুরী সবিনয়ে জানাল, সে 'শূদ্রাধম' দীনের চেয়ে দীন 'কর্তব্যনির্দেশক ক্রিয়াপদ' প্রয়োগ করার অধিকার তার নেই, সে শুধু নিজের সাধ্য মতো ধর্মাচরণব্রতী, ধাতুবিহীন নিজের আত্মকথনে, জ্ঞান দেওয়ার অধিকার তার নেই। সে শুধু ভক্ত, তার বেশি নয়।[৪]

তখন গোরা বুঝল, "বাণীপ্রচারের চেয়ে নিজেকে জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে মানুষের সামনে হাজির করা সর্বোত্তম ক্রিয়া।"[৫] শৈবাল মিত্র তাঁর উপন্যাসে বলেছেন যে, চৈতন্যদেব নবদ্বীপে কেবলমাত্র নিম্নবর্ণের মানুষদের সঙ্গে মিশতেন তা নয়, তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গেও মিশতেন। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গেও তাঁর ধর্মমতের আদান-প্রদান ঘটেছিল। এটিও শৈবালের নিজস্ব সংযোজন। কিন্তু চৈতন্যের উদার ধর্মমতের প্রেক্ষিতে এই ঘটনাকেও সম্ভাব্য বলে মেনে নেওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে মধ্যযুগের নানা জীবনীকাব্যে বিভিন্ন অভিমত

লক্ষ করা যায়। যেমন—তিনি জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে গেছেন, সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অথবা রথযাত্রায় কীর্তন নৃত্যের সময়ে পায়ে ইঁটের টুকরো বিঁধে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

শৈবাল মিত্র এই অভিমতগুলির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের জগন্নাথ মূর্তিতে বিলীন হওয়ার ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এভাবেই চৈতন্যের মৃত্যু হয়েছে, তা বলেননি। তাঁর মতে, চৈতন্যকে হত্যা করার জন্য প্রতাপরুদ্রের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী বিদ্যাধর গোপনে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। হোসেন শাহ চৈতন্যের মৃত্যু চেয়েছিলেন তাঁকে নিজের রাজনৈতিক ও প্রতিপক্ষ ভেবে। আর বিদ্যাধর চৈতন্যকে হত্যা করে হোসেন শাহের আস্থাভাজন হয়ে তাঁর সাহায্যে উড়িষ্যার সিংহাসন দখল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য অনুরাগী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিবারবর্গ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। তারা গোপনে চৈতন্যদেবকে মন্দিরে ঢুকিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেন এবং রটিয়ে দেন যে, চৈতন্য বিগ্রহের সঙ্গে মিশে গেছেন। কিন্তু চৈতন্যের অনুরাগী এক ভক্ত মন্দিরের গোপন সুড়ঙ্গ পথে তাঁর বাইরে যাওয়ার উপায় করে দেন। চৈতন্যদেব এরপর সুদূর পশ্চিমে গিয়ে নিজের ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। শৈবালের এই অভিমত আপাতদৃষ্টিতে যতই বাস্তব মনে হোক না কেন, সম্ভবত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্ত্যলীলায় যে দিব্যভাবোন্মাদ চৈতন্যের বর্ণনা আছে, তাতে তাঁর যে শারীরিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই তথ্যের ভিত্তিতে বলতে হয় যে, ছাব্বিশ ক্রোশ সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে চৈতন্যের পক্ষে সুদূর পশ্চিমে গিয়ে ধর্ম প্রচার আদৌও সম্ভব ছিল না।

এইভাবে শৈবাল মিত্র তাঁর একবিংশ শতাব্দীর চৈতন্যজীবনীতে অলৌকিকতা বর্জিত এক বাস্তব মানুষকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই রূপায়ণের কাজ শুধু বর্জন নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে মূল উপাদানগুলি তাঁকে সংগ্রহও করতে হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর সময় ও সমাজকে একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি আধুনিক পাঠকের জন্য এইভাবেই সময়োপযোগী করে তুলেছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. শৈবাল মিত্র : 'গোরা', দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮৪
২. তদেব : পৃ. ১১০; ৩. তদেব : পৃ. ১১০; ৪. তদেব : পৃ. ২৬৫; ৫. তদেব : পৃ. ২৬৫

ভগীরথ মিশ্রের ‘আড়কাঠি’ উপন্যাসে লোকসংগীত ও জীবন

নবগোপাল সামন্ত

বিশ শতকের সত্তর দশকের বাংলা কথাসাহিত্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভগীরথ মিশ্রের আবির্ভাব। একেবারে গ্রামীণ শিল্পী : তৃণমূল স্তর থেকে সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা। এই শিল্পীর লেখনীর অভিনবত্ব, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা তাঁর গল্প-উপন্যাসের স্বাদে এনেছে ভিন্ন মাত্রা। উচ্চবিত্তের রোমান্টিক প্রেম-যৌনতার বিপরীতে সাধারণ শ্রেণির মানুষদের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে নতুন আঙ্গিক রচনা করলেন তিনি। সমাজ ব্যবস্থায় তারা ব্রাত্য, অন্ত্যজ, নিম্নবর্গ হিসেবে পরিচিত। কালের যাত্রায় এরা শোষিত-বঞ্চিত—প্রতাড়িত-নিপীড়িত। শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের নেই বললেই চলে। লিঙ্গাগতভাবে অন্যের নিকট অবদমিত। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষবাষ্পে এরা অত্যাচারিত; অর্থনৈতিকভাবে পিষ্ট এমন সংগ্রামশীল মানুষের জীবনবৃত্ত রচনায় ‘আড়কাঠি’ উপন্যাসটি সচিত্র প্রদান করে।

মানুষের চিন্তন ও মননের আবেগঘন সুর হল সংগীত। যা মনে নব নব প্রাণের সঞ্চার করে। আর লোকসংগীত হল লোকায়ত মানুষের প্রাণের গান, জীবনের গান। তারা এককভাবে কিংবা যূথবদ্ধভাবে গান যেমন বাঁধে তেমনি সমবেত ভাবে গায়। যার মধ্যে তাদের দুঃখ-দুর্দশা, প্রেম-ভালবাসা, সাফল্য—ব্যর্থতা, সমাজ জীবনের ছবি তুলে ধরে। ‘আড়কাঠি’ উপন্যাসে মোট গানের সংখ্যা সাতটি। ট্রেন যাত্রীদের কণ্ঠে একটি গান, বাউলের গলায় দুটি গানের চারটি স্তবক, আসাম যাওয়ার আনন্দে গজাশিমুলবাসির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে একটি, নাবালে চাষাবাদ করতে যাওয়া রাঢ় আদিবাসী মানুষের গলায় একটি গানের দুটি স্তবক, কলকাতা যাওয়ার আনন্দে কাস্তো মল্লিকের কণ্ঠে একটি, নজরবন্দি রঙীর আক্ষেপের সুর একটি গানে দুটি স্তবকে প্রকাশ পেয়েছে।

উপন্যাসের প্রথমে লেখক 'ঘুমো' দেশের সন্ধানে বেরিয়েছেন। 'গুমো' নামক একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়ে। দেশ ও ট্রেন দুই'র নাম ব্যঞ্জনা দিয়েই শুরু। ঘুমিয়ে থাকা কিংবা সুপ্ত থাকার সমার্থ 'ঘুমো' এবং বিরক্তিকর, একঘেঁয়েমি প্রতিশব্দে 'গুমো' শব্দের ব্যবহার। অন্ধকার পরিত্যক্ত জায়গায় ঘুমিয়ে রয়েছে 'গজাশিমুল' গ্রামটি। বাঁকুড়ার গভীর জঙ্গালে এই গ্রামের অবস্থান। সেখানে বসবাস করে বত্রিশটি বসু-শবরের পরিবার। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সংঘের নাম 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ'। লেখক এই গ্রাম থেকে এক থোকা বুনো ফুল এনে আমাদের উপহার দিয়েছেন। কলকাতায় রাজ্য মেলাতে এই বুনো ফুলরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রদর্শন করে হাওড়া থেকে ট্রেনে চড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। কোনো এক অজানা জায়গায় এসে ট্রেন দাঁড়ালে কয়েকজন যাত্রী মিলে সমবেত সংগীতটি গেয়ে ওঠে—"রেলগাড়িটা পাহাল পাড়ে/হুঁকুর হুঁকুর ধুঁয়া ছাড়ে হে—/বুইসো রইছে দু-দশ কুড়ি/খাড়াই রইছে হাজার-জন,/হায়রে, অবোধ মন—।"[১]

আক্ষরিক অর্থে সংগীতটির মধ্যে একটি মন্থরগতি সম্পন্ন ট্রেন ও কিছু বিরক্তিকর যাত্রীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছ। এখানে ট্রেন হল ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষকে সচল রেখেছে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে দিনরাত। সেখানে দুই দশজন উচ্চবৃত্ত সুবিধাভোগী মানুষেরা আরামে বসবাস করে। সে কারণে এই ব্রাত্য মানুষরা তাদের 'অবোধ মন' পোড়া কপালকে বার বার দুষছে। অর্থাৎ লেখক রেলগাড়ির রূপকে বসু—শবর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবনের সারসত্যকে তুলে ধরেছেন।

খড়্গপুর স্টেশনে এসে ট্রেন থামলে, ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে এক বাউলকে নামতে দেখি। সাধারণত ট্রেনে আজকাল খুব বাউল কমই দেখা মেলে। এখন বাউল গানের পরিবর্তে কিছু রেকর্ড শিল্পী দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় আজও দু-একটি বাউল শিল্পী হদিস মেলে। উপন্যাসে বাউলের কণ্ঠে দুটি গানের চারটি স্তবক উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল লেখক কেন বাউলকর্তাকে নিয়ে এলেন, আর কেনই বা তার কণ্ঠে গান শোনালেন গজাশিমুলবাসীরা তো গাইতে পারতো! সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। যার ভাবার্থ হল 'পাগল'। 'বা' অর্থে 'আত্ম বা আত্মা' এবং 'উল' অর্থে 'সন্ধান' অর্থাৎ আত্ম বা আত্মার সন্ধানকারি ব্যক্তি। এঁদের মূল কথা মানবধর্ম। দেহতত্ত্ব প্রচার করাই মূল লক্ষ্য। এঁরা অর্থনৈতিভাবে বিপর্যস্ত। গৃহী ও সন্ন্যাসী যেমন প্রকৃতি বাউল হোক না কেন এরা মনের রাজ্যে ভবঘুরে। প্রসঙ্গাক্রমে, রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধের লাইন তুলে মনের মানুষ বাউল ব্যবহারে সারসত্যকে স্পষ্ট করা যায়—

> অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিতমানব।[২]

বাউলের গান ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরনের 'আয়না' দেখিয়েছেন সভ্য সমাজকে। যে আয়নাতে গজাশিমুলবাসির সাধারন মানুষের ব্যথা, বেদনা, সংগ্রামময় জীবন ও যন্ত্রনার অবস্থা দেখতে পাই। অপরদিকে গজাশিমুলবাসি তো সংসারিক মানুষ তাদের কাছে দেহতত্ত্বের গান পাওয়া অমূলক—"সময় হইল্যাক, যাই ফিরে যাই, ভবের খেলা শেষ।/(এতদিন) ছিলাম যেন পিঁজরাতে পাখি/(যেন) গুয়াল-ঘরে ছাগল মেষ/ভবের খেলা শেষ...।"[৩] আক্ষরিক অর্থে, দিনের কাজ শেষে পাখিরা নিজের বাঁসায় ফিরে যাচ্ছে। বিশেষাথে এই দুনিয়ায় গজাশিমুলবাসির কাজ হল নাচ গান দেখিয়ে বিত্তবান ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করানো। সারা কলকাতাকে আনন্দ দিয়ে তাদের ফিরে যেতে

হচ্ছে সেই অন্ধকার জগতে যেখানে সভ্য সমাজের আলো প্রবেশ করেনি। গ্রহণ করতে হবে জঙ্গালের রীতিনীত। ফল, পাকুড় নিত্যদিনের জীবনসঙ্গী; গড্ডালিকা প্রবাহের মতো হবে জীবনধারা। দেহতত্ত্বের আধারে জীবের জরা-মৃত্যু-ব্যাধির কথা উল্লেখ করেছেন—"খাইলাম-দাইলাম, বিয়া কল্ল্যম/ঝলক-ঝালক বসন পইরল্যম/বছর-বছর ছা' বিয়াল্যম ভরাঁই দিলাম ভারত-দেশ/ভবের খেলা শেষ।"[৪]

অর্থাৎ গানটির মধ্যে যৌনতাবদের পরিচয় মেলে। ফ্রয়েডিও মনস্তত্ত্বে জীবের জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষুধা (Hunger) এবং যৌনতা (Sex) র কথা পাই। দেহতত্ত্ব অনুসারে এই ভবের সংসারে মানুষ শুধু কামনা বাসনায় আবদ্ধ হয়ে নিজের আমিত্বকে খর্ব করছে। যৌবন তো ক্ষণস্থায়ী; সারা জীবন সুখ ভোগের মধ্যে কাটালে ঈশ্বরের সানিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বাউল সংগীত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখক 'আড়কাঠি' উপন্যাসের সাহিত্যকীর্তি এবং সাধক- ভাবুকচিত্তে অপার্থিব রসের উদ্বোধন করেন। সাধারণ মানুষের আত্মনিবেদন এবং ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গাক্রমে বিদ্যাপতির প্রার্থনা পর্যায়ের একটি পদ উল্লেখ করে বলা যায়—

> তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম/সুত মিত রমনি সমাজে।/তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ/অব মঝু হব কোন কাজে।।/মাধব হম পরিনাম নিরাসা।/তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়/অতএ তোহরি বিশোয়াসা।।[৫] (বিদ্যাপতি : প্রার্থনা)

কবি বিদ্যাপতির মত মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ করেন এবং জগদীশ্বর প্রতি বিশ্বাস রেখে সারাজীবন বৃথা কাজের কথা চিন্তা করে ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে আত্মনিবেদন জানান। পরবর্তী স্তবকে বন্দিত্ব ও বন্ধন মুক্ত দুই সত্তা প্রকাশ পেয়েছে—"ঢের খেলা খেলছিস যাদু, ইবার ফিরে আয়,/উ যেন শিকল-খুলা পক্ষী আবার পিঁজরাতে সেঁধায়/ইবার ফিরে আয়—।"[৬]

গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের শিল্পীরা বাঁকুড়া, কলকাতা, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মালদা, শিলিগুড়ি, আসাম, দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি জায়গায় তাদের শিল্পকলা প্রদর্শন করে; বন্ধনহীন মানব জীবনের স্বাদ আস্বাদন করে বাড়ি ফিরছে। পাশাপশি এই মানুষদের জীবন যে আড়কাঠির কবলে তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। গানটির মধ্যে জীবভাব ও বিশ্বভাব দুই লক্ষ্য করা যায়। জীব স্বভাবে মানুষ হয় স্বার্থপর, নিজের চাহিদা পূরণে তৎপর। আর বিশ্ব স্বভাবে মানুষ নিজের প্রয়োজনের গণ্ডিকে অতিক্রম করে এক নিগূঢ় সংকেতে আত্মসমর্পণ করে। সেখানেই তার মুক্তি—"(ওরে) নাম দিয়েছিস পদ্মবন, তায় পদ্ম ফুটে না/রাত পুহালেও দিন আইসে না, সূয্য উঠে না।/অমন মোদের ফাটা কপাল, চুন লেইপ্যে বুজানো দায়/ইবার ফিরে আয়।।"[৭] বাউলের শেষ স্তবকের গানটি সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের ছবিটাই স্পষ্ট। কর্পোরেট সেক্টরের অদৃশ্য শাসনের শিকার প্রান্তিক জীবনে ছবি চিত্রিত। পরবর্তী গানটি বসু শবর গোষ্ঠীভুক্ত কমবয়সী ছেলে মেয়েদের মুখে সমবেতভাবে গীত হয়েছে। গজাশিমুলবাসীদের কাছে জঙ্গালই মা। যেখানে তাদেরকে—"এখানে খাটালি নেই, বাটালি নেই, পেটের ভাত নাই, পরনের ছৈতা নাই, এখানে জঙ্গালই যেন ইহকাল-পরকাল।"[৮] সেই জঙ্গালই যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় খিদের জ্বালায় অতিস্ট হয়ে ওঠে তখন তাদেরকে রঙলাল সবুজ দেশে কাজ পাওয়ার স্বপ্ন দেখায়। শুনে আনন্দে আত্মহারা; সমবেত হয়ে তারা গেয়ে ওঠে—"দ্যাশে-ঘরে নাই কাম/চলবাবুয়া যাই আসাম/চা-বাগানের দ্যাশে চল যাই—।/(এই) শুখা-হাজা দ্যাশে কুনো সুখ নাই/চা-বাগিচার দ্যাশে কুনো দুখ নাই।"[৯] বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে গজাশিমুল গ্রাম। পুণ্যপানি, পচাপানি, কানাপাথর, আমঝরনা, ঘটিডুবা, কাঁড়াডুবা ইত্যাদি গ্রামগুলি

গজাশিমুল গ্রামকে ঘিরে রয়েছে। বসু শবর জাত ছাড়া অনেক আদিবাসী মানুষ এইগ্রাম গুলিতে বসবাস করে। মাটি কাটার কাজ ছাড়া বসু শবরেরা কৃষিকাজে অক্ষম। রাঢ় আদিবাসীরা চাষবাসে খুব পারদর্শী। কিন্তু এই অঞ্চলের মাটি খুব অনুর্বর, লাল মাটি আর কাঁকর মিশ্রিত। ক্ষেতের বেশির ভাগ অংশ টাঁড় টিকড়। আকাশের জলের উপর ভরসা। দো ফসল তো দূরের কথা এক ফসলও ঠিক ঠাক হয়না। এই গরিব মানুষগুলো তিন মাস পেটপুরে খেতে পেলেও বাকি নয় মাস অর্ধাহার, অনাহার, অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে দিন চালায়। তাই জীবিকার জন্য এই সকল মানুষেরা বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ইত্যাদি জেলার 'নাবাল' বা নিচু জায়গায় চাষের সময় আর ফসল কাটার সময় যায়। তারা যাওয়ার পথে সমবেত হয়ে গান করে—

> দ্যাশ জুইড়্যে খরা হইল্যাক,/দারুণ খাটারশাল হে—,/রাঢ়ের মানুষ চল্যেছে নাবাল।/শুখা-হাজা দেশে মরে, ঘরের ছা-ছাওয়াল হে—,রাঢ়ের মানুষ চল্যেছে নাবাল—।[১০]

কারণ এখানে নিচু জায়গায়। জল জমে থাকে বারোমাস। সারা বছর কাজ লেগেই থাকে। পশ্চিমা মজুরেরা যেমন পরিশ্রমী তেমনি পারিশ্রমিক এবং দুই বেলা খাওয়ার পায় এখানে। এই আদিবাসী মানুষদের মন খুব সরল ও সুন্দর। কষ্ট হলেও মাটির গান তারা ভোলে না। সারাদিন মাঠে কাজের পর ফিরতি পথে যেমনই গান করে তেমনি কাজ পাবে এই আনন্দেও গান গায় তারা—"(উখ্যেনে) আগাশ ভত্তি বিষ্টি আছে/ফোটোয় আঁকা ক্যাদেল আছে/ফিরার ব্যালায় ধইরল্যাক পুলুশ,/ছিনাই লিল্যাক বামাল হে—,/রাঢ়ের মানুষ, চল্যেছে নাবাল।"[১১] অর্থাৎ গানটির শ্রমজীবী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পাশাপাশি শাসক ও শোষিতের চিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজে এই মানুষরা প্রকৃতির আশীর্বাদ থেকেও বঞ্চিত।

উপন্যাসে কাস্তো মল্লিকের কণ্ঠে গানের একটা কলি খুঁজে পাই। গজাশিমুলবাসীরা কলকাতার মেলাতে সংস্কৃতি দেখানোর সুযোগ পেয়েছে এই আনন্দে সে কলকাতাকে নিয়ে গানের বোল ধরে। এককালে এই শহরটাকে নিয়ে তার ভয়ের সীমা পরিসীমা ছিল না। কারণ এখানে 'সাদা কাঁকড়া' ও 'কাঁকড়া' শ্রেণির মানুষের বসবাস। 'কাঁকড়া' বলতে এরা সভ্য শিক্ষিত ভদ্র মানুষকে বলে। সেই কারণে এরা প্রফেসর রাজীব চৌধুরী, ক্যাথি বার্ডের সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করতে চায়নি। মহাশ্বেতার উপন্যাসে এদেরকে 'দিকু' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই শহরে ভদ্র মানুষদের বসবাস; প্রচুর গাড়ি ঘোড়া চলাচল করে; অর্থের অভাব নেই অথচ সুযোগ পেলে পকেট থেকে দুই পয়সা চুরি করতে বিবেকে বাধে না—"কইলক্যাতা শহরে, গাড়ি চলে লহরে,/লীলমণি, —/(তুয়ার) খুইলে লিল্যাক দু' আনি।"[১২] অর্থাৎ গানটির মধ্যে শহরতলীর উপকথা এবং তার মুল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা ধরা পড়ে। শিক্ষা থাকলেও মানবিকতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

উপন্যাসের শেষ গানটি রঙী গেয়েছেন। আড়কাঠির এক্তিয়ার সম্পতি হয়েছে সে। কয়েকদিন পর তার স্থান হবে ডিপুঘরে। পেটে ক্ষুধার জ্বালাকে সহ্য করতে পারবে কিন্তু চিরকালের জন্য আপনজনদের হারাবার কষ্টে অন্তরের ভিতর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সে। তাই যদুরামের কাছে কাতর প্রার্থনা—

> ফাঁকি দিয়ে ডিপুঘরে ঢুকালি/হা যদুরাম, কুথা লুকালি—।/ভোখেতে পেট জ্বলে—/কোড়া খেইয়্যেঁ পিঠ জ্বলে—/ঘরের লেইগ্যে আন্তর জ্বলে খালি/হা যদুরাম, কইরলি চতুরালি।[১৩]

গানটির মধ্য দিয়ে নারীর নারকীয় জীবনযন্ত্রণার কথা বর্ণিত হয়েছে। ঝাড়েশ্বরের চার মেয়ে—সাবিত্রী, রূপমতী, রঙী ও সুখী। বড়ো, মেজো মেয়েকে রঙলালের লাল খাতায় নাম লিখিয়ে

আসাম মূলুকে পাঠিয়েছে। রঙীর বাবদ চার হাজার ছয় শত টাকা দাদন নিয়েছে ঝাড়েশ্বর কোটাল। ফলে সে এখন নজরবন্দি; রঙলালের সম্পত্তি। কিন্তু রঙী কিছুতেই আসাম দেশে যেতে চায় না। সুচাঁদ ও রাজীবের মুখে শুনেছে আসাম দেশের কুলি কামিনদের দুরাবস্থা। দরিদ্র অসহায় মেয়েদের বিক্রি করে তাদেরকে নীলকুঠির দেশে চালান দেওয়া। তাই রঙী আক্ষেপ করে ব্রজরাজ কানাইশরকে প্রার্থনা জানায় প্রতিবছর আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার খরসতিয়া নদীর পাড়ে 'জলকেলি নাচ' দেখিয়ে তুষ্ট করা সত্বেও তার ভাগ্যে কী এই চরম দুর্দশার কথা লেখা রয়েছে। শেষমেষ একজন আড়কাঠির দাঁড়ায় বন্ধ হতে হল ডিপুঘরে। যে ঘরে কোনো নারী একবার প্রবেশ করলে তার ইহজগৎ অচেনা হয়ে যায়। দূর কোনো জগতে পিশাচের খাদ্য হতে হয়। যদুরাম তথা কানাইশরের কাছে প্রার্থনা—"কাজবাবু সাঁঝ ব্যালায়/শরীলখানা ছিঁড়্যে ফ্যালায়,/সর্দার এইস্যে করে ছেনালি—,/হায় যদুরাম,/ফাঁকি দিয়্যে কুনলরকে পাঠালি।।"[১৪] সমকালীন অর্থনৈতিক অবক্ষয়, মুল্যবোধের অবমূল্যায়ন, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লোক-সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু চেহারার পাশাপশি বিপণন সভ্যতায় নারীকে কাম, যৌনতার দাসীতে পরিণত করার সচিত্র দলিল হয়ে উঠেছে গানটি মধ্যে দিয়ে। সামগ্রিক আলোচনা সুত্রে বলা যায় লেখক ভগীরথ মিশ্র একটি গ্রামীণ ভারতবর্ষের ছবি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ব্রাত্যদের বাস্তব জীবনের ছবি। এই ছবিকে প্রাণবন্ত করতে বিষয়ের মধ্যে এনেছেন সঙ্গীত। এই গানের মধ্যে চরিত্রগুলির জীবনদর্শন প্রতিধ্বনিত হয়। দুঃখকে অতিক্রম করে জীবনের চরম সত্যে পৌঁছানো যেন ব্যথার নদীগুলো ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ পরিসর পায়।

উৎসের সন্ধানে

১. ভগীরথ মিশ্র : 'আড়কাঠি', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ (এপ্রিল ২০১৯ বৈশাখ ১৪২৬)। পৃ. ০৯
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', বিশ্বভারতী, দশম খণ্ড, আশ্বিন ১৪২১, কলকাতা,পৃ. ৬২৭
৩. ভগীরথ মিশ্র : 'আড়কাঠি', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ (এপ্রিল ২০১৯ বৈশাখ ১৪২৬)। পৃ. ১৫
৪. তদেব : পৃ. ১৬
৫. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, বিদ্যাপতি পদাবলী, বসুমতী— সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, আষাঢ় ১৯৪২, পৃ. ২১৮
৬. ভগীরথ মিশ্র : 'আড়কাঠি', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ (এপ্রিল ২০১৯ বৈশাখ ১৪২৬)। পৃ. ১৯
৭. তদেব : পৃ. ১৯
৮. তদেব : পৃ. ২৯
৯. তদেব : পৃ. ৩২
১০. তদেব : পৃ. ৪৩
১১. তদেব : পৃ. ৪৩
১২. তদেব : পৃ. ৫২
১৩. তদেব : পৃ. ১৫৫
১৪. তদেব : পৃ. ১৫৬

ভগীরথ মিশ্রের ‘চারণভূমি’ : লৌকিক বৃত্তিগত ভাষার পরিচয়

পিউ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ এবং তার পাশের দুটি জেলার মানুষ যারা ভেড়া-চরোয়া নামে পরিচিত তারা হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে বহু বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-পরিজন, সব পিছুটান কাটিয়ে বৃত্তির কারণে নিরন্তর যাযাবর জীবন পালন করছে। পশুপালনের জন্যই এই ঘুরে বেড়ানো, যাযাবরত্ব ও পশুপালন বৃত্তি সমার্থক হয়ে গেছে—এঁদের নিয়ে ভগীরথ মিশ্রের অনন্য উপন্যাস ‘চারণভূমি’।

পশুপালন এবং কৃষি হচ্ছে পৃথিবীর আদিমতম, প্রধান এবং মৌলিক বৃত্তি। পৃথিবীতে মানবের পথ চলার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য উৎপাদনের শুরু। পৃথিবীতে মানবের প্রথম পথ চলার সুনির্দিষ্ট সময় যেমন জানা যায় না, তেমনি পশুপালনের সুনির্দিষ্ট সময়ও জানা যায় না। তবে ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ১১০০০ বছর পূর্বে পশুপালন শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পূর্বে গৃহপালিত পশু হিসাবে গরু, ছাগল, উট, ভেড়া প্রভৃতি পালন করা হতো। সময়ের পথ পরিক্রমায় এবং মানুষের প্রয়োজনে পশুপালন এখন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বৃত্তি। এই বৃত্তি থেকেই মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পোশাক পায়। এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষকে নানান নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—গো-পালক অর্থাৎ যাঁরা গো-পালন করতেন তাঁদের উপাধি হতো ‘গোপ’। এঁদের বিভিন্ন নামান্তর পাওয়া যায়—গোয়ালা, গোয়ার, গোপ, গোপাল, পল্লব, গোপ, আহীর, আভীর। ‘আভীর’-গণ বর্তমানে ‘আহীর’ নামে পরিচিত।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে এই আভীররাই নামাঙ্কিত হন ‘বাগাল গোষ্ঠী’ হিসেবে। বৃত্তিজাত এই আভীর বা বাগাল গোষ্ঠীও জীবিকানির্বাহের তাগিদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে তাঁদের শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানিক নামে চিহ্নিত হয় এবং তাঁদের সামাজিক মর্যাদারও তারতম্য ঘটে। বর্তমানে বাগাল সম্প্রদায়ের

অনুরূপ দশটি শাখার অস্তিত্ব পাওয়া যায়—

১. বাগাল ২. আভীরঘ্ন আহির-বাগাল ৩. পান-বাগাল ৪. মাল-বাগাল ৫. গোপ-বাগাল ৬. গৌড়-বাগাল ৭. খেরোয়াল-বাগাল ৮. মগধা-বাগাল ৯. বইগা-বাগাল ১০. পল্লব-বাগাল। 'বাগাল' নামটির উৎপত্তি বিষয়ে অধ্যাপিকা ড. ছন্দা ঘোষাল নিজ গবেষণাকৃত গ্রন্থে লিখেছেন—

> গো-সম্পদের লালন-পালন এবং চারণভূমিতে নিয়ে গিয়ে গোচারণ অর্থাৎ রাখোয়ালি এঁদের মূল জীবিকা। কেন্দ্রীয় ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষায় 'বাগাল' শব্দটি মান্য বাংলায় 'রাখাল' শব্দের সমার্থক। সংশ্লিষ্ট ভাষা ব্যবহারকারীদের অভিমত, জমিতে আল দিয়ে যেমন জমিতে জমা জল সংরক্ষণ করা হয়, তেমনি ঘন অরণ্যে বাঘের বিরুদ্ধে আল দিয়ে তথা প্রতিরোধ তৈরি করে গোরু-বাছুরকে যারা রক্ষা করে, তারাই বাঘ + আল > বাগাল।[১]

বংশানুগত বৃত্তি : 'দাহো ভকতের বাপ নন্দলাল ভকত ছিল ওদের মুলুকের বাছাবাছা মুরুব্বিদের একজন। বাপ শিউপূজনের মতো অনেক শাস্ত্রকথা জানত সেও। পুরাণের বহুৎ কহানী। ভকতদের ভেড়িহার-জীবনের দিগদারি দেখতে দেখতে বড়ো আপশোশ হতো নন্দলালের। বলত, এ হামারা তগ্দীরকে লিখল কে মিটাই! পরশুরামের হাত থেকে বাঁচবার জন্য একদিন এই কাজ বেছে নিয়েছিলাম আমরা। শুরু করেছিলাম ভেড়ার পেছনে দৌড়। সেই দৌড় জনম-জনম চলছে। কা কর্বা বাপ, এ তোহলোককে ভাগকে কাটল এ হল নিয়তির কামড়। বলত, ভাগকে কাটল। কচ্ছপের কামড় থেকে ছাড়া পাওয়া যেত সহজ নয়। কাজেই, দৌড়োও জনম জনম, ভেড়া-গোঠের পিছে পিছে।' পরশুরামের তাড়নায় যে পলায়ন বৃত্তি শুরু হয়েছিল এরা, এখনও তার আতঙ্ক ছুটে চলেছে ভকত সম্প্রদায়, দেশ থেকে দেশান্তরে, বংশ থেকে বংশ ধরে। কিন্তু নবীন বাগাল মুনসী দেখেছে, বাঁকুড়ার লোকপুরে থিতু হচ্ছে ভকতরা। অন্য বৃত্তি নিয়ে নিজেদেরকে বদলে ফেলছে ভকত সম্প্রদায়। 'মুনসীরও আর ভাল লাগে না।' আর সহ্য হয় না এই নিরন্তর পশুজীবন। নতুন প্রজন্ম থিতু হতে চাইছে। তারা আর ঝুঁকি নিয়ে পথে বেরোতে চাইছে না। লোটন ভকত যেমন অনৈতিক কাজ বেছে নিয়েছে কম পরিশ্রমে অধিক অর্থ উপার্জনের পথ।

গোঠের স্তর : এই গোঠে মোট সাতটি বাঘা, প্রতিটি বাঘায় দু'শোর ওপর ভেড়া। বাঘাপিছু দু'জন করে বাগাল। আর, ডেরা পাহারা দেবার জন্য একজন 'ডেরোয়াহা', সে দাহো ভকত। সাতটির মধ্যে একটি বাঘা বিশ্বনাথ ভকতের, দুটি মানিক্য ভকতের, দুটি শ্রীকৃষ্ণ ভকতের, আর দুটি যদু ভকতের। শ্রীকৃষ্ণ ভকতের একটি বাঘায় বাগাল হিসেবে রয়েছে মুনসী, আর অন্যটিতে ভিখারী ভকত, মুনসীর বাপ।' একটি গোঠে প্রথমের স্তরে থাকে ভেড়ার মালিকেরা। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ ভকত। জমি জিরেত নেই। দুটো গোঠে তিন বাঘা ভেড়া রয়েছে। আর নিজের ঘরের বারান্দায় কম্বল বানানোর কারখানা। ভেড়া থেকে যে পশম হয়, সেই দিয়েই কম্বল, আসন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক জিনিস তৈরি করে। মূলত ভেড়া থেকেই এদের আয় হয়।

এরপর আসে গোঠের 'ম্যাড়াল'। সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে গোঠকে এগিয়ে নিয়ে চলে। সেই দলের কাণ্ডারী। সমস্ত কিছু আগাম আন্দাজ করতে পারে গোঠের ম্যাড়াল। সকলেই মনে করে ম্যাড়াল হবে চৌকস আর পাটোয়ার ব্যক্তি। কিন্তু রামনা ভকত ভালো মানুষ। তিনিই গোঠের ম্যাড়াল। গাঁয়ের অনেকেই তার সুযোগ নিয়েছে। এনাকে ম্যাড়াল করার একটাই কারণ, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তার মতো ম্যাড়াল এই বাংলা-বিহার মুলুকের কোনো গোঠেই মেলা

দুষ্কর। এরপরে গোঠে 'ডেরোয়াহা'-র স্থান। গোঠের ডেরোয়াহা হল দাহো ভকত। ভেড়ার বাঘা নিয়ে বাগালরা যখন ডেরা থেকে বেরিয়ে যায় সারাদিনের মতো, তখন তার কাজ হলো ডেরা পাহারা দিয়ে জেগে বসে থাকা। তাকে সাহায্য করে কালুয়ার নেতৃত্বে একপাল বাঘা-কুকুর। প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে তার গোঠে গোঠে ঘুরে। থিতু হওয়া তার ধাতে নেই। সবার নিচে হল গোঠের বাগালদের স্থান। এরাই হল ভেড়া চরোয়া। যদিও এদের মধ্যেও বিভাজন রয়েছে। এক, যারা প্রবীণ বাগাল। বয়সে এবং অভিজ্ঞতা দুটোতেই এরা প্রবীণ। প্রবীণ বাগালদের মধ্যে রয়েছে পদিনা ভকত, ভিখারী ভকত, সম্পত ভকত। আর নবীন বাগালরা হল মুনসী ভকত ও লোটন ভকত। পদিনা ভকতের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। পদিনা এবং মুনসী দুজনে একই বাঘার বাগাল। মুনসী সঙ্গে থাকলেও বাঘার মূল দায়িত্ব রয়েছে পদিনা ভকতের উপর। মুনসী গোঠে নতুন। মাস কয় আগে এসেছে নিজের মুলুক থেকে। এখনও ভেড়িয়ার জীবনের অনেক কিছুই অজানা। বাপ ভিখারি ভকত তাকে রোজ অন্তত একবার উপদেশ দেয়, 'শিখ লে বান, জলদি শিখ লে, আগে বাঢ়, বেটা।' মুনসী ভকতের চেষ্টা আছে, সে একজন ভালো বাগাল হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু লোটন ভকতের বাগাল জীবনের প্রতি কোনো টান নেই। রাঁচি শহরে দিয়ে 'দশরা বেওসায়' নেমে রাতারাতি লাখোপতি হতে চায়। তাই গোঠের কোনো কাজে গতর খাটাতে চায় না। প্রবীণ ভেড়িয়াররা এদের নাম দিয়েছে 'বাবু' বাগাল। এরা নিজেদের মর্জি মতন চলে।

গোঠে অন্যান্য বাগালদের মধ্যে রয়েছে হাঁদু ভকত, হঠাৎ ভকত, খেদাড়েং ভকত প্রভৃতি। আর রয়েছে বিষমি ভকত, গোঠের মধ্যে সে ওঝাগিরি করে।

বাগালদের কাজ : ভেড়াদের দেখাশোনা, পরিচর্যা, তাদের লালন-পালন সংক্রান্ত একদম মূল স্তরের কাজগুলি করে বাগালরা। অর্থাৎ গোঠের সমস্ত কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলি করে বাগালরা। উর্দতনের নির্দেশ মেনে চলা এদের অন্যতম কাজ। নতুন যখন কেউ গোঠে প্রবেশ করে তাকে বাগালি করেই কাজ শুরু করতে হয়। বাগালদের মধ্যে যেহেতু দুটি ভাগ রয়েছে নবীন এবং প্রবীণ। তাই প্রথমে প্রবীণ বাগালদের অধীনে থেকেই শিক্ষানবিশের কাজ চলে। একমাত্র দক্ষ বাগালরাই পারে গোঠের পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হতে। এমন অনেক প্রবীণ বাগালও রয়েছে যারা সারাজীবন বাগালি করেই কাটিয়ে দিয়েছে—

> রোজ সকালে উঠে বাগালদের প্রথম কাজ হল, হাত-মুখ ধুয়ে , টাট্টি সেরে, চা বানিয়ে খাওয়া। ভেলি-গুড় দিয়ে বানানো চা। মাঠের মধ্যে তাই যেন অমৃত। তারপরেই বাগালরা বসে যাবে পৃথক পৃথক আলের ওপর, সঙ্গে রাখবে খারি-নুন, বদনায় জল, বসে বসে নিজের বাঘার ভেড়াগুলোকে নাম ধরে ডাকতে থাকবে একের পর এক। আয়, খাঁদি, শিংরি, ভোলি, আয়, কাজরি, লেংড়ি, আয়, আয়, হৌ- হৌ হুজুর র...র। নির্দিষ্ট বোল আছে প্রত্যেক বাগালের, ভেড়ার কান তার বাগালের বোলে অভ্যস্ত। ঐ বোল শুনে, আর খারি-নুনের লোভে ভেড়াগুলো একে একে চলে আসবে তার বাগালের কাছে। বাগাল তখন তাদের মুখে এক চিমটে খারি-নুন দিয়ে এক চোল জল দেবে মুখ।

বাগালদের যাবতীয় কাজের কাজের মধ্যে অন্যতম কাজ ভেড়ার খাসিকরণ। যদিও নতুন প্রজন্মের বাগালদের মধ্যে এই কাজের প্রতি অনীহা দেখা গিয়েছে।

গোঠের পথচিত্র : বাংলার হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জিলা, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, হাজারিবাগ এবং বিহার মুলুকের ভিতর দিয়ে ভেড়া-চরোয়ারা পথ পরিক্রমা করেছে—'দৌড়ই বটে। পশ্চিমে

রাঁচী-হাজারিবাগ। পুবে হুগলি জিলা, বাংলা-বিহারের এই বিশাল এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দাহো ভকতের গোঠ। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। আর, এই ভেড়া জাতেরও ভারি আজীব জীবন। এরা মাঠেই জন্মায়, মাঠেই মরে কিংবা। বিক্রি হয়। জীবনে কোনোদিন কোনও গোয়ালের মুখ দেখেনি। জন্মাবার পর থেকে শুধু হেঁটে বেড়ায়। হেঁটেই বেড়ায় আজীবন কাল। এদের পিছু পিছু যারা ঘোরে, বাগাল-ম্যাড়াল-ডেরোয়াহার দল, তাদের অবস্থাও একই রকম। গোঠই তাদের ঘর-সংসার, ইহকাল-পরকাল। রাঁচী থেকে পুরুল্যা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি...। আবার হুগলি থেকে রাঁচী হাজারিবাগ, হাটিয়া, দুমকা...।'

বাথানের ডেরা : বাথানের ডেরা কোথায় ফেলা হবে সেটা ঠিক করে গোঠের ম্যাড়াল। সে ভিন্ন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দ্বিতীয় কেউ নেই। ডেরা করার আগে ম্যাড়ালকে অনেকগুলি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়, ভেড়া চরার উপযোগী জায়গা-জমি আছে কী না, সম্পন্ন গ্রাম আছে কী না, গ্রামের মানুষেরা খাতির যত্ন করবে কী না, সর্বোপরি বাইরের কোনো উৎপাত আছে কী না। এতগুলো ভেড়াকে নিয়ে অচেনা জায়গায় ডেরা ফেলা, পদে-পদে বিপদের আশঙ্কা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় ম্যাড়ালকে। তারপর সব গাঁয়ের মানুষই চায় সেই গ্রামে ডেরা ফেলা হোক কারণ ভেড়ার মূল-মূত্রের মতো উৎকৃষ্ট সার আর নেই। সেকারণে ডেরা ফেলা নিয়ে জমির মালিকদের তোষামোদের সীমা-পরিসীমা নেই, আবার কেউ কেউ ভয় দেখিয়েও কাজ হাসিল করতে চায়।

ভাষা : ভেড়া চারোয়াদের সংলাপে বাঁকুড়া জেলার ভাষার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—অন্তব্যঞ্জনাগমের উদাহরণ- ডুবাল্যাক, পারবেক, হবেক, শুইনব্যেক, যাব্যেক, আইবেক, ডুববেক, কাটল্যাক, দিল্যাক, রইল্যাক, হব্যেক, লিব্যাক, হইল্যাক, ভরল্যাক, সারব্যেক, বলল্যাক, মিলবেক, সইব্যেক প্রভৃতি। সর্বনাম পদের আদিতে 'ই' এবং 'উ'-এর আগমন। উইটুকু, উয়্যাদ্যার, উই, উটি, উ প্রভৃতি। 'এ' স্থানে 'ই' ধ্বনি-ইট্যা, সিট্যা প্রভৃতি। বাঁকুড়ার ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য নাসিক্যধ্বনির প্রভাব। কোথাও নাসিক্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াও ঘটে নাসিক্যভবন। কোথাও নাসিক্যধ্বনি লোপের ফলে পূর্ববর্তী স্বর হয়ে ওঠে অনুনাসিক। আঁইছি, হাঁ, আঁইছে, বদলাইঁ, হইয়েঁ, কেঁইদ্যে, হইয়েঁছিল, বারাঁই, কেঁইদ্যে, বাঁটছে প্রভৃতি।

● অপিনিহিতির প্রভাব প্রচুর—কইর্‌লে, আইজ, কইরে, বইলতে, পেইত্যে, চইলে, বইলে, হইলে, দেইখবো, কইর‍্যে, খেইয়ো, রেইখ্যে, খেইলে, পইড়ছে, আইজ্ঞা, রাইত, ভাইব্যে, কাইটছে, থাইকব, পেইয়ে, বাইন্যে, লাইগছে, ছুইটলে প্রভৃতি।

● স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—এ > ই মিলে, দিবে, ইসব, মিটাই, সিটাই, ইট্যা।

ও > উ উইটুকু, উয়্যাদ্যার, ঘুরাতে, ঢুকালে।

বর্ণলোপ—কর্ম > কাম

● নঞর্থক ক্রিয়াপদ লারল্যম, পারলাম না অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ন' এর স্থানে 'ল' এর আগমন—লষ্ট, লাও, লচেৎ, লড়া, লাচছে, লিয়ে, লিজের প্রভৃতি।

● স্বরভক্তি—জনম, গেরামে। শব্দের আদ্যক্ষরের 'ও' কার 'উ' কারে পরিণত হয়েছে কুনদিকে।

ভোজপুরী ভাষার বৈশিষ্ট্য

● সর্বনামে হিন্দি 'মে'-এর জায়গায় হম, হামার, 'তু'-এর জায়গায় তুম। সর্বনামের উত্তম পুরুষে 'মে' এর সম্বন্ধ কারক মে, মেরা—হামার এর প্রয়োগ। শব্দের শেষে 'বা' প্রত্যয় যোগ হয়,

যেমন, 'নহি বা' 'সতর প্রান্তমে শুখা পড়ল্ বা' 'দেওল্ বা' প্রভৃতি। স্বরের বৃদ্ধিকরণ ভোজপুরীর একটি বৈশিষ্ট্য, 'দেখে' প্রভৃতি। প্রত্যয় হিসেবে 'কে'-এর প্রয়োগ বহুল পরিমাণে দেখা যায়, বিশেষত কর্মকারকের প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। 'কা করবা বাপ, এ তোহলোককে ভাগকে কাটল'। 'যে ক'দিন বাঁচি উয়াকে লিজের পাশে পাশেই রাখব'। 'জনমাইকে সং সং'।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

- **পুংলিঙ্গ**

  'শিখ লে বান, জলদি শিখ লে, আগে বাঢ় বেটা।'
  'এ ছগরাকে গোঠে ঢুকালে পুরা গোঠ শুখা ডাঙায় ডুববেক।'
  'তুয়ার বাপ খাড়া রয়্যেছে তুয়ার পাশ।'
  'সেই আশীর্বাদটুকু পেল না ছেইল্যাটা!'
  'লেড়কাকে হামার বাঁচাই ক্যামন কইর‍্যে!'

- **স্ত্রীলিঙ্গ**

  'শিংরী তো ভেড়া নয়, ভেড়ী, শিংওয়ালা ভেড়ী।'
  'গিরস্থ ঘরের লেড়কি তুমি'
  পরদেশী মেয়ার সাথ পিরীত! গোঠ-জীবনের রীতি লয় 'ইট্যা।'
  'উ মাগী মা-জাতের কুলাঙ্গার।'

- **বচন**

  'বিয়ের পর যদি এক টুকরা ভিটা কিনে দিই'
  'চল, ভেড়াগুলানকে গা ধুয়াই। থাণ্ডা হবেক উয়্যাদার শরীর।'
  'সতর্ক থাক সক্কলে, এ রাত হুঁড়ারদের রাত, আমার বা চোখ লাচছে।'

- **উত্তম পুরুষ**

  'ভেড়া-চারোয়া বনতে হামারা তগদিরকে লিখল
  'বাবুমশায়, থির হইয়েঁ কথা শুনুন আমাদ্যার।'
  'আসলে তুমরা গরীব বটে।'

- **মধ্যম পুরুষ**

  'হব্যেকই ত, ইট্যা যে তুমাদ্যার দ্বিতীয় সনসার কিষ্টো।'
  কা কর্বা বাপ, এ তোহলোককে তগদীরকা লিখ।'
  তোহারেই দেওলবা, ই লালচ, জনমাইকে সং সং।

- **প্রথম পুরুষ**

  'আইজ কিষ্টো আঁইছে, টুকচানভালো-মন্দ খাবারের-দাবারের ইন্তেজাম কর তুয়ারা।'
  'একলা গোঠ পেইয়ে যদি ফের হানা দেয় উয়ারা'।

- **কারক ও বিভক্তি**

  কর্তৃকারকে শূন্য বা প্রথমা বিভক্তি।
  কর্মকারকে শূন্য, দ্বিতীয়া ('কে') এবং সপ্তমী বিভক্তি।
  অধিকরণ কারকে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ দেখা গেছে।

- **ক্রিয়ার কাল**

  গোঠের নিয়ম, রীতি-নীতি বিষয়ে যখন কথা বলেছে তখন সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান

কালের ব্যবহার হয়েছে।

'ভেড়া-চারোয়া বনতে হামারা তগদিরকে লিখল্ কে মিটাই!'

'কা করবা বাপ, এ তোহলোককে ভাগকে কাটল।'

'গাছের মগডালে সাগনা পাখনা ঝাপটায়, ক্ষতির দশা, ঘোর ক্ষতির দশা।'

- **ঘটমান বর্তমান**

'আইজ কিষ্টো আঁইছে, টুকচান ভালো-মন্দ খাবার-দাবারের ইন্তেজাম কর তুয়ারা।'

সাঁঝের বেলা যাবেক আইজ্ঞা। এখন কি অবসর হব্যেক?

ভেড়ার দল ভোখের জ্বালায় অস্থির।

- **বর্তমান অনুজ্ঞা :** অব চল যায়ে সে বাঁচ যেইতি। ইসব হামারা দেখে নহি শকত হৈ।
- **সাধারণ ভবিষ্যত**

এ ছগরাকে গোঠে ঢুকালে পুরা গোঠ শুখা ডাঙায় ডুববেক।

যে ক'দিন বাঁচি উয়াকে লিজের পাশে পাশেই রাখব, শিক্ষা দিব, ছ'মাস গোঠের সাথে ঘুরল্যে উ বদলাইঁ যাব্যেক। এমন কিছু সংলাপ রয়েছে যেটি রূপে এক কিন্তু অর্থে ভিন্ন। যেমন—

- **রূপে ভবিষ্যত অর্থে অতীত**

'আমার জনম লিবার কথা ছিল আরও পরে। হঠাৎ আগে ভাগে ভূমিষ্ঠ হইয়্যেঁ গেল্যম, আচানক।'

- **রূপে বর্তমান অর্থে ভবিষ্যত:** 'শালা, নাম ডুব্যাল্যাক বাগাল জাতের! লষ্ট কইরে দিবেক লাইনটা।'
- **রূপে বর্তমান অর্থে অতীত**

'বাঙলা-মুলুকের আধখান জুড়ে প্রায় প্রতিটি গাঁয়েই ডেরা পেতেছি বাবু, উই করে উম্বরটা কাটল্যাক।'

বাক্যতত্ত্ব

গঠনের দিক থেকে বাক্যকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা—সরল বাক্য, জটিল বাক্য এবং যৌগিক বাক্য। উপন্যাসে এদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

- **সরল বাক্য :** 'ছ' মাস গোঠের সাথে ঘুরল্যে উ বদলাইঁ যাব্যেক।' 'উই করে উম্বরটা কাটল্যাক।'
- **জটিল বাক্য :** 'উটি বলত্যে লারল্যম আইজ্ঞা। বাঘা লিয়ে বারাইঁ যায়, উসকা বাদ কে যে কুনদিকে যায়, হামার পক্ষে মালুম করা দুষ্কর।' কাগে আধার বাটছে, আইজ গোঠে মেহমান আইবেক।
- **যৌগিক বাক্য :** 'বচপন থেকে তালিম না দিলে এসব কাজ শিখবে কি করে মুনসী ভকত কুলে জনম লিয়েছে যখন, জাত-বেবসা তো করতেই হবেক। শিখে লিক, বচপন থেকে। বুঢ়া ময়না রামজী ভজে না।' অর্থের দিক থেকে বাক্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—
- **নির্দেশাত্মক বাক্য :** এটিকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক।
- **অস্ত্যর্থক বাক্যের দৃষ্টান্ত:** 'তুম হামারা সব কইকো লিডর।' 'ভেড়া-চারোয়া বনতে হামারা তগদিরকে লিখল।' 'হামরা সামনের ভোটে তোমাকেই ভোট দিব। তুম মন্ত্রী বনেগা।'
- **নঞর্থক বাক্যের দৃষ্টান্ত :** 'অব জীয়ে কে ইচ্ছা নহি বা নহি বা...।' 'উটি বলতে লারল্যম আইজ্ঞা।' 'আজ দেওতা সাথ মে নাই।'
- **প্রশ্নসূচক বাক্য :** শুধোয়, তুমার নামটি কি হে 'মুনসী ভকত।' 'ঘর কুথা বটে বাঁকুড়ার লোকপুরে, না বিহার মুলুকে।' 'বিহার মুলুকমে জী।' 'হে মুনসী, কা হয়ীল বা, সতর আছ তো কুত্তা অত ডাকে কেন?' 'পাশটিতে এসে থামে ওরা। মুনসীদের কয়েক পলক দেখে। বলে, 'কি হে, ভেড়া চরাচ্ছ নাকি?' 'জী, হুজুর।' মুনসী জোড়হাতে নমস্কার জানায়। 'বাড়ি কুথা' এবার জবাব দেয় পদিনা ভকত। বলে, 'আমার কুনো ঘর নাই আইজ্ঞা, গোঠের পিছু পিছু ঘুরি। ইয়ার ঘর বিহার-মুলুকে!' অপরিচিত ছেলেগুলি এসে প্রথম যখন তাদের প্রশ্ন করে, মুনসী ভকত উত্তরের সাথে নমস্কার জানায়। পথে-প্রান্তরে কোনো উটকো

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে রাজি নয় এরা। যেখানে গোঠ নিয়ে যায়, সেখানকার মানুষের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে। এরপর ছেলেগুলি তাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্ন-উত্তর পর্ব সেরে মুনসী এবং পদিনা ভকত কে ছাপ্পা ভোট দিতে নিয়ে যায়।

● **অনুরোধ :** 'নারাজ হবেন নাই সাহেব। একটা ভেড়া লিয়ে ছেড়ে দিন। গরীব আদমি আমরা। অন্যের ভেড়া চরিয়ে পেট চালাই হুজুর।' 'বাবুমশায় গুসা কইর্বেন নাই। থাণ্ডা হোন, বাবুমশায়, থির হইয়েঁ কথা শুনুন আমাদ্যার।"

● **উপদেশ :** ক) 'শিখ লে বান। জলদি শিখ লে।" খ) 'মহাভারতের অন্ধরাজার দুটি মাত্তর ব্যাটার দোষে গোটা কৈরব বনশো ধ্বনশো হইয়েঁছিল হে! ছা' কে অতএব সামলাও, বুঢ়া। লচেৎ বিপদ রাখবার জা'গা মিলবেক নাই। পরদেশী মেয়ার সাথ পিরীত! গোঠ জীবনের রীতি লয় ইট্যা।"

● **বিস্ময়াদিবোধক :** 'তাজ্জব! এ্যাদ্দিন ত উয়্যাদ্যার উদিগেই থাকবার কথা। বিরবদা থিকে রওনা দিয়েছে সেও আজ দিন দশ-বারো।'

● **কার্যকারণাত্মক বাক্য**

ক) 'কাগে আধার বাটছে, আইজ গোঠে মেহমান আইবেক।'

খ) 'এ ছগরাকে গোঠে ঢুকালে পুরা গোঠ শুখা ডাঙায় ডুববেক।'

● **শব্দভাণ্ডার**

আরবি ফারসি শব্দ সমূহ : তগদির—তকদির; তকদীর, বি. ভাগ্য; নসিব; অদৃষ্ট; কপাল; নিয়তি (আ. তাক্বদির); **জলদি**—ক্রি. শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি, দ্রুত (ফা. জলদি); **মেহমান**—বি. অতিথি, নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত (ফা. মেহমান); **ইন্তেজাম**---বি. ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, আয়োজন (আ. ইনতিজার); **উম্বর**—ওমর-বি. বয়স (আ. উর্); **তালিম**—বি. শিক্ষা, উপদেশ, জ্ঞানদান, শিক্ষিত, উপদিষ্ট, চর্চা, অভ্যাস (আ. তা'লিম); **মালুম**—বি. বোধ, উপলব্ধি, জ্ঞান, অনুভব, জ্ঞাত, অনুভূত (আ. মা'লুম); **মুলুক**—মুল্লুক বি. দেশ; রাজ্য, বৃহৎ এলাকা (আ. মুলক); **উজবুক**—উজবুক বিণ. মূর্খ; অশিক্ষিত; বেকুফ; আহাম্মক; হদ্দবোকা (ফা. উযবক); **সবুর**—ছবর, বি. ধৈর্য; সহ্য; অপেক্ষা, দেরি বা বিলম্বকরণ, বিণ. ধীরে; আস্তে (আ. সবর); **মাফি**—বি. মার্জনা; ক্ষমা (আ. মা'আফি);**নারাজ**—বিণ. অসন্তুষ্ট; গররাজি; অসম্মত; অপ্রসন্ন; অস্বীকৃত (ফা. নারাজ); **আদমি**—বি. আদম সন্তান; মানুষ, লোক; ব্যক্তি, পুরুষ, স্বামী (আ. আদামী); **হুজুর**—বি. সম্মানসূচক সম্বোধন; মহাশয়। প্রভু; মনিব, প্রভুর সমীপ; সমীপ; নিকট; সম্মুখ (আ. হুজুর; হুদুর); **আওরত**—ঔরত বি. নারী; মহিলা; স্ত্রীলোক, পত্নী, (আ. আউরাত); **আজাদী**—বি. স্বাধীনতা; মুক্তি; নিষ্কৃতি; বন্দিত্ব থেকে মুক্তি (ফা. আজাদি); **মুনসী**—বি. কেরানি; যিনি লেখাপড়ার কাজ করেন, লেখক, বিদ্বান ব্যক্তি (আ. মুনশি); **ফায়দা**—ফয়দা- বি. সুফল; লাভ, উপকার; মঙ্গল; সুবিধা; সুযোগ; আবশ্যক (আ. ফাইদাহ);**জরুরত**—বি. দরকার; প্রয়োজন; আবশ্যক (আ. জরুরৎ); **মুরুব্বি**—বি. অভিভাবক, সহায়ক; পৃষ্ঠপোষক, গুরুজন, মাতব্বর, প্রাচীন লোক, উপদেশক, উপদেষ্টা, রক্ষক (আ. মুরব্বি)।

● **হিন্দিশব্দ:** বনেগা (তৈরি হবে), সনসার (সংসার), আচানক (হঠাৎ), ছগরা (ছেলে),পুরা (সমগ্র), শুখা (শুকনো), অব(এখন), জীয়ে (বাঁচার), নহি (নেই), চলচলে, যায়ে (গেলে), বাঁচ (বেঁচে)

● **ইংরাজি শব্দ সমূহ :** ডিপটি---ডিউটি (Duty- কার্যভার); ইস্পেশাল---স্পেশাল (স্পেশাল-বিশেষ); এসপার্ট—এক্সপার্ট (Expert- বিশেষজ্ঞ); ইলেট্রিরি—ইলেকট্রিক (Electric-বৈদ্যুতিক); ভিটিনারি--- ভেটেরিনারি (Veterinary-পশুচিকিৎসা); কমনিশ ---কম্যুনিস্ট (Communist-সাম্যবাদী)।

● **উপন্যাসেব্যবহৃতশব্দ:** হুঁড়ার—বন্য পশু; গাভার—দুধের বাচ্চা; চেরিয়া বাচ্চা—চরতে শিখেছে; ফুসসা—রোগ বিশেষ; ডেরোয়াহা—ডেরা পাহারা দেয় যে; মুড়করাই—ভেড়াদের লোম পরিষ্কার করা;

ডেরা—আস্তানা, আড্ডা, মূল হল হিন্দি শব্দ, ফাঁকা মাঠের মধ্যে খোলা আকাশের তলায় বা কোনও গাছের তলায় বসবাস, কামিনা-একটি বুনো ফলের বীজ।

● **কর্মসংগীত :** 'মুনসীর থেকে সামান্য তফাতে আলের ওপর বসেছে পদিনা ভকত। গুনগুনিয়ে গান গাইছে আপন মনে—"ভাগকে পিঁজড়া মে আদমি রহেলা/লুহা কা পিঁজড়া মে চিড়িয়া,/তো ভি আদমিলোগ শোচ লেত বা/বাঁধ লেঙ্গো স্বরগ কা সিঁড়িয়া।" গানখানি বড়ো প্রিয় পদিনা ভকতের। মাঝে মধ্যেই গায়, ওর গলা থেকে ঝরে ঝরে পড়ে সীমাহীন হতাশা আর বিষাদ। কোনো স্বর্গের সিঁড়িটি বাঁধতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে পদিনা ভকত, ভগবানকে মালুম। কিনটি মুনসীর কেন জানি মনে হয়, মানুষটার বুক জুড়ে জমাট বেঁধে রয়েছে যুগ যুগ সঞ্চিত সীমাহীন বিষাদ। বিষাদ, বিষাদ। মাঝে মাঝে বরফের চাঙড়ের মতো গলে গলে পড়ে গান হয়ে।'

● **প্রবাদ-প্রবচন : 'কাগে আধার বাঁটছে, আইজ গোঠে মেহমান আইবেক'**—বিষমি ভকত যে দৃশ্যটা দেখেছিল সেটা হল, কয়েৎ-বেল গাছের ডালে বসে একটা কাক তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চাটা তার লাল টকটকে মুখখানি ফাঁক করে সমানে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচাচ্ছিল, আর বুড়ি কাক বার বার ওর মুখে খাবার উগরে দিচ্ছিল। গোঠে আজ শ্রীকৃষ্ণ ভকত আসবে- এই ভবিষ্যৎ বাণী বিষমি ভকত আগেই করেছিল। এবার তার সাথে যুক্তি জুড়ে দেওয়ার অবসর পেল সে। 'কুনো কাজে নাই বৌড়ি, লাউ কুটতে দৌড়াদৌড়ি।'—এর মর্মার্থ এই যে, চালাক বউ, কাজ দেখাতে লাউ কোটার মতো সহজ কাজটিই বেছে নিয়েছে। গোঠের মধ্যে সম্পত ভকত হল কামচোর মানুষ। যে কোনও পরিশ্রম সাধ্য কাজ হলেই সে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু দলের মধ্যে থাকতে হলে মুখ বাঁচাতে কিছু কাজ তো করতে হবে তাই অপেক্ষাকৃত সহজ কাজটিই সে বেছে নেয়। সম্পত ভকত সম্পর্কে উক্তিটি করেছে দাহো ভকত।

'বুঢ়া ময়না রামজী ভজে না'—মুনসী এখন নবীন বাগাল। সে এখন গোঠ জীবনের রীতি-নীতি শিখছে। কোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রে ছোটো বয়সেই শেখা উপযোগী। বেশি বয়সে শেখার ধৈর্য্য এবং ইচ্ছা কমতে থাকে। **শিমুল গাছে সাগনা**—শিমুলগাছের মগডালে একটা শকুন ঘনঘন পাখনা ঝাপটাচ্ছে। ফল পশু হানি। জীবন যাবে। শুকুন ডানা ঝাপটায় মরা পশুর লোভে। 'খামোকা সব কবুল করে, শেষে এক করতে আর হব্যেক, কোপনি সার। ঢিলিয়ে ক্যাঁগলাস গায়ে তোলে কোন উজবুক!' "সকালের মেঘ, মেঘ লয়, সকালের কুটুম, কুটুম লয়। এ মেঘ কাইট্যে যাবেক।"—কপালে নাই ঘি/তার, ঠকঠকালে হব্যেক কি?

উৎসের সন্ধানে

১. ছন্দা ঘোষাল : 'বাগাল', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

তথ্যের সন্ধানে

১. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ : 'বাঙালি জাতি পরিচয়', সাহিত্যলোক, পূনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৪৭-৪৯
২. ভগীরথ মিশ্র : 'চারণভূমি', দে'জ, পাবলিশিং, কলকাতা, পররথম পররকাশ
৩. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত : 'পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা', কোরক সংকলন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩

অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ বাজিকরদের জীবনের উপাখ্যান

স্বপন রানা

সতত পরিশ্রমী এই কথাসাহিত্যিকের শিল্পীসত্তা বহু বর্ণিল প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। অভিজিৎ সেনের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ জানুয়ারি, বাংলাদেশের তৎকালীন বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থানাধীন কেওড়া গ্রামে। পঞ্চাশের দশকে দেশবিভাগের অস্থির সময়েই তাঁরা কলকাতা চলে আসেন। ‘রহু চন্ডালের হাড়’ অভিজিৎ সেনের প্রথম উপন্যাস। উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর (বাজিকর) গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে অভিজিৎ সেনের বহুলবিশ্রুত উপন্যাস ‘রহু চণ্ডালের হাড়’।

‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসটি মূলত উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের কাহিনি। আর্যীয় আগ্রাসন বা আর্যীকরনের পর হাজার বছরের স্রোতধারায় বিচিত্র উত্থান-পতনে বিপর্যস্ত, বিপন্ন, অবসাদগ্রস্থ বাজিগর গোষ্ঠী। এই ছিন্নমূল সম্প্রদায়ের দেড় শতাব্দীর জীবনসংগ্রামের ইতিহাস ‘রহু চণ্ডালের হাড়’। দেড়শ বছরের-এ দীর্ঘ সময়কে ধারণ করার প্রয়াসে অভিজিৎ সেন বেছে নিয়েছেন ৬৩ পরিচ্ছেদে এক মহাকাব্যিক ক্যানভাস। সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় ঘটনার বিস্তার ঘটিয়েছেন লেখক। বাজিকরদের জীবন এগিয়ে চলে, সময়ের বিবর্তনে বাজিকররা রহু নির্দেশিত অন্বেষণে ছুটে চলে রাঢ় অঞ্চলের বিস্তৃত ভূখণ্ডে। কিন্তু সমকালীন ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় তাদের বারবার বিপর্যস্ত হতে হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যাযাবর গোষ্ঠী বাজিকরদের জীবনসংগ্রামের চালচিত্র তুলে এনেছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি বাজিকর গোষ্ঠীর মিথ, লোকবিশ্বাস, প্রথা ও রীতি-নীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং সমস্ত কিছুকে তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে স্থাপন করেছেন। এই বাজিকর গোষ্ঠীর মানুষগুলো প্রকৃতি

প্রেম আর জাদুবাস্তবতার অবলম্বনে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ঔপন্যাসিক এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—চন্ডালের হাড় শুধু যাযাবরদের জীবন সংগ্রামের কাহিনি নয়। এই যাযাবর গোষ্ঠী, আমার উপন্যাসের যে গোষ্ঠীর নাম বাজিকর, তাদের এক দেড়শো বছরের ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটা বিস্তৃত অঞ্চলের এই সময়ের সমাজ, ইতিহাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়কে টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।

২

উপন্যাসের পরতে পরতে রয়েছে রহুর উপস্থিতি। এক সুগভীর ব্যঞ্জনায় 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে মিশে আছে। এই হাড় কিভাবে তৈরি হয়েছিল তা জানার পূর্বে, রহুর পরিচয় জানা আবশ্যক। কিশোর শারিবাকে তার নানি লুবিনি শোনায় রহুর জন্ম বৃত্তান্ত—

> ঘোর অমাবস্যায় এক বিটিছেলের এক ছেল্যা হবে। সি হবে একোই বেটা। সি ব্যাটাক মরবা হবে অমাবস্যার দিনোৎ আর লাশ ভাসান হবে আমাবস্যার আতোৎ। তবি সি লাশ গহিন আতোৎ নদী থিকা উঠাবা হবে। তা-বাদে তার কণ্ঠার হাড়ে বানাবা হবে ভান্মতির হাড়। সি হল রহু চণ্ডালের হাড়।[২]

বাজিকরদের জীবনে রহু চণ্ডাল এক পৌরাণিক চরিত্র। বাজিকর গোষ্ঠীর সে আদিম পূর্বপুরুষ, আদি পিতা। রহু তার মানুষ নিয়ে সেই ভূখণ্ডে থাকত, সেখানে জীবন ছিল নদীর মতো, নদীতে ছিল অফুরন্ত স্রোত, বনে অসংখ্য শিকারের পশু এবং মাঠে অজস্র শস্য। মানুষ ছিলো স্বাধীন, সুখী। এরপর সেই বহিরাগত লোকটি এল, যে প্রথমে রহুর সেরা ঘোড়াটি নিয়ে গেল। রহু বাধা দিল না। দ্বিতীয়বার লোকটি এল অনেক লোক-লস্কর নিয়ে, পবিত্র নদীর তীরে তাদের দেবতার মন্দির নির্মাণ করেছিল, ফেরার পথে রহুর জনপদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিল, শস্য নষ্ট করেছিল, রমণীদের ধর্ষণ করেছিল এবং বাধাদানকারীদের হত্যা করেছিল। এবারও রহু তাকে কোনও বাধা দিতে পারল না। তৃতীয়বার লোকটি এল আরও বলশালী হয়ে, যাদের প্রতিরোধ করার শক্তি রহুর ছিল না। এবার সে নিয়ে এল তার পুরোহিতদের, মন্দিরে তাদের দেবতা স্থাপন করল এবং তাদের বিচিত্র রীতি-পদ্ধতির অনুশাসন ও বিধিনিষেধ প্রতিষ্ঠা করল। রহুর জনপদে যাবতীয় সম্পদ শস্য, পশু, এমনকি স্ত্রীদেরও আগন্তুকরা বল প্রয়োগে দখল করল। অবশেষে রহু একসময় আবিষ্কার করল, বহিরাগতদের যাবতীয় ভ্রষ্টাচার তার নিজ গোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ করেছে।

তারপর গোষ্ঠীর সকলকে ডেকে রহু স্বীকার করে নিল, সে তাদের রক্ষা করতে পারেনি। বহিরাগতরা তাদের অন্ত্যজ করে দিয়েছে, তাদের পবিত্র নদীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচারকে প্রবেশ করিয়েছে। সেই অসম্মান ও অধঃপতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রহু প্রাচীন অধিকার ও সমৃদ্ধিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিল। নদীকে পুনরায় অধিকার করার সঙ্কল্প নিয়ে রহু এগিয়ে চলল। বহিরাগত সৈনিকরা তাদের পথ আটকালো। প্রথমদিনের সেই পুরুষ প্রবল খড়গাঘাত করল রহুর বক্ষদেশে। তার দেহ ছিটকে পড়ল সেই নদীতেই এবং প্রবল গর্জন করে তার অনুগামীরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে তার দেহকে রক্ষা করতে। রহুর ক্ষত থেকে জলস্তরের মতো উচ্ছ্রিত হতে লাগল রক্ত এবং সেই রক্তের প্রবল বন্যায় নদী উঠল ফেঁপে। সেই রক্তের নদী বহিরাগতদের নগরী, দলত্যাগীদের ভূখণ্ড সব গ্রাস করে ধ্বংস করল। অবশেষে বন্যার বেগ মন্দীভূত হলে তারা একদিন তীর খুঁজে পেল এবং রহুর দেহের অস্থি কয়খানি আশ্রয় করে নতুন পথে পা বাড়ালো। তারা রহুকে দেবতার স্থানে বসাল—"হিন্দুর ভগবান আছে,

মোছলমানের আছে আল্লা, খ্রিষ্টানের যেশু। তো হামরার বাজিকরের রহুই সি ভগবান।"[২]

৩

বাজিকর গোষ্ঠীর যে ঐতিহাসিক পুরুষকে আমরা প্রথম দেখি, তার নাম দনু। এই দনুর বংশধরেরা মৃত্যুর আগে রহুকে প্রত্যক্ষ করে। প্রীতেম প্রসন্ন রহুকে দেখেছিলো, আর জামির দেখে বিষন্ন রহুকে, যেমনটি ঠিক দনু দেখেছিলো। মরার আগে লুবিনিও রহুকে দেখেছিলো। যখনই বাজিকর গোষ্ঠী বিপদে পড়ে, তখনই তারা রহু চণ্ডালের হাড়ে তেল-সিঁদুর লাগায়। তারপর মানুষের মনোরঞ্জন করে খুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করে। কিন্তু আসল রহু চণ্ডালের হাড় লুকিয়ে আছে কোনও এক ভূখণ্ডের ফলপ্রসূ মৃত্তিকার গভীরে, যে স্থানটি বাজিকরকে খুঁজে বের করতে হবে। সেই স্থানটি খুঁজে বের করার জন্যই বাজিকরের এই ভূ-পরিক্রমা।

বাজিকরদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে সেই হাড়কে খুঁজে বের করা। পীতেম থেকে শুরু করে শারিবা পর্যন্ত বংশানুক্রমে সেই হাড়ের সন্ধানে সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের পরিক্রমা চলতে থাকে। রহু যেন তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে অচ্ছেদ্য ভাবে। তাদের বিশ্বাস রহু তাদেরকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে চলেছেন অবিরত। সর্বদা তার দৃষ্টি বাজিকরদের উপর বর্তায় থাকে—"দনু বলে, পীতেম, রহু আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমাদের রক্ষা করেন, নতুন ভূখণ্ডে আমাদের সুস্থিতি না করিয়ে তাঁর মুক্তি নেই।"[৩]

বাজিকরদের থিতু হওয়া যেন ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। বাজিকর নামের সঙ্গে যেন মিশে আছে বান্দর নাচানো, ভান্‌মতির খেলা, বাঁশবাজি, দড়িবাজি, কাঠের পুতুল নাচানো প্রভৃতি বিষয়গুলো। বাজিকরদের আদি বাসস্থান ছিল গোরখপুরের পশ্চিমের দিকে। তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পবিত্র ঘর্ঘরা নদী। শনিবারের ভূমিকম্পে ঘর্ঘরার বিশাল তীরভূমি নদীগর্ভের সঙ্গে তলিয়ে গিয়েছিল। আর তাতে মিশে গিয়েছিল—"গোরখপুরের বাজিকরদের জীর্ণ বাড়িঘর। ধ্বংস হয়েছিল বাজিকরদের প্রধান অবলম্বন অসংখ্য জানোয়ার।"[৪]

এরপর পীতেম পাঁচকুড়ি পাঁচজনা মানুষকে নিয়ে পিতা দনুর নির্দেশে পূবের দেশে রওনা দিল। তার মনের মধ্যে স্থিতি হওয়ার স্বপ্ন বহুকাল থেকেই। তাই তারা রাজমহলে গঙ্গার ধারে ছাউনি পাততে শুরু করে। কিন্তু পীতেমের মনে চলতে থাকে শস্য উৎপাদন উপযোগী উর্বর কোনো জলমাটির দেশে চিরকালের উদ্বাস্তু বাজিকর সম্প্রদায়কে বাস্তুভিটায় স্থিতি দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে রাজমহলের গঙ্গার ধারে তারা নিজেদের বাসা তৈরি করে। পীতেম গেরস্থ হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই সময় পীতেমের সঙ্গে ভাব ঘটে সাঁওতাল পরগনার লক্ষ্মণ সোরেনের সঙ্গে। জমিতেই এক অনাবিল আনন্দ রয়েছে, চরম শান্তি রয়েছে এই কথা পীতেমের অভ্যন্তরে প্রোষিত করে লক্ষ্মণ সোরেনই। পয়সা খরচ করে রাজমহল পাহাড়ের গায়ে পাঁচ বিঘা জমির পত্তনি নেয় পীতেম জমিদার নায়েব শ্যামল মিশ্রের কাছ থেকে। পরে জানা যায় ওই সব পাট্টা ভুয়ো পাট্টা ওতে জমিদারের দস্তখত নেই। এর পর লক্ষ্মণ সোরেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এরপর দেখা দেয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। তা দমন করতে পুলিশ কড়া হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই যুদ্ধে পীতেমের ছেলে ধন্দু মারা যায়, পাঁচজন বাজিকর যুবককে ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এই ঘটনার পর তারা রাজমহল ছেড়ে মালদা শহরের অভিমুখে রওনা হয় নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। জমিদার বদিউল ইসলাম বাজিকরদের জমির পত্তনি দেয় মালদা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে জামিলাবাদের নমনকুড়ি গ্রামে। পরতাপ বুনো ধান চাষ করে সমস্ত অঞ্চলে প্রসংশিত হয়। পীতেম লক্ষ্য করে—

পরতাপের ভিতরে সেই বিচিত্র নেশার জন্ম হয়েছে, যার কথা লক্ষ্মণ সোরেন তাকে বলেছিল। ধানের গাছ যখন গামর হয়, কলার গাছে যখন মোচা আসে, সব্জিতে যখন ফুল আসে, পীতেম লক্ষ্য করে পরতাপের ভাবভঙ্গি অন্যরকম হয়ে যায়, যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে সে।[৫]

এই নমনকুড়িতেই সাত বছর বেঁচে থাকার পর পীতেম পরলোক গমন করে। বদিউলের ছেলে জামাল জমিদার হওয়ার পর বাজিকদের জীবনে নেমে আসে দুর্দিন। সে বাকিকরদের উপর অতিরিক্ত খাজনা বসায়। এদিকে প্রকৃতিও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে। প্রবল বর্ষায় নমনকুড়ির আবাদি সমস্ত জমি জলের তলায় তলিয়ে যায়। বাজিকররা জামিরের নেতৃত্বে রাজশাহি শহরের বাইরে পদ্মা নদীর ধারে নিজেদের ঘাঁটি পেতে বসে। পরে আবার তারা রাজশাহীর উত্তরে পাঁচবিবি নামে একটি গ্রামে, পাতালু নদীর তীরে পত্তনি নেয়।

৪

বাজিকরদের স্থায়িত্বের ব্যাপারটা মনে হয় ভাগ্যের বিড়ম্বনা। প্রতিবারই তাদের মনে হয় এই বুঝি তাদের দেশ। প্রতিবারই কোনো না কোনো আঘাত, সে মানুষের সৃষ্টি হোক কিংবা প্রকৃতির তা বাজিকরকে দিশেহারা করেছে। তাদের পথ চলা যেন অনন্তের পথে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি বাজিকরদের জীবনের আচার-আচরণ এর সামাজিক বিবর্তন ঘটেছে। রহুর অস্তিত্ব তারা ভুলে যায়। থিতু হওয়ার নেশায় তারা ইয়াসিনের নেতৃত্বে প্রায় দুশো জন শিশু, যুবা, বৃদ্ধ নরনারী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কলমা পড়ে। তারা রহুর অস্তিত্ব ভুলে যায়। তারা শহুরে শ্রমিক হয়ে ওঠে। বর্তমানে তারা ধর্ম পায়, দেশ পায়, আত্মপরিচয় পায়। অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থ মানুষ জনের মতো রেশনকার্ডে চিনি, কেরোসিন এইসব সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পায়। এক নতুন আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে আজন্ম যাযাবর বাজিকর সম্প্রদায়ের। বাজিকরদের এক নতুন জীবনের সূত্রপাতের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উৎসের সন্ধানে

১. অভিজিৎ সেন : 'রহু চণ্ডালের হাড়', জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, ডিসেম্বর ২০১৬, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৮১
২. তদেব : পৃ. ৮৯
৩. তদেব : পৃ. ৮০
৪. তদেব : পৃ. ৯
৫. তদেব : পৃ. ১১১

অভিজিৎ সেনের ‘রাজপাট ধর্মপাট’ : প্রেমিক, মানবিক, সংবেদনশীল শ্রীচৈতন্য

দেবারতি মল্লিক

সেই অর্থে অভিজিৎ সেন আবেগ-আপ্লুত লেখক নন। তিনি বস্তুবাদী। নকশালপন্থী আন্দোলনে যোগদানের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর লেখার মধ্যে তীব্র তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতন দৃষ্টিকোণ রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি লেখেন যে উপন্যাসগুলি তা শুধুমাত্র সাহিত্যবোদ্ধা পাঠকের-মন মনন-মেধার কাছে প্রতিধ্বনিত হয় না; বরং তা গভীর এক জীবনদর্শন থেকে যেকোনো সমাজবিদ্যা বা Human Science-এর পাঠককে আকর্ষণ করে। এখানেই অভিজিৎ সেনের দৃষ্টির অনন্যতা। ‘রাজপাট ধর্মপাট’ গ্রন্থে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রশ্নগুলি বক্ষ্যমান উপন্যাসের আখ্যানের গভীরে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ লেখক আমাদের প্রশ্নমুখর হতে সাহায্য করেন। তিনি একাধিক তথ্য সাজান এবং সংগতই তত্ত্ব থেকে দূরে থাকেন। তিনি বৈষ্ণব দর্শন থেকে সরে এসে ইতিহাসের যথাযথ বস্তুধর্মকে আশ্রয় করে। চৈতন্য-সমসাময়িক আর্থ-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির বাত্যাবিক্ষুব্ধ সময়-সংকটের গভীর সামুদ্রিক ঝোড়ো বাতাসের মাঝখানে ষোড়শ শতাব্দীর যে ইতিহাস হাজারতর বাঁক নিয়েছিল সেই ইতিহাসের কেন্দ্রপটে থাকা চৈতন্যকে সামনে রেখে গভীর এক ঋদ্ধ গবেষণার দিকে আমাদের জিজ্ঞাসু মনকে সুতীব্র আকর্ষণে রাখার পারঙ্গমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছেন।

লেখক কতগুলি প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে প্রশ্ন ষোড়শ শতাব্দীর হাজার সংকটের কেন্দ্রবিন্দু থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমান্বয়ে আমাদের মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ইতিহাসের কাজ হল নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-পরিণামের স্রোতস্বিনী প্রবাহ থেকে প্রকৃত সত্যকে তুলে আনা। সুতরাং সেখানে একের পর এক প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক। যে প্রশ্নগুলি এই উপন্যাসে উঠে

আসে তা হলো এমন—

১. শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তন করে সোজা শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে কী পরামর্শ করেছিলেন।

২. সেখান থেকে বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতেই বা তিনি অজ্ঞাতবাস করতে গেলেন কেন?

৩. রূপ-সনাতন গোস্বামী কেন ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে মাঝরাতে দেখা করতে গেলেন?

এইসব অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দেবে 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসটি। ব্যক্তিজীবনকে অবলম্বন করে যখন উপন্যাস লেখা হয় তখন তার মধ্যে ব্যক্তির সমকালীন যুগ-পরিবেশ-প্রতিবেশ কতখানি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটি আলোচনায় উঠে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হল এই সাধু-সন্ত জীবনী যাকে Hagiography বলা হয় সেই জীবনী সাহিত্যে অলৌকিকতার পদসঞ্চার শোনা স্বাভাবিক নয়। মধ্যযুগের সন্তজীবন অবলম্বনে যে আখ্যানকাব্য গড়ে উঠেছে সেখানে স্বাভাবিকভাবে ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য প্রচার অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেকথা না বললে নয়, তা হল এই জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বহু তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং সন্তজীবনী বা Hagiography বলতে বোঝায়—

> A hagiography is a type of biography that puts the subject in a very flattering light. Hagiographies are often about saints.'' (https ://www.vocabulary.com)

সুতরাং চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখার সময় লেখক ইচ্ছে করলে আধ্যাত্মিক জগতের অন্দরমহলে প্রবেশের সময় ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে অলৌকিকতার নানা কষ্টকল্পিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু অভিজিৎ সেন সেই প্রচলিত পদানুসরণের কোনোরকমে ভ্রান্তিকর সহজ সরল পথ ধরেননি।

বরং ইতিহাসের এমন তথ্য তুলে ধরেছেন, যেগুলি সহজেই দেশ-কাল-জাতির সামূহিক পরিচয় তুলে ধরতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসটি শুধু চৈতন্যজীবনকেন্দ্রিক পাঠ নয়; চৈতন্য ইতিহাসকেন্দ্রিক নতুন এক কালজয়ী উপন্যাস হওয়ার দাবি রাখে। সুতরাং এই উপন্যাসে ইতিহাসের নানা প্রামাণিক তথ্য উপন্যাসের মূল নদীটিকে বেগবান ও স্রোতস্বিনী করেছে। ইতিহাসের যে সূত্রগুলি এই উপন্যাসে উঠে আসে সেগুলি হলো—

১. চৈতন্যের জন্ম ও নবদ্বীপে সংস্কৃতি জীবন

২. হোসেন শাহের সিংহাসন দখল ও রাজ্যপাট : ১৪৯৩-৯৪

৩. প্রতাপউদ্দিনের সিংহাসন আরোহণ : ১৪৯৭

৪. চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ : ১৫১০

৫. চৈতন্যদেবের উড়িষ্যা থেকে নবদ্বীপে আগমন : ১৫১৪

৬. চৈতন্যদেবের রামকেলি গমন এবং কয়েকদিন পর শান্তিপুর হয়ে পুনরায় উড়িষ্যায় গমন : ১৫১৫

এভাবে দেশ-কাল-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিচৈতন্যের সমকাল-সমাজ-ইতিহাস-ধর্ম-দর্শনের এক সমন্বিতরূপ উঠে আসে 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসে। উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২৩।

শুরুতেই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর একটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরেছেন অভিজিৎ সেন এবং তারপরেই শ্রীচৈতন্য যে রামকেলিতে আসছেন তার একটি মুখারম্ভ করে নিয়েছেন সাংবাদিক সুলভ নির্মাণ নৈপুণ্যে। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানে তিনি না চাইলেও বহু মানুষের সমাগম হয়েছে। এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন যে তাঁর পরশ পাওয়ার অভিলাষে মত্ত মধুকরের মতো ভক্তরা ছুটে আসছেন। সুতরাং চৈতন্যদেব পদব্রজে গঙ্গার প্রবাহ ধরে উত্তরের দিকে যখন অগ্রসর হচ্ছেন তখন সহস্র মানুষ তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা গৃহধর্ম ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই এগিয়ে যাবেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ এগিয়ে চলেছেন এই খবর জেনে গিয়েছেন রাজা হোসেন শাহ। বলাবাহুল্য, কিছুটা ভীতিবোধও করেছেন। হোসেন শাহ প্রেরিত চরেরা বৃন্দাবন অভিমুখে চলেছিল এই অভিপ্রায়ে যে, এই বিপুল জনতা ঠিক কোন্ কর্মে ন্যাস্ত রয়েছে তা পরখ করে দেখে নিয়মিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পাঠানো। শ্রীচৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন তখন যাঁরা পার্ষদ ছিলেন তাঁরা হলেন—

- নিত্যানন্দ
- শ্রীবাস
- মুকুন্দ
- মুরারী
- ছোটো হরিদাস
- গদাধর
- জগদানন্দ
- বক্রেশ্বর
- ভক্ত হরিদাস

দলে দলে মানুষ এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা নৃত্য-গীত করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। অভিজিৎ সেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—শ্রীচৈতন্য যখন উড়িষ্যা ও দক্ষিণবঙ্গ ভ্রমণ করেন তখন শিল্পশোভন দৃষ্টিকোণ নিয়ে মন্দির গাত্রে শোভিত মূর্তির নানা রূপ তিনি দেখেছিলেন। অভিভূত হয়েছিলেন। আপ্লুত হয়েছিলেন। ভাব তন্ময় হয়েছিলেন। বোঝা যায়, শিল্পকলার প্রতি কি গভীর আকর্ষণ তাঁর ছিল। এইপ্রসঙ্গে একটি বিষয় সংযোজন করতে হয় যে, প্রাচীন এই ক্লাসিক ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত নৃত্য নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা করে চলেছেন এবং সেগুলিকে একালের দর্শকের সামনে এনেছেন অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়। অভিজিৎ সেন লিখেছেন 'মুসলমান অধিকারের পর থেকে মন্দিরগুলো ধ্বংস হওয়ার পর থেকে গৌড়ীয় নৃত্যের প্রচলন একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।'[১]

লেখক এই যে তথ্য দিয়েছেন তা দেশ-কাল-সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতির বিশেষ কাললগ্নকে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতি বা Historical Method অনুসারে কীভাবে একটা উপন্যাসকে বস্তুধর্মী রূপ দেওয়া যেতে পারে তারই প্রয়াস দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। চৈতন্যদেব এমনভাবে মানুষকে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে টেনেছিলেন যে গণনাতীত মানুষ তাঁদের বিরোধী ধর্ম-দর্শনকে মেনে নিয়েছিলেন। ফলে দেখা যায় এমন কতকগুলি দৃশ্য চৈতন্যদেবকে মধ্যস্থ করে সম্পন্ন করে চলেছে, যাএক কথায় লোকাতীত বা অলৌকিক। সেই অভূতপূর্ব ব্যাকুলতর ভাবের বিবরণে অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

১. মানুষ পাগলের মতো ছুটেছে।
২. চৈতন্যদেবের চরণ যেখানে পড়ছে সেখানে অসংখ্য মানুষ পদচিহ্ন সমন্বিত ধূলি মুঠো করে নিয়েছে।
৩. কর্কশ, কঠিন, রুক্ষ পাথুরে মাটি চৈতন্য পদস্পর্শে ধন্য হলে বিপুল জনতা সেই মৃত্তিকা খণ্ড গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের হাতের নখ রক্তাক্ত করে ফেলেছে।

অধ্যাপক জে. এন. সরকার চৈতন্যপ্রভাবিত যুগকে বলেছিলেন চৈতন্য রেনেসাঁ। অভিজিৎ সেন সেই জাগরণের ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ চৈতন্য হয়ে ওঠেন একটি যুগের নাম। মানুষের অবদমিত ও অবনমিত মনের জাগরণে চৈতন্য যেন যথার্থই পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোকিত করেন সবাইকে। তাঁর সংসার সম্পর্কে বীতরাগের পরিচয় আমরা পেয়েছি কিন্তু তিনি পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, মাতা-বধূ সম্পর্কে একেবারে যে উদাসীন ছিলেন তা বলা যায় না। উপন্যাসে প্রথম প্রকাশের ১১ পৃষ্ঠায় পাচ্ছি এমন তত্ত্ব—একবার জগদানন্দ চৈতন্যের মা শচীদেবীকে দেখার জন্য নবদ্বীপে এলো। এলো অবশ্য চৈতন্যের আদেশেই। শচীর সঙ্গে সে চৈতন্যের অনেক গল্প করলো। শচী অনেক চোখের জল ফেললেন। যে চোখের জল শুধু দুঃখের নয়, আনন্দের বটে। কত আনন্দের স্মৃতিও যে আছে তাঁর অবতার পুত্রকে নিয়ে।[২] চৈতন্যের সেবার জন্য তাঁর পরিকরদের যে নিয়ম-নিষ্ঠা তা মনে করিয়ে দেয় পঞ্চরসতত্ত্বের দাস্যরসের কথা। কিন্তু চৈতন্য নিজে এই সেবা পছন্দ করতেন না।

জগদানন্দ কবিরাজ শিবানন্দের কাছ থেকে এক কলসি তেল নিয়ে এসে গোবিন্দ কর্মকারকে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন 'প্রভুর মাথায় রোজ অল্প অল্প মাখাবে বুঝলে। পিত্ত, কফ, কুপিত বায়ু সব ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। শরীর ঠিক থাকবে প্রভুর।'[৩] বলাবাহুল্য, এই সুগন্ধী তেল চৈতন্য ব্যবহার করেননি। কেননা, সন্ন্যাসীর তেলে দরকার কী? বরং সেই তেল জগন্নাথ মন্দিরে দিয়ে এলে প্রদীপ জ্বালানোর কাজ হবে। এখন প্রশ্ন হল এই উদাসীনতা কেন? আসলে পার্থিব কোনো সুখ তিনি চাননি। কেননা, তাঁর মনে হয়েছিল এই সুগন্ধী তেল ব্যবহার করলে মানুষ তাঁকে কটাক্ষ করবে—বলবে বেশ্যাসক্ত সন্ন্যাসী বুঝলে? বলবে গণিকার শয্যা থেকে এইমাত্র উঠে এলো এই সন্ন্যাসী! চৈতন্য উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগলেন।[৪] জগদানন্দকে চৈতন্য আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন জগদানন্দের মন্দিরে এই তেল দিয়ে আসেন।

জগদানন্দ রাগে-অভিমানে-কষ্টে সেই তেলের কলসি ভেঙে ফেলেন। তারপর নিজের বাসায় ফিরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। এরপর তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় জগদানন্দ ঘরের দরজা খোলেননি। অভিমানী এই ভক্তের কাছে চৈতন্যদেব নিজে চললেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন—''ওঠো গো পণ্ডিত, ওঠো। এই কারণেই পুথিপত্র গঙ্গায় ফেলে আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, পণ্ডিত হইনি। শোনো, আজ তোমার কাছ থেকে রান্না করা খাবার ভিক্ষা নেব। মধ্যাহ্নে চান করে সোজা চলে আসব, খেয়াল থাকে যেন।''[৫]

চৈতন্য এভাবে মান ভাঙালেন জগদানন্দের। আসলে অভিজিৎ সেন যে চৈতন্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি প্রেমিক, মানবিক, বিচক্ষণ, সংবেদনশীল সন্ন্যাসী। ফলে তাঁর এই মানবপ্রেমের কারণেই তিনি যখন রামকেলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন বিপুল জনতা তাঁর সঙ্গ নেয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যভাগবতের দুটি চরণ তুলে ধরেছেন লেখক—''কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।/একন্যাসী আসিয়াছে রামকেলিগ্রামে॥'' উপন্যাসের শুরুতেই এই দুটি পঙ্‌ক্তি সামনে রেখে লেখক বাত্যাবিক্ষুব্ধ রাজনীতির গভীরে পৌঁছাতে চেয়েছেন। কেননা, এরপরেই দেখা যায় গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ সংবাদ পেয়েছেন সন্ন্যাসী চৈতন্য হাজার লোক নিয়ে রামকেলিতে প্রবেশ করেছেন। তিনি সপার্ষদ দবির খাস এবং শাকর মালিকের তত্ত্বাবধানে আছেন। গুপ্তচররা হোসেন শাহের কাছে নানারকম তথ্য দিয়েছেন। সেই তথ্য পরিবেশনের কারণে বেশ কয়েকটি

ছোটো ছোটো সংলাপ ব্যবহার করেছেন লেখক, যা একাঙ্ক নাটকের কোনো দ্রুততালে হতে থাকা দৃশ্যের মতো বেগবান হয়ে ওঠে। অভিজিৎ সেনের এই উপন্যাসে নিম্নলিখিত এই সংলাপ প্রমাণ করে উপন্যাসের আঙ্গিক নির্মাণে তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন—

> 'কোথা থেকে যাত্রা করেছে এরা?'
> 'নবদ্বীপের ফুলিয়া গ্রাম থেকে জাঁহাপনা'।
> 'প্রধান সন্ন্যাসীর নাম কী?'
> 'শ্রীচৈতন্যদেব, ভক্তরা তাকে মহাপ্রভু বলে।'
> 'কোথাকার সন্ন্যাসী ইনি?'
> 'নবদ্বীপ নগরেই বাড়ি ছিল এনার। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই অগ্রগণ্য এবং প্রতিভাশালী হিসাবে নাম করেছিলেন। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ এবং দেশত্যাগ করেন, হুজুর।'[৬]

ব্যক্তি চৈতন্য ইতিহাসের রাজপথ দিয়ে হেঁটে চললেন গণনাতীত মানুষকে নিয়ে। সংগতই শাসক দ্বিধান্বিত। ভীরুতা এমন এক রোগ, যার সঙ্গে গভীর সখ্যতা হয় অযথা আতঙ্ক, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-শঙ্কা এবং দোলাচলতার। সেই দোলাচলতার কারণ নির্দেশে ঔপন্যাসিক হোসেন শাহের মতো বিচক্ষণ শাসকের মানসিক বৈকল্যকেই চিহ্নিত করেছেন। আসলে ঔপন্যাসিক নিজে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সম্পর্কের অবনমনের ঐতিহাসিক কারণ সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। বঙ্গদেশের সন্ন্যাসীর উড়িষ্যা প্রীতিকে সুনজরে দেখেননি হোসেন শাহ। কিন্তু কেন? এই কেন-এর সুলুক সন্ধানে অগ্রসর হয়ে পাঠক যে তথ্য পান তা নিঃসন্দেহে বস্তুনিষ্ঠ।

অভিজিৎ সেন এই প্রসঙ্গে কী লিখেছেন একবার দেখে নেওয়া যাক—উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে গৌড়ের মিত্রতা নেই কোনো দিনই। হোসেন শাহের সিংহাসন দখলের আগে থেকেই এই দুই দেশ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। প্রতাপরুদ্র যখন রাজা হন তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। হোসেন শাহ তাঁর অভিষেকের কয়েক সপ্তাহের ভিতরে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। কিন্তু তরুণ রাজার বিক্রম কম ছিল না। গৌড়ের বাহিনীকে শুধু যে তিনি পর্যুদস্ত করলেন তাই নয়, তাড়িয়ে গঙ্গানদী পর্যন্ত পার করিয়ে দিয়েছিলেন প্রতাপরুদ্র। আত্মপ্রসাদ আকাশচুম্বি হয়েছিল এই কারণে যে হোসেন শাহকে গঙ্গা পার করিয়ে তিনি গঙ্গাতে পিতৃতর্পণ করতে পেরেছিলেন। মুসলমান ফকির, পীর, সুফি দরবেশরাও বিশেষ কোনো ধর্মাবলম্বী। তাঁদের নিয়ে যদি সম্রাটের ভয় না থাকে তাহলে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে ভয়ের কারণ কী? অভিজিৎ সেন সেই ভয়ের কারণ স্পষ্ট করেছেন এইভাবে—

১. বিগত বারো-তেরো বছরের উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ হয়েছে হোসেন শাহের। তারা যেন জাত শত্রু।
২. বিগত দু-বছর উড়িষ্যার সঙ্গে গৌড়ের যুদ্ধ বন্ধ আছে। তার অর্থ এই নয় যে কোনো শান্তি চুক্তি হয়েছে। আসলে তারা শক্তি প্রদর্শনে চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।
৩. চরের মুখে হোসেন শাহ জানতে পারেন, প্রতাপরুদ্র গৌড় আক্রমণের পরিকল্পনায় অপেক্ষারত; শুধু সময়ের অপেক্ষায়।

৪. প্রতাপরুদ্র দক্ষিণের কাঞ্চী দখল করে তাঁর শক্তি-সামর্থ্য-দম্ভ প্রকাশ করেছেন। বিজয়নগরও তাঁর অধীনস্ত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এখন তাঁর 'পাখির চোখ' হল গৌড়দেশ।

৫. হোসেন শাহ অবশ্য প্রচার করেছেন যে, প্রতাপরুদ্র নিজে গৌড় আক্রমণে উদ্যত হলে তাঁকে আর কষ্ট করে কটক পর্যন্ত যেতে হবে না।

উড়িষ্যা ও গৌড়বঙ্গের এই চাপান-উতোর পর্বের হাজার লোক নিয়ে শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে আসা হোসেন শাহের কাছে এই কারণে বেশ সন্দেহজনক—কেননা শ্রীচৈতন্যের পৃষ্ঠপোষক হলেন প্রতাপরুদ্র। এভাবে ইতিহাসের হাজরতর তথ্যে 'রাজপাট ধর্মপাট' গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে একটি কালের বহমানতার প্রতিচ্ছবি।

উৎসের সন্ধানে

১. অভিজিৎ সেন : 'রাজপাট ধর্মপাট', দে'জ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১০
২. তদেব : পৃ. ১১
৩. তদেব : পৃ. ১১
৪. তদেব : পৃ. ১২
৫. তদেব : পৃ. ১৩
৬. তদেব : পৃ. ১৪

অমর মিত্রের ‘হাঁসপাহাড়ি’ প্রান্তিক মানুষদের জীবনচিত্র

সুখেন্দু ঘোষ

ইতালি শব্দ ‘Subalterno’ বা ইংরেজি ‘Subaltren’ প্রথম ব্যবহার করেন Antonio Gramsei তাঁর Prison Notebook গ্রন্থটিতে। রনজিত গুহ যার বাংলা প্রতিশব্দ করেন নিম্নবর্গ। এই নিম্নবর্গের সঙ্গে কতগুলি শব্দ সম্পর্কযুক্ত দলিত, ব্রাত্য, অন্ত্যজ ও প্রান্তিক। ‘প্রান্ত’ সঙ্গের ‘ইক’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রান্তিক শব্দটি নিষ্পত্তি হয়েছে। ‘প্রান্তিক’ বলতে বোঝায় সমাজের শেষ সময় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে। তবে প্রান্তিক রূপ প্রতিপালিত হয় ব্যক্তির ভাষা, জাতি, খাদ্য, পোশাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ভেদে। তথাকথিত এলিট বা উচ্চশ্রেণির কাছে মানুষ হিসাবে যারা অবহেলিত নিপীড়িত শোষিত অধিকার বঞ্চিত ও সমাজ বৈষম্যের শিকার। তবে এই প্রান্তিক মানুষগুলোই হাত ধরেই সভ্যতার ইমারত গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—“ওরা চিরকাল/টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;/ওরা মাঠে মাঠে/বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।/ওরা কাজ করে/নগরে প্রান্তরে।”[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ওরা’ হল শ্রমিক শ্রেণি। এরাই নিম্নবর্গ, এরাই প্রান্তিক। এর বিপরীতে থাকে সাম্রাজ্যলোভী, বুর্জোয়া বা হেগেমনি বা এলিট শ্রেণি। যারা এই প্রান্তিক মানুষগুলোর ওপর শোষণ ও শাসন করে সভ্যতার উঁচু শ্রেণিতে বাস করে। এবং সাম্রাজ্য ভোগ করে। সমাজ সচেতন সাহিত্যিকদের লেখায় এই প্রান্তিক মানুষরা বারবারই উঠে আসে, প্রাচীন ও আধুনিক সময় ভেদে। অমর মিত্র বর্তমান সময়ের কথাকার। জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ৩০ আগস্ট বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় ধূলিহর গ্রামে। উপন্যাস বিশ্বে তাঁর প্রবেশ বিশ শতকের আটের দশকে। তার ‘হাঁসপাহাড়ি’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘প্রতিক্ষণ পত্রিকায়’ শারদীয়া ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে। উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে প্রান্তিক সমাজ জীবনের

কথা। বাউরি, লোহার, বাগদি, সাঁওতাল প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষের জীবনের দুর্দশা লেখক সযত্নে এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রান্তিক মানুষগুলো কখনো উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে লালসার শিকার হয়েও মুক থাকতে বাধ্য হয়েছে। উপন্যাসের ব্লার্বে 'হাঁসপাহাড়ি' সম্পর্কে জানানো হয়েছে পশ্চিম সীমান্তের বাংলার অখ্যাত এক জনপদ হাঁসপাহাড়ি। কেউ কেউ জানে উড়ন্ত হাঁসের রূপ নিয়ে এই জনপদ পড়ে আছে নিসঙ্গ। এখানে আছে এক প্রাচীন বট বৃক্ষ। তার কোলে লৌকিক দেবতা যিনি কান্না রোধ করেন। এই কাঁদন্যা বুড়ি প্রতি প্রান্তিক মানুষদের লোকবিশ্বাস ও তাদের অসহায়ত্ব দিয়ে উপন্যাসের প্লট গঠিত হয়েছে। হাঁসপাহাড়ির মানুষদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

> হাঁসপাহাড়িতে মানুষের হিশেবের গড়মিল হয়েছে বহুবার। জন্ম-মৃত্যু বাদেও কতবার যে মানুষের সংখ্যা বাড়ে কমে! পঁয়ষট্টি-ছেষট্টির ভয়াবহ করার সময় না মরেও মানুষের সংখ্যা কমে গেছে ধীরে ধীরে। এবাদে বছর বছর হিশেবের উলোটপালোট হয়। এই যে ধান রোয়া কাটার জন্য নিম্ন অঞ্চলে চলে যায় এখানকার বাউরি লোহাররা একসঙ্গে বাস বোঝাই হয়ে, যখন আলাদা আলাদা ভাবে ফেরে সংখ্যার গলমিল হয়। কেউ ফিরে কেউ ফেরে না। আবার কেউ হয়তো নতুন মানুষ নিয়েও ফেরে। হয়তো কোন রমণী ভিন জেলায় প্রসব করেছে তার সন্তান। তাকে নিয়ে হাঁসপাহাড়িতে ফেরা মানে, গিয়েছিল একজন, ফিরল দুজন। কেউ কেউ থেকে যায় বর্ধমান বা হুগলিতে কেননা তাদের হাঁসপাহাড়িতে ফেরাও যা ওদিকে থেকে যাওয়াও তা। এখানে তাদের ভিটে নেই জমি নেই ভাতের সংস্থান নেই। কোন যুবতী হয়তো ওই দিকে গিয়ে সংগ্রহ করে নাই তার পুরুষসঙ্গীটিকে। সেও ফেরে না আর। এইভাবে হাঁসপাহাড়ের মানুষের হিশেব ঠিক থাকে না কখনো।[২]

তবে হাঁসপাহাড়ের মানুষদের কাছে এই অভিজ্ঞতা নতুন নয়। এই মানুষগুলোর তেমন কেউ খোঁজ নেয় না। খরা, অনা বৃষ্টির সঙ্গে রোগ শোক তো লেগে আছে বাউরি, বাগদি, লোহারদের বস্তিতে। তাদের জীবনে বিশেষ কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। নতুন শহরে গিয়ে কখনো তারা ভিখারি বা মজুর হয়ে ওঠে। তবে তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রবল হয়। তাই তারা পাথরকেও দেবতার চোখে দেখে। এই সহজ সরল মানুষগুলোর উপর উচ্চবর্ণের মানুষগুলো নিজেদের স্বার্থান্বেষে অত্যাচার করে। তাদের বিশ্বাসে আঘাত করে। এবং শাসন ও শোষণের মধ্যে দিয়ে তাদের দমিয়ে রাখে। আসলে সময়ের কালস্রোতেও প্রান্তিক মানুষদের রূপভেদ হয় না। অমর মিত্রের এই বর্ণনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলে পাড়ার জীবনচিত্রেরই অনুরূপ—

> জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না। এ দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ও দিকে প্রাকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চাই। বর্ষার জল ঘরে ঢকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়ে বাজে কন্‌কন্। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেরারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়।[৩]

'হাঁসপাহাড়ি' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে রবিলোচন ও বন্দনার পুত্র সুনন্দ। বসিরহাটে রবিলোচন দত্ত হাঁসপাহাড়ি ব্লক অফিসের রিটায়ার্ড বড়োবাবু। রবিলোচন আঠাশ বছর আগে হাঁসপাহাড়ি এসেছিলেন জরাজীর্ণ শরীর ও পেটের আলসার নিয়ে। হাঁসপাহাড়ি জল হাওয়া তাকে নতুন যৌবন দিয়েছে। ছেলে সুনন্দ বড়ো হওয়ায় তার চাকরির জন্য রবিলোচন চিন্তিত হয়ে

পড়েন। এক সময় রামশঙ্করের পরামর্শে সুনন্দ পাহাড়ে পাথর কাটার ব্যবসায় নামে। ভালগা পাহাড়ে একটি মৌজা, তার দুটি দাগের মধ্যে আছে একটি পাহাড় অন্যটির পাহাড়তলী। যেখানে আছে প্রাচীন বটবৃক্ষ ও কাঁদন্যাবুড়ির থান। বাউরি, বাগদি, লোহার প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষের কাছে এই বুড়ি ঠাকরুনই হল একমাত্র সহায় ও আশ্রয়স্থল। তাদের দুঃখ-কষ্ট সেইই দূর করে আসছে। সুনন্দের ব্যবসার লিজ বেরিয়েছিল বুড়ির স্থান বাদে সমগ্র ভালগা পাহাড় ও পাহাড়তলীর অঞ্চল। অর্ধপিপাসু সুনন্দ চেয়েছিল কাঁদন্যা বুড়ির স্থানটি সরিয়ে দিতে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় কেটে টুকরো টুকরো পাথর তৈরি করে চালান করায় হল সুনন্দার ব্যবসা। কাঁদন্যা বুড়ির স্থানে বুড়ো বটগাছটা একদিন সুনন্দ ডিনামাইটের আঘাত উপরে পড়েন। গাছটি যেন একটি জীবন্ত মানুষ। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা—

> গাছ শিকড় ছিঁড়ে মাটি উপড়ে পড়েছিল রোগজর্জর বৃদ্ধের মত, টলমল করতে করতে, দুহাতে শূন্য প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে হা হা করতে করতে। শেষে বোধহয় বুক চেপে প্রিয় স্বজনদের মুখ স্মরণ করতে করতে। তার স্বজন হলো সন্তানেরা, যারা তার আশ্রয়ে ছিল, তার অভাবে যারা অনাথ হয়ে পড়বে সেইবাউরী বাগদি ডোম লোহার জনগোষ্ঠী। তারা তার নিচে বসে গান গাইত, তার নিচেই বসে সুখ দুঃখের কথা বলত। তার নিচে বুড়িঠাকুরুনের কাছে কান্না হরণের প্রার্থনা জানাত। গাছ পড়ছিল তাদের কথা স্মরণ করতে করতে। ভীষণ দুর্দম ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করতে করতে।[৪]

এই গাছ উপড়ে পরার পিছনে যে সুনন্দ সে কথা কাউকে সে বুঝতে দেয়নি। তিনি প্রথমেই এই প্রান্তিক মানুষদের কাছ থেকে বিশ্বাস অর্জন করে নিয়েছিল। বুড়ি ঠাকরুনের পুজোর সময় চাঁদা দিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রাচীন বট বৃক্ষসহ বুড়ির স্থানটি বাধিয়ে দেবে। সেই সুনন্দই এক সময় প্রান্তিক মানুষদের বুড়ি ঠাকরুনকে হাতুড়ের আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিল তাদেরই অজান্তে। হাঁসপাহাড়ির গরিব বাউরি, বাগদি, ডোম, লোহার প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষরাই সুনন্দর পাথর কাটার শ্রমিক। হাঁসপাহাড়িতে ধান কম হয়, তাই এখানে মজুরও কম। এখানকার প্রান্তিক মানুষরা তাই ধানের মরশুমে বর্ধমান, হুগলি, পুরুলিয়ায় যায়। সুনন্দ তাই তাদের লোভ দেখিয়ে কাজে লাগায়। অসহায় শ্রমিকরা বাধ্য হয় গনগনে রোদে পাহাড়ে পাথর কাটার কাজ করতে। আসলে প্রান্তিক মানুষদের শোক তাপ কেউ মনে রাখে না। তাঁদের এই ভাবেই বেড়ে ওঠা ও বেঁচে থাকতে হয়।

উপন্যাসের প্রান্তিক চরিত্র হিসেবে কাঁদনি বাউরী মুখ্য হয়ে উঠেছে। সুনন্দাকে এই কাঁদনি বাউরি পাহাড় থেকে নামার সময় পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল। ঔপন্যাসিক কাঁদনি বাউরির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> সুনাম ত এল নেমে। তার সঙ্গে বাউরি বউটিও। বউটির বয়স কম। কী যেন নাম কাঁদনি, দেবীর মতই বটের গা থেকে যেন আবির্ভুতা হয়েছিল সে, স্বাস্থ্যবান, যুবতী সাহসীও। সোজা উঠে গেল পাহাড়ে। পাহাড়ে উঠে হারিয়েও গেল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিরেও ত এল। সুনন্দ নামল তার পিছনে পিছনে। নামার সময় সে তিনবার সুনন্দকে পতনে হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কাঁকরে পাথরে ভরা পাহাড়ের গায়ে পা রাখতে হয় সাবধানে। জোরে নামলে পা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব। সুনন্দর তা হতে যাচ্ছিল। বউটি তাকে হাসতে হাসতে রক্ষা করেছে। হাত ধরে নামিয়েছে সবার সামনে। তারা নামছিল সোজাপথে।[৫]

তবে কাঁদনি বাউরির সহজ সরল স্বভাব সকলে সমান চোখে দেখে না। মধু লায়েক তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছে। সুনন্দর কাছে যাওয়াতে বউটির উদ্দেশ্য নিয়ে শেষ প্রশ্ন তুলেছে। যে কাঁদনি বাউরি একসময় সুনন্দাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল। সেই ভদ্র সমাজের প্রতিনিধি সুনন্দই তাকে ধর্ষণ করে এক সময় অর্থের লোভ দেখিয়ে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে। কাঁদনি বাউরিকে মুখ বুজে তা সহ্য করতে হয়। রবি লোচনের চোখে সুনন্দর নিম্নরুচির মানসিকতা স্পষ্ট ধরা পড়ে—

> যদি চাস তো আরো পঞ্চাশ নিয়ে যা, এখেনে কেউ নেই, কেউ জানবে না, যদি বেশি লাগে তো আরো দেব, তোর শাহেব টাকাটা মেরে দিল, তাই তোর বুড়ি ঠাকরুন হারিয়ে গেল। বুড়ি ঠাকরুন হারালো বলেই না গাছ পড়ে গেল!
>
> উটের মত ঘাড় উঁচু করল রবিলোচন, অন্ধকারে নারীর মধ্যে দুকাঁধে হাত রেখেছে পুরুষটি। পুরুষই বটে। তার সন্তান নয়, ও শুধু পুরুষ, ভয়ঙ্কর এক লোভী পুরুষ শপথ।[৬]

একসময় তীব্র জলকষ্টে ভোগে হাঁসপাহাড়ির মানুষেরা। যে হাঁসপাহাড়ির জল রবিলোচনকে একসময় প্রাণ দান করেছিল তাই আজ বিষাক্ত। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক বিষাক্ত মানুষগুলির কারণে কলেরা হাঁসপাহাড়ির প্রান্তিক লোকগুলিকে গ্রাস করতে থাকে। অর্থপিপাসু উচ্চবর্ণের মানুষগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারের টাকা দেওয়ার পরও কুয়োর জল পরিষ্কার করেনি। সেই জল ভুলবসত বন্দনা খেলে সেও কলেরা আক্রান্ত হয়। হাসপাতালে এসে রবিলোচনে নিজেকে অসহায় মনে হয়। হাসপাতালে যেন মৃত্যু মিছিল দেখতে পায় সে। হাসপাতালের সামনে শিরীষ গাছের নিচে পড়ে আছে পরপর খাটিয়া। যেমন শ্মশানে থাকে। হাসপাতাল যেন শ্মশানের রূপ নিয়েছে। চুল্লি ফাঁকা হলেই একজন করে উঠে যাবে চিতার ওপর। একসময় সুনন্দার সাহায্যে রবিলোচন বন্দনাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। বন্দনা ফিরে এলে মধু লায়ক বলেছেন—"ফিরিয়ে আনলেন ত। কুড়িটা মরেছে। কাঁদন্যা বুড়ি ঠাকরুন নাকি বদলা নিতে শুরু করেছে, কী ভীষণ ব্যাপার বলুন দেখি, সাবধানে থাকবেন মশাই?"[৭]

বাউরির পাড়ার লোকেদের কারও সামর্থ্য নেই নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর। তাই সবাই ফিরে আসে না, প্রান্তিক মানুষদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে তারা বাঁচে তাই এই প্রান্তিক মানুষগুলি ভাবে বুড়ি ঠাকরুনের অন্তর্ধানের ফল এই কলেরা। বাউরিরা তাই বুড়ি ঠাকরুনকে ফিরে আসতে প্রার্থনা করে। তাদের দুঃখের একমাত্র আশ্রয়স্থল হল এই বুড়ি ঠাকরুন। কাঁদনি বাউরির সন্তানও কলেরায় আক্রান্ত হয়। কাঁদনি বাউরি রবিলোচনকে বলেছেন—"কান্না থামাবেক কোনজন বড়বাবু, বুড়িঠাকুরুন নাই, কার নিকট যাব্যে বাউরি বাগদি লুয়ার। মোদের যা হবার হঁইছে, ছেল্যা কানছে যে সব্বো সময়।"[৮]

সুনন্দ তাই বাদাম গাছের তলায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার কথা বললে কাঁদনি বাউরি বাধা দেয়। সে জানে তাদের ঠাকুরন হারিয়ে গেছে—"বাদাম তলে হবেক নাই। হারানো ঠাকুর ফিরুক!"[৯] কাঁদনি প্রতিবাদ করে। তাঁর প্রতিবাদ বৃহত্তর না হলেও পুরুষতান্ত্রিক এলিট সমাজ তাকে আর থামিয়ে রাখতে পারে না। আসলে এই দৃঢ়তার অভাবই প্রান্তিক মানুষদের শোষিত হওয়ার একমাত্র কারণ।

অমর মিত্রের হাঁসপাহাড়ি হয়ে উঠেছে প্রান্তিক মানুষের দুঃখ দুর্দশা প্রতিচ্ছবি। প্রান্তিক মানুষের বিশ্বাস সংস্কার কতটা তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের জীবনকে পরিবর্তন করে তা উপন্যাসের প্রতিটি পরতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁরা অসহায়ভাবে থাকতে বাধ্য হয়েছে সমাজের

উঁচুশ্রেণির মানুষদের চাপে। তবু প্রতিবাদ ফিরে আসে, যেমন ফিরে এসেছে কাঁদনি বাউরির চরিত্রের মধ্যে। এই প্রতিবাদই বাঁচায় সমাজকে। সৃষ্টি করে বৃহৎ বিদ্রোহ। বুঝিয়ে নিতে শেখায় তাঁদের অধিকার।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ অগ্রাহয়ণ ১৩৯০, কলকাতা, পৃ. ৮২৮
২. অমর মিত্র : 'হাঁসপাহাড়ি', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯২, কলকাতা, পৃ. ৫০
৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পদ্মানদীর মাঝি', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৭
৪. উৎস-২, পৃ. ৪৯
৫. তদেব : পৃ. ৩৩
৬. তদেব : পৃ. ৫
৭. তদেব : পৃ. ৭৯
৮. তদেব : পৃ. ৯৩
৯. তদেব : পৃ. ৯৪

নলিনী বেরার ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ উপন্যাসে লোকজ উপাদান অনুসন্ধান

রিঙ্কু দাস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) থেকে সার্থক বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু। তারপর ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬), ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩), ‘চন্দ্রশেখর’ (১৮৭৫), ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৮) প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বাংলা উপন্যাস সমৃদ্ধ হয়ে উত্তরসূরীদের হাতে পৌঁছে গেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সাহিত্যে লৌকিক উপাদান প্রয়োগে যতটা সচেতন ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েচেন, তার তুলনায় অধিক সচেতনতা তিনের দশকের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে সতীন অভিপ্রায় বা step-wife motif একটি মূল বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায় মেয়েলি ছড়া, গান, প্রবাদ, আচার-অনুষ্ঠান, নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে লৌকিক ছড়ার প্রয়োগ দেখা যায়—

> আয় রে চাঁদের কণা।/তোরে খেতে দিব ফুলের মধু,/পরতে দিব সোনা।/আতর দিব শিশি ভরে,/গোলাপ দিব কাচ্চা করে/আর আপনি সেজে বাটা ভরে/দিব পানের দোনা।[১]

বাংলা লোকসংস্কৃতি-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান অনস্বীকার্য। শিলাইদহ ও বোলপুর পল্লিসান্নিধ্য ও অন্তরের মধ্যে চিরজাগ্রত দেশাত্মবোধের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যতটা লোকসংস্কৃতি সচেতন, কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ততটা নন। বিশেষ করে তাঁর ‘গোরা’ (১৯১০) উপন্যাসের সূচনায় লালনের বিখ্যাত গান—“খাঁচার ভিতর অচিনপাখি কেমনে আসে যায়, ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।”[২] এই বিখ্যাত বাউল গান রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮), সাহিত্যের মূলে মানব-প্রীতির সত্য নিহিত। গ্রামীণ বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, ঝাড়-ফুঁক, গালিগালাজ, আশীর্বাদ অভিশাপ শরৎ সাহিত্যের পাতা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ এক একটা চরিত্র তাঁর হাতে Type চরিত্রে পরিণত হয়ে লোকঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তুলেছে।

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় যে অঞ্চলের কথা লিখেছেন, সেখানকার লোকায়ত মানুষ, তাদের বৃত্তি, জীবনধারণ প্রণালী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর উপন্যাসে রাঢ়বাংলার মাটি-প্রকৃতি-মানুষ, তাদের জীবন-জীবিকা, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-অনুষ্ঠান সমস্ত কিছুকেই কথাসাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। উপকথার মতো কাহিনি শব্দটিও সার্থক হয়ে ওঠে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২) উপন্যাসে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১), উপন্যাসে Myth প্রয়োগে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী জেলে-মাঝিদের জীবনের কথা পাওয়া যায়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে লৌকিক উপাদান ও তার ব্যঞ্জনা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) সামগ্রিক লোকজীবন-আশ্রিত রচনা। এখানে কিংবদন্তি আছে, ছড়া আছে, লোকক্রীড়া আছে, ডাইনি প্রথার বিশ্বাস, রূপকথা, মন্ত্র, গ্রামীণ লোক-উৎসব চড়ক সবকিছু ভর করে আছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে গ্রামজীবনের প্রতি নজর দেন এই পর্বের লেখকরা। ফলে লোকসংস্কৃতি নতুন যাত্রা নিয়ে সাহিত্যে হাজির এই পর্বে। অনিল ঘড়াইয়ের (১৯৫৭-২০১৪) 'নুনবাড়ি' (১৯৮৯) গুণময় মান্নার (১৯২৫-২০১০) 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০) 'কটা ভানারি' (১৯৫৪), মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৯) ভগীরথ মিশ্রের (১৯৪৭) 'মৃগয়া' (১৯৬১), 'আড়কাঠি' (১৯৯৩), নলিনী বেরার (১৯৫২-) 'শবর চরিত' (২০০৫), 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' (২০১৮) উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যে নলিনী বেরা এক স্বতন্ত্র নাম। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তার পদচারণা। সত্তরের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে নবযাত্রার অন্যতম যাত্রী নলিনী বেরা। সত্তরের দশকের একটি বিশেষ রাজনৈতিক স্লোগান ছিল 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা' তা রাজনীতিতে কতখানি সফল হয়েছিল সেই বিষয়ে মতান্তর থাকলেও বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রামজীবন বিস্তৃত ও বিশিষ্ট জায়গা দখল করে আছে। উপন্যাস শুধু অভিজ্ঞতার সমাহার নয়, উপন্যাস এমন এক শিল্প যেখানে অভিজ্ঞতাকে কল্পনার মায়ায় মুড়ে দিতে পারেন কথাকার। এর ভিতরে কত গল্প আছে, যা কিনা সত্যের বাইরে আরেক সত্য। নলিনী বেরা তাঁর 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে এক কৃষিজীবী পরিবারের আলেখ্য রচনা করেছেন। যে জীবনের কথা তিনি লিখেছেন, সে জীবনের অনেকটাই আমরা খুব কাছ থেকে দেখেছি। মেজকাকা, বিধবা মা, কাকি, দাদা, ছোটকাকা, ছোটপিসি, হংসী নাউড়িয়া, রোহিনী হাই স্কুলের হেডমাস্টার, জমিদার বাবুঘর, নদীর চর, বৈশাখী পালের ইতিহাস, ভ্রমরগড়ের কাহিনি— সব মিলিয়ে জঙ্গলমহলের এক কৃষিজীবী পরিবারের আলেখ্য ঔপন্যাসিক রচনা করেছেন। তিনি দ্বৈপায়ন পত্রিকাকে (২০২২) প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলেন—

> লোকউপাদান বিশেষত আমি যেগুলো ব্যবহার করি, সেগুলো আমি যেখানে জন্মেছি, সেখান থেকে নেওয়া। স্থানটি সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল এবং উড়িষ্যা সংলগ্ন, এর মধ্যবর্তী অঞ্চল মূলত।[৩]

লোকসমাজে যে উৎসব প্রচলিত তাকেই আমরা লোক উৎসব বলে থাকি। 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে আমরা 'বালিজাত' উৎসবের কথা পাই। যেমন—বছরের শেষদিনে সেই কবে অজ্ঞাতবাসে এসে নদী জলে নেমে পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন যুধিষ্ঠির, তাকে ঘিরে আজও নদীর বালিয়াড়িতে বসে 'বালিজাত' উৎসব। সুবর্ণরেখা নদীর উপর এই বালিজাত উৎসবকে কেন্দ্র করে গাজনের পরের দিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কত মানুষ আসেন এবং নদী জলে তর্পণ করেন। আখ্যানে পাহাড় পূজাকে আশ্রয় করে এক লোকজ কাহিনি প্রচলিত আছে। 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে লোকউৎসবের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যখন ১৭৪২ সালে বর্গী অধিনায়ক ভাস্করপণ্ডিত 'হর হর ভৈরব' তুমুল কলরব তুলে পূজা দিতে আসেন ভৈরব মন্দিরে। এছাড়াও এই আখ্যানে দেখা যায় সাঁওতালদের 'দিশম সেদরা' বা শিকার উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। যে উৎসব সম্পূর্ণ নারীবিহীন উৎসব। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসে বসু শবরদের যে লৌকিক নাচ 'জলকেলি' যা সম্পূর্ণ পুরুষবিহীন নৃত্য।

মানবসমাজ উদ্ভবের সময় থেকেই মানুষ নিজেদের দেহ বিকারজনিত নানাবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য আপন জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে রচনা করেছিলেন এক চিকিৎসা বিধি। ভারতীয় আদিবাসী সমাজেও গুনিনেরা তুকতাক ঝাড়ফুক মন্ত্রতন্ত্রসহ নানারকম পাহাড়ি বনজ গাছগাছালি শিকড় রস ব্যবহার করেন নানা রোগ নিরাময়ের জন্য। 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় 'ছাগল হাচি কী বাঘনখির' গুণে যখন পদ্মল ঘা ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছে গদ গাছের রসে কী গোলমরিচের গুড়োয় সাপ কাঠির রোগী যখন আস্তে আস্তে চোখ খুলছে। সাপকাঠি রোগীর চিকিৎসার জন্য লোকজ মন্ত্র হল—

> মেঘ কনকনআঁধার রাতি সাপে মারল ঘা।
> হেন কালে বিপদ হৈল স্মরণ করব কা।[৪]

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে লোকচিকিৎসার অবদান অপূরণীয়। যখন সাধারণ লোকের কাছে বিজ্ঞানের রশ্মি পৌঁছায়নি তখন গ্রামে বনে জঙ্গালে মানুষ নিজস্ব উদ্ভাসিত জ্ঞানের দ্বীপ প্রজ্জ্বলিত করে নানা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। যুগের পর যুগ এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষদের সেবা-করে আসছে। ভারতে বহু প্রাচীন যুগে চিকিৎসাবিধি মনীষীগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও বনে জঙ্গালে থাকা পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে তা ছিল অজ্ঞাত। তারা নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে বনজঙ্গাল থেকে ভেষজ আহরণ করে নিজেদের চিকিৎসার ব্রতী হয়েছিলেন। এই লোকচিকিৎসা বিধি এখনো লোকজগৎ থেকে অন্তর্হিত হয়নি তা ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি নাম ধারণ করে আছে যেমন 'টোটকা' চিকিৎসা যদিও কোনো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে না তাঁরা সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকেন।

'ছড়া' শব্দটির সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে এসেছে। 'ছড়া' বলতে গ্রাম্য কবিতাকে বোঝানো হয়েছে। গ্রাম্য কবিগান, যাত্রা, তরজা ও বিভিন্ন পাঁচালির আসরে সামগ্রিক ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বিভিন্ন রসের 'ছড়া' বলা হয়। দৈনন্দিন জীবনে গার্হস্থ্য বিষয়ে, হাসি-কান্না, ঝগড়া-বিবাদ, সামাজিক-পারিবারিক উৎসব, অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ, অবসর-বিনোদন প্রভৃতির সময় 'ছড়া' বলা হয়। রচনাকার মুখে মুখে ছড়ার সৃষ্টি করতেন। এর কোনো লিখিত রূপ নেই। গ্রাম্য কবিতা বা ছড়ার ব্যবহার লোক ভাষাতেই ছিল। ছড়াগুলিকে কৃষি সংক্রান্ত ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, মেয়েলি ছড়া, রোদসংক্রান্ত ছড়া, বর্ষা সংক্রান্ত ছড়া, লেখার ছড়া, মেয়েলি ছড়া, ব্রতের ছড়া, হেঁয়ালি ছড়া,

ঘুম পাড়ানি ছড়া ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। নলিনী বেরা 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে লোকছড়ার ব্যবহার করেছেন। সবেশ্বরের বউ নিত্যদিন ঝগড়া করতেন তাই তাকে দেখলে যে ছড়াটি মনে পড়ে—"ঘরের ধারে নিম গাছটি নিম ঝড় ঝড় করে।/সদা সতীনের বিটি নিত নিয়াই করে।"[৫] 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে ব্যাঙের বাসা, সাপ ব্যাঙের কাহিনি নিয়ে হেঁয়ালি ছড়া পাই—

১. তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা।/খায়দায় গান গায় তাইরে নারে না।[৬]
২. খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষির নদীর কূলে,/ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।[৭]
৩. হরির উপর হরি হরি শোভা পায়,/হরি কে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়।[৮]

উপন্যাসে দেখা যায় বড়ো ডাঙ্গার প্রভা বিশুই খই-মুড়ি ভাজতে এলে ন্যাংটা ভুটুম সাধের কুটুমরা ছড়া বলে অভ্যর্থনা জানায়—"পরভা রে পরভা কি তরকারি রাঁধবা/যৌ ফলটার ডাঁটি নাই সো ফলটা রাঁধবা।"[৯] নলিনী বেরা 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে পাতাঝরা শিমুলগাছকে নিয়ে লোকছড়া ব্যবহার করেছেন— "কাল ছিল ডাল খালি আজ ফুলে যায় ভরে।/চল দেখি তুই মালি হয় সে কেমন করে।"[১০] উপন্যাসে নানান ছড়ার প্রয়োগ দেখা যায়—

১. আজ নগদ কাল ধার ধারের পায়ে নমস্কার।[১১]
২. কোথায় ফলে সোনার ফসল/সোনার কমল ফোটে রে/সে আমাদের বাঙলাদেশ/ আমাদেরি বাঙলা রে![১২]

এই লোকছড়াগুলি প্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে কোনো কোনো অঞ্চলে ছড়াগুলি সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার মূল বিষয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই লোকজ ছড়াগুলিকে নলিনী বেরা তাঁর 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন।

লোকসংস্কৃতি মতে একটি জাতির আবিষ্কৃত সত্য সামাজিক রসবোধ ঐতিহ্যগত বন্যা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধ দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত হয় যা প্রবাদের সর্বজনীনতা লাভ করে। 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায় সেই প্রবাদগুলি হল—

১. মঙ্গালের ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা।[১৩]
২. একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ![১৪]
৩. ব্যাপারে অপার সুখ সব সুখ চাষে চাকুরিয়া কুকুরিয়া ঘুরে দেশে দেশে।[১৫]
৪. রোদে বাড়ে ধান ছায়ায় বাড়ে পান।[১৬]
৫. ঘৈতা আর পৈতা কখনো হাত ছাড়া করতে নেই সব সময় কাছে কাছে রাখতে হয়।[১৭]

প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি। একদিক দিয়ে এ যেমন প্রাচীন আবার তেমনি অন্য দিক দিয়ে আধুনিক। দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) বলেছেন—'একটি জাতির প্রতিভা বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মা সেই জাতির প্রবাদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়।' প্রবাদ মানুষের পরিবেশ ও জীবন পর্যবেক্ষণ এবং প্রকাশের এক সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যে ও প্রবাদের পরিচয় আমরা পাই প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থ বুক অব দি ডেড (৩৭০০ খ্রিস্টাব্দ) ও ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) প্রবাদ প্রবচনের যথেষ্ট প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি। নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী 'জঙ্গালমহল' অঞ্চলের মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় পাই। এই অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদগুলিকে লেখক তাঁর আখ্যানের লোকজ উপাদান করে তুলেছেন।

লোকসাহিত্যে কিংবদন্তি সংখ্যা লোকপুরাণ কিংবা লোককথার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কম। কিংবদন্তিতে যে কাহিনি বিবৃত হয়, লোকসমাজ মনে করেন একদিন তা ঘটেছিল সেই ঘটনা তাদেরই এলাকায় সংগঠিত হয়েছিল তাই কিংবদন্তির মধ্যে ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রের সন্ধান মিলতে পারে। 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে কিংবদন্তির কাহিনি হল—জাহাজ কানার জঙ্গাল। ওই যেখানে এককালে সুবর্ণরেখার নদীগর্ভে মাল মশলা বোঝাই একটা আস্ত জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। যে জাহাজ নাকি বালিপোত হয়ে মাটিপোত হয়ে এতদিনে জাহাজ কানার জঙ্গাল। ভৈরব মন্দির-গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈঋত কোণে কাঁটা বাঁশের ঝাড় তার ভিতর দিয়ে ওই দেখা যায় ভৈরবডাঙ্গা এখনও সেখানে মাকড়া পাথরের তৈরি ভাঙা ভৈরবশ্বরের মন্দির। নাকি ওই মন্দিরেই একদা হর হর ভৈরব তুমুল কলরব তুলে পূজা দিতে আসতেন বর্গী অধিনায়ক। কিংবদন্তির উদ্ভব নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। পুরাণ কাহিনির অনেক পরবর্তীকালে এর জন্ম। মানুষ তখন আদিম জীবন থেকেই অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে এসেছে। পুরা কাহিনি কল্পকথার অতি লৌকিক স্তরের পরে যখন বাস্তব কিছু ইতিহাসবোধ সমাজের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখনই কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত রোহিণীগড়ের ইতিহাস জানতে গিয়ে 'রসিকামঙ্গাল'-এর কথা পাওয়া যায়। যেমন ডুলু ধারে রোহিণীগ্রামে জন্মেছিলেন চৈতন্যদেবের (১৪৮৬—১৫৩৪) শিষ্য শ্যামানন্দের (১৫৩৪-১৬৩০) মহাশিষ্য রসিকানন্দ (১৫৯০-১৬৫২)। রসিকানন্দকে নিয়ে কবি গোপীজনবল্লভ দাসের লেখা 'রসিকামঙ্গাল'-এ (১৬৫৪) রোহিণীগ্রামের কথা পাওয়া যায়—

> উৎকলেতে আছয় সে মল্লভূমি নাম।/তার মধ্যে রোহিণী নগর অনুপম।/কটক সমান গ্রাম সর্বলোকে জানে।/সুবর্ণরেখার তটে অতি পুণ্যস্থানে।/ডোলঙ্গা বলিয়া নদী গ্রামের সমীপে।/গঙ্গোদক হেনজল, অতি রস কূপে।/...রাজধানী গড় তাহে দেখিতে সুন্দর।/গড়বেড়ি বসিতে সে রউনি নগর।[১৮]

বাংলা লোকসংগীত-এর স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের দিকে দেখতে হবে। আদিম সংগীতের বৈশিষ্ট্যগুলিই লোকসংগীতকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। জনসমাজের মধ্যে কঠিন কঠোর মৃত্তিকায় লোকসংগীতের জন্ম হয়। ফলে লোকসংগীত স্বভাবতই হয়ে ওঠে প্রাত্যহিক জীবনের গান। আদিম সংগীতের মতোই লোকসংগীত মাটির সঙ্গে গভীর মমতার বন্ধনে বাঁধা। গ্রামীণ জনসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। এখানে রচয়িতা বা গায়কের স্বতন্ত্র মর্যাদা কিছু নেই। এই সংগীত বৃহত্তম জনসমাজেরই সম্পত্তি। জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি অধিকাংশ লোকসংগীত-এর সৃষ্টির পশ্চাতেই সমাজের শ্রম প্রক্রিয়া আর উৎপাদন রীতি বিদ্যমান। পশুপালনের স্তর থেকে মানুষ যখন কৃষির স্তরে এসে উন্নীত হল, সংগঠিত কৃষি উৎপাদন যখন শুরু হল এর প্রতিটি স্তরে, উৎপাদনের উপাদানগুলির সঙ্গে জনমানুষের সম্পর্ক লোকসংগীতকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ছাত্রাবাসে কালীপদ বলল—'নে পুনিয়া, এবার তোর 'ঝুমুর' শুরু কর।' সে একটা ঘাগরার মত লুঙ্গি পরেছে গামছা দিয়ে মাথায় ফেট্টি বেঁধেছে। ভাত খাবার এনামেলের থালাটা বাঁ হাত দিয়ে 'চাঙু' যন্ত্র বানিয়ে ধরে 'ঝুমুর' গান শুরু করল—"শালগাছে শালপঙড়া খেজুর গাছে ঝুরি হে।/বঁধার গায়ে লাল গামছা চটক দেখে মরি হে।"[১৯] বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে 'কাঁদনা' গীতের সুর পাওয়া যায়। উপন্যাসে ছাগল চরানি সরলা তাঁর বাপ পতিত পাবনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে 'কাঁদনা-গীত' গাইছে—

> সুখ সারি ঝুলে কদম্ব ডালে এ বাপা।/মহি ঝুলি থিলে তুমর কোলে এ বাপা।/শুক সারি গলে বৃন্দাবন চলি এ বাপা।/মুহি এবে যাবা শ্বশুরালী এ বাপা।/আলু পতর কি পান হেইব বাপা

গো।/পর দেশের কি মন রহিব বাপ গো।/ঝিপি ঝিপি পানি মুহকু ছাটে বাবা গো।/পর ঘর কথা পাষাণ ফাটে বাবা গো।[২০]

আবার 'নাচুয়াদের' গান ঢোল বাজনার তালে তালে চলছে। দেখা যায় 'বাঁধা পণী' যখন শেষের দিকে বাঁধা পণীর বেহা গীতও যখন কীর্তনাঙ্গের ধারায় বইছে—

কুচি কুচি সুপারির রাই/কাঁসার গাগরী ঝলকে যাই/যেই ঘাটে যাই গো রাই/সেই ঘাটেতে নন্দাই যায়।/সর সর নন্দাই আমার।/আমি গাগরী নিয়ে ঘরকে যাই।[২১]

যে দেশের শেকড় যত গভীরে, তার ইতিহাসও তত গভীর। আর এই গভীরতাই লোকগানের, লোকসংস্কৃতির প্রকৃত ভিত্তি। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা যাত্রাপালা, কথকতা, পাঁচালি, কবিগান, কীর্তন, বাউল, ছড়া, ভাটিয়ালি, ভাওইয়া গানের মতো লোকসংগীতের মূল ধারাগুলির মাধ্যমে সহজেই খোঁজ মেলে লোকায়ত জনজাতির জীবনের ধারাটির। আর এইসব লোকসংগীতের মাধ্যমে আমরা খুঁজে পাই প্রকৃত লোকজীবনকে; লোকায়ত সমাজকে, সমাজের প্রকৃত চিত্রটিকে।

'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে পাওয়া 'অতি দর্পে আর রূপের অহংকারে কোলা সুন্দরীর মৃত্যু ঘটল'। এই লোককথা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে এক কাহিনি পাওয়া যায়। প্রধান চরিত্র ললিনের বাবা-কাকাদের মা! ফোকলা দাঁতে হাঁটুয়া ভাষায় চমৎকার গল্প বলতেন—

এক ছিল হাতি তার পাশে থাকত এক কোলাব্যাঙ। কোলাব্যাঙের নাম 'কোলাসুন্দরী'। হাতি আর ব্যাঙের মধ্যে খুব ভাব ছিল। রাস্তার উপর একদিন শুয়ে আছে ব্যাঙ, হাতি রাস্তা দিয়ে হেলতে দুলতে যাচ্ছে। কোলাকে দেখতে পেয়ে বলল, "সরি যা কলা না হিনে মোর গোড়ের তলে পড়নে একাবেলে চেপটি চিড়া হি যাবু।" অর্থাৎ, সে রাগ করি ব্যাঙটাকে মারি দিলা! অতি দর্পে আর রূপের অহংকারে 'কোলাসুন্দরীর' মৃত্যু ঘটল।[২২]

'সুবর্ণরেখা' নদীর নামকরণ নিয়ে উপন্যাসে যে লোককথা প্রচলিত আছে তা হল— ঝাড়েশ্বর পানী তিনি অবলীলায় নিজেরই গ্রামের দিকে আঙুল তুলে উত্তর দেন—"সোউ যে বেহারাঘর দেখুটু ললিন বেহরা বুড়ার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা তার ঠাকুর্দার তার ঠাকুর্দা পুত্র কামনায় নদী জলে সোনার থালা ভাসাই থিলা বলি না নদীর নাম হেলা 'সুবর্ণরেখা'।"[২৩] লেখকের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য শুধুমাত্র শব্দবিভাগ ও শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয় মানুষের রাগ, দুঃখ, আনন্দ, উৎসব এ সব কিছুর নিজস্ব সুরকেও তিনি এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছেন। অর্থাৎ শুধু মুখের কথাই নয়, গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সর্বজনবোধ্য গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যগুলিও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর লেখনীতে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। লোকজ শব্দগুলি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে লোকজ শব্দগুলির বহুল ব্যবহার দেখা যায়—

পদ্মল ঘা—শতদল, হলহলিয়া—হেলে সাপ, হাটুয়া—যারা বাংলা উড়িয়া মেলামেশী ভাষায় কথা বলেন, টকা—ছেলে, মৌ—আমি, নিমু—নেব, নাচুয়া—নর্তকী, ছাগল হাঁচি— যে ফল সকলে চরণটি ছাগল হাসতে থাকে, হুড়ি— ছোটখাটো পাহাড়ের মত উঁচু জায়গা, হাড়োয়া— পায়ের মল, বাজু—হাতের বাজুবন্ধ, বাউটিয়া ভূত—রাস্তা ভুত, বাবু ঘর—জমিদার বাড়ি, চুরকা—আলু জাতীয় মূল, মহামাদল—আতা, দেয়ইয়া—সঙ্গম করতে দেওয়া, গজাল—লম্বা বাঁশ।

লোকভাষার দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসপাঠে যেভাবে উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ—

১. মায়া মানুষ চিরকালটিকে চাপা স্বভাবের বুক ফাটবে ও মুখ ফাটবেনি। সেত কুনো শব্দ না করি গুমরি গুমরি কাদি বুলেটে। (পৃ. ১১৬)
২. তুই তো জানু ললিন, মোর কেতে অভাব রে, ঘরে মোর এক গন্ডা বালবাচ্চা, তার উপর তোর বৌদি—। (পৃ. ১৩২)

৩. আঘু তভু অনেক ইলশা উঠথায় সুবর্ণরেখায়। অখন সে-ইলশা কুঠে আছে জাঅু —কলকাতায়। (পৃ.১৪০)
৪. ঘরে আছু নাকি জটিয়া ভাই ঝড়িয়াটায় আজ তোর ঘরে মকা খাই। আরে মকা ত বাদাম বারকা, আর ভাজা নাই ত ভাজা করা। (পৃ. ১৪১)
৫. ললিন বহুৎ দাঁড় বাইছ, ডোঙায় বসি অখন টিকে বিশ্রাম কর—মুই লবোকিশোর পুর যামু আর আসলু। (পৃ.১৪৪)
৬. অউ ত একজন শিক্ষিত ছুআ, ভাস্কো-দা-গামা না কী-কুহো না ললিন, দত্ত ত দু'কলম ইংরেজি ঝাড়ি! (পৃ. ১৫১)

নলিনী বেরা তাঁর 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' আখ্যানে যে অঞ্চলের লোকজ উপাদান ব্যবহার করেছেন, সেই অঞ্চলের 'সাংস্কৃতিক' পরিচয় উপরে আলোচনা করা হয়েছে। পূজাপার্বণ ও লৌকিক উৎসবগুলি যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলির নিজস্ব রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য আছে। আর্য ও অনার্য এই দুই সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে এই জেলায়। বিভিন্ন পূজাপার্বণ ও লোক উৎসব যেমন—ভীমপূজা, শিবের গাজন, ধর্মঠাকুরের পূজার্চনা, শীতলাপূজা, যুগিনীপূজা, বড়াম বা গরাম পূজা, জাঠ ও জাঠেল উৎসব, চণ্ডীপূজা, সাতভউনী, বীরঝাপট, সরপূজা, চাঁচর উৎসব ছাড়াও মাকাল ঠাকুর, শিকড়বাসিনী উৎসব প্রচলিত।

কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতি ছাড়াও শিল্পের উপর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এখানে পটশিল্প, পুতুলনাচ, কবিগান, তরজা গান, পিরের গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রবহমান স্রোত লক্ষণীয়। আদিবাসীদের বিভিন্ন পরব যেমন— জাওয়া পরব, জারগিডার পরব, শারদুল, ঈদপরব, বাঁধনপরব, টুসুপরব, লোকায়ত জীবনের লোকসংস্কৃতি মূলক আচার-অনুষ্ঠানগুলি লোকায়ত জীবনের কলরবে মুখরিত।

উৎসের সন্ধানে

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বিষবৃক্ষ', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ.১৯-২০
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'গোরা', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩১৬, পৃ. ৭
৩. অমিত কুমার বিশ্বাস : 'দ্বৈপায়ন পত্রিকা', উত্তর ২৪ পরগনা, অখিল স্মৃতি গ্রন্থালয়, ২০২২, পৃ. ৩৫
৪. নলিনী বেরা : 'সুবর্ণরেনু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৭
৫. তদেব : পৃ. ১৩৪
৬. তদেব : পৃ. ১৮৬
৭. তদেব : পৃ. ১৮৯
৮. তদেব : পৃ. ১৯১
৯. তদেব : পৃ. ২৫১
১০. তদেব : পৃ. ২৫১
১১. তদেব : পৃ. ১২২
১২. তদেব : পৃ. ৭৬
১৩. তদেব : পৃ. ৫৫
১৪. তদেব : পৃ. ১৮
১৫. তদেব : পৃ. ৮৫
১৬. তদেব : পৃ. ১০৮
১৭. তদেব : পৃ. ১৩৩
১৮. তদেব : পৃ. ১০১
১৯. তদেব : পৃ. ১১৮
২০. তদেব : পৃ. ২৬৮
২১. তদেব : পৃ. ২৬৮
২২. তদেব : পৃ. ২৭২
২৩. তদেব : পৃ. ১৮০

নলিনী বেরার ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ উপন্যাসে জেলে কৈবর্ত সমাজ

শুভাশিস আচার্য

> বাংলার বুকে জটার মতো নদীর প্যাঁচ। সাদা, ঢেউ-তোলা জটা। কোন মহাস্থবিরের চুম্বন রস-সিক্ত-বাংলা। তার জটাগুলি তার বুকের তারুণ্যের উপর দিয়া সাপ খেলানো জটিলতা জাগাইয়া নিম্নাঙ্গের দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এসবই নদী। সবগুলি নদীর রূপ এক নয়। উহাদের ব্যবহার এবং উহাদের সহিত ব্যবহার তাও বিভিন্ন রকমের। সবগুলি নদীই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে আসে, কিন্তু এ কাজে আসার নানা ব্যতিক্রম আছে।[১]

জীবন-জীবিকার সঙ্গে নদীর যোগ যে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে, তার প্রমাণ সমস্ত প্রাচীন নদীকেন্দ্রিক সভ্যতাগুলি। তবে একথাও সত্য ‘নদীর ব্যবহার’ আর তাকে মানুষের ‘ব্যবহার’-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে সভ্যতা তথা সমাজের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। সভ্যতার প্রথম পর্বেই বেশিরভাগ মানুষ ছিল নদীনির্ভর। কিন্তু ক্রমে সেই মানুষ যখন উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ সংগঠনের পথে এগোল, তখন কর্ম তথা বৃত্তির ভেদে কিছু মানুষকে কেবলই নদীনির্ভর হতে হল। সমাজ তাদের চিহ্নিত করল নৌবাহক, মৎস্যজীবী ধীবর, পাটনী রূপে। উচ্চবর্ণ শাসিত সমাজে তারা ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠল শূদ্র স্থানীয়, জল-অচল জাতি। এইরূপ এক সমাজের ছবি প্রতিভাত হয়েছে নলিনী বেরার আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত (২০১৯ খ্রি:) উপন্যাস ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’য়। সুবর্ণরেখা নদী নির্ভর এই জনসমাজ মূলত ধীবর বা জেলে কৈবর্ত, তবু এদের আরও এক পরিচয় উপন্যাসিক তুলে ধরেছেন—এরা ‘নাউড়ীয়া’। আলোচনার প্রথমেই এই ‘নাউড়ীয়া’ শব্দের উৎস এবং এই সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

চর্যাপদের ৩৮ সংখ্যক পদের প্রথম ছত্রে (কাঅ ণাবড়ী খান্টি মণ কেড়ুয়াল)[২] ‘নাবড়ী’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে; যার মূল উৎস বোধহয় সংস্কৃত ‘নৌবাহী’ শব্দ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকা খণ্ডের ১৩ নং পদে 'নাঅবাহিআ' রূপে কৃষ্ণের প্রতি রাধার সম্বোধন আছে (নাঅ বাহিআঁ যমুনা জল বিশাল এ)।[৩] মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভায়া মঙ্গাল' কাব্যেও নৌকাশ্রেণি অর্থে 'নায়ড়া' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সম্ভবত প্রাচীন বাংলার 'ণাবড়ী' শব্দটির শ্রুতিধ্বনি জাত বর্তমান রূপ 'নাউড়ী'-এর সঙ্গে পেশা বাচকতা অর্থে 'ইয়া' প্রত্যয় যোগে (যেমন সাপুড়িয়া, বেদিয়া ইত্যাদি) 'নাওড়ীয়া' শব্দটির উৎপত্তি বলে বোধ হয়। যার অর্থ দাঁড়িয়েছে নৌকা পারাপারকারী বা নৌকাচালক। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছু ভাষিক বৈশিষ্ট্য এবং শব্দ সম্ভারের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা ভাষার বেশ কিছু সাধর্ম এখনও বর্তমান। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'নাঅবাহিআঁ' শব্দ থেকে বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা ভাষা অঞ্চলে প্রচলিত 'নাউড়ীয়া' শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে। বর্তমানে এই নাউড়ীয়ারা জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত কারণ নৌকা পারাপার ছাড়াও সারাবছর এরা নদীর জলে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত থাকে—যা এদের জীবন-জীবিকার অন্যতম অংশ। গ্রামীণ সমাজে এরা কেওট/কেউট, মাঝি, জেলে/জালি, দণ্ড/দঁড় ছত্র মাঝি প্রভৃতি নামে পরিচিত। তবে শিষ্ট সমাজে এরা জেলে কৈবর্ত হিসেবেই পরিগণিত হয়।

'কেউট' শব্দটি সংস্কৃত 'কৈবর্ত' শব্দের মূর্ধন্যীভবন জাত রূপ। কৈবর্ত জাতির উল্লেখ বহু প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ ও শিলালিপিতে উল্লিখিত। কোথাও 'কৈবত' কোথাওবা 'কৈবত' নামে তার পরিচয়। আবার পাশাপাশি মৎস্যজীবী রূপে ধীবরদের উল্লেখও রয়েছে। তাছাড়া মনুসংহিতায় যে দাস জাতির কথা উল্লিখিত হয়েছে তাদের পেশাও নৌকার মাঝিগিরি করা। মনে করা হয় এরাও কৈবর্ত সমাজেরই লোক। বাংলায় কৈবর্ত তথা ধীবর উপজাতির উল্লেখ দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং 'বল্লাল চরিত' গ্রন্থে স্পষ্টত পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ধীবর এবং জালিক রূপে দুটি গোষ্ঠীকে পৃথক করে মধ্যম সংকর জাতের মধ্যে রাখা হয়েছে। এছাড়া অধম সংকরের মধ্যে 'ঘট্টজীবী' নামে আরেকটি শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে।[৪] এই ঘট্টজীবীরাই হয়তো ঘাটোয়াল; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও যার উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিককালে এরাই হয়তো নাউড়ীয়া সমাজ। যাইহোক, পরবর্তীকালে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কেবল কৈবর্ত জাতির নামোল্লেখ রয়েছে। তখন এরা অন্ত্যজ ও সমাজে জল-অচল জাতি। কথিত আছে বল্লাল সেন যে নতুন করে সমাজ-সংগঠনে হাত দিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে তিনি এই কৈবর্তদের অপেক্ষাকৃত সমাজের জল-চল শ্রেণিতে স্থান দেন। কৈবর্তরা পরবর্তীতে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়—জেলে কৈবর্ত আর হেলে কৈবর্ত। যারা মূলত চাষাবাদ কর্মে হাল ধরার কাজে যুক্ত থাকল তারা হল হেলে, আর যারা নদী-সমুদ্র অধ্যুষিত বাংলায় মাছ মারা, নৌকা চালানো প্রভৃতি কর্মে নিয়োজিত রইল তারা হল জেলে কৈবর্ত। এই বিভাগ যে-কোনো সময় থেকে হয়েছিল তার স্পষ্ট কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ষোড়শ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে এরা দুই গোষ্ঠী যে পৃথক ছিল না তার প্রমাণ চণ্ডীমঙ্গালে রয়েছে। কালকেতুর গুজরাট নগরীতে নতুন সমাজ-সংগঠনের সময় যে কৈবর্তরা এসেছিল, তাদের উভয় ধরনের পেশা তখনো বর্তমান—"মৎস্য বেচে চষে চাষ/কৈবর্ত ধীবর দাস।"[৫] আবার পেশাগত দিক থেকে প্রাচীন কাল হতে নৌবাহকদের একটি স্বাভাবিক পরিচয় রয়েছে (ঘট্টজীবী) সেকথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 'অভয়ামঙ্গাল'-এর কবিও সে কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি—"পাটনি নগরে বৈসে/রাত্রিদিন জলে ভাসে/পার করি লয় রাজ করে।"[৬] অন্ত্য-মধ্যযুগের বেশিরভাগ পুঁথি-পত্রে কিন্তু 'পাটনি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই পাটনিরা যে সকলেই ধীবর বা কৈবর্ত সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যাইহোক,

মাহিষ্য রূপে হেলে কৈবর্তদের স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া অর্বাচীন কালের ঘটনা। তারা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মণ্য সমাজ-পতিদের নিকট হতে নিজেদের মাহিষ্য জাতির সঙ্গে অভিন্নতার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নেয় এবং ১৯০১ সালের পরিসংখ্যানে হেলে কৈবর্তরা সকলেই মাহিষ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে এরা নিজেদের কৈবর্ত বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করে। বাকি যে কৈবর্তরা থাকল তারাই বর্তমানে কেওট/কেউট, মাঝি প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ বিষয়ে মেদিনীপুরের প্রাচীন গেজেটিয়ারে O'MALLEY যথার্থই জানিয়েছেন—"Nearly all are cultivating Kaibarttas or Mahisyas, and only a small minority are fishing Kaibarttas or Jelyas, who occupy a very low position in the social scale।"[৭] জেলে জাতি হিসেবে কেওটদের উল্লেখ সুবর্ণ রৈখিক ভাষার কাঁদনা গীতিতেও পাই। নব বিবাহিতা বধূটি শ্বশুরবাড়ির সামাজিক অবস্থাকে চিহ্নিত করে দিয়েছে তার গীতের মধ্যে দিয়ে—"মো শাশু ঘর কেউট জাতি/মাছ আণিদব পাঁহাতা রাতি/জ্বালিতে দব মতে চাকুন্দা ঝাঁটি।" (আমার শ্বশুর বাড়ি কৈবর্ত জাতি। সারারাত মাছ ধরে ভোররাতে রাত্রির প্রহর অতিক্রান্তে মাছ এনে দেবে। আর সেই মাছ রান্না করতে হবে চাকুন্দা গাছের ঝাঁটি বা কঞ্চি দিয়ে।) জেলে সম্প্রদায়ের এ তো এক জীবন্ত আলেখ্য।

নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাস মূলত নদীনির্ভর জনজীবনের এক শ্রেষ্ঠ আখ্যান; যাদের জীবনচর্চা নদীর সঙ্গে বাঁধা, নদীর সঙ্গে তাল রেখে এদের জীবন যেন প্রবহমান। বর্তমান ঝাড়খণ্ডের হুড্রু জলপ্রপাত থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে সুবর্ণরেখা ঝাড়গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নিম্নে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন, সোনাকোনিয়া হয়ে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার উত্তর প্রান্ত বরাবর গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। নানা স্থানে বাঁকবদলের সাথে সাথে তার বুকে জেগে উঠেছে নানান উর্বর ভূমি, বালিয়াড়ি যেগুলিকে কেন্দ্র করে নানান জনগোষ্ঠী আবাসভূমি বানিয়ে তুলেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। সুবর্ণরেখার একটি উপনদী হল ডুলু। এটিও বেশ প্রাচীন নদী। সপ্তদশ শতকে রচিত গোপীজনবল্লভ দাসর 'রসিক মঙ্গাল' পুঁথিতে এই নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ডুলং ঝাড়খণ্ডের কানাইসর পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয় ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের হরেকৃষ্ণপুর, আঁধারি, নব কিশোরপুরের নিম্নভাগে সুবর্ণরেখার সঙ্গে মিলেছে। এই দুই নদীর মধ্যস্থলে রয়েছে সুবিস্তৃত নদীর চর-কোদোপালের জঙ্গাল।

'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে এই দুই নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত নয়াগ্রামের বড়ডাঙা (স্থানীয় উচ্চারণে বডডাঙা), বাছুরখোয়াড়, দেউলবাড় আর নদীর বাম পাশে সাঁকরাইল ব্লকের হরেকৃষ্ণপুর রোহিনী, আঁধারি, আকাশপুরা, মাসাড়, নব কিশোরপুর প্রভৃতি গ্রামের জনজীবন ও তাদের আর্থ—সমাজ রাজনৈতিক অবস্থা (Socio-Economic and Political Aspects)। আলোচ্য উপন্যাসে নাউড়ীয়া তথা জেলে সমাজের প্রধান প্রতিনিধি চরিত্র হংসী নাউড়ীয়া। যে ছিল লেখকের অদূরবর্তী বড়ডাঙ্গার গ্রাম সম্পর্কীয় কাকা। এই কাকাই ছিল ভাইপো ললিনের (লেখক নলিনী বেরার) অজানা-অচেনা জগৎ আবিষ্কারের প্রধান 'নাবিক ভেসপুচি-ভাস্কোদাগামা'; যার নৌকায় চড়ে ললিন চিনেছে সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখাকে। দেখেছে নদীকেন্দ্রিক গ্রাম্য জীবন ও প্রকৃতির রূপকে। এই অপূর্ব আস্বাদ ভরিয়ে রেখেছে তার স্মৃতিকে আজীবন।

হংসী নাউড়ীয়ার নামটির মধ্যেই রয়েছে জলকেন্দ্রিক তার জীবনাবর্ত। হাঁস যেমন জলচর,

সারাদিন জলে ভেসে-ভেসে, কখনো আনন্দের ডুব-সাঁতার দিয়ে তার দিন কেটে যায়, আর নদীর জলের নানান খাদ্যই তার জীবন ধারণের প্রধান উপায়; হংসী নাউড়ীয়ারও জীবন-ধারণ অনেকাংশেই সমধর্মী। সুবর্ণরেখার জল আর পানসি নৌকা নিদেনপক্ষে কাতা ধারের (নদীর পাড়ে) শিমুলতলা ছায়া তাকে যেন সর্বদা আকর্ষণ করে। তাই ঘরের মুখে তার গতি কম। প্রসঙ্গত মনে আসে কুবের কিংবা বিলাসের কথা। নদী নির্ভরতায় এই দুই নায়ক যেন হংসীর এক পূর্ব ছায়া। যদিও চরিত্র ধর্মে এদের মধ্যে মূল পার্থক্য যথেষ্ট। একদা বালক নলিনী যখন তাকে বাড়িতে খুঁজতে যায় তখন হংসীর স্ত্রী জানায়—"নাউড়ীয়া হি করি আর কঁঠে থাকবেন ললিন নদী বাটিয়া নৌকা নি পড়ি আছেন।"[৮] এই 'পড়ি আছেন' শব্দবন্ধটির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ হয় নাউড়ীয়ার পোর কর্ম ও অবসর-দুয়ের প্রধান সঙ্গী নদী। তাই বোধ হয় নাউড়ীয়া সমাজকে নিয়ে প্রবাদও তৈরি হয়েছে হাটুয়া ভাষায়—বার মাস জলে/ একশো দুশো গিলে।

নৌবাহক হংসী 'নাউড়ীয়া' হিসেবে পরিচিত হলেও তার আসল পদবি বধুক। এই বধুকদের বড় একটা বাখুল (ওড়িয়া-বখালি) রয়েছে বড়ো ডাঙ্গায়। এই বধুকদের প্রধান জীবিকা খেয়া-পারাপার আর 'মাছ মারা'। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নদী যখন কানায় কানায় ভর্তি, যখন নদীর জল কোদোপালের নিম্নভাগের চরকে ডুবিয়ে দেয় তখন দুই পাড়ের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় নাউড়িয়াদের নৌকা। নদীর এপারের মানুষদের এপারের রোহিনী বাজার, স্কুল, সদর শহর, আদালত যে-কোনো কাজে যাওয়ার জন্য একমাত্র ভরসা নাউড়ীয়ারা। বহু কাল থেকে বড়ডাঙ্গার বধুক পদবিধারী ধীবররা এই কাজ করে থাকে বলেইতো কেবল নদী-সেপারের এরাই 'নাউড়ীয়া' নামে পরিচিত। কারণ নদীর এপারে শ্রীপুরে এখনো বহু জেলে সম্প্রদায় বসবাস করে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে নাউড়ীয়া বলে কখনো পরিচয় দেয় না। তারা মূলত মাঝি। নদী সেপারের নাউড়ীয়াদের সঙ্গে এদের বৈবাহিক যোগাযোগ অবশ্য রয়েছে। তবু এরা নাউড়ীয়া নয়। আবার শীত-গ্রীষ্মে যখন নদীর জল শুকিয়ে যায় লোকেরা নদীর কোন কোন অংশ দিয়ে হেঁটে হাঁটুজল কিংবা কোমর জল পার হয়ে এপার- ওপার করে, তখনতো বড়ো নৌকা আর নাওড়ীয়ার বিশ্রামের দিন। তখন এদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় মহিষাসুর দাঁক, মশানির দহ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গভীর নদী বাঁকগুলিতে 'ফিকা জাল' মাথার ওপর দিয়ে 'ফাবড়িয়ে' জলে ফেলে মাছ মারা। অবশ্য মাছ মারার কাজটা অন্যান্য জেলেরা সারাবছরই করে থাকে। দিনের বেলার চেয়েও রাতের বেলা মাছ ধরতে যেন এদের ঝোঁক বেশি। অন্ধকারে জলের মধ্যে মাছ যখন নিজের আনন্দে খেলা করে, তখন জেলেদের তিনসেলের বড়ো বড়ো টর্চের আলোয় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। স্থির হয়ে থাকা সেই মাছের ওপর নেমে আসে ছুরি বা ভোজালি কিংবা চাবিজাল। চারিদিক বাঁশ দিয়ে ঘেরা জালটা মাছের ওপর চেপে ধরে ওরা স্বীকার করে বলে এর নাম 'চাবিজাল'। সুবর্ণরেখায় জেলেদের মাছ ধরার এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের জীবনে বহুবার ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'গঙ্গা' প্রভৃতি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে ধীবরদের গ্রাম জীবন-নির্ভর জীবন-উপাখ্যান যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি তার পাশাপাশি নর-নারীর প্রবৃত্তির জৈব খেলা কম চিত্রিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর দিকেই লেখকদের ইঙ্গিত শেষ পর্যন্ত প্রধান লক্ষ্যমাত্রা পেয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কুবের আর কপিলা, 'গঙ্গা'তে বিলাস আর হিমি একটু যেন বেশি ঝড় তুলেছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এক্ষেত্রে অনেকাংশেই ব্যতিক্রম। অদ্বৈত মল্লবর্মণের অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্তি নর-নারীকে ছাপিয়ে সামগ্রিক জনসমাজের বিবর্তনকেই

যেন প্রধান রূপে চিহ্নিত করেছে। আসলে তিতাস ও তার মালো সম্প্রদায়ের সঙ্গে লেখকের যেমন ছিল নাড়ীর সম্বন্ধ, সুবর্ণরেখা ও সুবর্ণ রৈখিক জনজীবনের সঙ্গে লেখক নলিনী বেরার ছিল অনুরূপ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে জৈব প্রবৃত্তির লীলা-তাড়িত জেলে সমাজের ছবি তেমন চোখে পড়ে না। তবে কোনো কোনো অংশে নারী-জীবনের মান-অভিমানের ছবি কিছু পরিমাণে প্রতিভাত হয়েছে ঠিকই, তবে তা খুব স্বল্প মাত্রায়।

উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আকারে কেবল বর্ণিত হয়েছে নাওড়িয়াদের গ্রামজীবনের চিত্র। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে পেশার দিক থেকে এরা মূলত নৌচালক ও মৎস্যজীবী। তবে কৃষিকাজেও এরা নিযুক্ত। নদীর কাদাধারের উর্বর পলিমাটিতে এদের সবজির ক্ষেত, আখবন এবং প্রত্যেকের বাড়ির উঠোনের ধারেই চোখে পড়ে লাউ, বৈতাল, কাঁখুয়ার, বরবটির মাচা। এছাড়া এই অঞ্চলের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো এদের রয়েছে গোরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগির চাষ। যা এদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর আছে আদিবাসীদের মতো ঘরের কাঠের দাঁতিয়ায় টাঙানো মাটির হাঁড়িতে শখের পায়রা। তাদের অহরহ ডাকে এদের বাখুল সদা সর্বদা সরগরম হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত একটি কথা স্মরণীয়, জেলে জীবনকেন্দ্রিক অন্যান্য উপন্যাসে জেলেদের জীবন কেবলই মৎস্য শিকারের সঙ্গে যুক্ত। তাদের অন্য কোন পেশার চিত্র উপন্যাসে নেই। এমনকী "জল বিণে মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে", তেমনি নদী ছাড়া এদেরও একই অবস্থা; 'তিতাস একটি নদীর নাম' যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সম্পূর্ণ মালো সমাজটাই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তিতাস নদীর জল হারিয়ে। কেউ কেউ অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছে ঠিকই তবে সে সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে। নদী যেন তাদের জীবন তথা সমাজের একমাত্র নিয়ন্তা। কিন্তু সুবর্ণরেখার জেলে জীবন তা নয়। এরা জল-স্থল নির্ভর জনসমাজ। মাটির টানও এদের নাড়ীতে রয়েছে।

তবে অন্ত্যজ সমাজের বঞ্চনার ছবি কিছুটা রকমফেরে প্রায় সর্বত্রই সমান। শীতল বাবুদের দল সর্বত্রই স্বমহিমায় বিরাজমান। কেবল নামের প্রভেদ মাত্র। আলোচ্য উপন্যাসেও দেখা যায় নাউড়ীয়ারা সারাবছর নদী পারাপারের মূল্যস্বরূপ সব সময় হাতে নগদ টাকা পায় না। গ্রামের মানুষেরা সারাবছর পারাপার করে এবং বৎসরান্তে পারানির খরচ বাবদ কেউ ধান-চাল কেউ-বা টাকায় তা শোধ করে। কিন্তু সব সময় সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। বঞ্চনার এ ছবি খুব সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা হয়ে যায় উপন্যাসে। লেখকের ভাষায়—

> তখন আদায়ের কালে হংসী নাউড়ীর ঠাটবাট হয় দেখার মতো-দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদারের ন্যায় গোমস্তা তহশীলদার সমভিব্যাহারে ছাতা মাথায় তিনি যেন বাহির হন খাজনা আদায়ে।...আদায়ে অসুবিধা হয়! কানে কানে বলেন—সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটা বেঁকা করতে হয়, বুঝলু ললিন আমি ঠোঁটে আঙুল টিপে ধরে হংসী নাউড়ীয়ার বেঁকা আঙুলে ঘি তোলার কায়দা দেখতে দেখতে তার পিছু পিছু হাঁটি, হাঁটি এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে। তল্লাট থেকে তল্লাটে।[৯]

খেয়াল করতে হয় পাওনাদার হয়েও পাওনার কথাটুকু জোর গলায় বলার সাহস নেই হংসী নাউড়ীয়ার। আদায় কত হয় তার কোনো উল্লেখ করেননি ঔপন্যাসিক। আসলে বঞ্চনার ইতিহাসটুকুই যেন মুখ্য বক্তব্য ঔপন্যাসিকের।

এদের বাসস্থালী অনেকটা বস্তির মতো। কুঁড়েঘরগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সুবর্ণ রৈখিক ভাষায় যাকে বলে 'বাখুল'। দুটি কুঁড়ের চালের জল এক স্থানে এসে পড়ে রাস্তা করে তোলে কর্দমাক্ত-প্যাচপ্যাচে-অস্বস্তিকর। বিশেষত বর্ষাকালে এ ছবি হয়ে ওঠে ভয়াবহ।

বর্ষাকালের সকালে নিত্যদিন দেখা যায় বিগত রাত্রিতে ধরা মাছগুলির সৎকারে ছবি। পাশাপাশি গ্রামে বিক্রির পর অবশিষ্টাংশ নিজেরা বাড়িতে শুঁটকি মাছ তৈরি করে। মূলত ছোট মাছগুলি শুঁটকি রূপে সংরক্ষণের উপযোগী। মাছের আঁশ ও ভেতরের পাকস্থলী টেনে বের করে ভালো করে ধুয়ে তার গায়ে হালকা লবণ মাখিয়ে রোদে শুকানো করা হয় বড়ো বড়ো বাঁশের চালুনিতে। কোথাও কোথাও অবশ্য দড়িতে টাঙিয়ে শুকনো করার দৃশ্যও চোখে পড়ে। এই মাছ ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে তাকে সংরক্ষণ করা হয় ভবিষ্যতের জন্য। আবার এগুলি বহু সময় এরা হাটে বা অন্য কোনো ব্যবসায়ীদের আড়তেও বিক্রি করে অর্থের প্রয়োজনে।

বধুকদের ঘরের মেয়েদের স্বভাব সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন—"ঐ যে 'হাটুয়া', 'হাটুয়া মেয়েরা' ভাঙবে তবু মচকাবে না, '[১০] আঙ্গুরবালা, ভারতী, মুক্তা মমতার মতো মেয়েরা গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুলেই সিক্স, সেভেন পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তবে পড়াশোনা নামে মাত্র। তার চেয়ে গৃহস্থালীর কর্মেই এদের সময় দিতে হয় বেশি। কাউকে সকালে উঠে বড়ি, কলাইয়ের ডাল থেকে মাটি বাছতে দেখা যায়। কেউবা ব্যস্ত আঁচল কোমরে জড়িয়ে 'ফুঁকনলি' দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে রান্নার কাজে। অন্যান্য আর পাঁচটা গ্রামের মতো এ পাড়ার মেয়ে বউরাও তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে চলে। ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে নদীতে নাইতে যাওয়া আর কুয়োয় জল তোলার সময় সকলে মিলে 'রীতিমতো পরচর্চা'র কাজটা করে। পাশাপাশি নিজেদের পরিবারের নানান ঘটনা নিয়ে চলে রঙ্গ-তামাশা। সবটাই অবশ্য, হাটুয়া ভাষায়। দূর থেকে কান পাতলে শোনা যায় তার রেশ—"আ লো, মা লো, শুন লো, দ্যাখ লো, তোর ঘৈতা, মোর ঘৈতা" আর হাসির কলরোল। তবে ঘোমটা বা পর্দা প্রথা এ সমাজের নারীকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি। এখনো আকছারই এইসব অঞ্চলে গেলেই দেখা যায় রাস্তার ধারের নদী কিংবা খালের জলে অবলীলায় এরা গাত্র মার্জনা করছে। একটি বস্ত্রখণ্ড দাঁতে চেপে সারা শরীর অবলীলায় ধৌত করে নেয় নদীর জলে। অদূরবর্তী কোনো মানুষকে দেখেও এদের কোনো ভ্রূক্ষেপ তেমন নেই। আসলে সেই অতীতকাল থেকে জঙ্গল আর নদী যেন তাদের স্বাধীন রাজ্য, সেখানে অন্যরা যেন অনুপ্রবেশকারী; তাদের দেখে লজ্জা পাওয়ার বা ঘোমটা দেওয়ার কোনো রীতির ধার ধারে না এরা।

নাউড়ীয়া সমাজের প্রধান ভরসা নদী আর নৌকা। এই নৌকাকে কেন্দ্র করে এদের সমাজে অনুষ্ঠিত হয় নৌকা বিলাস। পূর্ববাংলার নদীতে যেমন চলে নৌকা বাইচ। যদিও এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক পার্থক্য রয়েছে। নাউড়ীয়াদের একটি বড়ো নৌকাকে ফুল-চন্দন আর তেল-সিঁদুরে সুসজ্জিত করা হয়। তারপর নৌকায় গিয়ে ওঠে গাঁয়ের কীর্তনীয়ার দল; যাদের পরনে সাদা ধুতি, গেঞ্জি, গামছা, কপালে তিলক, গলায় তুলসী কাঠের মালা। আর ওঠে গাঁয়ের মাতব্বর শ্রেণির কিছু লোক, কয়েকজন ছেলে-ছোকরা। বেজে ওঠে খোল, করতাল, গুপী যন্ত্র। আর উদাত্ত কণ্ঠে শুরু হয় রাধা-কৃষ্ণের নৌকা বিলাস, মাথুর, মানভঞ্জনের গান। নাউড়ীয়ার নৌকা তীর তীর বেগে এগিয়ে চলে উজানে নদীর দুই তীরের একের পর এক গ্রাম, বনভূমি, হুড়ী পার হয়ে। তারপর বিকেলে ভাটার স্রোতে তারা ফোটার আগে নৌকা এসে ফের লাগে ঘাটে। অবশ্য এ বর্ণনা লেখকের শৈশবকালের স্মৃতিবাহিত। আধুনিক বিশ্বায়নের ছোঁয়া এই গ্রামীণ জীবনের আচার-উৎসবকেও ফিকে করে দিয়েছে। এখন এসব কেবলই স্মৃতি মাত্র।

উপন্যাসে নাউড়ীয়াদের নৌকা নির্মাণ ও সারাইয়ের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। গ্রামের মধ্যে নৌকা সারাইয়ের কাজ তেমন কেউ জানে না। শুধু প্রমথ ও আর পরমেশ্বর মিস্ত্রিকে দিয়ে টুকটাক

কাজ চলে। বড়ো কাজের জন্য এদের নির্ভর করতে হয় দিঘা, কাঁথি, রামনগরের মিস্ত্রিদের ওপর। কখনো-বা বালাগড়ের চাঁদড়া, সুখুড়িয়ার হলধর বৈরাগীর দলের ওপর নির্ভর করতে হয়। তখন শিমুলতলার পাশে শশাঙ্ক দণ্ডপাটের জমিতে কাজের আসর বসে। তুরপুন, ভ্রমর, করাত, হাতুড়ির শব্দে সরগরম হয়ে ওঠে পুরো চত্বর। শুরু হয় গোবর মাখিয়ে খড় বা কাঠের আগুনে সেঁকে 'বাগা' (তক্তা বাঁকাবার যন্ত্র)-র সাহায্যে তক্তা বাঁকানোর কাজ। আর তৈরি হয় বিনোদনের কর্মসংগীত—'শিমুল খুঁটার নৌকা তোমার হে/ও নৌকা তলায় জলের ভারে/শিমুল'। কখনো-বা নাউড়ীয়াদের সাথে মিস্ত্রিদের ঠোকাঠুকি লেগে যায় কাজের ভুল নিয়ে। কখনো বাঁক, ঠেই, গলুই, বড়াস, জলুই, দরগা, বারসিতি প্রভৃতি নৌকার বিভিন্ন অংশতৈরি নিয়ে। মেরামতির কাজ শেষ হলে নৌকার গায়ে চলে আলকাতরা মাখানোর কাজ। এরপর নৌকার দু'দিকে দুটি সুন্দর চোখ আঁকা হয়। অবশেষে নাউড়ীয়া ঘরের মেয়ে, বউরা এসে মিস্ত্রিদের সাথে একযোগে করে 'সিঁদুর দান' আর 'দণ্ডাপূজা'। এইভাবে কিছু নিজস্ব আচার নিয়ে নাউড়ীয়া সমাজ আজও চলেছে।

পরিশেষে কয়েকটি কথা অবশ্যই বলতে হয়—আলোচ্য উপন্যাসের সুবিশাল ক্যানভাসে ঔপন্যাসিক সুবর্ণরেখা-তীরবর্তী বিভিন্ন জনজীবনের যে ছবি সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে নাউড়ীয়া সমাজের বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত। তবে এ কথাও ঠিক বিগত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বের (লেখকের শৈশব-কৈশোরের) জনজীবন ও তার সমাজ কাঠামো আজ আর এক স্থানে দাঁড়িয়ে নেই। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নগরায়নের ছাপ অঙ্গে ধারণ করে এরাও পরিবর্তনের পথে। সময় এবং স্রোত চির প্রবহমান এবং পরিবর্তনশীল জীবনকেই দ্যোতিত করে-এ সত্য সর্ববাদী সম্মত।

উৎসের সন্ধানে

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ : 'তিতাস একটি নদীর নাম', পুঁথি ঘর প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সং, পৃ. ২০
২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত : 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুনর্মুদ্রণ ১৪২৭, পৃ. ১১৪
৩. বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ রায় সম্পাদিত : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, একাদশ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ৫৯
৪. নিহাররঞ্জন রায় : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব', বুক এম্পোরিয়াম, প্রথম সং ১৩৫৬, পৃ. ৩০৫-৩০৭
৫. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'চণ্ডীমঙ্গল' সাহিত্য অকাদেমি, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৮২
৬. তদেব : পৃ. ৮৩
৭. O'Malley, L.S.S. : 'Bengal District Gazetters Midnapore, Gayn Publishing, 2018 (reprint) P. 58
৮. নলিনী বেরা : 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সং ১৪২৬, পৃ. ৩৩
৯. তদেব : পৃ. ৩১-৩২
১০. তদেব : পৃ. ৩৩

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস জীবনবোধের দর্পণে

সত্যজিৎ সরকার

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যকে একটি ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতা ও তাঁর অসাধারণ লেখনীগুণে তাঁর রচনাগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ফর্ম নিয়েও তিনি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সাহিত্য রচনায় প্রচলিত বাঁধাধরা নিয়মকানুন তিনি মানতে চাননি। তাঁর উপন্যাসগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কল্পনার রাজ্য থেকে আমদানি করা চরিত্র তাঁর উপন্যাসে নেই অথবা থাকলেও সেটিও বাস্তব জীবনের রক্তমাংসের মানুষে পরিণত হয়েছেন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত, চোখে দেখা এই মানুষগুলো আশ্চর্য শৈল্পিকগুণে জারিত হয়ে স্থান পেয়েছে উপন্যাসের পাতায়। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অতি সহজেই জীবনের পূর্ণ চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যি সত্যিই সেখানে স্থান পায় 'গাঁ-ঘরের কথা'। অতি সহজেই পাশাপাশি অবস্থান করে যায় গ্রাম ও আধুনিকতা, পুরাণ ও ইতিহাস, সময় ও মৃত্যু, প্রকৃতি ও নিম্নবর্গীয় চেতনা। এই চেতনার অভিনবত্বেই রামকুমার মুখোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের অধিকাংশ প্রেক্ষিত জুড়ে যে 'বাঁকুড়া'র কথা পাওয়া যায়, সেখানেই তাঁর শৈশব ও কৈশোরের পুরোটাই কেটেছে। একদিকে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম-গ্রামান্তরের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে কলকাতার নাগরিক জীবনের ছোঁয়া তাঁর লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর উপন্যাসে মিথ, গ্রামজীবন, লোককথা, সংগ্রাম, উচ্চশ্রেণির বঞ্চনা মিশে যায়। ছবির পর ছবি ফ্রেম বন্দি হয়ে যায়। চোখের সামনে পাতার অক্ষর ছবি হয়ে যায়। এসবের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বহুমাত্রিক চেতনা ও জীবনবোধ। রামকুমার মুখোপাধ্যায় বাস্তব এবং ফ্যান্টাসির মধ্যে সুস্থ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। লোকায়ত জীবন, জনজাতির

মানুষের কথা, তাদের সংস্কৃতির কথা, মানব-মানবীর চিরন্তন সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা সুচিত্রিতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। আনন্দের বার্তা ও বেদনা একসঙ্গে বহন করার স্ববিরোধহীন শক্তির স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে। আসলে তিনি জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে চেয়েছেন। মেঠোপথের কাদামাখা জীবন থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের বর্ণময় উচ্ছ্বাস—সবকটাকেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসের পাতায়।

লেখকের প্রথম উপন্যাস 'চারণে-প্রান্তরে' (১৯৯৩) স্বাধীনতা-পরবর্তী গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রার কথা তুলে ধরেছে। ছেলেবেলা থেকে বয়ঃপ্রাপ্তির উত্তরণে, বিকৃত পুঁজিবাদী বিকাশের টানাপোড়েনে, অবাঞ্ছিত হয়ে উৎপাদন কাঠামো আঁকড়ে ধরতে না পেরে কোনোরকমে দিনযাপন করা বিশু, বদে, জিতে বা সুনোরাই উপন্যাসের প্রধান কুশীলব। নায়ক বিশু পেশাগতভাবে রাখাল। তার মা দিদি পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তির মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তার বাবার তাঁত ঘরে দিদি হাঁস পোষে। শহরকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থার তীব্র বিকাশের পদধ্বনির মাঝখানেও গ্রাম যেখানে বিপন্ন, বেঁচে থাকা যেখানে যুদ্ধ করার সমতুল্য, সেখানেও এই চরিত্রগুলো জীবনকে বেছে নিয়েছে। আত্মহত্যা করেনি। জীবন সংগ্রামকে বরণ করে নিয়েছে। জীবনচেতনার এ যেন অনন্য উদাহরণ।

'ভাঙা নীড়ের ডানা' (১৯৯৭) উপন্যাসে প্রবাসী বাঙালি পক্ষী বিশারদ দিশা চৌধুরী রাহাত বাংলার রুক্ষ-শুষ্ক মাটিতে এসে পঞ্চায়েত সদস্যা, মাধবী মুর্মু, পাখি প্রেমিক, পাখি বিক্রেতা ও শিকারি, বদন দত্ত—এদের প্রত্যেককে বন্ধু করে নিয়েছে। আবার, 'মিছিলের পরে' (১৯৯৮) উপন্যাসে পুরুলিয়ার সূর্য সাঁই, জলপাইগুড়ির বাসন্তী, হুগলির ঠাকুরানিচকের নিমাই চক্রবর্তী, বর্ধমানের নন্দ পাড়ুই, বাঁকুড়ার দামু মুহূর্তেই বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের জীবনের দুর্বিষহ ব্যথা বেদনার কাহিনি রাতের অন্ধকারে নিজেদেরকেই শুনিয়েছিল। সূর্য সাঁই ব্রিগেডের মাঝখানে আগুন জ্বেলেছিল, নিশান পুঁতেছিল, তাতে ভূগোল শুধু স্থির হয়েছিল। সূর্য সাঁইদের জীবন কোনোরকমে আলোকিত হয়নি। এই দলছুট মানুষগুলোকে নিজের নিশান নিজেকেই পুততে হয়, রাতের অন্ধকারে নিজেদের কথা সমমানসিকতা ও সামাজিক সহাবস্থানসম্পন্ন মানুষদের কাছে শোনাতে হয়। দিনের আলোতে সরে যেতে হয় অন্যত্র।

উপন্যাসটির কৃতিত্ব এই যে, উপন্যাসটির ভূগোল ব্রিগেডের মাঠ কিন্তু উপন্যাসটিতে কলকাতা-পুরুলিয়া- বাঁকুড়া-হুগলি-জলপাইগুড়ি এক সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। উপন্যাসটির পাঠকালে পাঠকও পৌঁছে যান পশ্চিমবঙ্গের ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে। তখন উপলব্ধি করা যায়, মাটির ভূগোল আলাদা হলেও মানুষের ভূগোল এক। নিজেদের প্রয়োজনেই উপন্যাসের পাঁচ-চরিত্র রাতের অন্ধকারে একত্রিত হয়েছে, এদেরকে একত্রিত হতেই হতো, কারণ এরা দলছুট। মিছিল তো দলছুটদের খবর রাখে না। এই দলছুট মানুষগুলোকে তাই নিজেদের নিশান নিজেকেই পুঁততে হয়। প্রাথমিক আলাপচারিতায় এরা নিজেরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-অভাব-অপমানের কথা আলোচনা করেছে। তবে শেষপর্যন্ত এ কেবল পাঁচজন মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা হয়ে থাকেনি। এ যেন হয়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার কোটি কোটি মানুষের জীবনালেখ্য। সূর্য সাঁইরা নিজেদের কথা ও ব্যথা যখন নিজেদেরকেই শোনান তখন তা কেবল ব্যক্তিগত জীবন কাহিনি হয়ে থাকে না, ঔপন্যাসিকের নিজস্ব জীবনবোধ এর মধ্যে চিত্রিত হয়ে ওঠে।

'দুখে কেওড়া' (২০০২) দ্বি-বাচনিক সংলাপের এই উপন্যাসটিতে জীবন আলাদাভাবে চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটির বারো অধ্যায়ের নামকরণ ও জীবনের এই বারোটি দিককে তুলে ধরেছে। এই বারোটি অধ্যায় হল—পরিচয়, ক্ষুধা, বাস্তু, স্বাস্থ্য, শ্রম, নারী, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবী, যুদ্ধ ও মৃত্যু। সমগ্র উপন্যাসটিতে দুখের কথাবয়নে লেখক পাঠককে নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে অন্যরকম দৃষ্টিতে ভাবতে শিখিয়েছেন। দুঃখহরণ আমাদের সাধারণ জীবন থেকে নেওয়া একজন চরিত্র। তবু তার উপজীব্য লেখকের চোখে ওই সাধারণ মানুষদের জীবনচর্চার অনুধাবন। উপন্যাসের শেষে দুখের সম্ভাব্য মৃত্যুর পর শ্মশানে মন্দির তোলার কথা বলা হয়েছে। দুঃখে জীবন নিয়েই বেশি ভাবত, মৃত্যু নিয়ে নয়। দু'বছর ধরে চালের খড় বাদ দিয়ে টিন দেওয়ার ইচ্ছে ছিল দুখে কেওড়ার। কিন্তু অর্থাভাবে সেই ইচ্ছে তার পূরণ হয়নি। তাই সে শ্মশান মন্দির নিয়ে ভাবতে চাই না। তবে বাবুমশাই যদি করান তাহলে তার আপত্তিও নেই। তার শুধু একটি ইচ্ছে আছে, শ্মশানে যে মন্দিরটি হবে সেখানে যেন 'দুখে কেওড়া' না লেখা থাকে। তিনি বলেন সেখানে যেন লেখা থাকে 'দুঃখহরণ কেওড়া'। সমাজ তাকে অবজ্ঞার সঙ্গে দুখে কেওড়া বললেও তিনি নিজের কাছে সর্বদাই দুঃখহরণ- আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন, সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক মানুষ। এই মানুষটির অস্তিত্ব সমাজ স্বীকার করে না। 'দুঃখহরণ' বললে গায়ের মানুষ বোঝেন বামন পাড়ার স্কুল মাস্টার দুঃখহরণ ভট্টাচার্যকে। 'দুখীরাম' হল তেলি পাড়ার চাষিমানুষ। আর কেওড়াপাড়ার মানুষটি শুধুই 'দুখে'। জীবন, জীবনের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, সামাজিক সহাবস্থান প্রভৃতির মেলবন্ধন এর অভাব 'দুঃখহরণ কেওড়া'কে কি করে 'দুখে' বানিয়ে দেয়, তাও ঔপন্যাসিক অসাধারণ দক্ষতায় আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

'ভবদীয় নঙ্গারচন্দ্র' (২০০৬) উপন্যাসে নঙ্গারচন্দ্র মিদ্যা থাকেন বাঁকুড়া জেলার গেলিয়া গ্রামে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা এই ব্যক্তি অটলবিহারী, সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, বাল ঠাকরে, নির্বাচন কমিশনার জেএম লিঙডো, লালু প্রসাদ যাদব, সুষমা স্বরাজ ও আরো বহু গণমান্য ব্যক্তিকে চিঠি পাঠান। এরকমই এক গোছা চিঠি দিয়ে গড়া এ উপন্যাস। অধিকাংশ চিঠিই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে পাঠানো। চিঠির বিষয়বস্তুও হয় রাজনৈতিক নাহয় সামাজিক। তারপরেও নঙ্গারচন্দ্রের চিঠিগুলির নিবিড় অধ্যায়ন করলে বোঝা যায়, তার মন পড়ে আছে মাঠে, গোয়ালে। সে তার দেশকে ভালো রাখতে চায়, ভালো দেখতে চায়। সক্রিয় রাজনীতির দিকে তার চোখ নেই, নজর আছে। উপন্যাসে শুধু নঙ্গারচন্দ্রের প্রশ্ন আছে, উত্তর নেই। প্রশ্নই শেষ হয়নি এই বিরলতম ব্যক্তিত্বটির। উত্তর খোঁজা শুরু করার সময় পাননি হয়তো তিনি। প্রশ্নই তার কাছে শাস্ত্রের নামান্তর হয়ে উঠেছে। প্রশ্নই তার কাছে যেন সাধনা এবং সাধনায় নিঃসন্দেহে সিদ্ধহস্ত তিনি। অন্যদিকে, 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' (২০১০) মধ্যযুগের বিনির্মাণ। তবে এই বিনির্মাণের একমাত্র কারণ আধুনিক জীবনকে ফুটিয়ে তোলা। ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলী দূর থেকে প্রত্যক্ষ দর্শনের দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিলেন, তেমনি রামকুমার মুখোপাধ্যায় মুকুন্দের কাব্য সামনে রেখে কয়েক শতাব্দীর দূরত্ব অতিক্রম করে পিছন ফিরে দেখেছেন মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালিকে। এ যেন আক্ষরিক অর্থে বাঙালি জীবনকে দেখা। কেবল তাকানো নয়। এ দেখা সবাই দেখতে পারেন না। দৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্মতা ও প্রগাঢ়তা প্রয়োজন হয়। উপন্যাসিকের দৃষ্টিতে সেই সূক্ষ্মতা ও প্রগাঢ়তা বর্তমান।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির আলোচনার সাপেক্ষে বলা যেতে পারে, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনবোধ তাঁর উপন্যাসগুলিকে প্রভাবিত করেছে। ঔপন্যাসিক সম্পূর্ণ কল্পনার উপর নির্ভর না করে, নিজের উপন্যাসের আখ্যানভাগ নির্মাণ করেছেন বাস্তব জীবনকে সামনে রেখে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবোধ আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসগুলির চরিত্ররা মৃত্যুতুল্য কষ্টের মাঝখানে দাঁড়িয়েও জীবনকে ভালোবেসেছেন, শুধু জীবনের জন্যই। প্রতিটি উপন্যাসে তাই জীবনই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন বহু অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ তাই তাঁর লেখনী অত্যন্ত বাস্তব। লেখনীর বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। একদিকে ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অন্যদিকে নিজস্ব শৈলী সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এবং প্রতিটি উপন্যাস যে নতুন ও ভিন্নতর কিছু দাবি রাখে—সেটির উপলব্ধি মননঋদ্ধ রামকুমার মুখোপাধ্যায়কে কালজয়ী ঔপন্যাসিক করে তুলেছে। একদিকে নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা অন্যদিকে পৌরাণিক চরিত্রের অভিনবত্বপূর্ণ পুনর্নির্মাণ, একদিকে প্রকৃতি চেতনা অন্যদিকে সময় চেতনা, একদিকে 'রাত্রি'র বহুমাত্রিক ও সাংকেতিক ব্যবহার অন্যদিকে মৃত্যুকে মৃত্যুত্তীর্ণ করার প্রয়াস যখন অতি নিপুণভাবে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে ফুটে ওঠে, তখন উপন্যাসের মায়ালোকে এক জীবনবোধ নির্মিত হয়, পাঠক সেখানে খুঁজে পান এক নিবিড় আশ্রয়।

তথ্যের সন্ধানে

১. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'চারণে প্রান্তরে', ১৯৯৩, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা
২. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'ভাঙা নীড়ের ডানা', ১৯৯৭, অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা
৩. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'মিছিলের পরে', ১৯৯৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
৪. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'দুখে কেওড়া', ২০০২, দীপ প্রকাশন, কলকাতা
৫. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কথার কথা', ২০০৮, এবং মুশায়েরা, কলকাতা
৬. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'ভবদীয় নঙ্গারচন্দ্র', ২০০৬, এবং মুশায়েরা, কলকাতা
৭. রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', ২০১০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবন ও জীবিকা

মনিহার খাতুন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট জেলা। এই জেলার ইতিহাস যেমন স্বতন্ত্র, প্রাকৃতিক ভূগোলও তেমনি অনন্য। মূলত এটি সমতলভূমি অঞ্চল, কিন্তু ভূমিভাগ সর্বত্র এক নয়। এই জেলার দক্ষিণে রয়েছে বিশিষ্ট ম্যানগ্রোভ অরণ্য-সুন্দরবন। সুন্দরী-গরান-গেঁওয়া-হেতাল-পশুর-ধুন্দুল ইত্যাদি লবনাম্বু উদ্ভিদের চিরহরিৎ রাজ্য। বাঘ, সাপ ও অন্যান্য হিংস্র বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ ঘন জমাট বাঁধা সমুদ্রোপকূলীয় অরণ্য। এই অরণ্যাঞ্চলে বাস করে যে হতভাগ্য মানুষগুলো, তাদের জীবন ভয়ানক বিপদসঙ্কুল। জল ও জঙ্গালের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় তাদের। অরণ্যের কাঠ, মধু, মোম সংগ্রহ করতে গিয়ে বন্যজন্তুর হাতে প্রাণ হারায়। কখনো বা মীন-মাছ ধরতে গিয়ে চলে যায় কুমীর-কামটের পেটে। নদীবাঁধের উপর ঘর বাঁধা এই অসহায় মানুষগুলো প্রতি মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে অতর্কিত মৃত্যু পরোয়ানার দিকে। এই অরণ্যাঞ্চলের বাইরে রয়েছে আরও এক বিস্তৃত ভূখণ্ড, যেখানে দু-একটি শহর ও আধাশহর থাকলেও, তার বেশিরভাগ অংশই গ্রামাঞ্চল। এই গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, ভয়ানক দরিদ্র। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এদের কেউ কেউ কৃষিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ব্যবসা-বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। কেউ বা চাকরির সুবাদে সামান্য স্বচ্ছল। শহর ও আধাশহরগুলিতে অপেক্ষাকৃত উন্নত, শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। যেখানে উচ্চবিত্তরা মূলত চাকুরি বা বড়ো ব্যবসা আর নিম্নবিত্তরা ছোটোখাটো ব্যবসা বা শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত। এইরকম এক ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ও আলাদা করে বলবার। ইতিহাস কথিত শৌর্যবান গঙ্গারিডি জাতির একদা অবস্থান ছিল এই

দক্ষিণবঙ্গেই-সাগর সন্নিহিত জনপদে। সে জাতি আজ খাতায় কলমে নিশ্চিহ্ন। কিন্তু তাদের রক্তধারা আজও নিঃশব্দে বহমান এখানকার ভূমিপুত্রদের দেহে-মজ্জায়-শোণিতে। প্রৌণ্ড, বাগদী, হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই এই জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানকার জীবন ও সংস্কৃতিতে এই সব জনসম্প্রদায়ের অবদানই সবচেয়ে বেশি। বস্তুত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার এখানকার লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে পৃথক পরিচয় দান করেছে—যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন। গ্রীক পর্যটকদের বিবরণীতে, রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্যে যে গঙ্গারিডি সভ্যতার কথা আছে তা নিঃসন্দেহে সুন্দরবনের প্রাচীন উল্লেখ। এরপর মধ্যযুগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রকৃতি, মানুষ ও লৌকিক দেবদেবীদের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে 'রায়মঙ্গাল', 'বোনবিবি জুহুরা নামা'-র মতো সাহিত্য। আধুনিক কালের সাহিত্যে প্রথম দিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ছিল একেবারেই ব্রাত্য। বঙ্কিমচন্দ্র-ত্রৈলোক্যনাথ-পরশুরামের মতো সাহিত্যিকগণের লেখায় অতিসামান্য পরিমাণে এসেছে এই জেলার প্রসঙ্গ। এর অনেককাল পরে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালে কবি-সাহিত্যিকদের কলমে ধীরে ধীরে বিস্তৃত আকারে উঠে আসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিতগুলির আমূল দিক পরিবর্তন ঘটে যায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ভিত্তিক সাহিত্য অনেকটাই নিস্তরঙ্গ। নাগরিক সভ্যতার অস্থির চাপল্য থেকে দূরে নিরালা আটপৌরে গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য রূপে এই জেলাকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন সাহিত্যিকরা। যেখানে দরিদ্র, সরল, সাদাসিধে মানুষের উপর ধনী, স্বার্থান্বেষী, লোভী মানুষের চিরকালীন আগ্রাসন। সংযম শিথিল, রক্তমাংসময় ভোগবাসনা বহুল জীবনের বিপরীতে নিরন্ন, উদাসীন, অরণ্যমুখী, অকুতোভয় মানুষগুলোর একটু ভালোভাবে বাঁচার যুথবদ্ধ প্রয়াস—এসব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত এক অভিনব ভৌগলিক আয়তন-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। মনোজ বসু, শিবশঙ্কর মিত্ররা দিলেন এই পথের সন্ধান। তারপর থেকে শক্তিপদ রাজগুরু, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, আব্দুল জব্বর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস প্রমুখ লেখকগণ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে তাঁদের লেখার উপজীব্য করে বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় দরবারে এক চিরস্থায়ী মর্যাদা দান করেছেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের যথার্থ সূচনা ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর হাতে। এই জেলার অখণ্ড বাদা অঞ্চলের অসামান্য রূপকার তিনি। বনাঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে অগ্রজ এই লেখকের ভাবনা ধরা পড়েছে তাঁর 'জলজঙ্গাল' (১৯৫১) ও 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) উপন্যাসে। উপন্যাস দুটি সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের সংগ্রামী মানুষের বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবন যাপনের বিশ্বস্ত দলিল। লেখকের ছেলেবেলা কেটেছে যশোরের ডোঙ্গাঘাটায়। এখানকার নদী-বন-শ্বাপদ-মানুষকে ভালোবেসে, একই মাটিতে বাস করে লেখক যে জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি এই দুটি উপন্যাস। লেখকের নিজের কথায়—

> গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয়। কাঠ কাটতে মধু ভাঙতে জীবিকার নানাবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়, বাঘ কুমীর সাপের কবলে পড়েতার মধ্যে কত জনে আর ফেরেনা।

জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি ও বাঘের সওয়ার গাজি-কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমায় আকর্ষণ করত। সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভেতরে খালের ওপর নৌকায় বসে লেখা।[১]

সুন্দরবনের প্রকৃতি, উপকূলবাসী মানুষের জীবন ও চরিত্র, বিশ্বাস ও সংস্কারের এক অসামান্য দলিল 'জলজঙ্গল'। এই বাদা অঞ্চল বড়োই নিষ্ঠুর। এখানে প্রতিমুর্হুতে লড়াই করে বাঁচতে হয়। প্রকৃতি এখানে তার ঐশ্বর্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে কিন্তু অত সহজে তাকে পাওয়া যায় না। জীবন-মরণের বিনিময়ে তাকে ছিনিয়ে আনতে হয়। এককথায় জলে-জঙ্গালে বেঁচে থাকতে গেলে গায়ের জোড় ও মাথার বুদ্ধি দুই-ই চাই। উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য সেটাই। প্রকৃতির মতো এখানকার মানুষও রহস্যময়। কেউ কেউ উদার-অনাবিল, আবার কেউ কেউ হিংস্র-কুটিল। জল ও জঙ্গালকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত তাদের জীবন-জীবিকা, দুঃখ-আনন্দ, জৈবিক প্রবৃত্তি।

মধুসূদন রায় নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে জমিদারির নাম রেখেছেন 'মৌভোগ'। কলকাতার নাগরিক ঐশ্বর্য ও বিলাসময় জীবনের মায়া ত্যাগ করে পড়ে আছেন বাদা অঞ্চলে, মৌভাগের কাছারি বাড়িতে। কিন্তু অসৎকর্মচারী দুর্লভচন্দ্রের অর্থ তছরূপে, বিশ্বাসী বন্ধু সুকুমারের বিশ্বাসঘাতকতায় ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূন্য হতে থাকেন তিনি। ভগ্নমনোরথ জীবন থেকে তিনি তাই পালিয়ে চলেছেন অরণ্যের নিভৃত অন্ধকারে, জীবন ও মৃত্যু যেখানে একাকার। কেতুচরণ ঢালি বাদাবনের বাঘের সঙ্গে যাকে তুলনা করা হয়। সেই সরল— সাহসী কেতুচরণ জীবন ও সমাজ দ্বারা বারবার প্রতারিত। ব্যর্থ কেতুচরণ তবুও স্বপ্নসন্ধানী। উপন্যাসের শেষে মধুসূদনের মতো সেও যাত্রা করে শান্তিনগরের উদ্দেশ্যে। আত্মসুখ পরায়ণ নারী এলোকেশী, যে নিজ স্বার্থে বারবার ব্যবহার করেছে কেতুচরণকে। কেতুকে প্রলুব্ধ করে শেষপর্যন্ত জমিদারের ম্যানেজার দুর্লভচন্দ্রকে বিয়ে করে বেছে নেয় ভোগলালসার জীবন। কিন্তু সেই দুর্লভচন্দ্রের সংসারেই একসময় তার বেহাল দশা। তাকে সংসারে রেখে দুর্লভচন্দ্র এদিক ওদিক অন্য নারীর সাথে ফূর্তি করে। সাঁইতলার মান্যধর মোড়লের ছেলে উমেশ, গান পাগল এক চরিত্র। কেতুর মতো ভালোবেসে সেও প্রতারিত। 'নিটোল কালো মেয়ে' পদ্ম, উমেশের ভালোবাসা মাড়িয়ে মর্জাল স্টেশনের বনকর অফিসের গার্ড হরিপদকে বিয়ে করে। প্রত্যাখ্যাত উমেশ গানকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরে। উপন্যাসের শেষে সেও কেতুচরণের সঙ্গে অনির্দেশের দিকে পাড়ি জমায়। এভাবেই মধুসূদন, কেতুচরণ, উমেশ, এলোকেশী, পদ্ম প্রভৃতি চরিত্রকে কেন্দ্র করে 'জল জঙ্গাল' হয়ে উঠেছে সুন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলবাসী জনজীবনের বিশ্বস্ত দলিল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'বাদাবন' ও 'মান্‌ষেলা' এই দুই বিপরীত মেরুর আখ্যানকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর অপর উপন্যাস 'বন কেটে বসত'। সুন্দরবনের অফুরান ঐশ্বর্যের টানে মানুষ ছুটে আসে বাদাবনে। বন কেটে বসত তৈরি করে। কিন্তু তাদের পরিশ্রমে গড়া আবাদী অঞ্চলে এরপর মুনাফা লুটতে মান্‌ষেলা থেকে ছুটে আসে লোভীর দল। তখন শান্তিপ্রিয় অরণ্যজীবী মানুষেরা এগিয়ে যায় আরও গহীন বনে। কাঠ, মধু, মাছভরা বাদায় ভাত কাপড়ের ভাবনা নেই। ভাগ্যান্বেষী গগন তাই নিজেকে বিভিন্ন ধান্দায় জড়াতে জড়াতে পৌঁছে যায় বাদারাজ্যের একেবারে শেষ সীমায়। রাজমিস্ত্রির মজুরির হিসাব লেখা, ডাক্তারের কপাউন্ডার থেকে ডাক্তার হবার বাসনা, পাঠশালার গুরুগিরি থেকে, শেষে মাছের ভেড়ি প্রতিষ্ঠা করে। নাবালের পথে ধাপে ধাপে কুমিরমারীশ, কোকিলবাড়ি, বয়ারখোলা হয়ে শেষে নৌকার মাঝি জগার সহায়তায় নিমকির মোহনায়

আলা বেঁধে শুরু হয় গগনের ঘেরিদার জীবন। 'মাছমারা'দের চুরি করে আনা মাছ বাজারে বিক্রি করে বাদাবনে বেশ জাঁকিয়ে বসে গগন। আর সেই সূত্রেই পার্শ্ববর্তী আলা চৌধুরিগঞ্জের সঙ্গে তার বিরোধ গড়ে ওঠে। একইসঙ্গে এসে জোটে স্ত্রী বিনিবউ, বোন চারুলতা, শ্যালক নগেনশশী। 'আলা' হয়ে ওঠে আলয়, ষোলো আনা গৃহস্থ বাড়ি। সবরকম প্রতিকূলতায় বিভ্রান্ত গগন শেষপর্যন্ত মুক্ত জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। জগার সঙ্গে মান্‌ষেলার উলটোদিকে যাত্রা তার এখানেই থেমে যায়। স্বাধীনচেতা জগা এগিয়ে যায় আরও দক্ষিণে, পৌঁছায় অথৈ কালা-পানির সামনে। সঙ্গী বলাই, চারু, শশী। মহেশের মতো খ্যাপা বাউলেরা সঙ্গী হয় জগন্নাথদের। পৌঁছে যায় 'কেশে ডাঙার চরে'। বন কেটে বসত তৈরি করবে। কিন্তু একদিন সেখানেও ছুটে আসবে লোভীর দল। জগার তাই ভাবনা— "তখনকার কী উপায় জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে কালাপানি পারের জন্যে আবার একদিন কোন্ কায়দা ধরতে হবে, কে জানে?"[২]

একদিকে গগনের সংসার জীবনের পিছুটান, অন্যদিকে জগার মুক্ত জীবন—এই দুই এর দ্বন্দ্ব 'বন কেটে বসত'। কেবল গগন নয় সুখের গন্ধে মান্‌ষেলা থেকে বাদাবনে এসে পৌঁছায় নগেন শশী, টোনি চক্কোত্তি, গোপাল ভরদ্বাজের মতো লোকেরা। তারা বাদাবনের শান্তি ভঙ্গ করে। বাদাবন কাউকে ফেরায় না। বাদায় এসে প্রতিপত্তি হয়েছে মনোহর ডাক্তার, কাঙালি চক্কোত্তির। কাঙালী চক্কোত্তি থেকে হয়েছে চৌধুরী। অবস্থা উন্নতির সাথে সঙ্গে চক্কোত্তির মেছোঘেরি হয়েছে 'চৌধুরী গঞ্জ'। 'রাঙবড়ি' বেচে লাল হয়ে ওঠে কবিরাজ মনোহর ডাক্তার। বাদাবনে জাত বেজাত নেই। বাদাবন সবাইকে ঠাঁই দেয়। মনোহর ডাক্তারের অতীত চাপা পড়ে যায়। গদাধর শানা থেকে হয়ে যায় ভট্টাচাজ্জি। গলায় পৈতে ঝুলিয়ে কুমিরমারীতে হোটেল খুলে বসে। সঙ্গে এনেছে আদরমনি নামে এক স্ত্রীলোককে। এমন অনেকে আসে। সমাজের তাড়া খেয়ে বাদায় এসে ঘর বাঁধে। এই বাদাবনের সাধারণ মানুষের সরল সাধাসিধে জীবনযাত্রা, বেঁচে থাকার জন্য তাদের কঠোর সংগ্রাম, স্বার্থান্বেষী মানুষের লোভ লালসা, নরনারীর অনিবার্য জৈবিকতা এসব নিয়েই অনবদ্য উপন্যাস 'বন কেটে বসত'।

সুন্দরবনের সংগ্রামী জীবনের আর এক দক্ষ রূপকার শিবশঙ্কর মিত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবনের পটভূমিতে লেখা তাঁর পাঁচটি উপন্যাস—'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' (১৯৫৫), 'সুন্দরবন' (১৯৬২), 'বনবিবি' (১৯৬৬), 'রয়ালবেঙ্গালের আত্মকথা' (১৯৮৩), 'বেদে বাউলে' (১৯৮৫)। 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' উপন্যাসটি লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ শিকারী আর্জানের সংগ্রামী জীবনযাত্রার সঙ্গে তার রোমাঞ্চকর শিকার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নানান কাহিনি মিশ্রিত হয়ে উপন্যাসটি রচিত। সুন্দরবনের দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান আর্জান। ছেলেবেলায় তার বাবা বনে মধু পাড়তে গিয়ে বাঘের মুখে প্রাণ দেয়। মায়ের কাছে সেই গল্প শুনে শিকারী হয়ে বদলা নিতে চায় সে। পিতৃহারা ছোট্ট আর্জানকে কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বড়ো হতে হয়। ঘর ও বন, বন ও ঘরের দ্বন্দ্ব তাকে ক্লান্ত করে। শেষপর্যন্ত বনের আকর্ষণই জয়ী হয়। অন্ন সংস্থানের জন্য বনকেই সে বেছে নেয়। দুর্জয় শিকারী আর্জান তথা বাদা অঞ্চলের সকল দরিদ্র মানুষ সামাজিক বঞ্চনার শিকার। নায়েবের চালাকিতে তার আবাদের বর্গা জমিটুকু হাতছাড়া হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে তার ভিটে মাটি দখল করে নেয় আরে শেখ। কখনো পেট চালাতে সে নৌকায় কাজ নেয়, আবার কখনো ক্ষেতে আল রক্ষার কাজ। বনের লড়াইয়ে যে আর্জান কখনো হার মানেনি, জীবনের লড়াইয়ে তাকে বারবার পর্যদস্তু হতে

হয়। উপন্যাসের শেষে বাঘ শিকার করে তাই আর্জানের উপলব্ধি বাঘ যেমন দুর্জয় সাহসী হয়েও মরে, প্রাণ দেয়। সেও তেমন একা। আসলে নীচুতলার মানুষের যূথবদ্ধতার অভাবে উপরতলার মানুষ সীমাহীন শোষণ করার সুযোগ পায়। এইসব মানুষ বাঘেদের বিরুদ্ধে আর্জানদের লড়াইটা তাই খুব প্রয়োজন।

নয়টি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সুন্দরবনের জনজীবনের ছবি অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর 'সুন্দরবন' উপন্যাসে। আয়না মিস্ত্রি, ফজর, রহিম বাওয়ালি, মমতাজ, সোনা, ইসমাইল, জয়নুদ্দি—এদের জীবনের সঙ্গে সুন্দরবন কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তারই বিশ্বস্ত দলিল এই উপন্যাস। সুন্দরবনের বনচারী জীব, বনজীবী মানুষ, উপকূলবাসীর জীবনযাত্রা, অরণ্য ও জীবজগতের সঙ্গে তাদের বিচিত্র সহাবস্থান, জীবন ও জীবিকার সঙ্গে বনকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার রসায়নে সমৃদ্ধ এক আকর রূপে উপন্যাসটি অনবদ্য। নোনা দেশে চাষীর স্বপ্ন একটি নৌকার, বাঘের সঙ্গে দেখা হলে আর ফিরতে হয় না, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব সুন্দরবনের নিরবচ্ছিন্ন জীবন প্রবাহে অবান্তর, বনে মায়ের অভিশাপ ফলে না, এই সব তথ্য ও সত্য দিয়ে সাজানো সংহত স্বতন্ত্র গল্পধর্মী উপন্যাস 'সুন্দরবন'।

তাঁর 'বনবিবি' উপন্যাসটি সুন্দরবনের সংগ্রামী মানুষের দিন যাপনের ইতিহাস। বন ও জমি, বাওয়ালী ও জমিদার, বাদা ও আবাদ এইসব দ্বন্দ্বের পাশাপাশি বন ও জীববৈচিত্র্যের কথা উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। খরস্রোতা নদীর সঙ্গে সুন্দরবনের মানুষের দিন রাত লড়াই, নোনা প্লাবনের বিরুদ্ধে লোনা মাটিতে সোনা ফলাবার সংগ্রামী প্রয়াস। জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘের সঙ্গে এদের জীবন-মরণ সংগ্রাম। তবু এদের জীবনে নবান্ন আসে। প্রতিকূল প্রকৃতি আর জমিদারের নিরন্তর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রসদ লুকিয়ে থাকে এই আনন্দযজ্ঞে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে গুনীন বাওয়ালীদের জীবনকথা। যে বাওয়ালীদের দায়িত্ব চকের মানুষজনকে রক্ষা করা। উপন্যাসের নায়ক কলিম, এমনই এক বাওয়ালী, যে কেবল বনের পশুদের হাত থেকে নয়, নায়েব—জোতদারের কৃষকস্বার্থ বিরোধী চক্রান্ত থেকে এলাকার মানুষজনকে রক্ষা করতে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া, দয়াপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জনজীবনের সুন্দর চিত্রায়ন ঘটেছে তাঁর 'বেদেবাউলে' উপন্যাসে। কদমতলী, বিদ্যাধরী কিংবা রায়মঙ্গালের বুকে পাড়ি জমানো মাঝি মাল্লার জীবন, গভীর অরণ্যে জীবিকার সন্ধানে যাওয়া কাঠুরে মৌলের সংগ্রামী জীবন, দেহাতী মানুষ গুলোর আশা আকাঙ্ক্ষা, রাঙাবেলিয়ার আপাত শান্ত লোকায়ত জীবন সবই উঠে এসেছে উপন্যাসে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের আর এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব শক্তিপদ রাজগুরু। তাঁর 'নোনাগাঙ' (১৯৬৩), 'নয়াবসত' (১৩৭৮), 'খলসেমারির গঞ্জ' (১৯৯৭), 'অধিকার' (১৯৮৪), 'রায়মঙ্গাল' (২০১২) প্রভৃতি উপন্যাসে আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রান্তবাসী মানুষের লোকায়ত জীবনের কথা। সুন্দরবনের মানুষ যারা বনে কাঠ কেটে, নদীতে মাছ ধরে কোনোক্রমে নিজেদের সংসার বাঁচিয়ে রাখে, তাদের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর 'নোনাগাঙ' উপন্যাসটি। উপন্যাসের নায়ক বাওয়ালী সুরমান, যে ভালোবাসে মরিয়মকে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে মরিয়মের বাবা তার বিয়ে দেয় ইরসাদের সাথে। নৌকা ডুবে মরিয়মের মৃত্যু হয়। শোকগ্রস্থ সুরমান শেষপর্যন্ত সংসার ত্যাগ করে গভীর জঙ্গালের ভেতরে জনবসতির উন্নয়নের চেষ্টায় নিজেকে সামিল করে।

একই পটভূমিকায় লেখা শক্তিপদ রাজগুরুর আর এক বিখ্যাত উপন্যাস 'নয়াবসত', যা পরে 'অমানুষ' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়। সুন্দরবনের গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, ধনেখালি প্রভৃতি অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। নায়ক জমিদার পুত্র মধুসূদন, ধূর্ত নায়েব মহিম ঘোষাল, নায়িকা লেখা, দারোগা ভুবন প্রভৃতি চরিত্রকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের জমিদারি ব্যবস্থার অন্তিম পর্যায় ও অম্লমধুর রোমান্টিক প্রেমের অন্তর্বয়নে 'নয়বসত' পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। এই জেলার সাগর দ্বীপের পটভূমিকায় লেখা তাঁর আর এক বিখ্যাত উপন্যাস 'অধিকার' যা 'অন্যায় অবিচার' নামে পরে চলচ্চিত্রায়িত হয়। জেলে বাওয়ালীদের কঠোর জীবনসংগ্রাম, মহাজনদের লাগাম ছাড়া শোষণ, সেই শোষণে সরকারি সহায়তা, অলস মানুষের সীমাহীন লোভ-পাপকর্ম উপন্যাসটিতে চিত্রিত। বাদাবনের শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত মহাজন মহেশ মান্না। আর তার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইকারী শক্তি উপন্যাসের নায়ক ঘনশ্যাম।

বাদা অঞ্চলের আর এক রূপকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। সুন্দরবনের আলা, ঘেরি, বাদা, জলকর, আবাদ—এসব নিয়েই রচিত তাঁর 'বনবিবি উপাখ্যান'(১৯৭৮), 'নদীর সঙ্গে দেখা' (১৯৮০), 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি'(১৯৮১), 'বাগদা'(১৯৮৯)-র মতো উপন্যাস। কর্মসূত্রে জীবনের কয়েক বছর তিনি কাটিয়েছেন সুন্দরবনে। সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন সুন্দরবনের জীবনযাত্রাকে।

বাদাবনের মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রামের উপন্যাস তাঁর 'বনবিবি উপাখ্যান'। গল্পের কেন্দ্রভূমি চৌধুরীদের আবাদ। এই আবাদ গড়ে তুলতে চল্লিশ কাঠুরিয়া, নায়েব দয়াল ঘোষ, সুন্দরবনের অভিজ্ঞজন রজনী, ইশান, মকবুল এদের জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়িকা অপরূপ সুন্দরী গৌরিকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে এই দ্বীপে নিয়ে আসে নিমাই। বসন্তে আক্রান্ত গৌরিকে ফেলে নিমাই গা ঢাকা দেয়। দ্বীপের লোকেরা তাকে নিয়ে সন্ত্রস্ত। কেবল ঈশান তার থেকে দূরে যায়না। গৌরিকে নিয়ে দ্বীপ সমাজের লোকেরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে তাকে ফেলে দেওয়া হয় নদীতে। জল থেকে তুলে তাকে সুস্থ করেন চৌধুরী আবাদের অদূরবর্তী ঘোষবনের ফাদার গ্যাব্রিয়েল। এই সূত্রেই গৌরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় লক্ষ্মণের। গৌরিকে মাঝখানে রেখে ঈশান ও লক্ষ্মণের মধ্যে তৈরি হয় মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। অক্ষম ক্রোধ, ঈর্ষা আর আক্রোশে উন্মত্ত লক্ষ্মণকে মেরে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেয় ঈশান। উপন্যাসটিতে আদিমতার ছাপ স্পষ্ট। দেহাতি অশিক্ষিত মানুষগুলোর কাছে গৌরি সহজে বনবিবি বলে পরিগণিত হয়। সাফল্যের আশায় জংলি মানুষেরা তাকে পূজা দেয়। সুন্দরবনের জনজীবনের সঙ্গে লোকপুরাণের মিথ মিশে উপন্যাসটি অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। সমালোচকের মতে, "মনোজ বসুর টোপোগ্রাফিকে নতুন করে ব্যবহার করেছেন বরেন গঙ্গোপাধযায়তাঁর 'বনবিবি উপাখ্যান' উপন্যাসে।"[৩]

সুন্দরবনের জলকরকেন্দ্রিক স্থানীয় জনজীবনের এক বিশ্বস্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর 'বাগদা' উপন্যাসে। সুন্দরবনের নদীতে যারা মাছ ধরে, মীন ধরে, বড়ো বড়ো কারবারিদের কাছে নিজেদের পরিশ্রম উজার করে দেয় সামান্য কটা পয়সার জন্য, তাদের নিয়ে লেখা হয়েছে 'বাগদা' উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমি সুন্দরবনের হরিণচক নামক জায়গা। ধান চাষের চেয়ে চিংড়ি চাষে মুনাফা বেশি। তাই চাষ-আবাদ বন্ধ করে চিংড়ির ভেড়ি করতেই এলাকার চেহারা পাল্টে যায় দ্রুত। কাঁচা পয়সার লেনদেনে এলাকায় গড়ে ওঠে নষ্ট মেয়েদের ঝুপড়ি। জলকর ঘিরে এখানে

সমাগম হয় অনেক লোভী, অসৎ মানুষের। মাছ ধরতে গিয়ে কামটের কামড়ে প্রাণ দেয় শিবুর বউ। তার মেয়ে হাসি, কালি কাঁটাদারের মিথ্যা ভালোবাসার বীজ গর্ভে নিয়ে বিষ পান করে। মৃত্যু নিয়ে দুঃখ এখানে সাময়িক। আরণ্যক মানুষকে প্রতি মুহূর্তে এখানে লড়াই করে বাঁচতে হয়। লড়াই করতে হয় স্বার্থান্বেষী মুনাফালোভী কূট চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ধান্দাবাজ মানুষের ফাঁদে পড়ে শ্রমজীবীরা কীভাবে তলিয়ে যাচ্ছে অভাব সমুদ্রের অতলে, ধনী কারবারিদের শোষণ আর শোষণের বিরুদ্ধে বাঁচার জন্য কী ধরনের সংগ্রাম করছে মানুষ, তা উপন্যাসের ঘটনাধারায় বর্ণিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জীবনের ছবি চিত্রিত হয়েছে আব্দুল জব্বরের 'ইলিশ মারির চর' (১৩৬৮) উপন্যাসে। উপন্যাসটি এই জেলার জেলে জীবনের আখ্যায়িকা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ-সন্তোষপুর-মেটিয়াব্রুজ থেকে ফলতা রায়চক-ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ বাংলার জেলেদের জীবন সংগ্রাম অসাধারণভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক জয়নদ্দি জেলে নৌকার মাঝি। সঙ্গী কানাই ও হরেন। জীবন তাদের কঠোর। ইলিশের মরশুমে তাদের হাতে কাঁচা পয়সা আসে, তখন তাদের চেহারা ও আচরণ দুই বদলে যায়। ইলিশের মরশুম শেষ হলে এরাই আবার চলে যায় সুন্দরবনে অন্য জীবিকার সন্ধানে। উপন্যাসে আছে মহাজনী শোষণের চিত্র। হতদরিদ্র মানুষগুলোর ঘরে হাঁড়ি চড়াতে এই মহাজনদের কবলে চলে যায় তাদের ঘটি বাটি থেকে, ঘরের মেয়ে-বউ এর শরীর পর্যন্ত। ভয়-কুসংস্কার খুন-যৌনতা প্রভৃতি জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সমাহারে গড়ে উঠেছে 'ইলিশ মারির চর।'

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলকে সাহিত্যে উপজীব্য করেছেন এই জেলার কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। এই জেলার প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করেছেন 'বন্দর'(১৯৯২), 'রামপদর অশনব্যসন'(১৯৯৩), 'স্বজন ভূমি'(১৯৯৪), 'চরপূর্ণিমা'(১৯৯৫), 'পূবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ'(১৯৯৮), 'ফুলের মানুষ' (২০০০), 'সহিস'(২০০৭), 'সমুদ্র দুয়ার'(২০১০) প্রভৃতি উপন্যাস। ডায়মন্ডহারবার, কুল্পী, কাকদ্বীপ, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, ফলতা, নৈনান, নুরপুর, নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকায়ত জীবন, জীবিকা, মানুষের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার সামাজিক ইতিহাসের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা, নৈনান অঞ্চলে নদীতীরে অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার সরকারি প্রকল্প গ্রহণের সাথে সাথে সেখানকার মানুষের জীবন, জমি ও নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত দ্রুত বদলে যায় তা নিয়ে লেখা উপন্যাস 'বন্দর'। সরকারি প্রকল্প গ্রহণকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষ ভিটে মাটি হারিয়ে হাহাকার করে। অন্যদিকে কিছু মানুষ ইট, বালি, মাটি, শ্রমিক সরবরাহের দালালি করে নিজের ভাগ্য গুছিয়ে নেয়। নদীতীরবর্তী এই অঞ্চলের লোকায়ত জীবন, জীবিকার সংকটকে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। নদী মধ্যবর্তী দ্বীপ বা চরজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর 'রামপদর অশন ব্যসন' ও 'চরপূর্ণিমা' উপন্যাস। নিষ্ঠুর প্রকৃতি, অর্থলোভী মহাজনের হাতে চরের গরীব দেহাতি মানুষগুলো কীভাবে প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে, তাই তিনি দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে খড়ের দালালি করে ভাগ্যান্বেষণে বেরোনো রামপদকে কেন্দ্র করে দক্ষিণবঙ্গের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন 'রামপদর অশন ব্যসন' উপন্যাসে। ঘোড়ামারা দ্বীপে রামপদ কারবার সাজিয়ে বসেছিল। কিন্তু চরের দখল নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধলে তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। চর দখলের লড়াই আছে 'চরপূর্ণিমা'তেও। অভাবী মানুষ বাঁচার রসদ সঞ্চয় করে চরের নবসঞ্চিত পলি থেকে। কিন্তু প্রকৃতির নির্মমতায়, প্রচন্ড জল্লোচ্ছাসে চরের মাটি

নদীবক্ষে তলিয়ে যায়। তবুও হতদরিদ্র মানুষগুলো বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কোনোক্রমে সাঁতরে গিয়ে ওঠে এক চর থেকে অন্য চরে। পাশাপাশি "চরের মালিকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, বেদনা, দুঃখ, সংগ্রাম, প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে ঝড়েশ্বরের কলমে। এত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তিনি যাতে গল্পগুলিকে আদৌ বানানো মনে হয়না।"[৪] নোনাজল আর জঙ্গালের দেশে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর 'স্বজনভূমি' উপন্যাস। এই জলজঙ্গালের দেশে মানুষকে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করতে হয় সমুদ্রের বিরুদ্ধে, নদীর বিরুদ্ধে, জঙ্গালের বিরুদ্ধে আর সামাজিক অর্থনৈতিক শত্রুর বিরুদ্ধে। সেই দৈনন্দিন বাঁচার গরীয়ান কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস। ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দাবি নিয়ে বর্গা চাষীদের জমি মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রসবভূমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ-নামখানা-চন্দনপিড়িসহ সমগ্র সুন্দরবন। বর্গা চাষীদের উপর জমি মালিকদের নির্মম শোষণ, বঞ্চনার অসামান্য আখ্যান 'স্বজনভূমি'।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতেই লেখা শিশির দাসের 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা'(১৯৫৯)। তেভাগা আন্দোলনের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত কুড়ি বছরের ভয়ঙ্কর কালের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের প্রথম তথ্যনিষ্ঠ দলিল এই উপন্যাস। গনপতি ভূমিহীন কৃষক। একটুকরো জমির সন্ধানে এসে পৌঁছেছে সুন্দরবনে। কিন্তু জোতদারের সঙ্গে জমি নিয়ে তার লড়াই বাঁধল। অনেককেই পেল সহযোদ্ধা হিসাবে। তাতেও ফল হল না। জমিদার, জোতদারের শোষণ-শাসন আর অত্যাচারের অনাবৃত ছবি উপন্যাসটিতে চিত্রিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পটভূমিকায় লেখা এখনো পর্যন্ত সর্ববৃহৎ মহাকাব্যোপম উপন্যাস বোধহয় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদী মাটি অরণ্য'। স্বতন্ত্র তিনটি পর্বে (১ম পর্ব ১৯৯৮, ২য় পর্ব ১৯৯৯, ৩য় পর্ব ২০০১), সাতকান্ডে বৃহদায়তন এই উপন্যাসে সুন্দরবনের জঙ্গাল হাসিল, আবাদ পত্তন থেকে ভূমি আন্দোলনের প্রায় একশো বছরের ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে 'রামায়ণ' মহাকাব্যের পটভূমিকায়। জলজঙ্গালে ভরা সুন্দরবনের একাংশ হাসিল করে কীভাবে আবাদপত্তন হল, জমির লোভে মেদনীপুর, বিহার থেকে মানুষ দলে দলে পা দিল সুন্দরবনের ঘোষড় জঙ্গালে, জল-জঙ্গালের আঘাতকে সঙ্গী করে নায়েব-জোতদারদের অত্যাচার সহ্য করতে করতে একসময় প্রতিবাদে গর্জে উঠল সেই ইতিহাসই উপন্যাসে বর্ণিত। উপন্যাসের নায়ক সুতাহাটার তরুণ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্য সুন্দরবনের পনেরো নম্বর লাটে বনবাস জীবন শুরু করে। সামান্য মুনিস থেকে কালক্রমে জমিদার হয়ে ওঠে সে। কিন্তু জীবনে মূল্যবোধ কখনো বিসর্জন দেয়নি। অত্যাচারী নায়েব—জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল সে। তার পুত্র কুশ বাবার উত্তরাধিকার বহন করে সেই লড়াই চালিয়ে নিয়ে গেছে অত্যাচারিত চাষীদের পক্ষ নিয়ে—

> সুন্দরবনের তিন প্রজন্মের নিটোল বৃত্তান্তে সুন্দরবনের সময় ও জীবন বহুমাত্রিক অবয়ব পেয়ে যায় উপন্যাসে। সেই সাথে সুন্দরবনের তেভাগা আন্দোলনের বহু মাত্রিক বিস্তারও। ইতিহাস-পুরাণ-প্রকৃতি ও জীবন এই চতুর্বিধ বিন্যাসে প্রান্তিক মানুষের ঔচিত্যবোধকে আশ্চর্য দক্ষতায় প্রকাশ করেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫]

আলোচিত উপন্যাসগুলি ছাড়াও বাংলা সাহিত্য জগতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জীবন-জীবিকা কেন্দ্রিক বহু উপন্যাস। স্বল্প পরিসরে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন (১৩৬২) শিকারী ঈশ্বরের জীবনকে

কেন্দ্র করে রচিত সুন্দরবনের জল-জঙ্গল নির্ভরতা কেন্দ্রিক মানুষের আখ্যান। নদী তীরবর্তী মানুষের অসহায়তা ব্যক্ত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলজঙ্গালের কাব্য'(১৯৮০) উপন্যাসে। এই জেলার গোসাবা অঞ্চলের পটভূমিতে জেলে-মালোদের জীবন জীবিকার সংকট, অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র পরিস্ফুটিত সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ'(১৯৮০) উপন্যাসে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পটভূমিতে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতার রূপায়ন ঘটেছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'(১৯৯৬) ও 'কুবেরের বিষয় আশয়'(১৯৬৭) উপন্যাসে। সুন্দরবনের উপকুলবাসীদের জীবন নিয়ে লেখা শচীন দাশের 'জল জঙ্গালের রয়ানি' (২০১৩), 'অন্ধনদীর উপখ্যান' (২০০৪)। ইদানিংকালে যে সব ঔপন্যাসিক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ভিত্তিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম উৎপলেন্দু মন্ডল, ভাগ্যধর বারিক, পঞ্চানন দাশ, প্রদীপ বর্মন প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই এই জেলার ভূমিপুত্র। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতার স্পর্শ তাঁদের উপন্যাসে স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের অখ্যাত এক অঞ্চলের সন্তান হিসাবে, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবিকা, জীবন সংগ্রাম, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ছবি বৃহৎ জগতের সামনে তুলে ধরার যে দায়বদ্ধতা তাঁরা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তার ভার আজও বহন করে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. মনীষী বসু সম্পাদিত : 'মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার (সুবর্ণ খন্ড)', কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৯৮৫. প্রথম প্রকাশ. পৃ. পাঁচ

২. মনোজ বসু : 'বন কেটে বসত', কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৬৮ বঃ. প্রথম সংস্করণ. পৃ. ২৪০

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ৩৪৫

৪. সনৎকুমার নস্কর : 'প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', কলকাতা, রত্নাবলী, ২০০২, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৪৮

৫. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম : 'সুন্দরবনের জনসমাজ ও আধুনিক সাহিত্য', দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০২১, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১০২

বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের চারের দশকে ভারত ও বঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ

বাণী রায়

একটি অঞ্চলে একটি বিশেষ সময়ের বাস্তব পরিমন্ডলের প্রধানত তিনটি দিক থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিকের কথাও বলা যায়। অবশ্য সামাজিক পরিমন্ডলের সঙ্গে একটি যুগের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

প্রথমে আমরা অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ ১৯৩০-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেমন ছিল তার একটি মানচিত্র তুলে ধরছি। অতঃপর ক্রমানুসারে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আসব। ভারতীয় উপমহাদেশ তখন ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকের শাসনাধীন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসীর একাংশ ক্রমশ সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন যথেষ্ট প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই বিপ্লবী আন্দোলন মূলত দুটি ধারায় বিস্তার লাভ করে। একটি হল অহিংস আন্দোলন এবং অন্যটি হল সশস্ত্র আন্দোলন। বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা যখন মনে করেছিলেন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব নয় তখন তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অবলম্বন করেন। এই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের শাসন যন্ত্রকে বিকল করে দেওয়া। এই কারণে ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের এই কার্যকলাপকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করার জন্য, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে এই সশস্ত্র আন্দোলন কখনও গোপনীয়ভাবে কখনও বা প্রকাশ্যে পরিচালিত হতে থাকে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২২ জুন মহারাষ্ট্রে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে তৎকালীন কালেক্টর মিস্টার র‍্যান্ড এবং অপর একজন সামরিক অফিসার

লেফটেন্যান্ট আয়ার্স নিহত হন। এর মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ক্রমে মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবেও বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ লেখক ভালেনটিনকিরল তাঁর বিখ্যাত 'অশান্ত ভারত' (Indian Unrest) গ্রন্থে এই বিপ্লবী আন্দোলনকে 'ভারতীয় বিদ্রোহ' না বলে 'হিন্দু বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সশস্ত্র আন্দোলনের মূলে ছিল ব্রিটিশ জাতি ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি ভারতবাসীর প্রবল বিদ্বেষ ও ঘৃণা। বাংলা 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা ও ইংরেজি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মধারা প্রচারে বিশেষ সাহায্য করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে বেশ কিছু গুপ্ত সমিতি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সমিতির নাম না করলেই নয়। আমরা ক্রমান্বয়ে বিশেষ কয়েকটি গুপ্ত সমিতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব যা বিপ্লবীদের এই আন্দোলনে এগিয়ে যাওয়ার পথে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা অনুশীলন সমিতির নাম করতে পারি। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশ চন্দ্র বসু। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মদন মিত্র লেনে অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) উপন্যাসের 'অনুশীলন' তত্ত্বকেই এই বিপ্লবীরা আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার এক খ্যাতনামা ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) এই অনুশীলন সমিতির সভাপতি ও সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন নৈহাটির অধিবাসী এবং সেই সূত্রে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। মাতৃভূমির বন্ধন মোচনই ছিল অনুশীলন সমিতির প্রধান লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুসারে 'অনুশীলন সমিতি'র তরুণ সদস্যদের ব্যায়াম চর্চা, মুষ্টিযুদ্ধ ও লাঠি চালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। প্রথম দিকে ব্যায়াম সমিতি হিসাবেই 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে ওঠে। পি. মিত্রকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন সোদপুর নিবাসী শশিভূষণ রায়চৌধুরী। এরপর বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় এসে 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দেন।

১৯০২ সালের শেষের দিকে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ যে বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবককে বৈপ্লবিক দল গঠনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। "১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে কয়েকটি বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই সংগঠনগুলির লক্ষ্য হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা। যতীনবাবু এই উদ্দেশ্যে ১০৮/এ, সারকুলার রোডে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন।" (R.C. Majumdar, : 'History of the Freedom movement in India', Vol-1, 1971, P. 405-6), বঙ্গানুবাদ) এরপর নতুন যে কমিটি তৈরি হয় তার সভাপতি হন পি. মিত্র এবং সহ সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাশ। পরবর্তীকালে তিনি দেশবন্ধু আখ্যায় ভূষিত হন। এই অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এছাড়াও 'অনুশীলন সমিতি'র কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য হলেন মন্মথ মিত্র, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের অনুজ), 'আত্মোন্নতি সমিতি'র ইন্দ্রনাথ নন্দী এবং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি এবং আরও অনেকের নাম এই সমিতির সঙ্গে জড়িত। এখানে ব্যায়াম চর্চার পাশাপাশি অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত। গীতার ক্লাস নিতেন রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী সারদানন্দ। পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন

জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা। ভগিনী নিবেদিতা 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান করলে সমিতির পদমর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী বারীন ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি দলনেতা অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করে একটি পৃথক দল 'যুগান্তর গ্রুপ' গঠন করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এই সমিতি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। অতঃপর আলিপুর বোমার মামলায় স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর সঙ্গীরা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

'অনুশীলন সমিতি' ভেঙে গিয়ে 'যুগান্তর দল' সৃষ্টি হলেও এই সমিতি দুর্বল হয়ে পড়েনি। বিপ্লবী নরেন সেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), অমৃত হাজরা প্রমুখ নেতাদের সমবেত উদ্যোগে পূর্ববঙ্গে 'অনুশীলন সমিতি' ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এ ব্যাপারে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থটিতে লিখেছেন, "নরেন সেনের মাথা ও মাহারাজার উদার হৃদয় একত্র না হলে আমরা অনুশীলনকে এমন ভাবে পেতাম না।"

এরপর পূর্ববঙ্গের ঢাকা হয় অনুশীলন সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র। পূর্ববঙ্গে এই সমিতির প্রায় পাঁচশত শাখা ছিল। এই সমিতির নেতা ছিলেন পুলিনবিহারী দাস। এছাড়াও প্রতুল গাঙ্গুলি, রমেশ আচার্য, রবীন্দ্রনাথ সেন, যোগেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ ছিলেন এই সমিতির কর্ণধার।

ঢাকা ছাড়াও ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, রাজশাহি প্রভৃতি স্থানে এই আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এর পাশাপাশি মালদহ, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্যরা তাঁদের কার্যকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রামগড়ে সুভাষচন্দ্র বসুর ডাকা আপোশ বিরোধী সম্মেলনে অনুশীলন সমিতির অধিকাংশ সদস্য যোগদান করেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যে নতুন দল গঠন করা হয় তার নাম হয় আর. এস. পি।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিপ্লবী নেতারা যে সংঘটি গড়ে তোলেন, তাঁদের মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে 'যুগান্তর' পত্রিকা। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও তাঁর দুই সহকর্মী অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইভাবেই 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর জন্ম হয়। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ্যেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করতে থাকে। এই পত্রিকাতেই প্রথম ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের ব্যবহারের কথা সামনা-সামনি প্রচার করা হয়।

বোমা তৈরি ও সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করে শাসনযন্ত্রকে বিকল করার যে পন্থা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীরা গ্রহণ করেছিলেন তা অনেক বিপ্লবীই পছন্দ করেননি। 'অনুশীলন সমিতি'র সভাপতি প্রমথ মিত্রের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের একদল সন্ত্রাসমূলক কাযকর্ম চালিয়ে যাওয়াকে মোটেই সমর্থন করেননি। অপরদিকে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যুগান্তর গোষ্ঠীর নেতারা বিদেশি শক্তির সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হলেন। সুতরাং বিপ্লবের কর্মপন্থা দুটি পৃথক শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গেল। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বিপ্লবীদের অন্য একটি দল সম্মুখ যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। কিন্তু ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' দেখে নেয় ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার পথ। সুতরাং ১৯০৮-এ বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাংলার এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে সহযোগিতা করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রমুখ। বারীন্দ্রকুমারের কাছে একদল তরুন বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্য

'ভবানীমন্দির' (১৯০৫) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে ধর্মের ভিত্তির উপর বিপ্লবী আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়। মানিকতলার কাছে মুরারিপুকুর বাগানে বিপ্লবীরা বোমা তৈরির জন্য এক গোপন আস্তানা স্থাপন করে। এই কাজে বারীন্দ্রকুমারকে সাহায্য করেছিলেন উল্লাসকর, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখ বিপ্লবী। সরকারি কর্মচারীদের বোমার আঘাতে নিহত করে তাঁদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই ছিল এই বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য।

সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কানুনগো প্যারিসে যান এবং সেখান থেকে তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার জন্য প্রথম বোমা তৈরি হয়। ফুলার সাহেবের আদেশে স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে বহু মানুষ নির্যাতিত হন। কিন্তু বিপ্লবীদের এই লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। তাঁরা দু-দুবার চেষ্টা করেও ফুলার সাহেবকে হত্যা করতে ব্যর্থ হন। এরপর বিপ্লবীদের লক্ষ্য হয় প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। এই অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করার দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রফুল্লচাকী ও ক্ষুদিরাম বসু নামে দুই তরুণ বিপ্লবীর উপর। কিংসফোর্ড সেই সময় বদলি হয়ে মুজফফরপুরে আসেন। তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বোমা নিয়ে মুজফফরপুরে আসেন। কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ করে তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড ছিলেন না। তার পরিবর্তে ছিলেন এক ইংরেজের স্ত্রী ও কন্যা। তাঁরা দুজনেই নিহত হন। অবশেষে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়, প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। এই দুই তরুণ বিপ্লবীর দেশের জন্য আত্মত্যাগ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রবল আলোড়ন তোলে। পুলিশ মুরারিপুকুর বাগানে তল্লাশি শুরু করে এবং সেখান থেকে বহু বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার হয়।

এরপর অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষ সহ চৌত্রিশ জন বিপ্লবী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। বিপ্লবীদের এই বিচার 'আলিপুর বোমা মামলা' নামে পরিচিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন কিন্তু বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। মুক্তির পর অরবিন্দ বিপ্লবের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হন।

আলিপুর বোমা মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিপ্লবীদের গুলিতে বহু অত্যাচারী কর্মচারী প্রাণ হারায়। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারা বজায় থাকে।

ব্রিটিশ সরকার স্বদেশি আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার চেষ্টা করলেও বাংলার এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সক্রিয় রূপ ধারণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংঘ গড়ে ওঠে। 'আত্মোন্নতি সমিতি' তার মধ্যে একটি। এই সংস্থার অন্যতম নেতা ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। পরবর্তীকালে বাঘাযতীনের নেতৃত্বে তিনি একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে প্রয়াসী হন (১৯১৫ খ্রি:)। বিপিনবিহারী 'অসহযোগ' ও 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় তার বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে মানুষ আবার সচেতন হয়ে ওঠেন। এই আন্দোলনের প্রসঙ্গ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪), গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) প্রভৃতি উপন্যাসে।

১৯২২-এর এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে এক গোপন সম্মেলনে বাংলার বিপ্লবীদল একত্রিত হয়ে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। পরের বছর 'লাল বাংলা' শিরোনামে এক প্রচার পত্রে পুলিশ কর্মচারীদের হত্যা ও বিপ্লবী আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে

বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে 'ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বাহিনী' নামে এক নতুন বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়। বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে বাংলাদেশে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গুরত্বপূর্ন অধ্যায় হল 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। সূর্য সেন ছিলেন স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে 'মাস্টারদা' বলেই সম্বোধন করতেন। ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে সূর্য সেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন বিপ্লবী লোকনাথ বল, গনেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল, অনন্ত সিং প্রমুখ। সূর্য সেন ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর নামে এক প্রচার পত্র প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল রাত্রে কয়েকজন সশস্ত্র বিপ্লবী চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করেন। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের সভাপতিত্বে এক বিপ্লবী সরকার গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। এরপর বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ১৯৩০-এর ২২ এপ্রিল ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের তিনদিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধ চলে। বহু বিপ্লবী এই যুদ্ধে শহিদ হন এবং ইংরেজ সরকার বিপ্লবী সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

এই কালপর্বের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের আন্দোলন হয়ে উঠেছিল খুবই গুরত্বপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার দাবি করেননি। কিন্তু ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে কংগ্রেসে যোগদানের পর পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করবার সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেও গান্ধীজি-ই প্রথম বলেন যে, যুদ্ধ শেষে ভারতকে স্বরাজ অর্থাৎ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' বা স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে। যদিও তাকে ঠিক পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না, তবুও তা অনেকটাই স্বাধীনতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হবার পরেও ব্রিটেন সেই শর্ত রক্ষা করে না। উপরন্তু ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়। বিরক্ত গান্ধিজি ১৯২০ থেকেই শুরু করেন তাঁর সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলন। ক্রমেই এই আন্দোলনের চাপ বাড়তে থাকে।

চতুর্থ দশকের শুরুর বছরে ১৯৩০-এ গান্ধিজি লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাতে নেতৃত্ব দেন। সস্তায় দেশীয় নুনের পরিবর্তে বিদেশে প্রস্তুত বেশি দামের নুন ব্যবহার করতে বাধ্য করা হতো ভারতীয়দের। তারই প্রতিবাদে গান্ধিজির ডাণ্ডি অভিযান সমস্ত দেশবাসীকে দেশপ্রেমের আবাগে আপ্লুত করে দিল। সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রতীরে একটি গ্রাম ডাণ্ডি। গান্ধিজি বহু মানুষের মিছিল নিয়ে সেই ডাণ্ডিতে গিয়ে সমুদ্রের জল থেকে তৈরি করলেন নুন। এই লবণ-আইন আন্দোলন নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করল কংগ্রেসের রাজনীতিতে। এই আন্দোলনেও বহু মানুষ আহত হয়েছিলেন; কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছিলেন।

গান্ধিজির এই ডাণ্ডি অভিযানকালে সারাপথে পল্লিবাংলার মানুষ এই সত্যাগ্রহীদের বিপুল সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানান। তাঁদের অনেকে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যোগ দেন। ফলে সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের সর্বত্র এক অভাবনীয় উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এই দেশপ্রেমের ঢেউ প্রসারিত হতে থাকে। ডাণ্ডিতে একদিন অনশন উদ্‌যাপনের পর (৬ এপ্রিল) গান্ধিজি নিজের হাতে জল তুলে লবণ তৈরি করেন। সেই সঙ্গে আন্দোলনের প্রথম পর্বের সূচনা হয়। দেশের নেতারা সমুদ্রতীরে নানা স্থানে জমায়েত হয়ে

লবণ-আইন ভঙ্গ করেন। বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার মহিষবাথান ও মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার কয়েকটি স্থানে ব্যাপকভাবে লবণ-আইন ভঙ্গ করা হয়। যেখানে লবণ তৈরি করার কোনো সুযোগ ছিল না, সেখানে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক বইপত্র ও পত্রিকা বিক্রি করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা-সমিতি গঠন করার চেষ্টা করেন সত্যাগ্রহীরা।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ কালপর্বের বঙ্গীয় রাজনীতিতে বামপন্থী আন্দোলনেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ভারতীয়দের মনে কমিউনিজম সম্পর্কে প্রথম ধারণা তৈরি হয় ১৯২০-তে দেশত্যাগী বিপ্লবী এম.এন.রায় যখন 'কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করলেন রাশিয়ার তাসখন্দ-এ। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সহযোগী মুজফফর আহমদ কলকাতায় বসে সমাজতন্ত্রবাদী ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন বাংলার মানুষের মনে, বিশেষ করে সাহিত্যিকদের মনে। তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্যেই বিশের দশকে অর্থাৎ তৃতীয় দশকে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'বিদ্রোহী', 'ধীবরদের গান', 'কুলি-মজুর' ইত্যাদি লেখা হল। নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রকাশিত হল 'লাঙল' ও 'গণবাণী' পত্রিকা ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে।

চতুর্থ দশকে, অর্থাৎ যে দশকটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমরা বুঝে নিতে চাইছি সেই দশকে ভারতে তথা বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা দিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হলে শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। এর মধ্যে বোম্বাইয়ে এম. এ. ডাঙ্গে, লাহোরে গোলাম হোসেন ও কলকাতায় মুজফফর আহমদ স্বতন্ত্রভাবে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 'কৃষক-মজদুর পার্টি'র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই সময়ে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। এই হরতালে শ্রমিক-সংস্থাগুলি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই সময় শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বামপন্থী আদর্শের প্রসার ঘটতে দেখা যায়।

কলকাতায় কংগ্রেস ও সর্বদলীয় সম্মেলনের সময় কমিউনিস্টরা সর্বভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দলগুলির ('অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স অব ওয়ারকারস এন্ড পেজেন্টস পার্টিস) এক সম্মেলনের আহ্বান করে। এই সম্মেলনে কয়েকটি বৈপ্লবিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি হল—

প্রথমত, শ্রেণি-সংগ্রাম; দ্বিতীয়ত, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন। তৃতীয়ত, শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন দান; সংবাদ পত্র ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই সম্মেলনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গ্রহণের বিষয়টির তীব্র নিন্দা করা হয়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ের সুতাকলে ধর্মঘট পালন করেন শ্রমিকেরা। রেল-শ্রমিকেরাও আন্দোলন শুরু করেন। আগের বছর ধর্মঘটে যে শ্রমিকেরা অংশ নিয়েছিল তাদের ছাঁটাই করার প্রতিবাদে সংঘটিত হয় এই শ্রমিক আন্দোলন। এই আন্দোলন ভয়ংকর রূপ ধারণ করলে পুলিশ কঠোর হাতে তা দমন করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ভারতের তিরিশজন প্রধান শ্রমিক নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুজফফর আহমদ, মিরাজ কর, ডাঙ্গে, পি. সি. যোশী প্রমুখ।

এরপর ব্রিটিশ সরকার এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীদের মিরাটে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন, যা ইতিহাসে 'মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। এই মামলা প্রায় পাঁচ বছর চলেছিল। মামলায় অভিযুক্ত অধিকাংশ বন্দিকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের দীর্ঘ কারাদন্ডে

দণ্ডিত করা হয়। জওহরলাল নেহেরু এই বন্দি কমিউনিস্ট নেতাদের সমর্থন করেছিলেন এবং সেই বিচারকে 'শ্রমিক আন্দোলনের উপর সরকারের আক্রমণ' বলে মন্তব্য করেছিলেন। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার নিষ্পত্তি হয় ১৯৩৩-এ। সারাদেশের বিভিন্ন আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে এই মামলায় বন্দিদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। অধিকাংশ বন্দি মুক্তি পেয়েছিলেন; বাকিদের অল্পদিন কারাদণ্ড হয়েছিল। এই মামলার ফলে কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল না হয়ে দৃঢ়তর হয়েছিল। প্রথমত—এই প্রথম দেশের লোকের কিছু সহানুভূতি তাঁরা অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সমমনস্ক সাম্যবাদী ব্যক্তিরা বেশ কিছুকাল একত্রে বন্দি থাকায় তাঁদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন যে উদ্দেশ্যে এই মামলা দায়ের করে, ফল ফলেছিল তার বিপরীত।

ভারতের অর্থনীতি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা অনেকাংশে পরিচালিত। কারণ সেই সময় থেকেই পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভারত ব্রিটিশের উপনিবেশ। ও ঔপনিবেশিক শাসকের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে দুর্বলতর দেশকে অধিকার করে সেই দেশের যাবতীয় সম্পদকে নিজেদের দেশের স্বার্থে ব্যবহার করা। ব্রিটিশ শাসকও ব্যতিক্রম ছিল না। কাজেই ভারতীয় অর্থনীতির অবনমন ঘটতে শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই। ভারতের তাঁত শিল্পকে নষ্ট করে দেওয়া, কৃষকদের নীলচাষ করতে বাধ্য করা; তারও আগে ১৭৯৩ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলার কৃষককে নির্বিচারে শোষণ করা ইত্যাদি ছিল শাসকদের পদ্ধতি। কিন্তু ১৯১৪ খ্রিস্টব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। যুদ্ধে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল ব্রিটেন তার অনেকটাই পূরণ করতে চেয়েছিল ভারতীয় সম্পদের সাহায্যে। তারফলে দ্বিগুন হল ভারতের অর্থনৈতিক অবনমনের পরিস্থিতি।

সমগ্র বিশ্বেই ১৯২০ থেকে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল। কারণ এই যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল বিশ্বের বহু দেশে। তারফলে সমগ্র বিশের দশকে অর্থাৎ ১৯২০ থেকে শুরু করে ১৯২৯, এবং তার পরেও এই অর্থনৈতিক মন্দা বিশ্ব জুড়ে কেবল অব্যাহত থাকে না, দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। এই অর্থনৈতিক মন্দা সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছিল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। সেজন্য এই বছরটিকে বিশ্ব সভ্যতায় 'গ্রেট ডিপ্রেশন ইয়ার' বলে চিহ্নিত করা হয়। ভারতেও এই মন্দার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

ফলে ভারতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে। শিল্পে ও কারখানায় শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন কলকারখানা, কফি ও চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ। এই অবস্থায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে শুরু করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টব্দে মোট একশো আঠারোটি ধর্মঘট হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই ও নাগপুরে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে। শ্রমিক ধর্মঘটে কমিউনিস্টদের প্রভাব লক্ষ করে সরকার তাদের দমন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিক সংগঠন- গুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। এই কালপর্বে (১৯৩০-১৯৩৯) ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্ক থাকে অঙ্গাঙ্গি। ঔপনিবেশিক শাসক সর্বদাই শাসিত রারে পুঁজি নিজের দেশের স্বার্থে হরণ করতে চায়। এটি হল ঔপনিবেশিকতার অন্যতম চরিত্র। প্রথম বিশযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। যদিও ব্রিটেন যে পক্ষের শরিক ছিল তারাই জয়ী হয়েছিল যুদ্ধে, তবু যেকোনো যুদ্ধেই প্রচুর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ভার বহন করতে হয় সব দেশকেই। ব্রিটেনেরও প্রচুর

ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল এবং ভারত থেকে সেই ব্যয়ের অনেকটা অংশ-ই তারা তুলে নিতে চাইবে- তা নিতান্তই স্বাভাবিক। সেজন্য দিনে দিনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল; বেড়ে যাচ্ছিল বেকার সমস্যা। সেই আর্থিক পরিস্থিতেতে দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণি এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের ক্ষোভও বৃদ্ধি পাচ্ছিল শাসকের বিরুদ্ধে।

এই কালপর্বে রচিত বাংলা উপন্যাসে এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্রণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জগদীশ গুপ্তের বিভিন্ন লেখায়। তারাশঙ্কর ও গোপাল হালদার ছিলেন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। দেশের মানুষের আর্থিক পরিস্থিতির সত্যতা তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন, তাঁদের উপন্যাসে সেই সাক্ষ্য আছে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের সামাজিক পরিস্থিতি এই সময়ে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। তার একটি কারণ হল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ যৌথ পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে একক পরিবার গড়ে উঠছিল শহরে ও শহরতলিতে। এই ভাঙনের কারণ প্রধানত দুটি। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে যুবকদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা খানিকটা বিস্তৃত হয়েছিল। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি ও ব্যবসায়িক দপ্তরে কাজ করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল করণিকের। অন্যদিকে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষিকর্মও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। গ্রামের যৌথ পরিবারের ছেলেরা গ্রাম ছেড়ে কলকাতা মফস্‌সল শহরে চাকরি নিয়ে চলে আসছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে এসে আলাদা সংসার করতে শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হল, স্ত্রীশিক্ষা খানিকটা বিস্তৃত হয়েছিল। সেজন্য মেয়েদের মধ্যেও ঘটেছিল কিছুটা ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ। সন্তানদের লেখাপড়া সম্পর্কেও সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসব কারণের ফলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলা উপন্যাসে দেখা দিয়েছিল পরিবর্তন।

উপন্যাসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তুলে ধরা হয় বলে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ সর্বদাই থাকে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে মনস্তত্ত্বে বেশ কিছু ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পাশ্চাত্য দর্শনবিদরা। বিশ শতকের প্রারম্ভেই ফ্রয়েড, অ্যাডলার, য়ুং প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ মনের বিভিন্ন স্তর এবং অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনা, মানব-মনের যৌনচেতনা ও আধিপত্যবাদের ধারণা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। একদিকে মার্কস ও লেনিন প্রভাবিত সমাজতন্ত্রবাদ, অন্যদিকে মনস্তত্ত্বের এই নতুন ভাবনার মিশ্রণে বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে পাশ্চাত্য দেশে লেখা হয়েছিল বেশ কিছু নতুন ধরনের উপন্যাস। সেখানে অবচেতন মনের নিগূঢ় জটিলতা উপন্যাসের বিষয় ও প্রকরণকে প্রভাবিত করে। সেই ধারায় বেশি না হলেও কিছু বাংলা উপন্যাসও রচিত হয়েছিল। লিখেছিলেন প্রধানত গোপাল হালদার এবং ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এছাড়াও আর একটি অভিনব দিক দেখা দিয়েছিল চতুর্থ দশকের বাংলা উপন্যাসে। কোনো কোনো বাঙালি যুবক উচ্চশিক্ষার জন্য তার আগে থেকেই বিদেশে যেতেন। সেই পাশ্চাত্য দেশের সমাজ ও চিন্তাধারা প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল বাংলার লেখকদের। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রমথ চৌধুরীর লেখাতেই পশ্চিমি পরিবেশ ও চিন্তাভাবনার পরিচয় উঠে আসতে থেকে। এই পর্বের বাংলা উপন্যাসে কারো কারো লেখায় প্রধানত অন্নদাশঙ্কর রায় এবং দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসে ভারতীয় মানসিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে পশ্চিমের সামাজিক বাতাবরণ ও চিন্তন-মননের সম্পর্কের জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক বিভিন্ন দিক থেকে ভারত তথা বঙ্গাদেশের ইতিহাসে ছিল অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বের সামগ্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল তার তরঙ্গ আলোড়িত করেছিল ভারত ও বঙ্গাদেশকেও। সামাজিক বাস্তবতা সর্বদাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। চতুর্থ দশকের কালপর্বটি বিভিন্ন দিক থেকে বাঙালির চিন্তন-মননে অনেকটাই পরিবর্তন এনেছিল যার স্বাক্ষর আমরা বিশেষ করে কথাসাহিত্যে লক্ষ করছি। বাংলা সাহিত্যের এই কালখণ্ডের চিত্রটি বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরা হল।

উৎসের সন্ধানে

১. স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত : 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ রজতজয়ন্তী বর্ষ প্রকাশন, ১১ মার্চ ২০০০

২. Reflections In History : Essays in Honour of professor Amalendu De. Editors Keka Dutta Roy and Chitta Ranjan Misra, Amalendu De Felicitation committee 2009, Raktakarabee 20, Nabin Kundu Lane, Kol. website: www.raktakarabee.com 1st Edition December, 2009

৩. অমলেন্দু সেনগুপ্ত : 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব', পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৯০, চল্লিশের দশকের নানা আন্দোলনের তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য

৪. যোগনাথ মুখোপাধ্যায় : 'বঙ্গা অভিধান', এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ—বইমেলা ১৯৯৯

৫. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : 'তরী হতে তীর', মনীষা গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯৭৪

৬. সুভাষ ভট্টাচার্য : 'সংসদ ইতিহাস অভিধান' দ্বিতীয় খণ্ড, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩

৭. R. C. Majumdar : 'History of the Freedom Movement in India', Vol. 1, 1971, P. 405

৮. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় : 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৩ (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ); দ্বিতীয় সংস্করণ, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, নিউ দিল্লি, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।

রবীন্দ্র-গল্পে নারীর ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন

চন্দন বিশ্বাস

সুবিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীসত্তার বিচিত্র রূপ ধরা পড়েছে এবং রবীন্দ্র-ছোটোগল্পেও নারীকে লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন নানা মহিমায়। সেখানে নারীর প্রতি লেখকের হৃদয়ের শ্রদ্ধামিশ্রিত অর্ঘ্য নিবেদন হতে দেখি। নারীর হৃদয়ের মধ্যের অপার রহস্যের সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের 'সিভ্যালরী'র স্পর্শে নারীকে আবিষ্কার করেছিলেন যথার্থ মূল্যে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির স্পর্শ রবীন্দ্র-মনোভাবের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও নারী চরিত্রের অতুলনীয় মহিমা ধরা পড়েছে। যেমন ক্ষমাশীল প্রেমের সঙ্গে সঙ্গেই সুগভীর আত্মমর্যাদাবোধের উদাহরণ দেখি সীতার চরিত্রে। দময়ন্তীর চরিত্রে দেখি অপরূপ বীর্য। নিদারুণ দুর্দিনেও তিনি আপন জীবনসঙ্গীর পাশে অবিচল, দৃঢ়। সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা যে নারী মহিমার বর্ণনা পাই, তার বীজ নিহিত আছে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের নারী চরিত্রের মধ্যেও।

নারীর প্রতি সমাজের অবিচারে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছেন বারে বারে। তাঁর অনেক রচনাতেই সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নারীর প্রতি কবির মনোভাব সমালোচকের কলমে ধরা পড়েছে এইভাবে—

> কবি দেখিয়েছেন ব্যক্তি বিশেষ যখন মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তখনও সেই ব্যক্তি বিশেষ তার জন্য একা দায়ী নয়। তার উপরে প্রভাব ফেলে সমস্ত সমাজের মনোভাব। নারীকে অপমান করতে, অবজ্ঞা করতে সমস্ত সমাজ তার সমর্থন জানাচ্ছে পুরুষকে। এই জন্যই যেখানে পুরুষ নারীকে আন্তরিক ভালোও বাসে, সেখানেও সে অনায়াসে নারীকে অপমান করতে পারে। এমনি করে আমাদের দেশের মেয়েদের অপমান করাটা যেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বভাবগত হ'য়ে উঠেছে। এর কারণ এরকম অপমানে সমাজ কোন প্রতিবাদ করে না।[১]

এরূপ সমাজের মধ্যে কোনো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে জীবন-যাপন দুঃসাধ্য। তার

ব্যক্তিগত অসুবিধার সীমা অতিক্রম করে সে অনেক সময় হয়ে ওঠে নারীজাতির প্রতিবাদীসত্তার প্রতীক। এমনভাবেই হয়ত সে এই সমাজবন্ধনের হাত থেকে মুক্তি চাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের মধ্যে আমরা দেখব সেই প্রতিবাদী সুর। সংকীর্ণ বিধি-বিধানের গণ্ডী টানা সমাজ ত্যাগ ক'রে সে উদার বিশ্বের খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতে চেয়েছে। যেখানে মানুষে মানুষে অধিকারের কোনো ভেদাভেদ নেই। যেখানে নারী-পুরুষ সমান সম্মান অর্জনে সক্ষম। তাই পরিবারের মেজবৌ মৃণাল চলে এসেছে পুরীর সমুদ্রতটে এবং তার পত্রে সে জানিয়েছে—কলকাতায় আর ফিরে যাবে না। এভাবেই আমরা দেখি রবীন্দ্র-সাহিত্যে অপমানিতাদের পক্ষ নিয়ে কবির বিক্ষোভ, তাঁর বিদ্রোহ। সেসময়ের সমাজে অবস্থান করেও কবি এই বিদ্রোহের ঘোষণা করেছিলেন, যা তাঁর পরম দুঃসাহসকেই সূচিত করে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' গল্পটি গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প। গল্পশিল্পী রূপে রবীন্দ্রনাথের আদি সৃষ্টি। তবে ছোটোগল্পের শিল্পরীতি বিচারে এই গল্প যথেষ্ট চর্চিত। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের আদি-সমালোচক সুখরঞ্জন রায় বলেছেন, 'ঘাটের কথা' 'লিরিক ও ছোটোগল্পের সীমান্ত দেশের রচনা', 'ছোটোগল্পের স্ফুটগৌরবে' অপ্রকাশিত। পরবর্তীকালে এর সমালোচনাসূত্রে কেউ এটিকে বলেছেন 'গল্পচিত্র', কেউ বলেছেন 'গল্পভাস', আবার কেউ বলেছেন 'উপাখ্যান'। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ এখানে লক্ষ্য করেছেন 'বাক্‌প্রগলভতা'।[৩] গল্পটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ জানিয়েছেন—

> কুসুমের জীবনকথায় ঘাটের ভাষা বিবৃতিমুখ্য না হয়ে হয়ে উঠেছে সংকেতমুখ্য। কুসুমের জীবনের যেটুকু অংশ ঘাটের ইন্দ্রিয়গোচর শুধু সেটুকুই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেই খণ্ডাংশের মধ্যেই দেখা দিয়েছে একটি অখণ্ড ব্যঞ্জনা। কুসুমের বাল্য থেকে যৌবনে পদার্পণে, বিবাহ, বৈধব্য ও একাকীত্বের মধ্যে সময়ের প্রলম্বিত গতিবেগ অনুক্ত না থাকলেও অনুভূত হয়নি।[৪]

রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পে পণপ্রথার ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। এই গল্পে পণপ্রথার নিষ্ঠুরতম শিকার নিরুপমার বাবা রামসুন্দর মিত্রের ধারণা ছিল তাঁর অসামান্য সুন্দরী কন্যার বিবাহের জন্য যোগ্য পাত্র রায়বাহাদুরের একমাত্র চাকুরিরত পুত্র। কিন্তু বিয়ের সময় 'যোগ্য' পণ জোগাড় হল না। আর এরই ভয়াবহ পরিণতি আমরা গল্পে দেখতে পাই। গল্পে আমরা দেখি গরীব পিতা তার অতি আদরের একমাত্র মেয়ে নীরুর সম্বন্ধ করলেন রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে। কন্যাস্নেহে অন্ধ হয়ে পিতা বিবাহের পূর্বে পণের টাকার হিসাব করলেন না। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও সমস্ত টাকা জোগাড় করতে পারলেন না বিবাহের নির্দিষ্ট সময়ের আগে। বর জেদ ধরায় বিয়ে তো হয়ে যায়, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখি বধূর যথাযোগ্য সম্মান বা আদর নীরু পায় না শ্বশুরবাড়িতে। বধূর প্রতি শাশুড়ীর এক নির্মম উদাসীনতা ছিল। বধূর পিতাও যেন অপরাধী থেকে যায় কন্যার শ্বশুরবাড়িতে। একসময় নিজের অনধিকার প্রবেশের লজ্জায় নীরু খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয় এবং অবশেষে মারাও যায়। তখন শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যের অনুরূপ তার সৎকার এবং শ্রাদ্ধের কার্যাদি হয়। আমাদের সমাজে যেমন বধূর কোনো মূল্য নেই, তেমনই যেন তাঁর মৃত্যুও সমাজের কাছে কোন গুরুতর ক্ষতি নয়। রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি সমাজের অন্যায়-অবিচারের ছবি এঁকেছেন 'দান-প্রতিদান' গল্পেও। 'বিচারক' গল্পে নারীর প্রতি সমাজের অবিচারের বিচারাসনে বসে কবি রায় দিয়েছেন কাপুরুষতার বিপক্ষে। সমাজের চোখে অপরাধিনী নারীকে গভীর সমবেদনার সঙ্গে নির্দোষ বলেই অভিমত দিয়েছেন।

অপর রবীন্দ্র-সৃষ্টি 'সুভা' ও 'মহামায়া' গল্পদুটি সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন—'সুভা' (মাঘ, ১২৯৯) ও 'মহামায়া' (ফাল্গুন, ১২৯৯) এই দুইটি গল্পে বাক্‌শক্তিহীনা সুভা মূক প্রকৃতির সহিত এক বৃহৎ একাত্মতায় লগ্ন হইয়া নিজ ব্যক্তি সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে ও প্রকৃতি তন্ময়তার সাঙ্কেতিক গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার গ্রাম্য পরিবেশকে যতদূর সম্ভব সমবেদনাহীন ও তাহার শুভাশুভের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনরূপে দেখান হইয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহার বিবাহ সারিয়া নির্দায় হইতেই ব্যস্ত ও তাহার স্বামী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করে নাই। তাহার অন্তর-সৌকুমার্যের সহিত তাহার মানবিক পরিবেশ একেবারেই নিঃসম্পর্ক এবং এই উপায়েই এই পেলবসত্তাটির বাস্তবতা রক্ষিত হইয়াছে।"[৫] অপরদিকে 'মহামায়া' গল্পটি প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন—

> মহামায়া চরিত্রের বিদ্যুতদীপ্তি বাঙলা দেশের সদ্যো অতীত ও দীর্ঘকাল---প্রচলিত কৌলীন্যমেঘবিচ্ছুরিত। তাহার মুমূর্ষু বৃদ্ধের সহিত বিবাহের আয়োজন; তাহার সতীদাহের জন্য তাহার একমাত্র অভিভাবক দাদার অনমনীয় দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহার চিতা হইতে পলায়ন ও কঠোর শর্তাধীনে রাজীবলোচনের সহিত বাস করিতে সম্মতি ও এই শর্তভঙ্গ হইলে তাহার ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান—সমস্তই প্রমাণ করে এই দীপ্ত রূপের পিছনে কতটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কঠোর উপাদান সঞ্চিত ছিল। তাহার চরিত্রে বিদ্যুতের সহিত বজ্র অব্যবহিত নৈকট্যে মিশ্রিত ছিল ও কুলীন কন্যার প্রচণ্ড কুলাভিমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজ্রস্তনিত নিঃস্বনেই আত্মপ্রকাশ করিত।[৬]

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পেও নারীর ওপর পীড়ন এসেছে বিবাহোত্তর জীবনে। 'শাস্তি' গল্পে কৃষিজীবী দরিদ্র পরিবারে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন লেখক। এই গল্পে একইসঙ্গে উঠে এসেছে শারীরিক ও মানসিক পীড়নের চিত্র। এ গল্পে রাধাকে হত্যা করা হয় এবং চন্দরার ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চাপিয়ে দিয়েছিল সেই হত্যার দায়। চন্দরা তার ফাঁসির আগে একবার শুধু তার মা'কে দেখতে চেয়েছিল, স্বামীকে নয়। স্বামীর নাম তার সামনে করলে সে শুধু বলেছিল 'মরণ'। এই 'মরণ' শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও মানসিকতার প্রতি তার ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও চপেটাঘাত। 'মানভঞ্জন' (১৩০২) গল্পে দৈহিক ও মানসিক নিপীড়নের চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। 'মানভঞ্জন' গল্পের নায়িকা গিরিবালা আত্মহত্যা করেনি, বরং যে কারণের জন্য তার প্রতি অত্যাচার নেমে এসেছে সেই কারণ সে অনুসন্ধান করে। অবশেষে জানতে পারে থিয়েটারের অভিনেত্রীর প্রতি প্রেমাসক্তির জন্যই তার স্বামী আর তার সঙ্গে থাকতে চায় না। এক্ষেত্রে জোর করায় তার প্রতি নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। প্রতিবাদস্বরূপ গিরিবালা অভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে।

উনিশ শতকে নতুন আলো প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত-সচেতন পুরুষের যেমন জন্ম হয়েছিল, তেমনি জন্ম হয়েছিল সচেতন নারীরও। প্রত্যেকের হয়তো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, কিন্তু তৈরি হচ্ছিল শিক্ষিত রুচিশীল মন। যেমন 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনকে আমরা দেখি শহর থেকে গ্রামে আসা নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টারের একমাত্র সঙ্গী ও আশ্রয় হয়ে উঠেছিল সে। রতন একাধারে পালন করেছিল বন্ধুর ভূমিকা, গৃহরক্ষাকর্তীর ভূমিকা, আহারের যোগানদাত্রী ও সেবিকার ভূমিকাও। 'একরাত্রি' গল্পের নায়িকা সুরবালা পাঠশালায় পড়ত। সুরবালার বিবাহ পরবর্তী জীবনে একই গ্রামে নায়কের আবির্ভাব এবং সুরবালারই স্বামী উকিল রামলোচনবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনার সময়ে পাশের কক্ষে সুরবালার যে উপস্থিতি সেখানে নায়কের প্রতি বাতায়নবর্তিনীর

কৌতূহলী চোখ যেমন আছে, তেমনি হয়তো শিক্ষিত রুচিশীল মনের স্মৃতির চিত্রও নেপথ্যে কাজ করেছে। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীও যে পড়াশোনা শিখেছিলেন তার উল্লেখ আছে গল্পে। যদিও মৃন্ময়ীর চিঠিতে বাঁকা লাইন, অক্ষর সুছাঁদ পায়নি এবং শুদ্ধ বানান হয়নি তবুও সেই সময়ের একটি নারী যে স্বামীকে পত্র লিখছে এটি উঠে এসেছে। সেই সময়ের এক নারীর আবেগবিহ্বল অসম্পূর্ণ মনের অসচেতন প্রকাশ ঘটেছে এই পত্রে, যা গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের গিরিবালার মধ্যে যে পড়ার অদম্য ইচ্ছা ছিল তা ধরা পড়েছে যখন সে আপন ঘরে বসে দাদাদের মতো বই নিয়ে পড়ার ভান করে ও বইয়ের পাতা ওল্টায়। 'আখ্যানমঞ্জরী'র দিকে তার নীরবে তাকিয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে লেখক গিরিবালার মনের ইচ্ছেকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশেষে স্বামী শশীভূষণের কাছে তার পাঠগ্রহণ শুরু হয় এবং শশীভূষণ অনেক কাব্যের তর্জমা শুনিয়েও গিরিবালার মতামত জানতে চাইতেন। অর্থাৎ নারী-পুরুষের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পারস্পরিক মত আদান-প্রদানের আধুনিক রীতির দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নারীর স্বাধীন-স্বতন্ত্র ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে তার ব্যক্তিসত্তার স্ফূরণকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'অধ্যাপক' গল্পে পুরুষের তুলনায় নারীর বিদ্যা বা মেধার শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গও এসেছে। কিন্তু এখানে নারী তার শ্রেষ্ঠত্বকে লোকসমাজে প্রচারিত হতে দিতে চায় না। গল্পের নায়িকা কিরণ প্রগতিশীল নারীর যথার্থ শিক্ষিতা রূপ, যারা যুগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। 'হৈমন্তী' গল্পেও আমরা দেখেছি হৈমন্তীর শিক্ষায় উৎসাহ। হৈমন্তীর স্বামী যে বি. এ. পাশ করেছিল, তার কারণও ছিল হৈম। 'খাতা' গল্পের নায়িকা অল্পবয়সী উমাকে আমরা দেখেছি যে সে লিখতে ভালোবাসে। ঘরের দেওয়ালে কয়লা দিয়ে আঁকা বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো অক্ষরে সে লিখে চলে 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'

নারীর ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন ও আত্মপ্রকাশের অন্যতম একটি রবীন্দ্র-গল্প 'নষ্টনীড়'। গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন—"এ গল্পের নায়িকা চারু লিখতে চেয়েছিল, কল্পিত প্রতিপক্ষের তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ—এই বোধ—থেকে।"[৭] গল্পে যদিও চারুর লেখিকা হবার কোনো কথা ছিল না, কিন্তু সে লেখাপড়া জানত বলে—'ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠাই তার একমাত্র কাজ বলে মনে করেছিল। চারু লিখত গোপনে শুধুমাত্র অমলের জন্যই, স্বামী ভূপতিকে সে তার লেখা দেখাতে চায়নি। কারণ বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি ভূপতির কোনো দৃষ্টি ছিল না, সে ব্যস্ত ছিল—"ভারত সরকারের সীমান্ত নীতি।" নিয়ে। তবে পরবর্তীকালে বিপর্যস্ত ভূপতি চারুকে জয় করার জন্য, চারুকে পাবার জন্য চারুর সঙ্গে লেখালেখি করে চারুকে উৎসাহিত করতে চেয়েছে। অপরদিকে 'দর্পহরণ' গল্পে উনিশ শতকের নারীর লেখিকাসত্তা ও বধূসত্তার দ্বন্দ্বের চরমতম প্রকাশ। গল্পটি লেখা হয়েছে বক্তার উত্তম পুরুষে। গল্পের নায়িকা নির্বারিণীর স্বামী তার স্ত্রীর প্রতিভাকে স্বীকার করেন না। স্ত্রীর লেখা যখন প্রত্যেকে ছাপাতে চায় তখন নায়ক পড়ে অসুবিধায়। স্ত্রীর পরিচয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিতে লজ্জিত হন, তার অহংবোধে আঘাত লাগে। অপরদিকে 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পের দীপালি শিক্ষিকা। সে স্বাধীনভাবে বাঁচার কথা ভাবে। 'প্রগতিসংহারে'র নায়িকার মতো পুরুষের জন্য নয়, দীপালির প্রেমে নিজস্বভাবে আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটি স্পষ্ট।

'ল্যাবরেটরি' গল্পে রয়েছে নারীর স্বাধীন বিকাশশীল মনের ছবি। স্বামীর সঙ্গে 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনীর মিল ছিল কর্মজগতের একাত্মতায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপর দু'টি উল্লেখযোগ্য

গল্প হল—'অনধিকার প্রবেশ' (১৩০১), 'বলাই' (১৩৩৫)। গল্পদুটি প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন—

> এ গল্প দুটিতে কিন্তু একজন নারী প্রগতিবাদী হয়েছে, বা আলোকপ্রাপ্তা হয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র ফুটে ওঠেনি সমগ্রতায়, কিন্তু একটি ঘটনায় তার বৈশিষ্ট্যের স্বরূপটি চিহ্নিত হয়েছে। যেমন 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে জয়কালী স্বতন্ত্র, প্রতিবাদী ছিল কিন্তু সে প্রতিবাদে সামাজিক আলোক চিহ্নিত হয়নি, শূকরছানাকে রক্ষার মাধ্যমে জয়কালীর প্রতিবাদ, চিরকালীন মানব-শক্তির রূপের জয়গান গাওয়া হয়েছে। অসহায় প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে জয়কালী আর 'বলাই' গল্পে রয়েছে নারীর বৃক্ষোচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।[৮]

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পেলাম অত্যাচার, অপমান, অবহেলা, বঞ্চনা, উদাসীনতার শিকার ছিল যে নারীরা তারা ক্রমশই রবীন্দ্র-গল্পে হয়ে উঠেছে আলোকপ্রাপ্তা—নিজের আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করেছে। এই নারীরাই আধুনিক সভ্যতার ধারক ও বাহক। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'কালান্তর' গ্রন্থের 'নারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন সভ্যতার আবির্ভাব ঘোষণা করে বলেছিলেন—

> অতি দীর্ঘকাল মানব-সভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে।...মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে উঠেছিল এক ঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে, সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয় ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়েছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিল।[৯]

এভাবেই রবীন্দ্র-গল্পের নারীরা পরবর্তীকালের সাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীদের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বের দরবারে বাংলা কথাসাহিত্যে নারীর ভূমিকাকে কালজয়ী রূপ দান করেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. লীলা বিদ্যাস্ত : 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী', অভী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৮, পৃ. ৩
২. সুখরঞ্জন রায় : 'রবীন্দ্র কথাকাব্যের শিল্পসূত্র' ফাল্গুন ১৩৮৩, পৃ. ২২৮-২২৯
৩. শিশিরকুমার দাশ : 'বাংলা ছোটগল্প', প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ. ৮৯
৪. তপোব্রত ঘোষ : 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ১৮
৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা' প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৪১৭, পৃ. ৩২৬-৩২৭
৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা' প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৪১৭, পৃ. ৩২৯
৭. নবনীতা বসুহক : 'রবীন্দ্র গল্পে নারীর সামাজিক বিবর্তন', এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৯ জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৮০
৮. তদেব : পৃ. ৪৩৭
৯. তপোব্রত ঘোষ : 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৩৮২

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে সমাজব্যবস্থা

পার্থজিৎ বেরা

কবি 'ক্ষণিকা' কাব্যে লিখেছিলেন—"আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে ছিল মনে-ঠেকল কখন তোমার কাকন কিংকিনীতে, কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে। মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায় পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।" এ শুধু তাঁর গীতি-কবিতা সম্পর্কেই সত্য নয়, সত্য তাঁর ছোটোগল্প সম্পর্কেও। বস্তুত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের যে-মানস জাগতিক সুখ দুঃখ বিলাস বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করেছে, তার-ই প্রকাশ তাঁর গীতি কবিতায় ও ছোটোগল্পে। আমরা তাঁর ছোটোগল্প আলোচনার আগে তাঁর গল্পের উৎস ও পটভূমি জেনে নিতে চাই। প্রসঙ্গাত রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সম্পর্কে কিছু বিদগ্ধ পণ্ডিত মহলে ধারণা প্রচলিত আছে যে, তাঁর ছোটোগল্প। গীতিকাব্যিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, সে বিষয়টিও আলোচ্য। অবশ্য গীতবাঞ্জনার মধ্যে যথাযথ অর্থে রোমান্টিকতার যে বিশিষ্টতা ব্যক্ত হয়, আমরা ভাগবত ও বস্তুগত যে চেতনার মধ্যে বসবাস করি তাকে কল্পনায় ও অনুভবে ছাড়িয়ে যাওয়া, তা যে তাঁর ছোটোগল্পে ছিল না, কথাটি তা নয়, বরং উচ্চার্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলির মূল উৎস ও পটভূমি আমাদের পরিচিত বাস্তব জীবনক্ষেত্র থেকে গৃহীত, এবং তাকে রূপায়িত করার সময় কল্পনার স্পর্শ যে তাতে লাগেনি, এমনও নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ছোটোগল্পগুলির পটভূমি বর্তমানে যাকে আমরা বাংলাদেশ বলি, পূর্বে যা ছিল পূর্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের অন্তর্গততার একটি খণ্ডিত অংশকে ভিত্তি করে তাঁর। ছোটোগল্পগুলি রচিত হয়েছিল এবং তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নদী। বহুনদী এবং বিপুল আকৃতির নদীও। পদ্মা প্রধান নদী এবং বর্ষাকালে বিপুল। ছিল ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা, সে-ও বড় কম নয়। আর আছে আরোষ্ঠী, নাগর, গোড়াই ও ইছামতী। তাছাড়া ছিল পাবনা জেলার একাংশ ব্যাপ্ত করে অনির্দিষ্ট আকার চলনবিল, তাও অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। পরবর্তীকালে যখন সবুজপত্রের যুগ। শুরু হয়েছে, তখন উপরিউক্ত চিত্রপট পরিবর্তিত হয়ে, হয়েছে গাঢ় বঙ্গের

ধূসর ও শুষ্ক প্রাকৃতিক প্রাঙ্গণ। নদী যে ছিল না তা নয়, কিন্তু নদীকে কেন্দ্র করে গল্পগুলি বিকশিত হয়ে ওঠেনি। এই পটভূমিতে অবস্থান করে রবীন্দ্রনাথের যে ছোটোগল্প রচনা তা যেন কবির-ই কথায় তার চিত্তে জমিদারি ও আসমানদারীর সমন্বিত সম্মেলন গড়ে তুলেছিল। তখন পদ্মানদীর ওপর চলমান বোটে অবস্থান করে তিনি স্থলভূমির ওপর বিভিন্ন ও বিচিত্র জীবনের চিত্র অবলোকন করছেন। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পগুচ্ছ পাঠ করলে এখনো যাঁরা পুরাতন পল্লি-জীবন সম্পর্কে অবহিত, তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন না এত সত্য ও বাস্তব অনুমান কীভাবে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানাভাবে একথা বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন—

> এক সময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লির বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা মাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি পাশা হবে। কিম্বা ধরো একটা ব্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছিল কল্পনা করে।...যা-কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।...গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে।...ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।

সেদিন কবি যে পল্লিচিত্র দেখেছিলেন, নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লি-পার্বণে, আপন প্রাতাহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে, কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।

জমিদারী দেখাশোনার কাজ নিয়ে উত্তরবঙ্গে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানবসমাজ প্রভাব ফেলল তার তৎকালীন সাহিত্যে। চারপাশের গ্রামজীবনের খণ্ডচিত্র জায়গা করে নিল তাঁর ছোটগল্পে। মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা তার গল্পের উপজীব্য হয়ে দাঁড়ান। তার দৃষ্টিপথে এসে পড়ল বেশ কিছু সামাজিক সমস্যা পণপ্রথা, বধূনির্যাতন, জাতিভেদ, কৌলীন্য। স্ত্রীশিক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রসূত জমিদার শ্রেণীর ক্রম অবলুপ্তি, নতুন স্বামী উদ্ধৃতি বেনেসমাজ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কিরকম অটল আকার ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ এসব দেখে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। ব্যক্তি এবং অবস্থা ভেদে শোষণ পীড়নের কিরকম পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্রগল্পে তার বাস্তব সম্মত রূপায়ণ ঘটেছে। গল্প ধরে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

রবীন্দ্রগল্পের নিবিড় পাঠকের অজানা নয় যে বেশ কিছু গল্পের নারীরা সমাজের কোনো না কোনো প্রথার চাপে নির্যাতিত হয়েছে। পণপ্রথা, বধূনির্যাতন, নারী অবমাননা, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এসবের প্রেক্ষিতে নির্যাতিত নারীর কিংবা তার হয়ে অন্য কারোর প্রতিবাদএসব গল্পের উপলব্য। 'দেনাপাওনা', 'যরেশ্বরের যজ্ঞ ,হৈমন্তী', 'অপরিচিতা' ইত্যাদি গল্পে কন্যাদায়গ্রস্ত

পিতা বা কন্যাপক্ষ এবং নারীর অসহায় অবস্থার কাহিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস্তব জীবন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব গল্পেপণের টাকা নিয়ে পাত্রীপক্ষের সঙ্গে পাত্রের পিতার দরকষাকষি প্রায় দোকানদারীর পর্যায়ে চলে গেছে। টাকা এবং পাত্রপক্ষের দাবির কাছে মানবিকতা কীভাবে বিকিনো যায় উল্লিখিত গল্পগুলিতে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুর মৃত্যুর আপাতকারণ শারীরিক অবহেলা এবং বিনা চিকিৎসা হলেও এর প্রকৃত কারণ হলো 'পণপ্রথা' নামক সামাজিক অভিশাপ। যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী', 'অপরাচিতা'তেও আমরা 'পণপ্রথা' নামক সামাজিক অভিশাপের কুফল দেখতে পাই। 'দেনাপাওনা'তে পিতা রামসুন্দর কন্যার শ্বশুরকে টাকা দিতে এলে নিরুর প্রতিবাদ—"আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণ আমার দাম" কিংবা "বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও" ইত্যাদির মধ্যে নারীর বিদ্রোহকে সূক্ষ্মভাবে অনুভব করা যায়। নিরু যে প্রতিবাদ তার পিতার কাছে করেছিল, তারই অন্যরকম পরিণতি দেখা যায় 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী এবং 'অপরিচিতা'র কল্যাণীর মধ্যে। 'হৈমন্তী' গল্পে পণের টাকা বাদ পড়েনি। তবু হৈমন্তীর পিতার জনরব অনুযায়ী অর্থকৌলীনা না থাকায় এবং শাশুড়ির পছন্দমতো মিথ্যাভাষণে হৈমন্তী অভ্যস্ত না হওয়ায় নির্যাতিত হয়েছিল। বধূ জীবনের অসহায়, করুণ রূপটি 'দেনাপাওনা' এবং 'হৈমন্তী' গল্পে বাস্তবসম্মত রূপ পেয়েছে। 'অপরিচিতা'র কল্যাণীর পিতা শম্ভুনাথ সেনকে কন্যাদায়গ্রস্ত' বলা ঠিক নয়। 'দেনা-পাওনা'র পাশাপাশি গল্পটিকে রেখে পড়লে রামসুন্দর মিত্র ও শম্ভুনাথ সেনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

'ত্যাগ' গল্পটিতে বিধবার পুনর্বিবাহের চেয়েও অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপারটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। হেমন্ত যেভাবে তার পত্নী কুসুমকে নিরাপত্তা দিয়ে বলেছে আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না, আমি জাত মানি না' ভাতে মানবিক মূল্যবোধ সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল। সমালোচক যথার্থ বলেছেন—

> এ গল্পে বিয়ের সূত্রে জাত মারা, বিলেত গেলে জাত যাওয়া গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা, সমাজপতির বিধান দেওয়া, জাত ভাঁড়ানো এসব মধ্যযুগীয় মানসিকতা এবং মূল্যবোধগুলি যা রয়েছে, তা সব তুচ্ছ হয়ে গেছে নবজাগ্রত মানবিক মূল্যবোধগুলির কাছে। (বিকশিত কুসুম/প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত)

স্ত্রীস্বাধীনতার পরিপন্থী কৌলীন্যপ্রথাকে অবলম্বন করে লেখা গল্প 'মহামায়া'। মহামায়ার দাদা ভবানীচরণ অকুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে চাননি। বংশগৌরব এবং কৌলীন্যকে বাঁচানোর জন্য মহামায়ার বিবাহ স্থির করেছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী এক কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে। এ গল্পে কৌলীন্যপ্রথার পাশাপাশি এসেছে সহমরণপ্রথা। মহামায়ার মতো আরেক স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী শাস্তি'র চন্দরা। গল্পটি সমাজবাস্তবতার জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কোরফা প্রজা দুখিরাম ও ছিদাম রুইকে ঝড়জলের মধ্যে জমিদারের (অদৃশ্য) গৃহ সারাইয়ের কাজে যেতে হয়। বেগার খাটা (সামান্য মজুরী, প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য) এবং অল্প জলপানি সারাদিনের ক্ষুধার্ত দুই ভাইকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে জমিদারি এলাকায় এভাবে দরিদ্র প্রজাদের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেওয়া ও কটুকথা শোনানো বাস্তব ঘটনা। ভাত খেতে চেয়ে না পাওয়া ও স্ত্রীর কুশ্রীতাপূর্ণ উক্তি দুখিরামের মাথায় রক্ত তুলে দেয়। হঠাৎ করে দুখিরাম রাগের মাথায় স্ত্রীকে খুন করে ফেলে। পল্লিজীবনে জমিদারি শোষণ, রাগ করে বৌকে খুন করা, খুনের হাত থেকে বাঁচতে

অন্যের কাধে দোষ চাপানো, কোর্ট-কাছারি, উকিল মোক্তার, অশিক্ষিত গ্রানা প্রজার মুক্তির আশায় অসহায় ক্রন্দন কোনো সাজিয়ে তোলা ঘটনা নয়। দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে ছিলাম বড় বৌকে খুনের দায় তার স্ত্রী চন্দরার কাধে তুলে দেয়—"বৌ গেল বৌ পাইব, ভাই গেলে ভাই পাইব না" ছিদামের এই গ্রামীণ বিশ্বাস চন্দরার জীবনের ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের একটি লক্ষণ হলো নারীজাগরণ, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন। বলাকা-পলাতকা-সবুজপত্র যুগে নারীরা আপন ব্যক্তিত্বে দাঁড়াতে গিয়ে সবসময় যে সফল হয়েছে, তা নয়। সংসার-সমাজ-সংস্কারের পাঁচিল অতিক্রম করতে হয়েছে তাদের। অসম সমাজ ব্যবস্থা জাত মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে গল্পের চরিত্রগুলি সবুজপত্র পর্বে অন্য মাত্রা পেয়েছে। এইসব গল্পে নারী অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জীবনজিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছে। ইউরোপ প্রত্যাগত লেখকের মানসিকতায় একটি বিশেষ দিক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে সবুজপত্র পর্বে।সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংসারে নারীর প্রতি যে কত অন্যায়-অবিচার করা হয়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি তার জীবন্ত দলিল। মৃণাল আগাগোড়া বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। এই বিদ্রোহ স্বামীর পরিবারের নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি রুগ্ন মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধেও। বিন্দুর প্রতি সকলের অমানবিক ব্যবহার দেখে মৃণাল মধ্যযুগীর মূল্যবোধবাহী সমাজের চেহারাটা উপলব্ধি করেছে।

'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা স্বামীর মতের অনুগামিনী হওয়ার সুপ্রাচীন রীতিকে উপেক্ষা করেছে। স্বামীর দেওয়া অপমান, অবহেলা থেকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই গিরিবালা গৃহত্যাগ করে পেশাদারী মঞ্চের অভিনেত্রী হয়েছিল। 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলাও স্বামীর অমনোযোগ থেকে সরে এসে রান্না-খাওয়া রান্নার বৃত্তে আবর্তিত জীবন ছেড়ে চলে গেছে অনির্দেশ্যের পথে। স্বামীর সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি প্রতিবাদে অনিলার গৃহত্যাগ। সমাজ মানুষের জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'খাতা', 'দর্পহরণ', 'সুভা' ইত্যাদি গল্পে। নারী শিক্ষিত হলে সংসারে পুরুষ তাকে দাবিয়ে রাখতে। পারবে না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে এমন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—'খাতা' গল্পের নায়িকা উমার স্বামী প্যারীমোহনের সংলাপে। তেমনি 'দর্পহরণ' গল্পের হরিণ তার স্ত্রী নির্ধারণীর সাহিত্যচর্চালোক সুখ্যাতিকে সুনজরে দেখেনি। বরং শেলী, ঝাঁসের তুলনা এনে স্ত্রীকে হেয় করার চেষ্টা করেছে। আর স্ত্রী সাংসারিক শান্তি অক্ষর রাখতে লেখার খাতা পুড়িয়ে ফেলেছে। সামাজিক প্রথার চাপে পড়ে একটি অসহায় মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাবার কাহিনি 'সুভা'। এই গল্পের সমাজ পটভূমি একটি কঠিন সময়ের প্রতিচ্ছবি। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাত্রস্থ করা না হলে কন্যার পিতাকে 'একারে' করা হতো। অসহায় পিতা সুভার বাকুহীনতার কথা গোপন রেখে কন্যাকে পাত্রস্থ করেন। কিন্তু সত্য উদ্‌ঘাটন হতেই সুভা কপালে জোটে লাঞ্ছনা। তার স্বামী একটি ভাষাবিশিষ্ট কন্যাকে বিবাহ করেন।

নর-নারীর দাম্পত্য এবং তাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত জটিলতা ও নারীর অসহায়তার কাহিনি নিয়ে লেখা 'মধ্যবর্তিনী', 'দিদি' এবং 'দৃষ্টিদান'। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে হরসুন্দরী স্বামীর দৃষ্টিতে দেখেছে নারীর দুটি রূপপ্রয়োজন এবং প্রেম হরসুন্দরী ও শৈলবালা। পুরুষের একাধিক বিবাহকেন্দ্রিক সমস্যার গল্প 'দৃষ্টিদান'। স্বামীর মন এবং মান রাখতে গিয়ে কুনু বিধ্বস্ত হয়। সমাজ-সংসারের সঙ্গে মানিয়ে চলার দায় মেয়েদের। 'দৃষ্টিদান' গল্পের কুমুর উপলব্ধি একটি বিশেষ সময়েরই নয়, সর্বকালীন।

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের নায়ক বৈদ্যনাথের কাছে 'প্রেমের চেয়ে পিণ্ড বড়। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম নারীর ভালোবাসার কোন মূল্য তার স্বামীর কাছে নেই। তাই বৈদ্যনাথের পত্নী বিনোদিনীর কপালে জোটে 'বন্ধ্যা', 'কলঙ্কিনী' বিশেষণে নারীদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। যৌবনের পদস্খলনের খেসারত নারীকে দিতে হয়, পুরুষকে নয়।

শ্রেণিবিভক্ত সমাঝোতা নারীপুরুষের স্বাধীনতার বৈষম্য রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেছিল। বহির্বিশ্ব এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় নারীদের অসহায়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। উত্তরবঙ্গে জমিদারী কার্যভার গ্রহণসূত্রে রবীন্দ্রনাথ পল্লিপ্রকৃতি, সমাজ এবং গ্রামীণ অর্তনীতির সংস্পর্শে আসেন। শাসনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিদারের নির্বাচিত মধ্যসত্ত্বভোগী নায়ের, ম্যানেজার প্রভৃতিরা প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত এবং শাসনের নামে চালাত দমন-পীড়ন। গল্পগুচ্ছের কয়েকটি গল্পে সেই বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে। 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে জমিদারকে নেপথ্যে রেখে ম্যানেজার প্রজাদের উপর পীড়ন, নির্যাতন করে। জেলেদের চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া, বেড় জাল ফেলা, প্রয়োজনীয় মাছ না পাওয়া এসব অত্যন্ত সত্য ঘটনা। তেমনি আরো বাস্তব ঘটনা হলো বিদ্রোহের অভিযোগে তাদের কয়েন করা, ভিটে থেকে উৎখাত করা, প্রয়োজনে কেটে বস্তায় বন্দী করে ফলে ডুবিয়ে দেওয়া। 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে দেখা যায়, নায়ের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যের নামে মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা করেন। মিথ্যা চুরির অভিযোগে কয়েদ করা, অতিমাত্রায় খাজনা বৃদ্ধি করা, মামলা মোকদ্দমা করে বাস্তুচ্যুত করা গরিব প্রজাদের জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

জমিদারি কার্যোপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গে গিয়ে তিনি কৃষক, মজুর, তাঁতি, জেলে, হাড়ি-ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি সমাজের নিম্নবর্গ ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদেরকাছ থেকে দেখেছেন এবং সমাজ জীবনের বাইরের পালিশের ভেতর থেকে উকি দিয়ে দেখেছেন ঘুণধরা, পচা-গলা সমাজের কুৎসিত চেহারা। রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্পে দেখা গেছে ক্রমাগত অত্যাচার-পীড়নে শ্রমজীবীদের প্রতিবাদের শক্তিপর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে (শাস্তি, দুর্বুদ্ধি এবং মেঘ ও রৌদ্র গল্পের কৃষক এবং জেলেদের চরিত্র)। আবার কেউ প্রতিবাদ করেছে মাথা তুলে (সমস্যাপূরণের অছিমন্দি, হালদার গোষ্ঠীর মধু কৈবর্ত)। শ্রেণিগত পরিচয়ে রবীন্দ্রগল্পের শ্রমজীবীরা হলো—চাষি ও খেত মজুর (শান্তি, সমস্যাপূরণ, দুর্বুদ্ধি), জেলে (মেঘ ও রৌদ্র, হালদার গোষ্ঠী), তাঁতি (পণরক্ষা), মেথর (সংস্কার) ডোম (অনধিকার প্রবেশ), কুমোর (লিপিকা'র নতুন পুতুল), মোটর মিস্ত্রী, জাহাজের খালাসি (রবিবার) লেঠেল (ম্যানেজার বাবু)। এসব গল্পে সামাজিক মানুষের ছোটোবড়ো দিকগুলিও ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রগল্পে শোষণের চিত্র যেমন আছে, কোনো কোনো গল্পে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও লক্ষ্য করা যায়। 'সমস্যাপূরণ' গল্পের গরিব চাষি অছিমদ্দি কাঁদেনি। নিজের অধিকার সম্পর্কে সে পুরোপুরি সচেতন। মহাজন তার সবকিছু কেড়ে নিলেও সে মাথা নীচু করেনি। সংঘবদ্ধ না হোক, তার একক প্রতিবাদই তাকে কাহিনির কেন্দ্রে স্থান দিয়েছে। জমিদার বিপিনবিহারীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে আছিমদ্দি চরিত্রটি বাস্তব হয়ে উঠেছে। জমিদারি শোষণ, জোর করে জমি কেড়ে নেওয়াইত্যাদি সবকিছুর বিরুদ্ধে অছিমদ্দির বিদ্রোহ।

'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের বনোয়ারিলাল শোষণের বিরুদ্ধে জেলে মধু কৈবর্তকে বিদ্রোহ করবার সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিল। এই পরে মধু কৈবর্ত নিজে থেকে প্রতিবাদ না করলেও অত্যাচারকে

প্রতিরোধ করবার জন্য সাহায্য চেয়েছে। মহাজনী শোষণ ও নির্যাতনের সামনে মধু কৈবর্তকে গামছাড়া হতে হয়েছে। মধু কৈবর্ত তৎকালীন যুগের নির্ধারিত শ্রেণির প্রতিনিধি। 'রাজটিকা' গল্পটি পুনা কংগ্রেস অধিবেশনের তিন বছর পর লেখা। গল্পটিতে সমকালীন রাজনীতি এবং ইংরেজ খেতার লুব্ধ ভারতবাসীদের কথা সরাসরি বলা হয়েছে। কংগ্রেস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও গোপন থাকেনি। 'পণরক্ষা' গল্পে স্বদেশি বন্ধুবান আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁতি সম্প্রদায়ের উত্থান পতনের ইঙ্গিত রয়েছে। বিদেশ থেকে নতুন কাপড়ের বল আসায় যে বাংলার তাঁত শিল্পের উপর আঘাত পড়েছিল গল্পের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহাসিক সত্যটির উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কুষ্টিয়াতে তাঁত শিল্পকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের স্বদেশি ভাই শরৎ ভলান্টিয়ারী করেছে। প্লেগের পাড়ায় ইঁদুর মেরেছে, আবার দামোদরের বন্যায় প্রাণকাজে ছুটে গেছে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে পরোপকার করার ইচ্ছা শরৎ চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। শরতের মধ্য দিয়ে স্বদেশিদের সেবাপরায়ণ মনোভার এবং সেচ্ছাসেবক রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। সরাসরি রাজনীতি প্রসঙ্গ 'নামঞ্জুর' গল্পে। স্বদেশি আন্দোলন, বিপ্লবীদের কথা, বদর পিকেটিং প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে।

বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা 'শেষকথা' এবং 'বদনাম'। 'সমস্যাপূরণ' গল্পের পুত্র বিপিন বিহারী মনোভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পিতা জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকারের বিপরীত কোটির মানুষ। 'নামঞ্জুর' গঞ্জে বিপ্লবী পুত্রের ভাষ্যে বিরোধের ব্যাপারটি উল্লিখিত। 'রবিবার' গল্পের অভীক কুমার পিতৃদত্ত নাম অভয়চরণ পরিত্যাগ করে প্রথম বিদ্রোহ প্রকাশ করে। এই গল্পে অভীকের নাস্তিকতা ইয়ংবেঙ্গাল গোষ্ঠীর সময়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে পিতৃপুরুষের প্রতি বিষোদগার করেছে নবদ্বীপচন্দ্র। 'অপরিচিতা'-তে অনুপম বিয়ে ভাঙার পর থেকেই মা ও মামার বিরুদ্ধে মনেমনে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। 'সমাপ্তি'র অপু নতুন মূল্যবোধ থেকে মায়ের পছন্দ করা পাত্রীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেছে। মায়ের জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ থেকে পুত্রের জীবনযাত্রার ভঙ্গী ও মূল্যবোধ যে আলাদা গল্পকার এ তথ্য জানাতে ভুল করেননি। 'ঠাকুরদা' গল্পে ঠাকুরদার অলীক বিশ্বাসের জগৎটিকে নবীন যুবক আঘাত করে। 'লিপিকা'র (১৩২৮) অন্তর্গত 'নতুন পুতুল' গল্পে প্রবীণ এবং নবীনের দুরত্বটি চোখে পড়ার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবেশ-পরিস্থিতির জটিলতা, চরিত্রের বিচিত্র পটপরিবর্তন, সময়ের দ্বান্দ্বিকতা, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, তৎকালীন রাজনীতি, হাজারতর সংস্কার-প্রথা-লোকায়ত বিশ্বাসের কথা শুনিয়েছেন তাঁর গল্পে। ফলে গল্পগুলিতে ধরা পরেছে সুগভীর সমাজবাস্তবতা।

উৎসের সন্ধানে

১. অশোক কুমার মিশ্র : 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের রূপরেখা', দে'জ পাবলিশিং
২. ক্ষেত্র গুপ্ত : 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব', পুস্তক বিপণী
৩. গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী
৪. সমরেশ মজুমদার : 'রবীন্দ্রনাথের গল্প বিশ্লেষণী পাঠ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

বন্ধু ভূতের আখ্যান : প্রসঙ্গ ‘সব ভুতুড়ে’র নির্বাচিত গল্প

মধুসূদন সাহা

দাদা সুকুমার রায়ের মতো গল্প বলা ও ছবি আঁকার সহজাত প্রতিভা লীলা মজুমদারকে খুব ছোটোবেলা থেকেই আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল। যে ব্রত, যে উদ্দেশ্য নিয়ে রায় পরিবারের পূর্বজরা সাহিত্য সাধনায় কায়-মনবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন লীলা মজুমদারও সেই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাই তাঁর রচনার মাধ্যমে তিনি শিশুমনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারণা দিতে চেয়েছেন বারবার। জীবনের ব্রত সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> সর্বদা মনে মনে জানতাম ইংরিজিতে বিদ্যাদিগগজ হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি বাংলায় আমাদের দেশের ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য লিখতে চাই। বড়ো পদ অলঙ্কৃত করতে চাই না; একদিন যদি আমার দেশবাসীরা বলে, ‘এ মেয়ে তার বংশের উপযুক্ত সন্তান’ তবেই আমার জীবন সার্থক হবে।[১]

তাঁর ‘সব ভূতুড়ে’ গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে মোট ৪২টি ভূতের গল্প। যেখানে গা ছমছমে কোনও বিষয় নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পের পরতে পরতে আছে মানুষ ও ভূতের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান।

বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য ভূতের গল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সরাসরি ভূতের আগমন ঘটছে বা ভূত স্বয়ং উপস্থিত না থাকলেও পারিপার্শ্বিকতা ও গল্পকারের গল্প উপস্থাপনের ভঙ্গিমায় ভৌতিক আবহ তৈরি করা হয়েছে। আবার কখনও কখনও গল্পকার রোমাঞ্চকর আবহাওয়া প্লট বা কাহিনিবৃত্ত নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু লীলা মজুমদারের গল্পগুলির ভূত গতানুগতিক ভয়ঙ্করদর্শন কিংবা কিম্ভূতকিমাকার নয়। তিনি ভয় মাখানো ভাষায় ভূতকে কখনও বর্ণনা করেননি বরং প্রায় সমস্ত গল্পের ক্ষেত্রেই অশরীরীকে মানুষের মতো করেই উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য অংশে তিনি বলেছেন—

শুনেছি মরে গেলে শরীরের এক কণাও নষ্ট হয় না। সবই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে চিরকাল রক্ষা পায়। তাহলে মানুষের সত্তার শ্রেষ্ঠাংশই বা বিনষ্ট হবে কেন?...মরে গেলে সেই শ্রেষ্ঠাংশের একটা অশুভ পরিণতিই বা হবে কেন? বিধাতার মঙ্গল বিধানে আমার আস্থা আছে, তাই আমার এই ভূতেদের একটু সুনজরে দেখতে হবে।[২]

'সব ভুতুড়ে' গল্পগ্রন্থের 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে দশজন শিশু অহিদিদির বন্ধু হয়ে উঠল তার কাহিনি। গল্প শেষে আমরা জানতে পারি, প্রায় ২০০ বছর আগে এক সদাগরের বাড়ি পৌষ-পার্বনের বাসি পিঠে খাওয়ার সময় চিৎকার করার অপরাধে কর্তা ৯ জন বাচ্চার জিভ কেটে দিয়েছিল। তারা ছিল সমাজের প্রান্তজ জন তথা গয়লাদের ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে বড়ো ছেলেটা পালিয়ে যায়। তার নাম বগেশ, দলের পাণ্ডা। তারাই ২০০ বছর পর হয়ে উঠেছে অহিদিদির বন্ধু। তারা একসঙ্গে খায়, গল্প শোনে, সবকিছু করে, কিন্তু কখনও কারোর ক্ষতি করেনি। তাদের যেহেতু সৌজন্যবোধের অভাব ছিল সেহেতু সেই শিক্ষা দিয়েছে অহিদিদি। মৃত্যুর পরেও তারা বাঁচতে চায়, তাদের মধ্যে তখনও শিশুমনের সরলতা। তাই তো তারা অহিদিদির রান্না করা খাবার লুকিয়ে লুকিয়ে খায় এবং ধরা পরে যাওয়ার পরও তারা কারোর ক্ষতি করেনি। উপরন্তু তারা অহিদিদির বন্ধু হয়ে যায় কারণ তাদের মন ফুলের মতো নিষ্পাপ তারা কি কারোর ক্ষতি করতে পারে!

'সব ভুতুড়ে' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে চোখে পড়ে অজস্র বাচ্চা ভূত। ছোটোদের জন্য লেখা বলে প্রায় সব গল্পে কোনো না কোনো বালক বা কিশোর চরিত্র উপস্থিত। তাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছে এমন ছোটো ছোটো ভূতেদের সংখ্যাও এই গ্রন্থে কম নেই। 'অহিদিদির বন্ধুরা', 'লক্ষ্মী', 'কাঠপুতলি', 'তেপান্তরের পারের বাড়ি', 'পাঠশালা', 'বাপের ভিটে', 'ভ্-ভূত'এই সব গল্পে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের ভূত দিব্যি মানুষের সঙ্গে মিশে আছে। 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পে ৯টি বাচ্চা ভূত, 'লক্ষ্মী' গল্পে এক পাল ছোটো ছোটো মেয়েদের ভূতকে দেখা যায়। এরা সারাদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে খেলা করে তাকে আনন্দ দিয়েছে। 'কাঠপুতলি' গল্পে দেখা গেছে সমুদ্রের তীরে থোমা গুবুর যে গ্রাম ছিল সেখানে ৫০ জন কালো কালো ছেলেমেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছে। ওই গ্রাম ও ছেলে-মেয়ের দল প্রায় ১০০ বছর আগেকার। তাই গল্পের শেষে ওই গ্রামসুদ্ধ ওরা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। 'তেপান্তরের পারের বাড়ি' গল্পে ১০০ বছরের পুরনো বাড়িতে যে একপাল ছেলে-মেয়ে হুল্লোড় করছিল তারা সব অনাথ ও উদ্ভ্রান্ত। ৬০ বছর আগেও এরা ওখানে থাকত। 'পাঠশালা' গল্পে অমর্ত্যপুরে মেজদাদুর পাঠশালায় যে ২টি বালক ছাত্র পড়তে এসেছিল তারাও কেউ ইহজগতের ছিল না; কিন্তু তারা ছিল পরস্পরের বন্ধু। 'বাপের ভিটে' গল্পে গয়নাদিদির বাপের বাড়িতে আরেকটি বাচ্চা ভূত পাওয়া যায়, সে পেঁচো-কালো লিকলিকে চেহারা। 'ভ্-ভূত' গল্পে আছে এমন ৩-৪ টি বাচ্চা ছেলে-মেয়েরদের ভূত। ভবানীপুরের পুরনো এক বাড়িতে থাকত নিঃসন্তান এক দম্পতি। অষ্টপ্রহর তাদের মধ্যে খিটিমিটি লেগেই থাকত। ঝগড়া হলেই স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত আর রাতে বাড়ি ফিরত না। গিন্নি এক টুকরো খোলা ছাদে গিয়ে কান্নাকাটি করত আর দেবতাকে ডাকতেন। তখনই তিনি দেখতেন পাশের ভাড়াটেদের ছোট্ট ছাদে ৩-৪ টে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে কুকুর, বিড়াল নিয়ে খেলা করছে। এই বাচ্চাগুলি ছাদের মধ্যেখানের পাঁচিল টপকে তাঁর কাছে চলে আসত, তাঁর কোলে-পিঠে চেপে নানা গল্প করত। এই বাচ্চাগুলি যে ইহজগতের নয় তা জানতে পেরেছিলেন তিনি ২২ বছর

পর। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমে চলে গেছিলেন তারা। ২২ বছর পর কলকাতায় ফিরে কৌতূহলবশত পুরনো সেই বাড়িতে গিয়ে দেখেন সেখানে এক বৃদ্ধা থাকেন। তবে প্রতিদিন রাতে পাশের ছাদে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে তখনও খেলা করে, মজা করে কুকুর-বিড়াল নিয়ে। এইভাবেই লীলা মজুমদারের গল্পগুলি খুব সুন্দরভাবে মানুষ এবং ভূতের বন্ধুত্বের আখ্যান হয়ে উঠেছে।

● **মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ভূত বা উপকারী ভূত :** লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পগুলি পড়ার যেমন আনন্দ আছে, তেমনি আড্ডার আমেজও আসে সমমাত্রায়। আসলে লীলা মজুমদারের গল্পবলার ভঙ্গিটিই মজলিশি ধরনের, জমাটি ও ফুরফুরে কৌতুক মেশানো। তাই ভূতের গল্প হয়েও সেখানে কোনও ভয় নেই। প্রথমদিকে গল্পগুলিকে অলৌকিক ভূতের গল্প মনে হলেও ঘটনার পরিণতিতে দেখা যায় সেখানে ভূতের পরিবর্তে অলৌকিকতার জন্য কোনও মনুষ্য সৃষ্ট বা প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে। এই ধরনের গল্প লেখার ক্ষেত্রেও লীলা মজুমদার নিজ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।'সব ভুতুড়ে'-র গল্পগুলি থেকে যে বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল ভূতেদের উপকার। দু-একটি গল্প বাদ দিলে অধিকাংশ গল্পের ভূতই মানুষকে নানাভাবে বন্ধুর মতো সাহায্য করেছে, উপকার করেছে অথবা সুপরামর্শ দিয়েছে। এত উপকারী, মানবহিতৈষী ভূত এই গ্রন্থে আছে যা আলোচনার সুবিধার্থে তাদের সাদামাটা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে নেওয়া যায়—

১. পরিচিত বা আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী ভূত।

২. সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে নাম না জানা, অচেনা ভূত।

তবে এরা প্রত্যেকেই মানুষের উপকার করে গেছে। লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পের ভূতগুলি অধিকাংশই উপকারী। এবং অনেকক্ষেত্রে তারা মানুষের উপকার নিলেও পরিবর্তে উপহার দিয়ে গেছে। সব ক্ষেত্রেই তারা নিঃস্বার্থ।

১.ক. হরু হরকরার একগুঁয়েমি : গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'হরু হরকরার একগুঁয়েমি' গল্পে আমরা দেখতে পাই এক ডাক হরকরা ভূতকে। হরকরারা স্বাধীনতার আগে লোকের চিঠি ও বার্তা একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছে দিত। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যায় সে মৃত্যুর পরেও নিঃস্বার্থভাবে তার জীবিকাকেন্দ্রিক দায়িত্ব পালন করে গেছে। তার ঝুলিতে যতগুলি চিঠি অবশিষ্ট আছে সেগুলিকে সে যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তার মুক্তি হবে না। এই ভাবনা থেকেই সে মৃত্যুর পরেও তার দায়িত্ব পালনে তৎপর, কারণ 'হরকরা' পদটির পাশে যেন কোনও দাগ না লাগে। উটকো ও লংকা ডাক বিভাগের গাফিলতির অভিযোগ তুললে এবং ডাকে চিঠি বা কোনো জিনিস চুরি যায় একথা বললে সে দেখায় তার ঝুলির ভিতরে থাকা ১৩টি চিঠি। 'একবার অজয় নদীর বানের জলে ডাকের থলি পড়েছিল। বহু চিঠি, প্যাকেটের নাম ঠিকানা ধুয়ে গেছিল। কিন্তু হারায়নি। চুরিও যায়নি।... এ লাইনে চোরটোর নেই।'[৩] সেই চিঠির মধ্যে থেকে হরু উদ্ধার করে একটা প্যাকেট যেটা কলকাতা থেকে উটকোর দাদুর দাদামশাই মারা যাওয়ার আগে তাঁর একমাত্র সন্তান দাদুর মাকে পাঠিয়েছিলেন। একটা হীরের সীতাহার ছিল সেই প্যাকেটে। শতাধিক বছর ধরে সেইসব বিলি করতে না পারা চিঠি, নাম, প্যাকেট আগলে রেখেছে হরু হরকরা। সে বলেছে—

> কিন্তু এই আমি তোকে বলে দিলাম, এই যে রং-ওঠা, নাম-ঠিকানা-ধোয়া, ভুল-নাম-লেখা তেরোটি চিটি বাকি রইল, এর পেরতেকটির মালিক খুঁজে বের করে তবে আমি ছাড়ব। তাপ্পর ছুটি নেব।[৪]

জীবনের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া এমন কর্মরত, নিষ্ঠাবান ভূত আর কারও গল্পে পেয়েছি বলে আমাদের মনে পড়ে না। আবার গল্পের নামে 'একগুঁয়েমি' শব্দটির মধ্যে দিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে খারাপ কোনও গুণাগুণ সম্পন্ন মনে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পটি পাঠ করতে করতে বোঝা যায়, গল্পকার এর মধ্যে দিয়ে আসলে শিশুমনে নিজ কর্তব্যবোধ সম্পর্কে নিষ্ঠাবান থাকার শিক্ষাই দিচ্ছেন।

১.খ. পেনেটিতে : 'পেনেটিতে' গল্পে আমরা দেখতে পাই শিশু-কিশোর মনের স্বাভাবিক চাহিদা, সমস্যার সমাধান ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সহজ-সরল ভাষায় কিছুটা মজার ছলে এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। গল্পটিতে বন্ধু এবং বন্ধুত্বের বিভিন্ন টানাপোড়েন বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। গল্পটিতে কথক তার মামার কেনা একটি পুরনো বাড়িতে থাকে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব হয় ওই বাড়ির আসেপাশে থাকা গঙ্গার ধারে বসবাসকারী তিনজন মাঝি বা জেলের। অল্পসময়েই তারা খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে, একসঙ্গেই সময় কাটায়, তাদের জেলে জীবনের ঘটনা বলে। এখানেও সমাজের উঁচু-নীচু শ্রেণির মানুষের মধ্যে অসমবয়সী এক বন্ধুত্ব গড়ে তোলার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কথকের স্কুলের তিন প্রতিদ্বন্দ্বী বালক তাকে বিরক্ত করায় তারা ঠিক করে তাদের ভয় দেখাবে, তারা সেটা করে এবং এই সাহায্য করার পর তারা উধাও হয়ে যায়। এইভাবেই কিশোর কথকের অজান্তে ভূতেরাই হয়ে ওঠে তার পরম বন্ধু ও পরিত্রাণকর্তা। এটাই তো প্রকৃত বন্ধুত্ব, যারা বিপদে নিস্বার্থভাবেই সাহায্য করে যায় নিজের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে। সেই শিক্ষাটুকুই যেন গল্পকার দিতে চাইলেন।

১. গ. আহিরিটোলার বাড়ি : 'আহিরিটোলার বাড়ি' গল্পের গল্পকথককে তার বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা শিবেন্দ্রনারায়ণ পরম আদরে আপ্যায়ণ করেছেন। অঙ্কে খুব খারাপ নম্বর পেয়ে বাড়ি ত্যাগ করে সে এই বাড়িতে চলে আসে। মুহূর্তের মধ্যে পরিত্যক্ত বাড়ি পরিণত হয় চাকর খানসামা পরিবৃত সাজানো সংসারে। রুপোর থালায় লুচি, সন্দেশ, ছানামাখা ও বাদামের শরবত দিয়ে তাকে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। পরের দিন সকালে কুটিকে দিয়ে ঠাকুরদা তাকে ভালো করে অঙ্কও শিখিয়েছেন। কারণ পরবর্তী প্রজন্মের উপরই বংশমর্যাদা অটুট থাকে। তাই ঠাকুরদাদার গলায় আন্তরিকতার মধ্যে একটু আক্ষেপের সুর লক্ষ করা যায় "পনেরো পেইছিস? হতভাগা, তোর লজ্জা করে না? আঁক হয় না কেন? শুভঙ্করী পড়িস না। মুখ অমন পাংশুপানা কেন? খেইছিস? এ্যা, খাসনি এখন"[৫] অঙ্কে পনেরো পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ভূতের বাড়ি চলে আসা বালকের মতো আমরাও ভুলে যাই ভূতের ভয়। ভূত নয়, গল্প শেষে জেগে থাকেন স্নেহপরায়ণ এক ঠাকুরদা শিবেন্দ্রনারায়ণ। গল্পকথকের সঙ্গে সত্যিই তার দাদু-নাতির হৃদ্যতাই প্রকাশিত হয়েছে।

১.ঘ. চোর : গল্পে হীরের ইয়াররিং চুরি করে পালানোর সময় এক চোর জাদুঘরের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। মুন্সীদের কুখ্যাত হানাবাড়িতে চোরটি আশ্রয় নেয়। ওই বাড়ির কালীভক্ত বামুন ভূত তাকে আশ্রয় দেয়, সুস্থ করে তোলে। পাশাপাশি আবার চুরির অপবাদ থেকে যাতে তার মুক্তি ঘটে সেই ব্যবস্থাও করে দেয়। এখানে ভূত তাকে সহজ-সরল ও সৎভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। এখানেও গল্পকার শিশুমনে চুরিবিদ্যা যে অসৎবৃত্তি এই নীতিকথাই ব্যক্ত করেছেন।

১.ঙ. কলম সরদার : এই গল্পটিতে আবার ঠিক এর উল্টো ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে চোরকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে এক ভূত। পুলিশের চাকরি জীবনে ছোটো ঠাকুরদা কুখ্যাত গুণ্ডা

কলমকে ধরার জন্যে এক পুরনো বাড়িতে গিয়ে ঢোকে। পরিত্যক্ত অন্ধকার সেই বাড়িতে অযাচিতভাবেই ওই বাড়ির বাসিন্দা ভূতটি তাকে চোর ধরতে সাহায্য করেছিল। চৌর্যবৃত্তি যে খারাপ কাজ সেই শিক্ষাই গল্পকার শিশুমনে দিতে চেয়েছেন।

এ ছাড়াও এই গল্পগ্রন্থের অন্যান্য গল্পগুলিতে ভূতেদের নানা উপকারের কথা রয়েছে, যেমন—'ফ্যান্টাস্টিক', 'পাশের বাড়ি', 'বাপের ভিটে', 'ভয়', 'চেতলায়', 'পিলখানা', 'লাল টিনের ছাদের বাড়ি', 'মোটেল', 'ভাগ্যদেবী ব্রাঞ্চ হোটেল' গল্পের ভূতেরা এমনকি 'তোজো' গল্পের কুকুর ভূতটিও নানাভাবে মানুষের উপকার করেছে। গল্পগুলির মধ্যে শুধু যে ভূতেরাই মানুষের প্রতি বদান্যতা দেখিয়েছে, সাহায্য করেছে তেমনটা নয়, মানুষেরাও সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে ভূতেদের ভালোবেসেছে, সাহায্য করেছে। কোথাও আবার মানুষের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের অপূর্ণ সাধ-বাসনা তৃপ্ত করেছে।

২.ক. ট্যাঁপার অভিজ্ঞতা : গল্পে কার্সিয়াং এর রহস্যময় বৃষ্টির রাতে ট্যাঁপার বাড়িতে এসে সাহায্য চেয়েছিল এক ফিরিঙ্গি বৃদ্ধ। দরজা খুলে ট্যাঁপা দেখে এক রোগা ফিরিঙ্গি বুড়ো, হাতে একটা ছোটো ব্রিফকেস, ভিজে চুপ্পুড় হয়ে গেছে। কোথায় আছাড় খেয়েছে, প্যান্টের হাঁটুতে শ্যাওলা আর কাদা লাগা, গাল-বসা, ফ্যাকাশে মুখ। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত কপাটি লাগছে। এমন অবস্থায় আশ্রয়প্রত্যাশী সাহেবকে ট্যাঁপা সাদরে ডেকেছে ''এসো, ভিজে কাপর-চোপড় ছেড়ে আমার গরম পাজামা-সুট পরো। চা আছে, খাও।''[৬] এর ১৫ বছর পর আবার যখন ট্যাঁপা কার্সিয়াং-এর সেই বাড়ি দেখতে গেল, সেদিনও পাহাড়, আকাশ অন্ধকার করে ঝড়-বৃষ্টি এল। দরজায় ধাক্কা পড়ল আর সেই ফিরিঙ্গি বৃদ্ধ আবার সাহায্য প্রার্থনা করল 'ভিতরে আসতে পারি কি?'' মানুষের কাছে, রহস্যময় ওই বাড়ির দরজায় এভাবে বারবার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ফিরে ফিরে এসেছে ফিরিঙ্গি ভূত।

২.খ. ছায়া : গল্পে গোপেনবাবুর কাছে সাহায্য চেয়েছে এক সুন্দরি মেয়ে। সে ছিল জগু বোসের বাগানবাড়ির বাইজি। ৩০-৪০ বছর আগে বাক্সভরা মোহর নিয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। দেউলিয়া হয়ে জগু বোস মারা যায়। কিন্তু তার স্ত্রী বনানী বৃদ্ধ বয়সে প্রায় না খেয়ে মৃত্যুর জন্য দিন গুনছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে অনুতপ্ত বাইজির প্রেতাত্মা বনহুগলীতে বনানীর কাছে সেই মোহর পৌঁছে দিতে চায়। এই কাজের জন্য সে সাহায্য চেয়েছে গোপেনবাবুর। তিনিও সেই বাক্স রেজিস্টার্ড পার্সেল করে বনহুগলীতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজের মানুষজন্মের ভুল শোধরানোর শিক্ষাই গল্পকার শিশুদের মনে দিতে চেয়েছেন।

২.গ. শেল্টার : মোহর দিয়ে ভূতের সাহায্যের কথা পাওয়া যায় 'শেল্টার' গল্পেও। এখানে জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ি অঞ্চলে ক্ষ্যাপা ভূত বিশুদা ১৯৪৩ সাল থেকে গোপন আস্তানায় রাখা সোনার মোহর আগলে আছে যক্ষের মতো। দেশের হাতে সেই অর্থ তুলে দেওয়ার জন্য বিশুদার ভূত অসীমের সাহায্য চেয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় সাহেবদের দলে ভিড়ে বিশুদা তাদের থেকে অজস্র মোহর উপার্জন করেছিল। সেই মোহর সে চায় দেশের কোনও কল্যাণমূলক তহবিলে জমা পড়ুক। বড়োমামা ও শ্যামাচরণদার সাহায্যে অসীম গুপ্ত কুলুঙ্গি ভেঙে থলি ভরা মোহর উদ্ধার করে। অর্থাৎ দেশের প্রতি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করাও যে প্রয়োজন সেকথাও গল্পকার আমাদের দিয়েছেন।

২.ঘ. দামুকাকার বিপত্তি : 'দামুকাকার বিপত্তি' গল্পে বাঁশঝাড়ের ভূতেরা যে বিপদে পড়েছিল তাতে সাহায্য করার জন্য তারা হাট ফেরত দামুকাকাকে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েভূতেদের সৌন্দর্য বিচার করে বিজয়ী একজনকে পুরস্কার হিসেবে সোনার মালা দিতে হবে। ভূত সুন্দরীদের মধ্যে এই মালা পাওয়া নিয়ে যে আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি চলছিল তাতে স্বয়ং ভূতেরাই বিপদে পড়ে মানুষের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। সেই অবস্থা থেকে দামুকাকাই সমাধানসূত্র বের করে আনে। অর্থাৎ মিলেমিশে থাকার মধ্যে দিয়েই সমাজে শান্তি বজায় থাকে, সেকথাই গল্পকার বললেন।

২.ঘ. সত্যি নয় : এই গল্পে কথকের মেজোমামা জঙ্গলের ভিতর এক পোড়ো বাড়িতে টর্চের আলোয় জমিদার ও তার ভৃত্যকে হারিয়ে যাওয়া মাদুলি খুঁজে বের করে দিতে সাহায্য করেছিল। এই মাদুলিই এক সময় ঘোড়ারেসের মাধ্যমে সেই জমিদারের প্রতিপত্তির মূল কারণ ছিল। 'ভুতুড়ে গল্প'-এ মেজো পিসেমশাই গোলাপি রঙের দু-প্যাকেট বিড়ি দিয়ে তৃপ্ত করেছে ভূতকে। পরিবর্তে সে একটি হীরের আংটিও লাভ করে। এইভাবে ভূতেদের সাহায্য করে ও তাদের দেওয়া উপহারে মানুষেরাও লাভবান হয়েছে। আসলে ইহলোক-পরলোকের মেলবন্ধনের মাধ্যমে বা বলা ভালো মানুষ ও ভূতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে শিশুমনে বেশ কিছু নীতিকথা দিয়ে গেছেন গল্পকার লীলা মজুমদার।

গল্প বলার ক্ষেত্রে খুব সহজেই বাচ্চাদের মনে দাগ কাটতে পারে এমন চটজলদি শব্দ ব্যবহার করেছেন লীলা মজুমদার। প্রতিদিনকার সংসার জীবন যাপনের ভাষা, চলতি শব্দ এবং ছোটো ছোটো বাক্য গল্পের ছিপছিপে চলনের সহায়ক হয়েছে। প্রয়োজন মতো গল্পের ভিতরে যুক্ত করেছেন চরিত্রদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানগত কথোপকথন। সেখানেও কোনও ভারি শব্দ ব্যবহার করেননি তিনি। কারণ শুরু থেকেই তিনি সজ্ঞানে শিশুদের জন্য লিখতে বসেছেন। গল্পগুলি পাঠের পর বোঝা যায়, জীবনের সব ধরনের নেতিবাচকতা পরিত্যাগ করে, জীবনের মহত্ব, মঙ্গল, সুন্দর ও আনন্দের দিকটিকেই তিনি তুলে ধরেছেন। মূল্যবোধের এক অবক্ষয়িত সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয় এতখানি Possitivity নিয়ে শিশুদের জন্য ভূতের গল্প লেখা খুব একটা সহজ কাজ নয়। কনভেন্টে পড়া, ইংরেজি সাহিত্যের তুখোড় ছাত্রী, পরবর্তীকালে ইংরেজির অধ্যাপক লীলা মজুমদার পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক বাতাবরণের পরিবর্তনকে সূক্ষ্মভাবে দেখেছিলেন বলেই মাতৃভাষায় এতখানি দক্ষতায় ভূতের গল্প রচনা করে শিশুমনে মূল্যবোধের শিক্ষাদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানেই মানুষ-ভূতেদের সহাবস্থান তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায়।

উৎসের সন্ধানে

১. লীলা মজুমদার : 'পাকদণ্ডী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৬, পৃ. ২৭২
২. লীলা মজুমদার : "সব ভুতুড়ে", 'লেখকের বক্তব্য', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ মার্চ ২০১২
৩. লীলা মজুমদার : "সব ভুতুড়ে", 'হবু হরকরার একগুঁয়েমি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৪. তদেব : পৃ. ১৪৩
৫. লীলা মজুমদার : "সব ভুতুড়ে", 'আহেরিটোলার বাড়ি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৬. লীলা মজুমদার : "সব ভুতুড়ে", 'ট্যাঁপার অভিজ্ঞতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপায়' গল্পে আশা ও মল্লিকা : একটি তুলনামূলক পাঠ

সুধাংশু কান্তি মুড়িয়া

একজন মানুষের মধ্যে যে কতরকমের প্রতিভা লুকিয়ে থাকে, বঙ্গজননীর কোলে এমন এক সন্তান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬ খ্রি:) জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে না জানলে কল্পনা করা যায় না। ওঁর প্রকৃত নাম ছিল প্রবোধ কুমার। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে তাঁর গায়ের রং কালো আর মুখ সুন্দর ছিল বলে তাঁর ডাকনাম হয় মানিক। ছোটোবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন। গায়ে আগুন নেভানো, শরীর থেকে কাঁচের টুকরো বের করে দেওয়ার ক্ষমতা এবং তাঁর মধ্যে প্রচুর সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি তিনি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি বহু উপন্যাস যেমন 'জননী' (১৯৩৫), 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'চিন্তামনি' (১৯৪৬), 'নাগপাশ' (১৯৫৩) এবং গল্পগ্রন্থ যেমন 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮) লিখেছেন। তাঁর লেখনীর মধ্যে মার্কসীয় ভাবনার বিকাশ ঘটেছে। যাইহোক, তাঁর অনেক রচনাশৈলী ভারত বিভাগের সময় রচিত হয়েছে। সেইসময় সমাজসংকটের অনেক রূপচিত্রও তুলে ধরেছেন তিনি। 'উপায়' গল্পে সমাজের দুর্নীতি, অত্যাচার, নীপিড়ন, দুর্দশা, নারী শোষণ প্রভৃতির রূপচিত্র তুলে ধরেছেন।

গল্পটি শুরু হয় কলকাতা শহরের উপায়হীন নিরাশ্রয় মানুষগুলির জীবনকাহিনি দিয়ে। যেখানে গল্পের প্রধান চরিত্র মল্লিকা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ভূষণের সঙ্গে এবং তার একটি সন্তান আড়াই বছরের খোকন। আর একজন সেই পরিবারে রয়েছেন, মল্লিকার বিধবা ননদ- আশা। তারা সবাই একটি অল্পবিস্তর স্থানের মধ্যে টিনের তৈরি বাড়ি, কাঁথাবালিশের পুঁটলি সব মিলিয়ে একটি গৃহে অবস্থান করে আছে কোনোরকমে। এই গল্পের মধ্যে মল্লিকা ও আশার চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা উদ্বৃত্ত হয়েছে। আশা ও মল্লিকা দু'জনই দ্বিমাত্রিক ভিন্ন মাত্রার চরিত্র প্রদান করে গল্পের চিন্তাধারা ও রূপকে অনেকখানি বিকশিতময় করে

পাঠকদের আকর্ষিত করেছে। সমাজের একটি অবস্থা থেকে ভুক্তভোগী হলেও আশা ও মল্লিকা দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে জীবন চলার পথে বেছে নিয়েছে। যেখানে মল্লিকা একজন বিবাহিতা, সে চায় পরিবারের সুস্থতা। সেই পরিস্থিতিতে কোথাও রুজিরোজগারের পথ দেখা যায় না। গল্পের খলনায়ক প্রমথ নিজে জানায় ছেলেদের কোনো কাজ নেই, কিন্তু মেয়েদের কাজের সন্ধান করে দেওয়া যেতে পারে। যখন মানবকল্যাণ ও জনসেবা সমিতির এক পরিচালক প্রমথ মল্লিকার বাড়িতে আসে, তখন মল্লিকার অবস্থা, চিন্তাধারা, লজ্জা বা সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। উপরন্তু, যখন প্রমথকে দেখে তখন তার মাথায় দেওয়া আঁচল সরিয়ে বাইরে তাকায় এবং প্রমথের প্রতি তার আর্জি জানায়। যেখানে স্বামী-সন্তানহারা আশা মল্লিকার বাড়িতে থাকে। জীবনের কোনো উদ্দেশ্যকে সামনাসামনি দেখতে না পেয়ে নিজেকে রীতিনীতি, আচার ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেয়। সংস্কৃতিকে সে শিরোধার্য বলে মনে করে। সে আদৌ চিন্তা করে না তার তাৎক্ষণিক অবস্থান, নিজেকে কেমনভাবে চলতে হবে, নিজেকে কতটা পরিবর্তন করতে হবে এইসকল বিষয় সে কিছুই বুঝতে পারে না এই সমাজের গহ্বরে থেকে। নিজেকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে সেটি তার বোধগম্যের আয়ত্তেও নেই। প্রমথের আগমনে সে নিজের কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চায় সমাজের থেকে। সে ভাবনাচিন্তা করে, মনে হয় এমনভাবে রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকলে, জীবন আপনা-আপনি ঘড়ির কাঁটার মতোই সামনের দিকে এগোবে। গল্পে লেখক দেখিয়েছেন—"আশা মাথায় কাপড় তুলে কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়।"[১]

সেই সময়ের রীতি-নীতি ছিল যে, যখন কোনো বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ সন্নিকটে আসেন তখন সেই পরিবারের সকল মহিলাদের মুখকে ঢেকে রাখা দরকার শাড়ির আঁচল দিয়ে, যেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্নিহিতভাবে প্রকাশ করেছেন এই গল্পে।

সৃষ্টির সেই প্রথম থেকে চলে আসছে মায়ের সঙ্গে সন্তানের নিবিড় প্রেম। একটি মেয়ের মধ্যে তার যাবতীয় গুণ যেমন চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, দায়িত্ববোধ, আরও যাবতীয় গুণাবলী যত থাকে, সেই একই মেয়ে যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সন্তানের জননী হয় তখন তার মধ্যে যেকোনো কষ্ট, বাধা, দুঃখ সমস্তকিছুই সহ্য করার ক্ষমতা লক্ষাধিক গুণ বেড়ে যায়। এমনকি বলা যায়, ভগবানের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তার মধ্যে তৈরি হয়, শুধুমাত্র তার পরিবারের জন্য। এইগল্পে একইভাবে মল্লিকাও শত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে উল্লেখিত মল্লিকা ও প্রমথের কথোপকথন সম্পর্কে বলা হয়েছে—"মল্লিকা আজ কথা বাড়ায় না, সোজাসুজি বলে, 'কই, আমাগো লেইগো কিছু তো করলেন না? আপনাগো ভরসায় আছি।"

প্রমথ বলে, "আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। ক'জনের জন্য ব্যবস্থা করব? আপনারা নিজেরা যদি একটু গা-ঝাড়া না দিয়ে উঠেন, সচেষ্ট না হন—"

মল্লিকা বলে, "গা-ঝাড়া দিমু? চেষ্টা করুম? ফল যদি ভালো হয় অখন খাড়াইয়া উলঙ্গা হইয়া গা-ঝাড়া দিতেছি। নাইচা-কুঁইদা হাত-পা ছুইড়া চেষ্টা করতেছি। আর কি করনের আছে কন?"[২] এই কথোপকথনের মধ্যে বোঝা যায় যে, একজন মা তার পরিবারের জন্য কতকিছু না করতে পারে। সব দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে যেমন তার মনের কোটরে ঠাঁই করে নেন, তেমনভাবে সবকিছুকে বিসর্জনও দিতে পারেন। লেখকের ভাষায়—

> বেশ, কাম করুম, যে কাম জুটাইয়া দিবেন তাই করুম। উলঙ্গা হইয়া নাচার কাম দ্যান, উলঙ্গা হইয়া নাচুম। কিন্তু মাথা গুইজা থাকলে থাকনের লেইগা একখান ঘর দিবেন তো আগে একখানা

ঘিরা ঘর আর এট্টা দুধ, খাওয়ার না পাইলে পোলাটা মইরা যাইব গা।[৩]

যাইহোক সমাজের এমন বর্বর, কৃপণ, দুর্বোধ, ছদ্মবেশী ভদ্র সমাজের মানুষ সমাজকে এমনভাবে কলুষিত করে রেখেছে সরাসরিভাবে তা বোঝা যায় না, চিন্তাধারাগুলিকে প্রচ্ছন্নভাবে ত্রিনেত্র দিয়ে দেখতে হয় অর্থাৎ মনচক্ষু। এই দুস্থ সমাজের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আফ্রিকা' কবিতার কথা বলতে হয়—"নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।"[৪]

এইসকল বিষয়গুলি মল্লিকার জীবন চরিত্রে স্পষ্টভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিলক্ষিত করেছেন। একজন মেয়ে শুধু সে বিবাহ করে নিলে তার মনের অবস্থা একজন মায়ের মতো তৈরি হয় না, জননী না হওয়া পর্যন্ত। যেটি আশার জীবনচরিত্রে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আশা বিবাহ করার পরেও তার মধ্যে মাতৃত্ববোধ তৈরি হয়নি। এমনকি তার স্বামীও নেই, সন্তানও নেই। তাই তার মধ্যে পরিবারকে নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা নেই। এখন সে বেশি সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। তার নিজের পরিবার বলতে সে নিজেকেই জানে। মল্লিকার পরিবারকে নিজস্ব বলে সে ভাবে না। তার মাথাব্যথা হল সম্মানহানিকে নিয়ে। সে মল্লিকার মতো প্রমথের কথায় অপরের হাতে নিজের ইজ্জতকে এত সহজে বিক্রি করে দিতে চায়নি। তার মধ্যে কর্তব্যবোধের থেকে সম্মানবোধ বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। যদি আশার স্বামী বা সন্তান, বিশেষ করে সন্তানও যদি থাকত তাহলে এই সমাজের মধ্যে ঘোমটা দেওয়া, লজ্জা, সম্মান সবকিছুই সে বিসর্জন দিয়ে দিত। যার জন্য আশার মধ্যে স্বার্থপরতা বা বিবেকহীনতাবোধ জাগ্রত হয়েছে।

গল্পে প্রমথ যখন মল্লিকাকে কাজের অনুসন্ধানের পথ দেখায় সে পথ ছিল বড়োই দুর্গম। মল্লিকা আশার কাছে তার পরিবারের প্রাণ রক্ষার জন্য ভীষণ কাকুতি-মিনতি করে কিন্তু আশা খুব রেগে যায় এবং চিন্তা করে সে খুবই চরম অপমানিতবোধ করে এবং মুখের ওপর সরাসরি অস্বীকার করে। লেখকের লেখনীতে তা ধরা পড়েছে—"আশা শিউরে উঠে বলে, আমি পারুম না মইরা গেলেও পারুম না।"[৫]

একথা ঠিক যে আশার প্রাণরক্ষার জন্য নিজেকে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজতে হত। কিন্তু সে যেতে চায়নি। সবার কথা মাথায় রেখে মল্লিকা আশার রক্তের সম্পর্ক না হয়েও অন্ন সংস্থান জুটিয়েছে। স্বার্থপরতার পথকে অজুহাত দেখায়নি মল্লিকা, আশার উপর। বলাবাহুল্য নিজের ইজ্জতকে বাজারে টাকার দামে বিক্রি করা, একজন মা-ই পারে, যেটা মল্লিকা করেছে। এমনকী অফিসার যখন প্রমথের কাজের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করলেও মল্লিকা চোখ-মুখ-কান ("কিন্তু মল্লিকার প্রশ্ন তার কানে যায় না"[৬]) নাক বন্ধ করে সে বেশ্যা প্রবৃত্তির পথকেই বেছে নিয়েছে। সবকিছু জেনেও সেগুলোকে সাম্মানিক কাজ বলে প্রতিউত্তর দিয়েছে অফিসারের কাছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার অন্নসংস্থান এবং সম্মান। দুটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অন্নসংস্থান। একজন মানুষ যদি বেঁচেই না থাকে, তাহলে সম্মান সঞ্চয় করা কোনো কাজে আসবে না। আগে তো সে বেঁচে থাকুক, তার জন্য দু'মুঠো অন্ন, আর এই অন্ন জোগাড় করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সেই সময় মল্লিকার আর কোনো পথ ছিল না, তাই সে কাজটিকে বেছে নিয়েছে।

গল্পের শুরুর দিকে মল্লিকার পরিবারের বাসস্থান সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। খুব সীমিত জায়গায় চারটি প্রাণী থাকে—মল্লিকা, ভূষণ, খোকন ও তার ননদ আশা। শুধু মানুষ নয় গৃহ সরঞ্জামও রয়েছে, যেমন টিনের তোরঙ্গ, কাঁথা, বালিশ, ঘটিবাটি এইসবই। একটি লাইনের

মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হয়—"একখানা চাটাই জায়গা জুড়তে পারে ঠিক ততটাই ছিল মল্লিকার ঠাঁই।"[৭] যাইহোক অবস্থানের কথা চিন্তা করেছে মল্লিকা, আশা নয়। মল্লিকার মতে জীবন চলার প্রথম শর্ত ছিল পরিবারের সকলেই যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে—"মল্লিকার প্রথম শর্ত ছিল মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই সকলের জন্য।"[৮]

সবাই যেন সুচারুভাবে দিন কাটাতে পারে। মল্লিকার মধ্যে এইসকল সদর্থক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু আশার চরিত্রের মধ্যে অপরের দায়িত্ব তো দূরের কথা নিজেরও কোনো চৈতন্যের উদয় হয়নি। কারণ একমাত্র মল্লিকাই বলেছে নতুন ঠাঁই খোঁজার, আশা কিন্তু ভাবনাচিন্তাই করেনি।

প্রমথ যখন আসে মল্লিকার বাড়ি কাজের প্রস্তাব নিয়ে তখন সে কিন্তু কাজে এগোয়নি। যাওয়ার আগে সে আশার কাছে প্রথমে আর্জি করে, আশা যেন কাজে যায় এবং তার পরিবারকে রক্ষা করে। মল্লিকা নিজ মুখে প্রমথের শর্তে রাজি হয়ে নিজে না গিয়ে আশাকে পাঠাতে চায়। এখানেও মল্লিকার মধ্যে পিছুটান কাজ করেছে তার পরিবারকে নিয়ে। গল্পে সে এই নতুন যুগের নতুন নারী হওয়ার চেষ্টা করলেও তার মধ্যে চিন্তাভাবনার দূরত্ব দেখা গেছে আশার মতো। তাই মল্লিকা ও আশার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও মল্লিকাও আশার মতোই তার পরিবারের জন্য অনেকাংশই স্বার্থপর ভাবনাচিন্তা করেছিল। তাই দু'জনকে একেবারে খাঁটি বলা যায় না, যে শুধু মল্লিকাই ভালো। একটা সময় আশার মতো মল্লিকারও একই চিন্তাভাবনা এসেছিল তাই দু'জনের চরিত্রের ক্ষেত্রে মিল—অমিল খুঁজে পাওয়া গেলেও একসময় উভয়ের চরিত্র এক হয়ে গেছে কিছুটা হলেও। গল্পে উল্লেখিত লাইনে বিষয়টি স্পষ্ট—

> মল্লিকা আশাকে বলে, 'ঠাকুরঝি, তোমার নি শুধু পরকাল। তুমিই কামে যাও—আমাগো বাঁচাও।'...'বুইঝ্যা দ্যাখো ঠাকুরঝি। আমাগো তিনটা প্রাণীরে বাঁচাইবা—তোমার কোন কলঙ্ক নাই, পাপ নাই।'[৯]

প্রমথের কাজের প্রস্তাবে আশা রাজি না হলেও মল্লিকা রাজি হয়। তার পরিবর্তে প্রমথ আগাম মল্লিকার সন্তানের জন্য দুধের যোগান ও একটি বাড়ির ব্যবস্থা করেন। এই বাড়িতে আসার পর আশার মনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। সেই বাড়িতে আসার কিছুদিন পর মনের মধ্যে যেন পরিবারকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন জেগে ওঠে আশার। সে চিন্তা করে যে তার বৌদির জন্য, পরিবারের জন্য তাকেও সেই কাজে যেতে হবে কারণ সমাজের এই অস্থিরতার পরিবেশ তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করেছিল। সবকিছু ভাবনাচিন্তা করে সে সিদ্ধান্ত নেয় তার বৌদি মল্লিকাকে সাহায্য করবে। লেখকের লেখনীতে দেখা যায়—"এ বাড়িতে আসার পর আশার মধ্যে একটি অস্থিরতা দেখা যাচ্ছিল। ভীরু নিরীহ মানুষ দোটানায় পড়ে যেমন ছটফট করে। আশা হঠাৎ বলে, বৌ, তুই দুগা ভাত রাঁধ, আমি যাই।"[১০]

উপরি উল্লিখিত লাইনগুলির মাধ্যমে আশার সেই পুরনো সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণাকে পেছনে রেখে নতুন সমাজের রূপচিত্রকে পরিবর্তন করার চিন্তাভাবনা নিয়েছে। সেজন্যই, মল্লিকাকে ভাত রান্না করার কথা বলে এবং আশা নিজেই প্রমথের কাজে যাওয়ার জন্য রাজি হয়। মল্লিকা প্রমথের প্রস্তাবে একটি নতুন বাড়িসহ অন্ন সংস্থান পায়—

> ট্যাক্সি নিয়ে রামলোচন এসেছে। সঙ্গে এনেছে কিছু চাল, ডাল, মাছ, তরকারি। ... তুমি যাইবা ঠাকুরঝি? তুমি কাম করবা? নিরুপায় আমাগো প্রাণ দিবা—আমি তোমারে পূজা করুম। রামলোচন জানায়, না, আশা গেলে হবে না। প্রমথ মল্লিকাকেই যেতে বলেছে।[১১]

এই লাইনের মাধ্যমে মল্লিকা ও আশার চরিত্রের ভিন্ন রূপ দেখা যায়। মল্লিকার মধ্যে এমন বিশেষ গুণ, কর্ম, দক্ষতা রয়েছে নিশ্চয়ই, তা না হলে প্রমথ কেন বিশেষত মল্লিকাকেই যেতে বলেছে। মল্লিকার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে বলা যায় যে—"মল্লিকা একটু নড়লে চড়লে প্রমথের মনে হয় উপোস দিয়ে রোগা একটি বাঘিনী যেন মেয়ে মানুষের রূপ ধরেছে।"[১২]

মল্লিকার মধ্যে ভিন্ন আকর্ষণ ও তেজ ছিল, যেটা সমাজের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। অন্যদিকে আশার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে বলা যায়, আশা ছিল ভীরু ও নিরীহ মানুষ যেটা গল্পে দেখা যায়। সমাজের মানুষ বলতে গেলে প্রমথ আশাকে নিয়ে যেতে বারণ করেছে কারণ তার মনের মধ্যে নিরীহ গুণগুলি দেখা গেছে।

সর্বোপরি মল্লিকা ও আশার চরিত্রে অনেক অমিল খুঁজে পাওয়া গেলেও একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যখন মল্লিকা প্রমথের কাজের প্রস্তাবে রাজি হয় এবং নিজের ও ননদের কাজের কথা দাবি করে তখন প্রমথ খুশি হয় অনেকটাই—"দুটি শিকার পাবার আশায় প্রমথ খুশি হয়ে বলে, 'তা দিতে পারি।'"[১৩] এখানেই প্রমথ তাদের চরিত্রকে বুঝিয়েছে যে সমাজের কাছে দু'জনই শিকারি।

পরিশেষে বলা যায় যে, মল্লিকা ও আশার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেশিরভাগই অমিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে মল্লিকার মধ্যেও সমাজের এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি একটা সময়ে। তাই সে আশাকে দেহব্যবসার কাজে যাওয়ার জন্য আর্জি করেছিল। কিন্তু একথা আশা অস্বীকার করলেও, সমাজের এই পরিবেশে নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে সে পরিবারকে বাঁচানোর কথা ভেবেছে। যেটা দু'জনই এই পরিবেশের একই অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের পরিবারকে রক্ষা করার পণ নিয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষোড়ষ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৪১
২. তদেব : পৃ. ৩৪২
৩. তদেব : পৃ. ৩৪৩
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আফ্রিকা', সাহিত্য সঞ্চয়ন, দশম শ্রেণি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পৃ. ৩৭
৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষোড়ষ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৪৪
৬. তদেব : পৃ. ৩৪৪
৭. তদেব : পৃ. ৩৪১
৮. তদেব : পৃ. ৩৪৫
৯. তদেব : পৃ. ৩৪৪
১০. তদেব : পৃ. ৩৪৭
১১. তদেব : পৃ. ৩৪৭
১২. তদেব : পৃ. ৩৪৭
১৩. তদেব : পৃ. ৩৪৩

‘দুঃশাসন’ : এক কলঙ্কিত পুরাণকথার পুনরাবৃত্তি

সুব্রত চক্রবর্তী

মনোবিদ্যা একটি মানসিক ব্যাধির কথা বলে যার নাম ‘লাইক্যানথ্রোপি’ (Lycanthropy)। গ্রিক ‘লাইকোস’ (lykos) ‘নেকড়ে’, ‘অ্যানথ্রোপ্স’ (anthropos) (মানুষ)। এই রোগাক্রান্ত মানুষ বিশ্বাস করেন যে, তিনি একটি নেকড়ে বা অন্য কোনো অমানবিক প্রাণী। সাধারণত দেখা যায় এই অস্বাভাবিক চিন্তাচ্ছন্ন ব্যক্তি সর্বাধিক বিপজ্জনক পশুটির রূপ কল্পনা করে থাকেন। বিভিন্ন দেশে এই কল্পিত পশুর তারতম্য ঘটতে দেখা যায় (যেমন ইউরোপে ও উ: এশিয়ায় নেকড়ে কিংবা ভল্লুক; আফ্রিকায় হায়না বা চিতা; ভারত-চিন-জাপানসহ এশিয়ার বিস্তৃত অংশে বাঘ ইত্যাদি)। বিভিন্ন প্রাচীন লোকবিশ্বাস, লোককথা, কিংবদন্তীর হাত ধরে সেই কোনো ধূসর প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এই মনোবিভ্রম মানব-সমাজে প্রবাহিত হয়ে আসছে। মনোবিজ্ঞানের ‘লাইক্যানথ্রোপি’ একটি ভ্রান্তবিশ্বাসমূলক মনোবিকলন, কিন্তু মানব-সভ্যতার ইতিহাসের সহস্রাব্দিক যাত্রাপথ রক্তাক্ত করেছে বাহ্যত মানুষ, অথচ অন্তরে পশুত্বের অধিকারী এক ধরনের প্রকৃত লাইক্যানথ্রোপ। পার্থক্য শুধু একটাই, ক্লিনিক্যাল লাইক্যানথ্রোপদের ক্ষেত্রে মানস-রুগ্নতা কেবলমাত্র ভাবনার স্তরে সীমাবদ্ধ, বিশ্বসংসার সেই নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় না। অপরপক্ষে প্রকৃত লাইক্যানথ্রোপদের চেতনার স্তরেই তা গণ্ডীবদ্ধ না থেকে বাস্তব জনজীবনে তার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে অহরহ। সীমাতীত লোভ-লালসা-স্বার্থপরতার সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে এরা যুগ যুগ ধরে স্থান করে নিয়েছে সভ্যতার রক্তাক্ত ইতিহাসে। বিশ্বসাহিত্য এইসব প্রকৃত লাইক্যানথ্রোপদের মানস-দূষণের ছবি তুলে ধরেছে উন্মেষপর্ব থেকেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এরকমই এক লাইক্যানথ্রোপ মহাভারতের দুঃশাসন। মহাভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে একালের ভোগসর্বস্ব জগতে তার আত্মপ্রকাশ রূপে-রূপান্তরে। আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘দুঃশাসন’ গল্পে সেই রূপান্তরিত দুঃশাসনের বিশ শতকীয় চিত্র নিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। বন্ধুবর সন্তোষ

গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত গল্পগ্রন্থ 'দুঃশাসন' (১৯৫২/আশ্বিন) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় গল্পসংকলন। এই সংকলনের ন'টি গল্পের প্রথম গল্প 'দুঃশাসন'। গল্পের শুরুতেই গল্পকার একটি স্থানুরূপ (times) লোকপ্রকরণ ব্যবহার কারলেন 'তীর্থের কাক'। শরণাগত মানুষটির অসহায় ব্যাকুলতা ও স্বার্থগৃধ্নু দেবীদাসের প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের এ এক মোক্ষম লক্ষ্যভেদ। অব্যবহিত পরেই আমরা গল্পের মুখ্যচরিত্র দেবীদাসের 'Deist'-সত্তার প্রথম পরিচয় পেলাম। শরণাগত মানুষ প্রায় 'হাউ হাউ' করে কেঁদে ফেললে চতুর মুখোশী মানুষের কৃত্রিম সহানুভূতির শান্তিজল ছিটিয়ে 'Deist' সাজা ছাড়া আর কোন পথ থাকেও না। একটা কাপড়ের ব্যবস্থার অনুনয় তাকে 'অন্যমনস্ক' সাজতে বাধ্য করেছে। আর সেই ভাবের সার্থক অনুভাব হিসাবে এসেছে কলম কামড়ে ধরা, খোলা জানালা দিয়ে বহির্বিশ্বে উদার দৃষ্টিসম্পাত ইত্যাদি। লেখক ছোট্ট বঞ্জনাময় বর্ণনা দিয়েছেন—"ছোট নদীর খেয়া পার হয়েই ধুলোয় ভরা পৃথিবী হারিয়েছে ধূ ধূ করা দিকচিহ্নহীন মাঠের ভেতর, প্রখর সূর্যের আলোয় নিজেকে মেলে দিয়েছে নগ্ন অনাবৃত পৃথিবী।"[১]

ঔপনিষদিক বসুধামাতা কিংবা প্রাচীন গ্রিক পুরাণের 'গায়া' (time) এবং জেমসলাভলকও লীন মারগুলিসের গায়া হাইপোথিসিসের (Gaia Hypothesis or Gaia Principle or Gaia Theory) বাইরে অন্যভাবে দেখলে আমরা দেখতে পাব লেখক অসাধারণ প্রতীকধর্মী করে এই বর্ণনাকে আখ্যান-কথনের সহায়ক করে তুলেছেন। 'ছোট নদী' অর্থাৎ প্রাণ-প্রবাহের ক্ষীণ ধারা। শূন্য মাঠের ভেতর ধুলোয় ভরা পথের হারিয়ে যাওয়া আসলে মাটিঘেঁষা জনজীবনের রিক্ততার মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়ার দ্যোতক। আর তারই অনিবার্য পরিণতি অনাবৃত 'নগ্ন' পৃথিবী, অর্থাৎ গৃহসম্মানের বেআব্রু পরিণতি। "নগ্ন অনাবৃত পৃথিবী"-এর 'নগ্ন' শব্দের প্রেক্ষিতে 'পৃথিবী' শব্দের বৈকল্পিক (paradigmatic) অবস্থানে 'কুললক্ষ্মী' বা 'নারী'-র মতো শব্দ পাঠকের মনে আসতে বাধ্য। অন্তত একজোড়া কাপড়ের আবেদন শুনেই দেবীদাস সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (conditioned reflex) বশবর্তী হয়ে যুগপৎ সচকিত ও সতর্ক হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে 'Deist' দেবীদাস জেগে উঠেছে। সক্রেটিক আইরনির (Socratic Irony) মতো করে শুরু হল দেবীদাসের অভিনয়—"কাপড় পাওয়া যাবে কোথায় চালান নেই। সব সাফ করে বসে আছি। ব্যবসা-বাণিজ্য গেল লোকেরও দুর্গতির একশেষ।"[২] দেবীদাসের অশ্রু যে আসলে কুম্ভীরাশ্রু তা সাধারণ মানুষেরও জানতে বাকি নেই। তাই সীমাতীত অসহায়ত্বের কারণে সে হাল ছাড়ে নি। নাছোড়বান্দা লোকটা দেবীদাসের পা আঁকড়ে ধরে। আর করুণা যাদের জীবনের নিত্য স্থায়ীভাব তাদের 'টপটপ' করে চোখের জল পড়ার মতো অনুভাব অনিবার্য ছিল। লেখক তা বিস্মৃত হন নি। গদী থেকে একজোড়া কাপড় বের হওয়াটা যে অতিসাধারণ ব্যাপার, তা লোকটা বিলক্ষণ জানত। তাই তার সবিস্ময় আকুল প্রশ্ন—"এক জোড়া কাপড়ও কী গদী থেকে বেরুবে না?"[৩] অসীম বিরক্তি দেবীদাসকে আদ্যন্ত গ্রাস করল। তবুও সে উত্তেজনা প্রশমিত করেছে। 'শির শির' করে শিউরে ওঠা শরীরে নিয়ন্ত্রণ রেখেই সে নিজের ভেতরকার 'Deist' দেবীদাসকে আসরে নামিয়েছে। গম্ভীর গলায় সে বলে—"কী করবি বল? সবই ভগবানের মার।"[৪]

ধর্মবিশ্বাসের ঘরে সুড়সুড়ি দিয়ে অস্থির মানুষকে শান্ত ও একান্ত অনুগত রাখার সনাতনী কৌশলটি এখানেও অনুসৃত হল। আবার যুদ্ধ-আকালকে কার্য-কারণ সম্পর্কে যুক্ত করেছে দেবীদাস। সেইসঙ্গে বস্ত্র সংকটকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সংকটের অন্যতম মুখ্য কারণ যে মুনাফালোভী কালোবাজারী মনোবৃত্তি তা দেবীদাস সুচতুরভাবে এড়িয়ে গেছে। সাংখ্যদর্শনের

সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ কার্যকে একান্তভাবে কারণের পরিণাম রূপে ঘোষণা করেছিল। দেবীদাস কার্যোল্লেখ সঠিক করলেও সচেতনভাবেই পূর্ণ কারণ নির্দেশ করেনি। বস্তুত দেবীদাসের বক্তব্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে বহুচর্চিত কার্য-কারণ মতবাদ (cause and effect theory)-র ব্যত্যয় ঘটেছে। ওয়ার্নার হেসেনবার্গ (Werner Heissenberg) আমাদের জানিয়েছিলেন 'uncertainty principle--এর কথা, যেখানে বলা হয়েছে কোন পরিমাপের যাথার্থ্যের উপর নির্ভর করে ফলাফলের যাথার্থ্য। একাধিক মানদণ্ড বিচারের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা বিশেষ সহায়ক। 'দুঃশাসন' গল্পে আমরা দেখলাম চতুর দেবীদাস বস্ত্রসংকটের একাধিক কারণের মধ্যে একটি মুখ্য কারণকে অনুল্লেখিত রেখেছে এবং কার্যের (বস্ত্রসংকট) প্রকৃত কারণের পরিপূর্ণ রূপটিকে সচেতনভাবে আড়াল করেছে। অবশ্য দেবীদাসের এই চাতুরী বুঝতে সাধারণ মানুষেরও কোনো অসুবিধা হয় না। তবুও তাদের কিছু করার থাকে না, তারা অসহায়। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে মানবতার বাণী যখন নীরবে নিভৃতে কেঁদে যায় তখন চোখের জলে বেদনার চালচিত্র এঁকে যাওয়া ছাড়া অসহায় মানুষের আর কোন উপায় থাকে না। 'লোকটা'ও তাই করেছে—"জলভরা চোখে লোকটা পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।"[৫]

চোখের বিশেষণ 'জলভরা'। 'লোকটা'কে বিশেষিত করতে গিয়ে লেখক 'জলভরা চোখ'কে প্রমুখিত করতে চেয়েছেন। তাই পূর্বস্থাপনা (preposing) ঘটানো হল। আর চোখ যখন মানুষকে পাথরের মূর্তির মতো করে তোলে, মানুষের যখন প্রতিকারের কোন সুযোগ থাকে না, তখন তার নিঃশব্দে প্রস্থান অবধারিত। তাই 'নিঃশব্দ' ক্রিয়াবিশেষণটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য লেখক পদটিকে প্রমুখিত করলেন। এক্ষেত্রে পরস্থাপনা (postposing)-র সহায়তা নেওয়া হল। 'জলভরা চোখ' ও 'নিঃশব্দ' প্রমুখিত হয়ে কখন যেন আপামর অসহায় নিপীড় মানুষের হতভাগ্য জীবনের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। একটিমাত্র বাক্যেই পাঠকের মনশ্চক্ষে সেই ভাগ্যহত জীবনের মর্মস্পর্শী ছবি ভেসে উঠল।

দেবীদাসের ভাইপো গৌরদাসের মধ্যে যে কিছুটা সংবেদনশীল নীতিবোধের পরিচয় মেলে তা আসলে সাপেক্ষ নৈতিকতা (conditioned morality)। কাকার 'অভিনয়' সে আদ্যন্ত দেখেছে জড়ভরতের মতো। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে মন বসিয়েছে, আসল সময়ে নীরব থেকেছে। আর লোকটা চলে যাওয়ার পর সে খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলেছে, বলা ভালো মনটাও তুলেছে। তার ঘুমন্ত বিবেক একটু যেন নড়ে উঠেছে, সানুনয়ে লোকটিকে একটি কাপড় দেওয়ার কথা বলতে চেয়েছে; কিন্তু তার বিবেববোধের প্রকাশ কীভাবে দেবীদাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা আরও একবার বোঝা গেল লেখকের টার্ন টেকিং (turn taking)-এর ব্যবহারের মাধ্যমে। টার্ন টেকিং-এর সাহায্যে দেবীদাস গৌরদাসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খারিজ করেছে—

> (গৌরদাস) ওকে অন্তত একখানা—
>
> (দেবীদাস) ক্ষেপেছিস তুই? দেবীদাস ভ্রুভঙ্গী করলে, ওকে একখানা দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই দোরগোড়ায় উল্টোচণ্ডীর মেলা বসে যেতো না ও ব্যাটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তো আর বেশী নেবার উপায় নেই।[৬]

'ভ্রুভঙ্গী' এই অনুভঙ্গির (micro-gesture) দেবীদাসের মনোভাবকে আরও স্পষ্টতা দিল। আর কাকার অনুগ্রহে প্রতিপালিত গৌরদাসের বিবেকের জাগরণ যে একান্তভাবেই কাকার ইচ্ছাধীন, লেখকের এই বাকবিন্যাসের মধ্য দিয়ে তা আরও একবার পাঠকের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল।

এই সাপেক্ষ নৈতিকতার বশবর্তী হয়েই সে দেবীদাসের বক্তব্য সমর্থন করেছে এবং নির্বিকার ঔদাসীন্যে গা ভাসিয়েছে—"তা বটে! গৌরদাস আবার খবরের কাগজে মন দিলে।"[৭]

লেখক এই গল্পে আরও একবার নিসর্গ প্রকৃতিকে নিয়ে এলেন। এখানেও প্রকৃতি-চিত্রণ জনজীবনকে প্রতিফলিত করার অব্যর্থ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। শ্রীহীন পাণ্ডুরতা পৃথিবীর সব শ্যামলতাকে নিঃশেষ করেছে। জ্বলন্ত আকাশের তলা দিয়ে তৃষ্ণাতুর 'সামকল' পাখির ঝাঁক উড়ে যায় সুদূরে জলের তথা প্রাণের সন্ধানে। 'ধুলোর ঘূর্ণী' আসলে জীবন-সংকটের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত। সামকল পাখির ঝাঁকের স্থানত্যাগ প্রাণের তাগিদে। মানুষেরও একই অবস্থা। আর প্রাণস্পর্শহীন স্থান তো শ্মশান। এই রিক্ততার বিপ্রতীপে লেখক দেবীদাসের কোঠাবাড়ি ও থানার লাল রঙের বাড়ির জৌলুস তুলে ধরেছেন। আলো-অন্ধকারের এই বৈপরীত্যময় সহচিত্রণে উভয়ই মোটাদাগে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

স্বার্থসর্বস্ব ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি গৌরদাস তখনও সম্পূর্ণত আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি। তাই তার ভেতরকার 'রক্তকরবী' এই নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক লোভ-জঞ্জাল ভেদ করে মাঝে মাঝে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই—"সভয়ে একবার দেবীদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললে, 'কিন্তু এভাবে চলবে কদিন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে?'"[৮] এ কথায় দেবীদাসের প্রতিক্রিয়া লেখক অনুভঙ্গির সহায়তায় অসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন—"দুচোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে গেল দেবীদাসের। কোনো কারণ নেই হঠাৎ দপ দপ করে উঠল চোখের তারা দুটো। বাইরে জ্বলন্ত পৃথিবী থেকে খানিকটা জ্বালা কি প্রতিফলিত হয়ে পড়ল।"[৯]

'কি' প্রশ্নবোধক অব্যয়টি এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করছে না, কেননা লেখক শেষে পূর্ণ ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। 'দপ' শব্দের ধ্বন্যাত্মক ব্যবহারে তারার বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হল। তারার নিজস্ব জ্বলন রয়েছে। অর্থাৎ দেবীদাসের এই জ্বলন সত্য। এটা তার 'মেকি অভিনয়' নয়। স্বার্থান্ধ মানুষেরা বিন্দুমাত্র স্বার্থচ্যুতির সম্ভাবনায় এমনভাবেই জ্বলে ওঠে। ভেতরকার অস্বস্তি চেপে রেখে স্থির গলায় দেবীদাস যখন বলে—"কী করতে হবে?" তখন পাঠকের পাশাপাশি গৌরদাসও বুঝে যায় দেবীদাসের আসল প্রতিক্রিয়াটি। তাই আর কথা না বাড়িয়ে গৌরদাস নিজেকে আবার ঔদাসীন্যে মুড়ে ফেলতে চায় খবরের কাগজের মাধ্যমে। সাবানের বিজ্ঞাপনে মন দেয় সে। কিন্তু সেই মনোযোগও বিঘ্নিত হয়েছে থানার এল.সি কানাই দে যখন মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে। কানাই দে-র আবির্ভাব-মুহূর্তের বর্ণনায় লেখক পরোক্ষ টার্ণ টেকিং ব্যবহারের মাধ্যমেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

> (গৌরদাস) স্বনামধন্য অভিনেত্রী চঞ্চলা দেবী বলেন
> ঝনাৎ করে নিচে একখানা সাইকেল আছড়ে পড়ল।[১০]

'ঝনাৎ করে' 'আছড়ে' পড়ার মধ্যে দিয়ে একটি দম্ভিত আস্ফালনের ইঙ্গিত মেলে এবং সেই ইঙ্গিত কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। কৃপণ সময় দেবীদাসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। অসহায় মানুষ তার কাছে আছে ধীরে, সন্দর্পনে, সলজ্জ কুণ্ঠায় ও সকাতর অনুনয়ে তিন বছর আগের পরিস্থিতি এখন পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু অন্যায়কারীর দুর্বলতম স্থানটির সন্ধান থাকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন দুরাত্মার নখদর্পণে এবং সে সেই সুযোগ সহজেই গ্রহণ করার চেষ্টা করে। আর পুলিশ-প্রশাসন আপাদমস্তক জনবিরোধী দুর্নীতিলালিত হয়ে উঠলে এই হিসেবটি তাদের ভালো করেই জানা থাকে। গল্পের ক্রমঅগ্রগতিতে আমরা দেখব থানার এল.সি কানাই দে

এবং তস্যগুরু দরোগা শচীকান্ত সেই চেনা ছকেই হেঁটেছে। 'চোদ্দটাকা বেতনের' 'সাধারণ কন্সটেবল' কনাই দে জমাদার হয়ে ওঠার আশুসম্ভাবনায় কেবল আভিজাত্যবোধ অনুভব করে তা নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনে সে খোশমেজাজে 'সর্বসুখ' অনুভব করে। অপরাধ ও অপরাধীকে সম্বোধন করার জন্য পুলিশের বেশ কিছু 'কোড ল্যাঙ্গুয়েজ' থাকে। সেভাবেই দেবীদাসের প্রতি কানাই দে-র সদর্প জিজ্ঞাসা—"কি হে সরকার ফুলছ কেমন?"[১১]

তাকে (তাদেরকে) অভ্যর্থনা করার প্রয়োজন নেই, কেননা নিজ নিজ থানা-এলাকার সবকিছুতেই তার (তাদের) অবাধ অধিকার। 'লোকটার ধরনধারণ দেখলে পিত্তি চড়ে যায় দেবীদাসের'। লেখক এখানে 'দেবীদাসের' পদটির পরস্থাপনা করলেন। ফলে বোঝা গেল এই 'পিত্তি চড়ে' যাওয়াটা শুধু দেবীদাসের একার নয়, এটা আপামর জনসাধারণেরও। দেবীদাস কিন্তু কোন ক্ষোভ প্রকাশ করল না। স্বার্থবুদ্ধি তাকে সংযত রেখেছে, বরং আর এক প্রস্থ অভিনয় করে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়। পঞ্চাশটি টাকা চাঁদা নিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় অন্যমনস্কতার ভান করে কানাই দে সিগারেটের প্যাকেটটা নিজের পকেটে ভরে নিতে ভোলে না। অহেতুক চাঁদার জুলুমে দেবীদাস ক্ষুন্ন। গল্পে তৃতীয়বার লেখক প্রকৃতি-চিত্রণ করলেন। তবে এবার একটু অন্যভাবে। পূর্বের দুটি ক্ষেত্রে নিসর্গ-প্রকৃতি ও সাধারণ জনজীবন-প্রকৃতি সমরূপী হয়ে দেখা দিয়েছিল। আর এখানে তা দেবীদাসের মনঃপ্রকৃতি উদ্ঘাটনের সহায়ক হয়েছে। লাল টকটকে থানা বাড়ির যে বিশেষণ লেখক দিয়েছেন তাও অন্যবদ্য—"নিঃস্প্রাণ মাটির ফাটা বুকের ভেতর থেকে তার হৃৎপিণ্ডের মতো যেন বেরিয়ে এসেছে একটা রক্তজবা।"[১২] লালবাড়ি-প্রসঙ্গ দেবীদাসের মধ্যে সাময়িক পরিবর্তন আনল। গৌরদাসকে সে বলল—"জানিস, কেন এত রাঙা হয়েছে রক্তে।"[১৩]

সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তরে 'বটে' বলে গৌরদাসের বাচনিক সংজ্ঞাপন (verbal communication) থামলেও অবাচনিক (non-verbal) স্তরে আমরা দেখি গৌরদাস দেবীদাস চরিত্রের 'হ্যালো এফেক্ট' (Hello effect) আবিষ্কার করেছে। রসহীন অর্থগুণ দেবীদাসের সরস সবাক রূপ গৌরদাসকে বিস্মিত করেছে। আবার দেবীদাস চরিত্রের 'হ্যালো এফেক্ট' কাটতে না কাটতেই দেবীদাসের সাদাবাটিটার সঙ্গে মানুষের হাড়ের তুলনা গৌরদাসের মনে এসেছে, কিন্তু তা সে প্রকাশ করতে পারেনি সেই সাপেক্ষ নৈতিকতার শিকার হয়ে। তাই রক্ত প্রসঙ্গে ছোট্ট 'হু' দেয়েই সে আবার আপাত হতাশার রাজ্যে ডুব দিল। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ (Ethical Relativism) আমাদের বলে কোন কাজের নৈতিক মান নির্দিষ্ট করার জন্য কোনো সর্বজনীন নিয়ম নেই। কিন্তু গৌরদাসের এই সাপেক্ষ নৈতিকতা প্রসঙ্গে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের নৈতিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট কতটা নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেখা যায়, লেখক আলো-অন্ধকার, পূর্ণতা-রিক্ততার বৈপরীত্যময় যুগপৎ সহাবস্থানকেই সুকৌশলে তুলে ধরেছেন। যাত্রার আসরের ডে-লাইট আলো বহুদূর থেকেও বোঝা যায়। আর তার বিপরীতে একটু আলোর অভাবে মুচি পাড়ার মা অন্ধকারের হাত থেকে ছেলেকে রক্ষা করতে পারে না। এই বৈপরীত্য যেখানে সত্য সেখানে গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার 'কমিউটেটিভ ল' (Commutative Law) ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর তাই যুগ যুগ ধরে অসাম্যদীর্ণ মানব-সমাজে আলোর বিপরীতে অন্ধকারের নির্মম পদচারণা সত্যতা পায়।

যাত্রার আসরের চারপাশে দাঁড়ানো 'কালো কালো' ছায়ার মতো মানুষগুলোর চোখ আলোর তীব্রতায় ধাঁধিয়ে ওঠে। আলোর বন্যায় কেবল ওদের অন্ধকার দেহই নয়, ওদের অন্ধকারে ঢাকা

জীবনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে সভ্যতার, ভদ্রতার স্বঘোষিত ধ্বজাধারী চালক ও রক্ষকদের মুখোশ। গৌরদাসের জবানীতে লেখক বলেন—"শরীর দেহ ছাড়িয়ে লোকগুলো যেন অশরীরী হওয়ার চেষ্টা করছে সর্বাঙ্গ থেকে ঠিক্রে পড়েছে আত্মিক একটা জ্যোতির্ময়তা।"[১৪] এই 'আত্মিক' 'জ্যোতির্ময়তা'কে নিঃস্ব মানুষের তন্ত্রসাধকোচিত দেহসাধনালব্ধ শূন্যতার পথে যাত্রা বলে ভাবলে সম্পূর্ণ ভুল হবে। এই জ্যোতির্ময়তাই আসলে মহাকালের পথ-পরিক্রমায় কমিউনিজমের জন্ম দেয়। আর হেনরি সিডউইকের 'হেডোনিস্টিক প্যারাডক্স' (The Hedonistic Paradox) যে সুখসর্গের কথা আমাদের জানায় তা হেলাভরে প্রাপনীয় নয়, তা অর্জন করে নিতে হয়। নিঃস্ব মানুষের অসহায়ত্ব তাদেরকে সেই যুগ-পরিবর্তনের রথের রশি ধরতে বাধ্য করবেই।

এই গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল শচীকান্ত দারোগা। যাত্রার আসরের মূল উদ্যোক্তা সে। অবশ্য একাজে তাকে বেশি বেগ পেতে হয় না চেয়ারের অপব্যবহার করে সমস্ত ব্যয়ভার অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তার কোন সমস্যা হয় না। বিশেষ করে দেবীদাসের মতো ছিদ্রময় চালুনি থাকলে তার স্বার্থ দিব্যি গলে যেতে পারে। উনিশ শতকের নব্যবাবুর ন্যায় সুসজ্জিত দারোগা হাব-ভাবে পাশ্চাত্যের ড্যাণ্ডিদেরকেও হার মানবে। অবশ্য যুদ্ধকালীন আকালের বাজারে তার আদ্দির পাঞ্জাবির বহরের আসল রহস্য দেবীদাসের খুব জানা।

যাত্রাপালা 'দুঃশাসনের রক্তপান'। ধীরে ধীরে দেবীদাস অভিনয়ে মুগ্ধ হতে শুরু করে। আর শচীকান্তের তো 'তন্ময়ীভবন' (generalization) ঘটে গিয়েছে। অবশ্য এই তন্ময়তায় সুরা ও নাট্যসুরের তুল্যমূল্য গুরুত্ব নিরূপণ করা অসম্ভব। 'বজ্রগর্জিত ঝড়ের আবেগে' ফ্ল্যাশব্যাকে দর্শক পৌঁছে গেল মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে দেড়শো টাকার বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দলের নটনটীদের অভিনয় নৈপুণ্যে। কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবিধানের জন্য কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্ষবিদীর্ণ হয়ে রক্ত উছলে ওঠে এই চিরচেনা পুরাণবৃত্তের সমান্তরালে লেখক গৌরদাসের অবচেতন ক্যানভাসে এঁকেছেন সমকালের রুক্ষ বাস্তবতার মর্মন্তুদ চালচিত্র। মহাভারতে দ্রৌপদীর দীপ্ত নারীমূর্তি ও তীক্ষ্ণ সতর্কতা—

> শোনো কেশব, শোনো ভীমসেন, শোনো ধনঞ্জয়!...দুঃশাসনের রক্তরঞ্জিত হাতে যদি বেণীবন্ধন না করতে পারি, তাহলে জেনে রেখো, সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যাবে।[১৫]

আর গৌরদাসের মনে হয়েছে—"সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে কে বলবে।"[১৬] মায়াবী অতীতচারী নিশি-জাগরণের পর ভোরের বাস্তব আলো ফুটেছে। ক্লান্ত দেবীদাস গৌরদাসকে নিয়ে ফিরছে নিজগৃহে, নিঃশব্দে। অভিনয় ও আহ্লাদনীয় আয়োজনে দেবীদাসের পঞ্চাশ টাকার শোক প্রশমিত হয়েছে। মুচি পাড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় 'লক্ষণ' মুচিকে ডাক দেয়। ঘাটের দিক থেকে জল নিয়ে আসা ষোড়শী মেয়েটি মানুষের গলা শুনে বিদ্যুৎবেগে মিলিয়ে যায়। আর তা দেখে দেবীদাস ও গৌরদাস দু'জনেই। গল্পের সূচনায় কেবলমাত্র দেবীদাসের মধ্যে আমরা যে অমানবিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Conditioned Reflex) প্রকাশ দেখেছিলাম, গল্পের শেষ পর্বে দুজনের মধ্যেই তার নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করলাম। লেখক লিখেছেন—"একসঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি, ছলছল করে উঠল রক্ত।" কেননা—"মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন।"[১৭] এখানে লেখক বৈকল্পিক গঠনের সাহায্যে অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই দৃষ্টান্তের প্রথম

বাক্যে দুটি অব্যবহিত উপাদান (Immediate Constituent) আছে, যথা—"একই সঙ্গে চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি/ছলছল করে উঠল রক্ত।"[১৮] মেয়েটির এই অবস্থা দেখে তাদের চমকিত হওয়াটা যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে মানবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের চোখ এরপরে অনিবার্যভাবে বেদনায় ছলছল করে উঠতে বাধ্য; কিন্তু তা হয় নি। কারণ দেবীদাস ও গৌরদাসের চোখের জল নয়, ছলছল করে উঠেছে তাদের 'রক্ত'। 'দৃষ্টি' চমকে ওঠার সঙ্গে চোখ 'ছলছল' করে উঠলে সেটাই মানবিক হত। কিন্তু তা না হয়ে 'চোখ'-এর বিকল্পে লেখক 'রক্ত' শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দেবীদাস ও গৌরদাস উভয়েরই পাশব প্রবৃত্তির জাগরণকে সংকেতিত করলেন। সাপেক্ষ নৈতিকতার শিকার কলেজে পড়া গৌরদাসের এই একটি ক্ষেত্রে দেবীদাসের সারিতেই ক্ষণিক অবনমন ঘটল।

ফরাসি-বিপ্লবের সময়কার (৫ মে, ১৭৮৯ নভেম্বর, ১৭৯৯) একটি জনপ্রিয় ব্যঙ্গচিত্রের শিরোনাম ছিল 'The Peasant weighed down by the nobility and the clergy'। এই ব্যঙ্গচিত্রে দেখানো হয়েছিল ঝুঁকে পড়া এক বৃদ্ধ কৃষকের পিঠের উপরে বসে রয়েছেন দু'জন অভিজাত ও জাজক। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে অসাম্য রয়েছে তা নির্দেশ করার জন্য এই ব্যঙ্গচিত্রের সৃষ্টি। আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গৌরদাসের চোখে যেন একটি আস্ত কাইমোগ্রাফ (Kymograph) যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছেন। সেই যন্ত্রে নিঃস্ব হতভাগ্য মানুষের অসহায়ত্বের শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক লেখচিত্রটি যেমন ধরা পড়েছে ঠিক তেমনি দেবীদাস-শচীকান্তরা কীভাবে সেই ঝুঁকে পড়া ভাগ্যহত মানুষগুলোর পিঠে চেপে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে তার অনবদ্য বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। রুশো তাঁর বিখ্যাত 'Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men' (১৭৫৫) বা 'Second Discourse' গ্রন্থে দু'ধরনের অসাম্যের কথা বলেছিলেন প্রাকৃতিক বা শারীরিক অসাম্য (Natural or Physical) এবং কৃত্রিম (Artificial) অসাম্য। এদের মধ্যে সামাজিক স্তরে সম্পদ, খ্যাতি, ক্ষমতা, ব্যক্তিগত মেধা ইত্যাদির কারণে যে অসাম্যের সৃষ্টি হয় তা কৃত্রিম অসাম্য। এক্ষেত্রে ক্ষমতালিপ্সা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। আর এই ক্ষমতাবুদ্ধিজনিত যে অসাম্য তার মূলে লিবিডোকে ভাবা যেতে পারে। অন্তত ফ্রয়েড-অনুগামী আলফ্রেড অ্যাডলারের ভাবনানুযায়ী এমনটা ভাবাই যায়। তিনি মনে করতেন 'লিবিডো' (Libido) আসলে ক্ষমতালাভের বাসনা। এই ক্ষমতালিপ্সা কৃত্রিম অসাম্যের অন্যতম প্রধান কারণ। 'দুঃশাসন' গল্পে লেখক এই কৃত্রিম অসাম্যেরই এক মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায় দ্রৌপদীকে 'বিক্ষিপ্তকেশে অর্ধস্খলিত বসনে' কৌরব রাজসভায় আনা হল। অপমানিতা ক্রোধান্বিতা দ্রৌপদী বললেন—

> এই কুরু বীরগণের মধ্যে আমাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর আর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই কুরু বৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে পাচ্ছেন না ধিক, ভরতবংশের ধর্ম আর চরিত্র নষ্ট হয়েছে।[১৯]

ভীষ্ম বললেন—"ভাগ্যবতী ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।"[২০] কেবলমাত্র দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ এই ঘটনা-পরম্পরার স্পষ্ট প্রতিবাদ করেছেন। সভাস্থ সকলের উদ্দেশ্যে বললেন—"পাঞ্চালী যা বললেন আপনারা তার উত্তর দিন, যদি সুবিচার না করেন তবে আমাদের সদ্য নরকগতি হবে।"[২১] সবাই নিরুত্তর। বিকর্ণ নিজের যুক্তিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে দ্রৌপদী বিজিতা নন। তার যুক্তি শুনে অনেকেই তার প্রশংসা করলেও ক্রুদ্ধ

কর্ণ তাকে তিরস্কৃত করলেন। বললেন—"এই সভার সদস্যরা যে কিছু বলছেন না তার কারণ এঁরা দ্রৌপদীকে বিজিত বলেই মনে করেন। বিকর্ণ, তুমি বালক হয়ে স্থবিরের ন্যায় কথা বলছ। নির্বোধ, তুমি ধর্ম কিছু জান না।"[২২] মহামতি বিদুর দ্যূতক্রিয়ায় প্রথম থেকে আপত্তি তুলে আসছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর কাতর প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছেন। ভীমের ক্রোধ দেখে বললেন—"ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহাবিপদ হবে তা জেনে রাখ।"[২৩]

অর্থাৎ মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীর অসহায় আর্তির মুহূর্তে পাশব-প্রবৃত্তির উপাসক দুর্যোধন-দুঃশাসন ছিল একটি দল। তাদের একান্ত সহায়ক কর্ণ প্রভৃতি দুর্বন্ধুরা আর একটি দল। নিস্পৃহ নীরব দর্শক ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রমুখ একটি দল। আর প্রতিবাদমুখর বিকর্ণের দল। সমস্যা হল এই চতুর্থ দলের মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং প্রথম দুই দলের চাপে ও তৃতীয় দলের নিশ্চেষ্টতায় এদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। মহাভারতীয় যুগের এই চার শ্রেণি আজও সমানভাবে রয়েছে। মহাভারতের দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা মরে না। দেবীদাসের মতো নানা রূপ ধারণ করে তারা যুগে যুগে পৃথিবীকে রিক্ত, বেআব্রু করে চলে। আর যুগান্তরের দুঃশাসনেরা সে সাহস ও সুযোগ পায় শচীকান্ত-কানাই দে-র মতো কর্ণদের যোগ্য সংগত ও গৌরদাসের মতো ভীষ্ম-বিদুরের প্রতিবাদ-বিমুখ নির্বাক উপস্থিতির কারণে। বিকর্ণের সোচ্চার প্রতিবাদ কালিক গণ্ডি অতিক্রম করে সব কালে পৌঁছাতে পারে না। ফলে দিনবদলের ভোরের আগমনী থমকে থাকে। 'দুঃশাসন' গল্পটি আসলে অমানবিকত্বের যুগান্তরের রূপটিকেই ধারণ করে রয়েছে। সেদিক দিয়ে গল্পের নামকরণ কালাতিক্রমী শিল্পসার্থকতা লাভ করেছে। মহাভারতে বিদুর দুর্যোধনের কৃতকর্মের যথোচিত ফলভোগের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। আর নিঃশব্দে রাস্তা চলতে চলতে গৌরদাসের মনে প্রশ্ন জেগেছে একালের দুর্যোধনদেরও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কিনা। ভারতীয় কর্মফলবাদের ন্যায় প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা গৌরদাসের মনে উঁকি দিয়েছে। বস্তুত ঔপনিষদিক ধারণায় 'তম' প্রকৃতি 'সত্ত্ব' প্রকৃতির মতোই স্বাভাবিক। দেবতা ও অসুরের ধারণা এরই প্রতিরূপ। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তির তুলনায় বলশালী হলে পাপকর্ম সংঘটিত হয়। বৃহদারণ্যকে ঋষি বলেন কাম-অকাম, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, ধৃতি-অধৃতি, সংকল্প, লজ্জা, ভয়, প্রজ্ঞা এসব, অর্থাৎ ভালো-মন্দ সবই মনের মধ্যে রয়েছে। মন্দের আধিক্য আসুরিক বুদ্ধির প্রকাশ, ভালোর আধিক্য দৈবভাবের উন্মেষ। আর উভয়ের সমতায় মনুষ্যত্ব।[২৪] আর ইন্দ্রিয়াতুরতার প্রাবল্যে যে পাপের জন্ম তার প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। পাপের গুরুতা-লঘুতা বিচার করে এবং জীবের সামর্থ্যের ন্যূনাধিক্য অনুযায়ী গুরু-লঘু নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধান। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই চিত্তশুদ্ধিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহাভারতেই বলা হয়েছে—

অদ্ভির্গাত্রানমলমিব তমাহ্যগ্নিভয়াদ্যথা।
দানেন তপসা চৈব সর্বপাপমপোহতি॥ (মহাভারত-১৩/১২৩/১৭)

'দুঃশাসন' গল্পের শেষ পর্বে গৌরদাসের মধ্যেই কেবল অনুশোচনার ক্ষীণরশ্মি দেখা গিয়েছে। বাকিরা পাশবপ্রবৃত্তিকেই আগলে রেখেছে। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাত জাগার কারণে বিষণ্ণতা ও পাণ্ডুরতা গ্রাস করেছে দেবীদাসকে। 'রাত্রি জাগরণ' আসলে যেন 'স্বার্থান্ধকারে সোল্লাস বিচরণ' এবং তা ক্লান্ত করেছে, আচ্ছন্ন করেছে দেবীদাসের দৈবভাব ও মনুষ্যত্বভাবকে; প্রবলতর করেছে আসুরিক ভাবকে। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পাপ-পুণ্যের মানদণ্ডে দেবীদাসের পাপের ঘড়া পরিপূর্ণ হয়েছে। ফলে অনিবার্য পতন সময়ের অপেক্ষামাত্র।

অন্যদিকে 'ভাঙা আলের' উপর দিয়ে অর্থাৎ 'ভাঙা ব্যবধানের' উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সংঘবদ্ধ মানুষগুলোর ধারালো হেঁসো আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠছে। প্রবল অন্যায়ের ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন প্রতিরোধী সত্য মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস দেখায়। তখন ভয় ধরে শোষকের বুকে। তাই—"অকারণে অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। আমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা।"[২৫] বস্তুত গল্পের ক্রমঅগ্রগতিতে গৌরদাসের ভেতরকার 'শ্যাডো' (Shadow) যেন সক্রিয় হয়েছে এবং গল্পের শেষে একধরনের পাপবোধ তাকেও আচ্ছন্ন করেছে। যদিও সে প্রত্যক্ষভাবে পাপকর্মে লিপ্ত নয়, তবুও 'নিমেসিস' (Nemesis) তার মধ্যে জেগেছে। পক্ষান্তরে ধরিত্রীর এই হাহাকারের মূল কারণ যারা অর্থাৎ দেবীদাস-শচীকান্তদের মতো লোকেদের মনে নিমেসিস তো দূরের কথা, সামান্যতম অনুশোচনাও জাগেনি। মহাভারতের কালে বিদুর দুর্যোধনের পাপকর্মের সমুচিত শাস্তির ভবিষ্যবাণী করেছিলেন। আর একালের সংশয়াচ্ছন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে একালের 'বিদুর' গৌরদাসের মনেও প্রশ্ন জেগেছে একালের দুর্যোধনদেরকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কিনা। আর গল্পের শেষে চকচকে ধারালো হেঁসোগুলো যেন একথাই বলতে চাইছে যে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে; মনে করিয়ে দিচ্ছে যে চাকা একদিন ঘুরবেই। সেই অসীম সম্ভাবনার বীজ প্রোথিত করেই গল্পকার আখ্যান-কথনে আপাত ইতি টানলেন।

বস্ত্রসংকটের প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ছোটগল্প 'দুঃশাসনীয়'। এটি তাঁর ১৯৪৬ সালে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) প্রকাশিত 'আজ কাল পরশুর গল্প' সংকলনের অন্যতম গল্প। তিনি এই গল্পে অসহায় নারীর সম্ভ্রম রক্ষার অনিবার্য অদৃশ্যমানতার যে ছবি তুলে ধরেছেন তা ব্যঞ্জনাময়তা পেয়েছে লেখকের বর্ণনার গুণে। লেখকের ভাষায়—

> বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য যাবে জমকাল কতগুলি গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে। দিদি, মাসি, খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে, অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে।... বিদেশির সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে, কে গো ওখানে।'[২৬]

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দুঃশাসন' গল্পে শোনালেন—"ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার।"[২৭] অর্থাৎ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়া' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে কায়া ধারণ করেছে। ছায়ারা 'অদেষ্টকে অভিশাপ' দেওয়া পর্যন্ত এগোতে পেরেছে। ফলে সংঘবদ্ধ প্রতিবিধানের অভাবে রাবেয়াদের অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয় সেই অন্যায় প্রতিকূলতার কাছে—

> আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁটে পুকুরের জলের নিচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।[২৮]

কিন্তু ছায়ারা যখনই কায়ারূপ পায় তখনই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের পথ প্রস্তুত হয়। সেই প্রতিবাদী আগুনে মেঘের পূর্বাভাস বিচলিত করে শোষকগোষ্ঠীকে। ভয় ধরায় শাসকের মজ্জায়। ফলে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে আমরা দেখি 'ভাঙা আলের' উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোর, অর্থাৎ নিজেদের সমস্ত ব্যবধান ঘুঁচিয়ে সংঘবদ্ধ মানুষগুলোর ধারালো হেঁসো আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে গৌরদাসকে; অনাগত ভবিতব্যের আগমনীও যেন এরই পাশাপাশি ঘোষিত হল। আসলে বস্ত্রসংকটের পটভূমিতে রচিত এই গল্প দুটি যেন এক অখণ্ড বাস্তব-চিত্রণ, যার দুটি পর্ব প্রথম পর্বে সমস্যার ক্রমারোহী জটিলতা। আর দ্বিতীয় পর্বে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের আশাবাদী প্রত্যুষক্ষণ সূচিত হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক সেই জায়গা থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুরু করেছেন। আর এই দুই কথাশিল্পীর সৃজন নৈপুণ্যে পূর্ণতা পেয়েছে বিশ শতকে ভারতবর্ষে বস্ত্রসংকটের মর্মন্তুদ জীবনালেখ্য এবং কলঙ্কিত দুঃশাসনের একালের বিবর্তিত রূপটি সামগ্রিকভাবে ফুটে উঠেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৪শ মুদ্রণ, ১৪১৭), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃ. ৫১
২. তদেব : পৃ. ৫১
৩. তদেব : পৃ. ৫১
৪. তদেব : পৃ. ৫১
৫. তদেব : পৃ. ৫১
৬. তদেব : পৃ. ৫১-৫২
৭. তদেব : পৃ. ৫২
৮. তদেব : পৃ. ৫২
৯. তদেব : পৃ. ৫২
১০. তদেব : পৃ. ৫২
১১. তদেব : পৃ. ৫৩
১২. তদেব : পৃ. ৫৪
১৩. তদেব : পৃ. ৫৪
১৪. তদেব : পৃ. ৫৫
১৫. তদেব : পৃ. ৫৬
১৬. তদেব : পৃ. ৫৭
১৭. তদেব : পৃ. ৫৮
১৮. তদেব : পৃ. ৫৮
১৯. রাজশেখর বসু সারানুবাদ : 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত' (ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ১৪১৮), এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৩২
২০. তদেব : পৃ. ১৩২
২১. তদেব : পৃ. ১৩৩
২২. তদেব : পৃ. ১৩৩
২৩. তদেব : পৃ. ১৩৪-১৩৫
২৪. স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত : 'উপনিষদ গ্রন্থাবলী' (৭ম সং., ১৯৬২), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, খণ্ড ১, পৃ. ৯
২৫. জগদীশ ভট্টাচার্য : তদেব, পৃ. ৫৮
২৬. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প' (৭ম সংস্করণ, ২০১৬), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, বাংলাদেশ, পৃ. ১১০
২৭. উৎস-১, তদেব, পৃ. ৫৮
২৮. উৎস-২৬, পৃ. ১১৫

চল্লিশের দশকের প্রেক্ষাপটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প

অরিত্র বাগ

ছোটোগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙি গ্রামে ১৩২৫ সালে। তাঁর আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আর মায়ের নাম বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। প্রথমদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মূলত কবিতা চর্চায় নিমগ্ন থাকলেও ছোটগল্পেই তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—'ছোটোগল্প লিখে অনেক তৃপ্তি পাই।' একটাসময় তিনি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন যা তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়। জীবন সম্পর্কে নতুন ভাবনা তৈরি করে, তাঁর গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'নিশীথের মায়া' 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হলেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা পাই উত্তাল চল্লিশের দশকের সময়ে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে। এইসময়ের ভারতবর্ষ এক অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষ।একটা কালো রঙের সঙ্গে আর একটা কালো রঙ যুক্ত হয়ে চল্লিশের দশক হয়ে উঠেছিল আরও ভয়ঙ্কর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চল্লিশের দশকের সময়ে লিখিত গল্পগুলির অন্তর্মহলে ঢুকতে গেলে প্রথমে আমাদের সমগ্র চল্লিশের প্রেক্ষাপট ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার।

চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে যুদ্ধ ও তার প্রতিক্রিয়াই ছিল বাস্তব সত্য। এরই মধ্যে দানা বেঁধেছে ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলন। ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনের আগুন যখন সমস্ত বঙ্গাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখনই সুজলা-সুফলা বঙ্গাদেশে পড়ল দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। দেখা দিল ১৯৪৩-এর মর্মান্তিক মন্বন্তর। অনাহারে মারা পড়ল প্রায় ১৯,০৮,৬৬২ জন (দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী)। যদিও প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্যসামগ্রী সবই মজুত ছিল। বলাবাহুল্য এ সবই ছিল সৈনিকদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য নয়। অমর্ত্য সেন বলেছেন—

> It seems safe to conclude that the disastrous Bengal famine was not the reflection of a remarkable over all shortage of foodgrains in Bengal.[২]

অনেকেই মনে করেছেন এই দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরি। দেশ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইহার নিমিত্ত দায়ী নহে। এই দুঃখ-দুর্দশার নিমিত্ত দায়ী বর্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ সম্ভূত জটিল কুটিল পরিস্থিতি এবং তদনুষঙ্গো সরকারের দূরদৃষ্টির অভাব এবং অবিমৃষ্যকারিতা।[২] প্রায় এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্য শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, ইহা মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ।[৩]

এই দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরি। কারণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্যসামগ্রী সবই মজুত ছিল। খাদ্যসংকট তৈরি হয়েছিল কৃত্রিম উপায়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই দেখা দিয়েছিল কালোবাজারি। কিন্তু ইংরেজ চালিত ভারত সরকারের সময় ছিল না এইদিকে মনোনিবেশ করবার। কারণ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের বিপুল ব্যয় সামলাতে ইংরেজ সরকারকে প্রচুর টাকা ছাপাতে হয়েছিল সেইসময়। ফলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধিও। তাই ড় অমর্ত্য সেন এই দুর্ভিক্ষকে 'boom famine' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে—

> The 1943 famine can indeed be described as a 'boom famine' related to powerful inflationary pressure initiated by public expenditure expansion.[৪]

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তখন আকাশ ছোঁয়া। দুর্ভিক্ষের সময় দেশের কালোবাজারি ও মুনাফা-শিকারীরা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা মুনাফা করেছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে স্থান পেয়েছে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদি যুগব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের ছবি। একদিকে তিনি যেমন দেখেছিলেন তৎকালীন ধনী ব্যবসায়ীদের যারা অর্থের লোভে খাদ্য, বস্ত্র লুকিয়ে রাখে, অন্যদিকে দেখেছিলেন দরিদ্র হাভাতে মানুষদের যারা সারাদিন খাদ্যের সারিতে দাঁড়িয়েও গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে পারে না। এমন কয়েকটি গল্প হল 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'নিশাচর', 'নক্রচরিত', 'ভাঙাচশমা' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধে মূলত 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'নিশাচর', 'নক্রচরিত' এই তিনটি গল্প নিয়েই আলোচনা করবো। 'নক্রচরিত' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নীতিহীনতার নগ্ন বিকৃত রূপ আরো ভয়ংকরভাবে প্রকাশিত। এই গল্পে মোট তেরটি চরিত্র—নিশিকান্ত কর্মকার, কষ্টবালা ওরফে বিশাখা, ইব্রাহিম দারোগা, নিশিকান্তের কাছে আগত মদন, যোগী, তাদের দুই সঙ্গী (গল্পে নামহীন) ডাকাত, গোলাপাড়া হাটের তিনজন মহাজন—মধুসূদন কুণ্ডু, নিত্যানন্দ পোদ্দার, জগন্নাথ চক্রবর্তী, ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার, মতি পাল ও তার স্ত্রী প্রভৃতি। নিশিকান্তই এই গল্পের প্রধান চরিত্র। গোলাপাড়া হাটের সে জাঁদরেল মহাজন, গোলাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কাটা কাপড়ের ব্যবসার পাশাপাশি সোনাদানার লেনদেনও সে করে। ধান চালের আড়ৎও তার আছে। নিশিকান্তের মধ্যে আমরা মূল্যবোধের ছিটেফোঁটাও দেখতে পাই না। ডাকাতদলের সঙ্গো তার যোগসাজশ। নিশিকান্ত ডাকাতদের কাছ থেকে চোরাই সোনা কেনে ন্যায্যমূল্যের থেকে অনেক কম দামে। সে শুধু ডাকাতদের বঞ্চিত করে তা নয়, সে ধান চালের আড়তে প্রায় আটশো মণ চাল সঞ্চিত করে রেখেছে। সাধারণ মানুষের খাদ্য, মুখের গ্রাস কেড়ে সে বারো টাকা দরে কেনা চাল চল্লিশ টাকায় বিক্রি করতে চায়। এই কালোবাজারি চল্লিশের দশকের পরিচিত চিত্র। এই গল্পে আমরা মতি পাল ও তার স্ত্রীর চরিত্রও দেখি। যে মতি খাদ্যের অভাবে মারা যায়। মৃত্যুর আগে সে পেটের জ্বালায় দাওয়া থেকে খানিকটা

মাটি কামড়েও খেয়েছিল। অন্যদিকে মতির স্ত্রীও পেটের জ্বালা সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। চৌকিদারের কথায়—

> শুধু এই একটা বাড়িই নয় বাবু। এরকম চললে দুমাসে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। যে আগুন চারদিকে জ্বলছে, কারো রেহাই পাবার জো আছে! দেখুন না, দু তিন দিনের মধ্যে আরও পাঁচ সাতটা মরার খবর।[৫]

আসলে এটাই ছিল চল্লিশের দশকের বাস্তব চিত্র। একদিকে একশ্রেণি কালোবাজারির হাত ধরে ক্রমশ বড়লোক থেকে আরো বড়োলোক হয়েছে, আর অন্যদিকে আরেকশ্রেণি খিদের জ্বালায় একমুঠো অন্নের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে বেরিয়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। নিশিকান্ত নিশির মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন, রহস্যময় চরিত্র। সে নারীলোলুপ। তার নারীলোলুপতা প্রকাশিত হয় তার এই ভাবনা থেকে—

> বুড়ো! তা বটে। সমস্ত শরীর দিয়ে সে আজ অনুভব করে তার শিরাস্নায়ুগুলোর নিরুপায় পঙ্গুতা। অথচ এককালে গ্রামের কোন সুন্দরী মেয়েটাকে অন্তত সে দু'দিনের জন্যে আয়ত্ত করেনি।[৬]

আবার তার 'বৃন্দাবনলীলার লীলাসঙ্গিনী' বিশাখাকে ইব্রাহিম দারোগার কাছে পাঠায়, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সাধারণ মানুষের অসহায় মৃত্যুও তার মনে কোনো অনুশোচনা জাগায় না। চল্লিশের দশকে অর্থের জন্য মানুষ যে ক্রমশ মনুষ্যত্ব হারাচ্ছিল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই নিশিকান্ত চরিত্রটি। সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে লোভের কারবারে 'নক্র' হয়েছে। কালোবাজারির জন্য তার সঞ্চিত চালে বর্ষার জলে পচন ধরে। চাল থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। আসলে পচন ধরেছে নিশিকান্তের মনুষ্যত্বে। পচা চালের গন্ধে নিশির মনে পড়ে 'অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে'—

> ঠিক এই রকম একটা গন্ধই পেয়েছিল আর একবার। শিবপুরের হাট থেকে সে ফিরছিল। চোখে পড়েছিল—মাঠের মাঝখানে একটা গলিত গরুর দেহ আগলে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর; চারদিক থেকে শকুনেরা উড়ে উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চিৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুনগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।[৭]

এই গল্পে লেখক চল্লিশের দশকের ভয়ংকর পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন, তুলে ধরতে চেয়েছেন মূল্যবোধের সংকটকে, মনুষ্যত্বহীনতার চিত্রকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'হাড়' গল্পটিও মানুষের তৈরি করা মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা। এই পটভূমিতেই কিছু মানুষ তাদের অর্থলিপ্সা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অমানবিকভাবে অর্থ উপার্জনের খেলায় মেতে ওঠে। রাঘববোয়াল মজুতদার চোরকারবারি আড়তদারদের তখন রমরমা। সরকারের ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে মজুতদার কালো কালোবাজারির দল অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য কন্টোলের নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উধাও করে দিয়ে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে খাদ্যশস্যের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও প্রচুর দামে বিক্রি করতে শুরু করল। এ প্রসঙ্গে কালিচরণ ঘোষের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

> Among other evils the invitable òblack marketó spread its tentacles to every rook and corner of the country. The Government also failed to realise the serious shortage of every from the òconsumersó goods and were most reluctant to release the mills and factories for the production articles of everyday use.[৮]

কালোবাজারির হাত ধরে উচ্চবিত্ত সমাজ আরো উচ্চবিত্ত হয়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছিল নিম্নবিত্ত সমাজ, মধ্যবিত্ত সমাজ। নিম্নবিত্ত সমাজ যাদের হাতে কোন

অর্থ ছিল না তারা হাহাকার করেছে একমুঠো খাদ্যের জন্য। ছিন্নভিন্ন গ্রাম থেকে নিরন্ন মানুষ ভিড় জমিয়েছিল 'রাজার শহর' কলকাতায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য। আর মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' গল্পে এই তিনশ্রেণির মানুষের চিত্রই উঠে এসেছে। এই গল্পে একদিকে যেমন আমরা পাচ্ছি অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙিন কাচ দেওয়া জানালায় সিল্কের পর্দা, চিনামাটির টবে কম্পমান অর্কিড, মায়াবী আলো এবং ভেলভেটের দামি বাক্সে তুচ্ছ হাড় অন্যদিকে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বুভুক্ষু কলোনীর একরাশ আবর্জনার দুর্গন্ধ, চীৎকার-কলহ, একইসঙ্গে সামান্য আহার্যের জন্য ডাস্টবিনে কুকুর ও মানুষের কাড়াকাড়ি, 'জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে হাইড্রেনের ময়লা জল' খওয়ার চিত্র, সাধারন মানুষের খাদ্যাভাবের অসহায়তার ছবি। গল্পের শেষেরদিকে তিনি লিখছেন—

> সামনে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলকচক্র পড়েছে তার ওপর। তিন চার জন অমানুষিক মানুষ তার ভিতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি- নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেট ওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড় হাঁ, হাড়ই তো।[৯]

ক্ষুধার্ত এই মানুষগুলি গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দিয়েছিল মূলত তিন কারণে—

১. শহরে কম দামে বা সরকারী দামে অর্থাৎ কন্টোলের দরে খাবার মিলছিল।
২. এখানে মন্বন্তরের সময় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে অনেক ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল, যেখানে খাওয়া মিলত।
৩. যুদ্ধের বাজারে কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখার কারণে এখানে মোটামুটি খাদ্য সরবরাহ বজায় ছিল।

তাই ছিন্নমূল নিরন্ন এই মানুষগুলোর ধারণা ছিল এখানে নাগরিকদের উচ্ছিষ্ট-পরিত্যক্ত খাবার অন্তত পাওয়া যাবে। গোপাল হালদারের কথায়—"নিরন্নের জোয়ার গ্রাম ছাপিয়ে এসে পড়েছে শহরে—রাসবিহারী এভিন্যু ছাপিয়ে বন্যা পৌঁছেচে রসা রোডে—পৌঁছেচে তা চৌরঙ্গীর সীমানায়। চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী বুঝি সমস্ত বাঙলার হতভাগ্যরা দেখতে এসেছে তাদের রচিত ঐশ্বর্য প্রাসাদপুরী কলকাতা।"[১০] এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে তারাশঙ্করের একটি বর্ণনা—

> চারিদিক হতে অনাহার—শীর্ণ নরনারী ছুটে আসছে দলে দলে এই মহানগরীতে দু'মুঠো আহার্যের প্রত্যাশায়। দিনে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়—চারটি ফেন-ভাত দেবা মা মা-মাগো! মা! মাগো!—দুটি ভাত দাও মা! এক মুঠো খেতে দাও মা। মা-মাগো! মা! বাবা গো!—ভাত! দুটো ভাত![১১]

কিন্তু হায়! সেদিন ভিক্ষা দেবারও কেউ ছিল না—বড়োলোকের দল তাদের ফেলে দেওয়া খাবারও এই হাড়জিরজিরে কঙ্কালসার মানুষগুলির মুখে তুলে দেয়নি—ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিন-নর্দমায়। ক্ষুধার দাপটে বাধ্য হয়ে তারা সেদিন ডাস্টবিন-নর্দমা থেকে পরিত্যক্ত খাবার সংগ্রহ করেছে বিড়াল-কুকুরের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে। সেদিন তাদের মুখে উচ্চারিত হতো—

> এ এক মন্ত্র! রুটি দাও রুটি দাও—
> বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও

সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশেরও স্বাধীনতা।

—'রুটি দাও', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিলাসিতা ও দারিদ্র্যের পরস্পর বিপরীতধর্মী ছবি এঁকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'হাড়' গল্পে চল্লিশের দশকের বীভৎসতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'হাড়' গল্পে প্রধান চরিত্র দুটি— রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জি আর গল্পের কথক স্বয়ং। রায়বাহাদুর সুখের স্বর্গে জীবনযাপন করা এক বিত্তবান মানুষ। যিনি অভিজ্ঞতার নামে, সৌখিনতার নামে, এ্যাডভেঞ্চারের নামে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে জীবনটাকে উপভোগ করতে চান। তিনি মূলত বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার তথা বিত্তবান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। গল্পে উঠে এসেছে বিত্তমান গোষ্ঠীর অর্থলিপ্সা, অমানবিকতা। তাদের সুখী বিলাসী জীবনযাপন। অন্যদিকে নির্ধন বুভুক্ষু মানুষের একমুঠো অন্নের জন্য কাতর আবেদন। একইসঙ্গে লেখক কথক চরিত্রের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের আবক্ষয়কেও তুলে ধরেছেন এই গল্পে।

যুদ্ধের সময়ে গ্রামে, শহরে বস্ত্র সংকটের যে তীব্রতা দেখা দিয়েছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'দুঃশাসন' গল্পে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে দুঃশাসন চরিত্রটিকে প্রতীকীরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। দুঃশাসনের মতোই কাপড়ের আড়তদার নির্লজ্জ পাশবিক একটি চরিত্র। সে লোভী স্বার্থপর ঝানু বস্ত্র-ব্যবসায়ী। 'দুঃশাসনের রক্তপান' যাত্রাপালার myth-এর ironical প্রয়োগ লক্ষণীয়। যাত্রাপালা দেখে ভোরে ফেরার সময় দেবীদাস দেখে বস্ত্রহীন এক নগ্ন ষোড়শী মেয়েকে। দুঃশাসন যেন সমগ্র দেশের বস্ত্রহরণ করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন —

> মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একখানি কাপড় নেই—কাপড় পাবার উপায়ও নেই, যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।[১২]

রূঢ় বাস্তবকে তিনি নির্মমভাবে তুলে ধরেছেন। যাত্রাপালায় দুঃশাসন ভীমের দ্বারা শাস্তি পেলেও এ যুগের দুঃশাসনরা শাস্তি পায় না। তবে যাত্রা দেখার পর অন্তর্গত পাপবোধ দেবীদাসকে ভীত করেছে। আবার গৌরদাসের মনে বাংলাকে বিবস্ত্র করার দুঃশাসনের প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠে আসে—

> রাত্রি জাগরণে দেবীদাসের মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ণ আর পাণ্ডুর। ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙা আলোর ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে—তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে-অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগলো গৌরদাসের। অমন ঝকঝকে করে হেঁসোতে শান দেয় ওঁরা।[১৩]

এই মানুষগুলোই হয়তো একদিন ভীমরূপে দুঃশাসনকে পরাজিত করবে। এইভাবেই চল্লিশের দশকের বেদনারক্তিম অধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যধারার মধ্যে ধরা পড়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. Poverty and Famines : 'An Essay on Entitlement and Deprivation', Amartya Sen, Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford, UK, 1981, P. 63
২. যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'অন্নের অনটন', দশম বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা ১৩৫০

৩. সমসাময়িক প্রসঙ্গ, দেশ পত্রিকা, ১৩৫০
৪. Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation, Amartya Sen, Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford, UK, 1981, P. 75
৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'নক্রচরিত', "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প", প্রকাশ ভবন, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৪১৪ পৃ. ৪৮
৬. তদেব : পৃ. ৪৩
৭. তদেব : পৃ. ৫০
৮. Kalicharan Ghosh : 'Famines in Bengal', Kolkata, 1944, P. 40
৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'হাড়', "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প", প্রকাশ ভবন, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৪১৪ পৃ. ৩৭
১০. গোপাল হালদার : 'তেরশ পঞ্চাশ', ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ. ৩৩৭
১১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'মন্বন্তর', "তারাশঙ্কর রচনাবলী", ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬
১২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'দুঃশাসন', "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প", প্রকাশ ভবন, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৪১৪ পৃষ্ঠা ৫৮।
১৩. তদেব : পৃ. ৫৮

তথ্যের সন্ধানে

১. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ্ঠ গল্প', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৪
২. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলন ও সম্পাদনা : 'উপোসি বাংলা : সাময়িক পত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর', সেরিবান, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টম্বর ২০০৭
৩. সরোজ দত্ত : 'কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়', রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
৪. সুব্রত রায়চৌধুরী : 'কথাসাহিত্য : মন্বন্তরের দিনগুলিতে', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৭
৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪

সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্পে প্রেমধর্মের প্রকাশ

টিংকু কুমার ঘোড়াই

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) স্বাধীনোত্তরকালের দুর্বিষহ সমসাময়িক জীবন-যন্ত্রণাকে তাঁর কথা সাহিত্যে অকপট ও অবিকলভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। খণ্ডিত স্বাধীনতার হতাশা, দেশভাগ, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা নগরজীবনের সার্বিক রূপ তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি ঔপন্যাসিক—মুলত এটাই সন্তোষকুমারের সবিশেষ পরিচয়। 'কিনু গোয়ালার গলি', 'শ্রীচরণেষু মা'কে ইত্যাদি উপন্যাসের জন্য তিনি সমধিক খ্যাতিমান। সন্তোষকুমার নানা পত্র-পত্রিকায় শতাধিক গল্প লিখেছেন। তিনি 'যুগান্তর', 'নেশন', 'স্টেটসম্যান' ইত্যাদি পত্রিকা সহ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। কর্মজীবনে সংবাদ বিভাগের সাথে সুদীর্ঘকাল যুক্ত থাকার কারণে হয়তো তাঁর রচনায় মানবিক আবেগ সমূহের তুলনায় দুর্মর রূঢ় জীবনসত্য অধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ভগ্নাংশ' (১৯৩৯)। এরপর প্রকাশ পায় তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৪৪), 'পারাবত' (১৯৫৬), 'চীনের মাটি' (১৯৫৬), 'পরমায়ু' (১৯৫৭), 'ঝড়ের ঝাঁপি' (১৯৫৮), 'কুসুমের মাস' (১৯৬০), 'আমার প্রিয় সখী' (১৯৬০), 'দুই কাননের পাখি' (১৯৬০), 'চিররূপা' (১৯৬০), 'ফুলের নামে নাম' (১৯৬১), 'ছায়া হরিণ' (১৯৬১), 'ত্রিনয়ন' (১৯৬৪), 'বহেন্দ্রী' (১৯৬৪), 'বাইরে দূরে' (১৯৬৫), 'সুখের রেখা' প্রভৃতি। সন্তোষকুমার ঘোষ জীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, প্রতিটি বস্তুর নিখুঁত চিত্রায়নে, ভাষার ঔজ্জ্বল্যে ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হলো 'কানাকড়ি', 'ভেবেছিলেম', 'প্রেমপত্র', 'যাদুঘর', 'শানি', 'শরিক', 'দ্বিধা', 'ঘর', 'পুরানো রোগ', 'মাটির পা' প্রভৃতি।

নগরজীবনকেন্দ্রিক গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষের লেখায় উদ্ভাসিত সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমিকে নজরে রেখে, তাঁর কথাবিশ্বকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে—

- ❖ সূচনা ও বিকাশপর্ব : ১৯৩৭-১৯৫৭
- ❖ মধ্যপর্ব : ১৯৫৮-১৯৬৮
- ❖ অন্ত্যপর্ব : ১৯৬৯-১৯৮৫

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প রচনার সুচনা ও বিকাশ পর্ব অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত গল্পগুলির মধ্য সময়কালে সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা দেশবাসীর মনে অযুত আলো ও আশার সঞ্চার করে। তাই তাঁর লেখা এই সময়কালের কিছু গল্পে প্রেম ও প্রেমজ সিনিক ভাবনা প্রকাশ পেতে থাকে। বস্তুত, সুখ বা প্রেমের মতো বিষয় অবলম্বন করে সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা প্রেমধর্মী গল্পের সংখ্যাও খুব কম।

এই সময় পর্বের শেষ দশকে রচিত গল্পগুলিতে স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই উচ্চকিত হয়েছে। এ সময় মানুষের আশা-ভরসা, সুন্দর সুস্থ সুকুমার বোধ, আদর্শ ও মূল্যবোধগুলি ধীরে ধীরে নির্মূল হতে বসেছে। দাম্পত্য, পারিবারিক, সামাজিক, প্রেম ও প্রেমজ সম্পর্কে জটিল ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। এসব স্খলন এবং সার্বিক ক্ষয়িষ্ণুতাজনিত পতন হতে ক্রমে মানুষ-মানুষীর বয়েসী সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, বিশ্বাসহীনতার স্বাভাবিক জন্ম হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম দিককার লেখায় তাঁর আবেগের প্রাধান্য ও রোমান্টিক মানসের ছাপ রয়েছে। পরে তাঁর লেখায় ধীরে ধীরে বস্তুজীবনের সমস্যা ও জটিলতা প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

সন্তোষ কুমার রচিত গল্প সম্ভারের মধ্য পর্বে (১৯৫৮-১৯৬৮) আশা-ভরসাহীন উত্তাল সময় তথা লেখকের ব্যস্ত কর্মজীবন। তাঁর এই পর্বের গল্পে ইতিবাচক জীবনবোধের প্রকাশ প্রায় লক্ষ করা যায় না বললেই চলে। তাঁর গল্প সম্ভারের শেষ পর্বে (১৯৬৯-১৯৮৫) একজন পরিণত প্রতিষ্ঠিত লেখকে সুবিবর্তিত হয়েছেন। তাঁর বয়সের সীমা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, জগৎ ও জীবনকে দেখার মধ্যে স্বাভাবিক গভীরতা ও ব্যাপ্তি এসেছে। এই গভীরতা ক্রমে আত্মমগ্নতায় রূপান্তরিত হয়েছে। আর্থসামাজিক উন্নতির সাথে সাথে নগরসভ্যতার যান্ত্রিকতা ও ইঁদুর দৌড়ে ন্যস্ত মানুষ ক্রমে একা এবং কোনঠাসা হয়ে পড়ছিল। তাঁর এই সময়ের গল্পে উচ্চ-মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রের পাশাপাশি গভীর জীবনবোধ, মানসিক সংকট, অন্তর্মুখীনতা, খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা থেকে দার্শনিক ভাবনামূলক তত্ত্ব প্রবণতা ও মৃত্যুচেতনা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। ক্রম পূর্ণায়মান জীবনবোধের কারণে সন্তোষকুমার ঘোষের শেষপর্বের গল্পেও প্রেম ও প্রেমজ কিছু প্রসঙ্গ এসেছে।

উপরোক্ত তিন পর্বের গল্পকায়ায় আগত প্রেম তথা প্রেমজ ভাবনার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ ভাবে কম এলেও, তাঁর প্রভূত গল্পে প্রেমের প্রসঙ্গ অপ্রত্যক্ষ ভাবে এসেছে। অপর জনকে মনে ও জীবনে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ায়, ছেড়ে যাওয়ায়, ফেলে যাওয়ায় কিম্বা আর ফিরে না আসার দুঃখ, হতাশা, ব্যর্থতা, শূন্যতাও প্রেম বটে। সন্তোষকুমারের বিভিন্ন গল্পে বিচিত্র প্রেমের কথা অনুচ্চার ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর কিছু প্রেমধর্মী ছোটগল্পের মধ্যে 'গিল্টি', 'যাদুঘর', 'হয় না', 'সে আমার প্রেম', 'প্রেমপত্র', 'সাধ', 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঘ্রাণ', 'যে কোনও', 'সমীকরণ', 'বিকেল

বেলা', 'মনসিজা' , 'শোক' ও 'শবানুগমন' প্রভৃতি অন্যতম। লেখালিখির প্রথম পর্যায়ে সন্তোষ কুমার প্রেম ও বয়েসী চাপল্যে বলেছেন—

> আহা, সেই একটা বয়স, যখন আমরা খালি প্রেমে পড়ি, তৎক্ষণাৎ উঠে ধুলো ঝাড়ি এবং আবার পড়ি। মেয়ে হলেই হল, তারা সেনটার অব দি ইউনিভার্স! ব্রহ্মময়ী, তবে নিতান্ত মাতৃস্বরূপা নন। সেই উত্থান-পতনের (স্তন, কঠিন পৌরুষ এবং খ্যাতি ছাড়া আর কোনও তুলনা জগতে আছে কিনা জানিনে) একমাত্র অবশেষ স্মৃতির অঞ্জুরী অর্থাৎ বেশ অব্যবহিত রচিত বুকফাটা ডাক ডাকা পদ্য ইত্যাদি। আমার সে সব বছরের বাছুরে প্রেমের, এখন তো বাড় কেউ আর পড়ে না, দু'একটা নমুনা শুনবেন। 'তোমারে দেখেছি আমি কল্পনায় প্রেমে, হেমে হোমরাগে'—বোধগম্য হয়। এ-সব পংক্তি রবি ঠাকুরের আগেকার না পরেকার।[১]

একালের একজন আধুনিক গল্প-গবেষক সমরেশ দাস সন্তোষকুমার ঘোষের প্রেম ধর্মী গল্প গুলির প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন—"সন্তোষকুমার ঘোষ কখনো সুস্থ সুন্দর বানানো প্রেমের গল্প লিখতে পারেননি। কারণ প্রেমের মধ্যেও যে কত হীনতা নীচতা রয়েছে তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। আধুনিক যুগ এভাবেই বোধ হয় বারবার জানান দেয় 'প্রেম নেই'।"[২] এই স্বল্প পরিসরে তাঁর গুটি কয়েক গল্পে প্রকাশিত প্রেমের বাস্তব রূপ অনুসন্ধান করা যাক।

গিল্টি : গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ 'গিল্টি' গল্পে প্রেম সম্পর্কের অবক্ষয়ের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কাহিনি তিনি প্রেমিক-প্রেমিকার 'একটি যৌথ ব্যবসায় ফেল পড়ার কাহিনী' বলে দেখাতে চেয়েছেন। এখানে যৌথ ব্যবসার মানে দেহ ব্যবসাকে দ্যোতিত করা হয়েছে! দেহ প্রেমিকার, আর ব্যবসায়ী স্বয়ং প্রেমিক।

গাঁ-দেশের মেয়ে সীতার সঙ্গে সলিলের একসময় প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সলিল জগন্নাথ ঘাটের কোন এক স্টিমার কোম্পানির চাকুরে। নানা ছুতোয় সলিল সীতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দেশের বাড়ি যেত। সলিলের চাকরি গেলে রোমান্সের নটে গাছটি আপনা আপনি মুড়িয়ে যায়। তার ঠিকানা হয় সীতারাম স্ট্রিটের একটি মেস বাড়িতে। বিধবা বোন ও তার ছেলের দায়িত্বভার তার কাঁধে এসে পড়ে। সেইসঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি টি. বি. রুগী ছোটো ভাইয়ের সমস্ত খরচের দায়িত্ব। মেসের মিল খরচের টাকা দিতে না পারায় মাঝে মাঝে তাকে জ্বরের ছুতোয় উপোস দিতে হয়। অন্যদিকে সীতার বাবার স্কুল উঠে গেলে তারা সপরিবারে কলকাতায় এক গা ঘিনঘিনে গলির ভিতর টালির ঘরে এসে উঠতে বাধ্য হয়। তার তিন বোনের নিরুপায় অসহায় ছবির মধ্য দিয়ে লেখক যেন পুরো পরিবারের নগ্ন দুর্দশাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন 'মানা, কান্না, আন্না'। বেশ বড়ো হয়ে গেছে, তবু ফ্রক ছাড়েনি, শুধু শেমিজের খরচায় শাড়ি আর শেমিজের দরকার মিটছে। সকলেরই কুতকুতে ভীত চোখ, বুকের ওপর আড়াআড়ি করে দু'হাত রাখা। শেষ বয়সী মেয়েদের বেশবাসে শরীরের বিলীয়মান রেখা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস, এদের ঢাকা দেবার।

উভয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ এখন প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বেকার সলিলের কাছে অসহায় সীতা বার বার একটা কাজ খুঁজে দিতে বললে, সে উপায়ন্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত সীতাকে দেহ-ব্যবসার প্রস্তাব দেয়। এই ঘৃন্য প্রস্তাবে সীতা প্রথমে তাকে 'ছোটলোক' বলে। কিন্তু সংসারের উত্তরোত্তর দুরবস্থা ও অপার অসহায়তা তাকে দিন পনেরো পরে সেই 'ছোটলোকে'র কাছে 'নতনেত্র সীতার মৌনই সম্মতি'তে বাধ্য করে। এই প্রেম, প্রেমহীনতার মধ্য দিয়ে শেষ অবধি

বিশ্বাসহীনতায় পর্যবসিত হয়। সলিল সীতাকে বলে আগরওয়ালার কাছ থেকে আগাম টাকা নেওয়া জাল, সীতাও জানায় খাস্তগীরের কাছে পাওয়া ইয়ার রিং গিল্টি বলে পরস্পর পরস্পরকে ঠকাতে ব্যস্ত। গল্পকার প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত প্রেম সম্পর্ককেই যেন গিল্টি বা নকল বলতে চেয়েছেন।

হয় না : গল্পের অন্তিম পর্যায়ে এসে এমন ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণের ধোঁয়াশা কাটে। বেদনা হত পাঠক হৃদয় নায়িকা আরতির আত্মজাগরণে অস্পষ্ট আনন্দ বোধ করে। প্রেমিক সরোজই পূর্ববঙ্গের গ্রাম থেকে এসে তিনমাস শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকা আরতির পরিবারকে এই সরোজই তো কলোনিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আরতির প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার ব্যবস্থা ও আরতির ভাইকে বই-বাঁধাইয়ের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এই 'বড় মন, চওড়া বুক' সরোজই। এই হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয়টি যে কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন ছিল তা কেউ টের পায়নি। সরোজ দেশত্যাগের আগে দু''মাস আরতি অত্যাচারীদের হাতে বন্দী ছিল জানার পর, দিদির দোহাই দিয়ে সতীত্বের সংস্কারে আরতিকে গ্রহণ করতে সরোজ কুণ্ঠাবোধ করে। আবার ভুল জানতে পেরে সরোজ যখন আরতির কাছে ক্ষমা চাইতে আসে। তখন আরতি ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষায় বলে—"এখনও মেঘ কাটেনি, সরোজ, তুমি কি করে ফিরবে। এখনও যে বৃষ্টি থামল না" বলা বাহুল্য এ মেঘ, সরোজের মনে সংস্কারের মেঘ। সরোজের মিনতি উপেক্ষা করে আরতি বলে—'তা হয় না।' আরতির একমাত্র সহায় সম্বল ছিল যে প্রেম; তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নারীর আত্মজাগরণে গল্পের উপসংহার রচিত হয়।

প্রেমপত্র : সুধাময় স্ত্রীকে বুড়ি বলেছিল। কিন্তু নিজে যে আরও বয়েসী, তা তাঁর মানতে খুব কষ্ট।সে গলির ওপারের কনককে ভালবেসে ছিল।তার কাছে ভালবাসা ফিরে পাওয়ার আশা সব নয়।সে বিশ্বাস করে ভালোবাসতে পারার অন্য নাম যৌবন। এখানে জীবনে পেতে চাওয়ার আকুল আর্তিই প্রেমের নামান্তর হয়ে উঠেছে।

সাধ : গিরিবালা বোষ্টমীর নিজের মাথার সাদা চুলের উপর প্রচণ্ড রাগ।সে বুড়ো হতে চায় নি।গিরিবালা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বলেছে—"থাক থাক এই পাকা চুল থাক, এই ঝুলে পড়া চামড়া থাক, কিন্তু আমিও থাকি।" এই বাঁচার এক নাম যৌবন। এই অনন্ত ভালবেসে চলবার তরে নিজেকে সপ্রস্তুতা ও সসজ্জিতা থাকাও প্রেম রূপের প্রকাশ বটে।

ঘ্রাণ : প্রৌঢ়া কৌশল্যার স্বামী অনেক দিন গত হয়েছে। স্বামী গেছে, বয়স গেছে, তবু তার জীবনের নেশা যায়নি। তার মেয়েদের আকর্ষণে যুবকেরা আসে, যৌবনের সেই গন্ধটুকু নিয়ে কৌশল্যা বাঁচে। নিজের মেয়েদের বিয়ে পাকা হলে সে বারবার মিথ্যে বলে ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছে। অদ্ভুত বিকৃতমন জননী কৌশল্যা হারানো জীবনের ফুরনো যৌবনের ঘ্রাণটুকু নিয়ে বাঁচতে চায়। তার কাছে জীবন মানে যেন যৌবনের স্বাদ পাবার অন্ধ ব্যাকুল ও ব্যর্থ বাসনা।

শোক : এখানে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধার অন্য প্রেমের কাহিনি বিবৃত। সীতেশ ঠাকুরপোর সাথে তার আকৈশোরের যে সখ্য ঐ কথা হাসি খেলা দরদ তো প্রেম চিহ্নই বটে। যৌবনে তাদের সম্পর্ক বহু বাঙময় ছিল, এখন সব নীরবতায় পূর্ণ। শুধু একটু হাসির তরে সীতেশ রোজই আসতেন। 'দুটি হাসি মাঝপথে মিলে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকত।' সীতেশ একদিন মারা গেলে বৃদ্ধা কান্নায় বিবশ হন। সে নিজে বুঝল এ সীতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যুর শোক নয়। এ তার নিজের মৃত্যুর

আগাম কান্না। এই আত্মপ্রেম কিংবা নিঃসঙ্গতার একান্ত হাহাকার লেখক সন্তোষকুমারের চিন্তন বৈচিত্র্যকে অনন্য মহিমা দান করে।

চীনামাটি : 'চীনামাটি' গল্পে কুঞ্জ মেনে নিয়েছিল তাদের মতো তুচ্ছ সাধারণ মানুষের জীবনে যতই ব্যর্থতা, হতাশার ঘন অন্ধকার, বিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি থাকা হয়তো স্বাভাবিক। সে ভেবেছিল, সমাজের উঁচুতলার মানুষ ইন্দ্রানীদের জীবন হয়তো আলোক-উজ্জ্বল ও আনন্দে পূর্ণ থাকে; হয়তো ওদের জীবনে কোনও মূল্যবোধ সহজে ভেঙে পড়ে না। ওদের জীবনেও যে স্বর্গের অস্তিত্ব নেই, সব মূল্যবোধ ওখানেও চিনেমাটির মতোই ভঙ্গুর; তা বুঝে ওঠার পর—"দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে কুঞ্জ। ওর এতদিনের গোপন সংগ্রহ, এতদিনের চুরি, পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে দিতে দিতে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, বাঁদিসব বাঁদি।" দুর্মর সময়ে সমস্ত মূল্যবোধ চিনা মাটিতে নির্মিত গেরস্থালী দ্রব্যাদির মতো হয়ে পড়ে।

ঠাকুমার ঝুলি : 'ঠাকুমার ঝুলি' গল্পের নিরুপমা ঠাকুমা হয়ে যাবার পর হঠাৎ অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবে ভীষণ লজ্জায় তিনি কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। এটি হল কাহিনীর প্রথম বাঁক। এই ঘটনার কিছু পড়ে বুঝতে পারেন যে তাঁর অনুমান মিথ্যে; আর কোনোদিন নতুন করে মা হতে পারবেন না, এ সত্য জেনে যৌবন হারানোর বেদনায় দীর্ণ হন। এটি কাহিনীর দ্বিতীয় বাঁক। কিন্তু এর পরেও তিনি দেখলেন, জীবনের কাছে তো তার প্রয়োজন ও মূল্য পুরোপুরি ফুরিয়ে যায়নি। তাঁকে ছাড়া তো নাতি-নাতনিদের একটুও চলে না। লেখক গল্পের উপসংহারে এসে লেখেন—

> একটি সুখের ইতি হয়ে গেল বলে নিরুপমা একদিন কেঁদেছিলেন, তখনও এই সুখের ঠিকানা জানতেন না। সেদিন বোঝেননি সারার পরেও শুরু আছে। যৌবনকেই একদা জীবন বলে ভুল করেছিলেন, এখন জেনেছেন জীবন যৌবনকে ছাড়িয়েও।

জীবন ও যৌবন বিষয়ে লেখকের অনবদ্য সৃজন সত্যিই বিস্ময় উদ্রেক করে।

কানাকড়ি : সন্তোষকুমার ঘোষের বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম 'কানাকড়ি' গল্পেও প্রেম তার রোমান্টিক মুখ নয়, রূঢ় রিক্ত প্রকাশে দণ্ডায়মান। গল্পের শেষে দাম্পত্যপ্রেম, বিশ্বাস, সততার জলাঞ্জলি দেখে সাবিত্রির—

> এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথের কাছে ভেতরের মানুষটার। মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।

বিশিষ্ট সমালোচক ও সুখ্যাত অধ্যাপক কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী সন্তোষ কুমার ঘোষের গল্পে জীবন বোধের সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন—

> সন্তোষকুমারের গল্পে কোথাও তৃপ্ত, সুখী, অলস, অলীক জীবনের ছবি নেই। আমাদের জীবনের চারপাশে যে চাপচাপ কালো অন্ধকার, অমসৃণতা, বিষাক্ত কুশ্রী আবহাওয়া ছড়িয়ে আছে, তাকে তিনি কোথাও লুকোতে চান নি। এই জন্যই বোধহয় বোকাবোকা সোনালি রঙের রোম্যান্টিক কাহিনীর জাল ছড়াতে তার দুর্মর অনীহা আগাগোড়া লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে একধরণের উত্তরণকে চিহ্নিত করেছেন। অন্তত বিবর্তনকে। অন্ধকারের থেকে আলোয়, সংকীর্ণতা থেকে মহত্বে, যৌবনবোধ থেকে জীবনবোধে উত্তীর্ণ হতে দেখেছেন তিনি মানুষকে।[৩]

অন্যদিকে সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর গল্পসমূহকে 'জন্ম রোমান্টিকের স্বপ্নভঙ্গ' আখ্যা দিয়ে

বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—"সন্তোষকুমার ঘোষ প্রধানত প্রেমের গল্পকার। প্রেমে তাঁর বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস। সবচেয়ে বেশি আস্থা একপ্রকার আত্মরতিতে, যেটাও শেষপর্যন্ত হয়তো আত্মছলনা।"[৪] সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পাবলীতে বিধৃত স্বাধীনোত্তর কালের স্বপ্নাহত নগরবাসীদের গ্লানি, নারীদের দুর্বিষহ অবস্থা, ব্যর্থ দগ্ধ যৌবন, অবিশ্বাস, আত্মগ্লানি, আত্মছলনা আসলে সর্বতোভাবে বিকৃত, বিস্রস্ত না পাওয়া প্রেমের মুখোশে— প্রেমসুধাকেই আশা করে গেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সন্তোষকুমার ঘোষ : "গল্পসমগ্র" ১, 'গল্প লেখার গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ১০

২. সমরেশ দাস : 'সমাজ ও সময়ের আলোয় সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প', দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৫, পৃ. ৮১

৩. অধ্যাপক কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী : পরিশিষ্ট, 'সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র' ১, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪

৪. ক্ষেত্র গুপ্ত : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প 'জন্মরোমান্টিকের স্বপ্নভঙ্গ', ভুমিকা, "সন্তোষ কুমার ঘোষের গল্পসমগ্র" ২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১৭, পৃ. ৩৫০

তথ্যের সন্ধানে

১. সন্তোষকুমার ঘোষ : 'সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র' ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৯

২. সন্তোষকুমার ঘোষ : 'সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র' ২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১৭

৩. সন্তোষকুমার ঘোষ : 'সন্তোষকুমার ঘোষ গল্পসমগ্র' ৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১১

‘আদাব’ : মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাবোধের আখ্যান

বিপাশা বসাক

আমাদের ভারতের স্বাধীনতার পূর্বের ইতিহাস আলোকসমুজ্জ্বল নয়। কেননা এর পিছনে আছে ইতিহাসের অনেক অন্ধকার দিক, তার মধ্যে অন্যতম ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। সাহিত্য ইতিহাসের সত্যের থেকেও কঠোর সত্যকে আমাদের সামনে আনে। ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রেক্ষাপট আলাদা। কারণ ইতিহাস তথ্য প্রদান করে আর সাহিত্য রস সৃষ্টিতে সহায়ক। সাহিত্যের সত্যকে কালের কষ্ঠিপাথরে বিচার করে নেয় পাঠক। সমরেশ বসু ‘আদাব’ গল্পটি লেখার জন্য যে সময় পর্বকে বেছে নিলেন সেটি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অন্ধকারময় সময়। সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) দেখছেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মাথানাড়া দিয়ে উঠছে, তারই পাশাপাশি চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। সেই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াভয় পরিণতি তিনি খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ভারতীয় সেনারা সাহায্য করলে ভারতকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। কিন্তু ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লেগে যায়। এই দাঙ্গার কারণ ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করে তোলা। দেশিয় রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য তারা দেশকে দুটো জাতিতে ভাগ করে দেবার চেষ্টা করল—একটি হিন্দুরাষ্ট্র ও অন্যটি মুসলিমরাষ্ট্র। এইরকম পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই সমরেশ বসু লিখছেন ‘আদাব’ গল্পটি।

সমরেশ বসু দুজন প্রান্তজ মানুষের সামাজিক, অর্থনেতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন গল্পে। প্রান্তজ মানুষ বলতে তিনি নিম্নবর্গের মানুষদের বলেছেন। নিম্নবর্গ বা সাব-অলটার্ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭)। তিনি ‘কারাগারের নোটবই’ গ্রন্থে প্রথম ব্যবহার করেছেন। ‘সাব-অলর্টান’ (ইতালীয়তে সুবলতের্নো) শব্দটি ব্যবহার করেছেন দুটি অর্থে—একটি ‘প্রলেতারিয়াত’-এর প্রতিশব্দ পুঁজিপতি, অন্যটি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ‘সাব-অলর্টান শ্রেণি’ হল শ্রমিকশ্রেণি।’[১] যুগ যুগ ধরে

শ্রমিকশ্রেনি শোষিত ও শাসিত হয়ে চলেছে। দাঙ্গার রাতে দুই প্রান্তজ মানুষের মধ্যে একজন সুতা মজুর (শ্রমজীবি) অন্যজন মাঝি। দাঙ্গার রাতে তাদের মধ্যেকার জাতিগত বিশ্বাসহীনতা, বিদ্বেষ, সন্দেহের কথা উঠে এসেছে গল্পে। গল্পকার এইরকম ভাঙনের পরিস্থিতিতে দেখাচ্ছেন অবক্ষয়িত মানবতার মধ্যেও সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী মানুষদের মানবিকতা, মনুষ্যত্ব এগুলো উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই গল্পের পরিনতি আমাদের নির্মম সত্যের সামনে এনে দাঁড় করায়।

গল্পটা লিখতে গিয়ে সমরেশ বসু শহর কলকাতার চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। কারণ গ্রামগঞ্জের তুলনায় কলকাতা ও তার তৎসংলগ্নবর্তী এলাকায় দাঙ্গাময় পরিস্থিতি বেশি লক্ষ করা যেত, তাই সেই কারণে গল্পকার বেছে নিয়েছেন কলকাতা শহরের একটি দৃশ্য। কলকাতা শহরে যখন ১৪৪ নং ধারা চলছে তখন দুজন প্রান্তজ মানুষকে কেন্দ্র করে লিখছেন গল্পকার। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কলকাতা শহরের কথা বলতে গিয়ে প্রান্তজ মানুষের কথা কেন বলেছেন হয়তো তিনি গল্পের পরিনতিটা এটা ভেবেই লিখতে বসেছেন যে গল্পের শেষে অবক্ষয়িত মানবতার জয়গান গাইবেন এবং সমাজের প্রান্তজ মানুষদের দিয়ে। কারণ তিনি জানেন যারা শহরে বসবাস করেন তাদের মানবিকতা ও মূল্যবোধ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তারই মধ্যে তিনি আর একটা শ্রেণিকে দেখাচ্ছেন গুপ্ত ঘাতকের দল ও চোরা কারবারের সঙ্গে যুক্ত যারা। মানুষের দুঃসময়কে তারা তাদের সুসময় বলে মনে করছে এবং সুযোগের সৎ ব্যবহার করছে। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে একটি হল পুলিৎজার পুরষ্কার পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্রসাংবাদিকের নাম কেভিন কার্টার। ১৯৯৩ সালের সুদানের দুর্ভিক্ষের ছবি রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। খিদের জ্বালায়, অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে বছর তিনেকের পেটমোটা একটা শিশু। যেন একরত্তি কঙ্কাল, তার পেছনে একটা শকুন। শিশুটির মৃত্যুর জন্য শকুন অপেক্ষা করছে। কারণ শিশুর শরীরটিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করবে শকুন। কেভিন সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করেছিলেন শিশুটিকে ফেলে কেভিন কী করে চলে এলেন অপরাধবোধ আর অনুতাপের কারণে ভিতরটা রক্তাক্ত হয়েছিল কেভিনের। আসলে কেভিন বুঝেছিল সেই শিশুটির জন্য কিছু করতে না পারা তো সেই বেপরোয়া শকুন হওয়ারই সামিল।

শহরের আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে। অন্ধকারময় বস্তিতে শোনা যাচ্ছে নারী ও শিশুর বীভৎস চিৎকার। গল্পকার প্রেক্ষাপটটা বলার পর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে একটা ডাস্টবিনে নিয়ে গিয়ে। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাস্টবিনের আড়ালে সমাজের প্রান্তেবাসী দুজন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। গল্পকার ডাস্টবিনের প্রসঙ্গটা খানিকটা রূপক হিসাবেই এনেছেন। কারণ তিনি জানেন যে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা মানুষের ঐতিহ্যের বিষয় সেটা অবক্ষয়িত এবং আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হচ্ছে। সেই আস্তাকুঁড়েই সমাজের প্রান্তজ কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যেই গল্পকার মানবতার জয়গান গেয়েছেন।

আমাদের যখন নতুন কোনো মানুষের সাথে পরিচয় হয় প্রথমেই তার নাম জিজ্ঞাসা করি এবং তার সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করি। কিন্তু গল্পকার সেই বিষয়টি প্রাধান্য না দিয়ে গল্পে তারা কোন জাতির প্রতিনিধী সেই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তারা সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী মানুষ প্রথম পরিচয়ে একে অপরকে কীরকম প্রশ্ন করা উচিত সেই শিক্ষার অভাব তাদের মধ্যে উপস্থিত। সেই কারণেই একজন জিজ্ঞাসা করল—'হিন্দু না মুসলমান'[২] অন্যদিকের মানুষটি জবাব দেয়—'আগে তুমি কও'।[৩] Grorges Louis Leclerc Buffon বলেছেন—'The style is the

man himself.'[৪] একটি মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান সবকিছুর উপরই তার ভাষা ও শৈলী নির্ধারিত হয়। আমাদের গল্পে যে দুটি মুখ্য চরিত্র সেই দুজনের পরস্পরের ভাব বিনিময়ের প্রথম বাক্য থেকেই তাদের সামাজিক অবস্থান আমাদের সামনে উঠে আসে। পরস্পরের কথোপকথন এইরূপ—

—বাড়ি কোনখানে?
—বুড়িগঙ্গার হেইপারে-সুবইডায়। তোমার?
—চাষারা-নারাইণগঞ্জের কাছে। কী কাম কর?
—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি?
—নারায়ণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।[৫]

উভয়ের কথোপকথনে যেমন গ্রাম্যতার প্রভাব রয়েছে তেমন রয়েছে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রভাব। গল্পে মুখ্য চরিত্রের মধ্যে একজন মাঝি, অন্যজন সুতাকল মজুর। মাঝি স্থান পরিত্যাগ করতে চাইলেও সুতা মজুর বাধা দেয় তাকে—"আরে না না-উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?"[৬]

সুতা মজুরের বক্তব্যের মাধ্যমে গল্পে যে মানবিক আবেদনটি আছে, এই রকম আবেদন শুধুমাত্র আপন লোকের প্রতি ব্যক্ত করা সম্ভব। সময়ের সাহচর্যে দুজনের পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতায় ধীরে ধীরে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক দূরে সরতে থাকে। উভয়ের পরিচিতি স্পষ্ট হয় এবং একে অপরের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে। তাদের কথোপকথনের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুতা মজুর বলে ওঠে—'বিড়ি খাইবা'[৭] এখানে 'বিড়ি' খাবার আমোদটাকে উপভোগ করবে বলে প্রাণে মৃত্যু-ভয়টাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় তারা। তাই বিড়ি খাওয়ার জন্য ম্যাচবাতিটা জ্বালাতে গিয়ে বলে ওঠে—'সোভান আল্লা!'[৮] সুতা মজুরের বুঝতে বাকি থাকল না মাঝি মুসলমান। নিজে হিন্দু হওয়ায় সুতা-মজুর মাঝির কাছে থাকা পুঁটুলিটার প্রতি ভীতি প্রকাশ করল। পুঁটুলিটার মধ্যে কি আছে তা জানতে চাইল সুতা মজুর। তখন মাঝি জানায়— "পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখানা শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব,জানো?"[৯]

মাঝির এই কথাটায় সুতা মজুর প্রথমে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। কারণ তখনকার পরিস্থিতিটাই এমন ছিল যে বিশ্বাসের থেকে অবিশ্বাসটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল। শুধু সুতা মজুরের মনেই নয় মাঝির মনেও বিশ্বাসহীনতার ভাবটি জাগ্রত হয়েছিল গল্পে। সুতা মজুর ও মাঝির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলে-মেয়েদের কথা, দাঙ্গার কারণে ব্যবসার ক্ষয়ক্ষতি, অহেতুক প্রাণহানি এবং শোচনীয় পরিস্থিতির প্রসঙ্গ ওঠে উভয়ের কথার মধ্যে দিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সূত্রপাত কিভাবে মানবতার জয়গান করে সেই ঘটনাই লেখক আদাব গল্পটির মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

গল্পকার গল্পের প্রেক্ষাপটকে আরও ঘনীভূত করার জন্য আমাদের জানালেন যে আগামীকাল ঈদ। মাঝি যেহেতু মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে গল্পে উপস্থিত তাই মাঝির মধ্যে ঈদ উপলক্ষে যে আবেগ ও অনুভূতিগুলো গল্পকার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেজন্যে মাঝি ছেলে-মেয়েছের জন্য দুটো জামা আর বিবির জন্য একটা শাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বলি হলেও ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে অবিশ্বাসের মেঘ সরে যেতে থাকে, গড়ে উঠতে থাকে অনেকদিনের আত্মীয়তার সম্পর্ক। গভীর আত্মীয়তার সম্পর্কে তারা পাশাপাশি অবস্থান করলেও তাদের মনের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে মৃত্যু-ভয়। পুলিশের বুটের শব্দে শঙ্কিত হয়ে মাঝি ও সুতা মজুর সেখান

থেকে পালানোর চেষ্টা করে নিজেদের জীবন বাঁচাতে। মানুষের বাঁচার লড়াই হল অস্তিত্বের সংগ্রাম, এটাই অস্তিবাদ। অস্তিবাদ অনুসারে দেকার্ত বলেছেন—'I think, therefore I am' অর্থাৎ 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।'[১০] মাঝির নির্দেশ মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তারা পৌঁছায় পাটুয়াটুলি রোডে। ইংরেজ অফিসারের দৃষ্টি এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকে দুজনে। কিছুটা দূরেই মুসলিম এলাকা ইসলামপুর ফাঁড়ি। এই জায়গাটা হিন্দুদের আস্তানা আর ইসলামপুর ফাঁড়ি হল মুসলমানদের আস্তানা। মাঝির এখানে থাকা নিরাপদ নয়, তাই মাঝি সুতা মজুরকে বলে—"তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। কাল সকালে উইঠা বাড়িত যাইবা গা।"[১১]

মাঝির এই বক্তব্যেও গল্পে দ্বিতীয়বার মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতা মজুর হিন্দু হওয়ায় এই স্থানটি তার জন্য নিরাপদ তাই সে সুতা মজুরকে রেখে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের দুজনের মধ্যে মানবিকতার কোনো অভাব দেখা যায় না। এক রাতের মধ্যে তারা একে অপরকে খুব আপন করে নিয়েছে তাই ধর্মভেদের ঊর্ধ্বে উঠে একে অপরের পাশে থাকে তারা সর্বদা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে ইসলামীয় দেহে এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্ক নিয়ে।"[১২]

মাঝিকে পৌঁছাতেই হবে বাদামতলির ঘাটে। তার বাড়ি পৌঁছাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কেননা বাড়িতে ছেলে-মেয়ে, বিবি তার জন্য অপেক্ষারত। ইদ উৎসবটা পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে কাটবে তাই। ঈদের আগে আটদিন ধরে মাঝি বাড়ির বাইরে থেকে অর্থ উপার্জন করেছে। সেই উপার্জিত অর্থে পরিবারের সকলকে সামান্য উপহার দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাবে বলে। সংখ্যাতত্ত্বে বিষয়ে 'আট' একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা কেননা কৃষ্ণ অষ্টম গর্ভের সন্তান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অষ্টম গর্ভের সন্তান, আবার আটে অষ্টবসু আটজন ঋষির প্রসঙ্গ আসছে সেখানে আটদিন ধরে মাঝির ঘরে না ফেরার কথা বলা হয়েছে গল্পে তাই 'আট' সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাঝি যে ঘরে ফেরার কথা বলছে সেই ঘরের তো শুধু চারটে দেওয়াল নয়, সেই ঘরের একটা জীবন্ত সত্তা আছে। সেখানে প্রিয় মানুষেরা থাকে তাই ঘরে ফেরার তাগিদ সে অনুভব করছে। সেখান থেকেই উদ্বেগ আর আশঙ্কা দেখা যায় তার মধ্যে।

গল্পকার আমাদের দেখিয়েছেন উৎকণ্ঠাবশত সুতা মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরেছে। সুতা মজুর হিন্দু হলেও মাঝি তো মুসলমান তখনকার সমাজব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ছিল। আবার যে দাঙ্গা হচ্ছিল সেটাও কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের সংঘষের ফলেই। দাঙ্গার কারণে যেখানে এক শ্রেণির মানুষ অন্য শ্রেণির মানুষের উপর আক্রমণ করছে সেখানে তারা ভিন্ন শ্রেণির মানুষ হয়েও একটা ডাস্টবিনকে আশ্রয় করে একইসাথে বাঁচার চেষ্টা করছে। সেই সময়ের সমাজব্যবস্থায় সুতাকলের শ্রমিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে মাঝিকে বিদায় জানাতে চায় না। কারণ প্রতিনিয়তই তার মনে হতে থাকে মাঝি চলে গেলে সে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়বে। বোঝা যায় তারা দুজনেই যুদ্ধের, মারামারি, হানাহানির বিরোধী। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার কথার কথা বলতে পারি, সেখানে কবি দেখিয়েছেন চার বছর বয়সের একটি মেয়ে তার বাবাকে যেতে দিতে চায় না। বাবার প্রতি ছোটো মেয়েটির আত্মিক টান ও ভালোবাসা রূপ প্রকাশ পেয়েছে কবিতার মধ্যে। তাই সে ম্লানমুখে তার বাবাকে বলে ওঠে—'যেতে আমি দিব না তোমায়'।[১৩] সমরেশ বসুও 'আদাব' গল্পে তেমনি দেখিয়েছে সুতা মজুরের মাঝির প্রতি গভীর টান। এই উপলব্ধি

থেকে সুতা মজুর বলেছে—'কেমনে যাইবা তুমি, আঁ'[১৪] 'আঁ' শব্দটির মধ্যে আবেগময়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'আঁ' শব্দের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই কিন্তু ধ্বনিগত উপাদানে শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এখানে। 'তবুও সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে দিতে হল।'[১৫] তখন মাঝি ধরা গলায় বলে ওঠে—'পারুম না ভাই-পারুম না।'[১৬] অবশেষে বিদায় জানাতে হয় মাঝিকে। পরিস্থিতিটাই তাদের দুজনকে যেন আলাদা করে দিয়েছে। মন না চাইলেও বাধ্য হয়ে কিংবা পরিস্থিতির চাপে পড়ে আলাদা হতে হয়, এটাই হয়তো নিয়তির লীলা। যাবার আগের মুহূর্তে অনুকম্পা মিশ্রিত গলায় মাঝি বলে উঠল—"যাইভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।—আদাব।"[১৭]

বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় সুতা মজুর—'মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে'।[১৮] প্রার্থনার ধরণই বুঝিয়ে দেয় তাদের মধ্যে কতটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এইটুকু সময়ের মধ্যে। চরম প্রাণসঙ্কটের মুহূর্তে খুব নিকট সম্পর্ক ছাড়া এমন শুভকমনা করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। গল্পের দুটি দৃশ্যকে দেখানো হয়েছে—একদিকে গল্পের শুরুতে হিন্দু-মুসলমানেরা যেমন দাঙ্গায় মশগুল তেমনি অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের চিন্তায় মশগুল। সুতা মজুরের চিন্তা-চেতনা তখন শুধু মাঝি কেন্দ্রিক, হয়তো তার বিবি মাঝিকে দেখতে পেয়ে বলবে—"মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ।"[১৯]

অপরের সুখেও নিজের মধ্যে সুখ খুঁজে পায় সুতা মজুর। স্মৃতিচারণ করতে করতে সুতা মজুর দেখল রাস্তার উপর পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে লাফিয়ে পড়ল। নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে গুড়ুমগুড়ুম শব্দ করে উঠল অফিসারের কালাশনিকভ। এই শব্দ থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না দুবার গুলি চালানো হয়েছে। উত্তেজনায় সুতা মজুরের চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার জামা, তার বিবির শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। চারিদিকে নিরাবতা আরও ঘনীভূত হতে থাকল। ফলে মাঝির জীবনের ইতি হল এখানেই। তার ঈদ উপলক্ষে যত প্রত্যাশা ছিল সব অপ্রত্যাশিত থেকে গেল। জীবন আর মৃত্যুর দোলাচলতার সমাপ্তি ঘটল। আমরা ধরে নিতে পারি এর পর থেকে মাঝির বাড়িতে আর কখনোই ইদপালন করা সম্ভব হবে না। কারণ ঈদের আগের রাতটাই তাদের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিল।

আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে যে ভয়াবহ রক্তের দাগ সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ছিল না। কিন্তু লর্ড কার্জন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করল ইংরেজ সরকার। আমাদের কাঁটা তার দিয়ে দুটো ভাগে ভাগ করে দিল। সেই বিভাজনরেখাটা আজও আমাদের মধ্যে মুছে যায়নি। সেই বিভাজনরেখা তৈরি করতে গিয়ে যে সব মানুষদের প্রাণ গিয়েছিল বা যাদের রক্তে আমাদের ভারতভূমি রঞ্জিত হয়েছিল তারই ইতিহাস ফুটে উঠেছে 'আদাব' গল্পে। কিন্তু 'আদাব' শব্দটি যেহেতু সৌজন্য প্রদানকারী একটি শব্দ। যেখানে হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই বা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নজরুলের যে উক্তি—'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'।[২০] সেই প্রবাদ-প্রতিম বাক্যটিও মুহূর্তের মধ্যে নসাৎ করে দিয়েছিল ইংরেজ রাজশক্তির কালাশনিকভগুলি। হিন্দু-মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত ভারতভূমির উপর দাঁড়িয়ে বা দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সমরেশ বসু 'আদাব' গল্পটি লিখেছিলেন। তাই 'আদাব' গল্প একটি মানবতার দলিল এবং মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার প্রথম সোপান।

উৎসের সন্ধানে

১. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', ভূমিকা 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস' "নিম্নবর্গের ইতিহাস", প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২-৩
২. সমরেশ বসু : 'আদাব', "এ কালের ছোটগল্প সঞ্চয়ন"(২য় খন্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৬১
৩. তদেব : পৃ. ১৬১
৪. https://www.goodreads.com/quotes/328670-th -style-is-the-man-himself IST-5:36, 15/05/23
৫. সমরেশ বসু : প্রাগুক্ত পৃ. ১৬১
৬. তদেব : পৃ. ১৬১
৭. তদেব : পৃ. ১৬২
৮. তদেব : পৃ. ১৬৩
৯. তদেব : পৃ. ১৬৩
১০. নবেন্দু সেন সম্পাদিত : 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ : জুলাই ২০২০, পৃ. ৩৬৬
১১. সমরেশ বসু : প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৫
১২. https://www.sillypoint.co.in IST-2:54, 16/05/23
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'যেতে নাহি দিব', "সোনার তরী", বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪২৩ পৃ. ৬১
১৪. সমরেশ বসু : প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৬
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকু : প্রাগুক্ত পৃ.৬২
১৬. সমরেশ বসু : প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৬
১৭. তদেব : পৃ. ১৬৬
১৮. তদেব : পৃ. ১৬৬
১৯. তদেব : পৃ. ১৬৬
২০. https://dukhumia.com IST-1:25, 19/05/23

তথ্যের সন্ধানে

১. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : "নিম্নবর্গের ইতিহাস", প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
২. নবেন্দু সেন সম্পাদিত : 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই ২০২০

আন্তর্জালিক উৎস

১. https://www.goodreads.com/quotes/328670-the-style-i s-the-man-himself IST-5:36. 17/05/23
২. https://www.sillypoint.co.in IST-2:54, 16/05/23
৩. https://dukhumia.com IST-1:25, 19/05/23

ইকোক্রিটিসিজমের ভাবনায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘গাছটা বলেছিল’ গল্প

গনেশ কর্মকার

সাহিত্য সমালোচনার সাম্প্রতিক ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম ধারাটির নাম ইকোক্রিটিসিজম। ইকোক্রিটিসিজম হল সাহিত্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত চর্চা। ইকোক্রিটিসিজমের মূল কথা হল প্রকৃতির প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও মমতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশের ও মানুষের অন্তরঙ্গ নিগূঢ় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জল দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, যন্ত্র ও নগর সভ্যতার শোষণ এবং বিশেষ করে অরণ্য নিধন ইত্যাদির ফলে নানাদিকে প্রাকৃতিক বিপত্তি বাড়ছে। পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ইকোক্রিটিসিজমের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ‘Ecocriticism’ শব্দটির প্রথম উৎপত্তি ঘটে আমেরিকায়। ১৯৮০ সালের পরবর্তী সময় ‘Ecocriticism’ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করি। William Rueckert তার বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘Liteary and ecology : an experiment in the ecocritisisom, Ecocriticism’ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

Cheryll Glot felty’s ‘The Ecocriticism Reader’-এ ইকোক্রিটিজিমকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তাহল—‘‘Ecocriticism Reader is the study of the relationship between literature and the physical environment.’’[১]

ভূ-প্রকৃতির জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবনতি,মানুষের জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, দ্রুত বিভিন্ন প্রজাতি জীবের বিলুপ্তি এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষানুরাগীদের অনেক বেশি এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা দরকার।

‘ইকোক্রেটিসিজম’ বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় পরিবেশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বৈদিক যুগের সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বেদে এই বিশ্ব প্রকৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হতো এবং মনে করা হতো এই বিশ্ব প্রকৃতিই

কোনো-না-কোনোভাবে মানুষের প্রাণ ধারণের চালিকাশক্তি। এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই বেদে বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেছেন মুনি ঋষিরা। এছাড়াও মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে তা বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার পর্যায়ে বা মঙ্গলকাব্যের বারোমাস্যাগুলিতে আমরা ঋতু পর্যায়ের চিত্র দেখি। যেখানে ফুল্লরার বারোমাস্যাতে ঋতু পরিবর্তনের দীর্ঘ বর্ণনা পায়। মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখব প্রায় সমস্ত কবি-লেখক-প্রাবন্ধিকদের লেখাতেই প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে। আসলে প্রকৃতি বা পরিবেশকে বাদ দিয়ে কোন লেখকেরই লেখা বোধ হয় সম্ভব নয়। আধুনিক সাহিত্যে প্রকৃতির ব্যবহার মূলত অনুষঙ্গ হিসেবে। নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা নয়তো নারী রূপের উপমা হিসেবে।

কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের বিভিন্ন রচনার মধ্যে আমরা প্রকৃতি বা পরিবেশ চেতনা লক্ষ করি। বর্তমানে ইকোক্রিটিকরা পরিবেশ সচেতনতার জন্য যা করছেন তার অনেক কাল আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পল্লী প্রকৃতি' প্রবন্ধে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ ও সমাধানের কথা রয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থে ইকোক্রিটিসিজমের আলোচনায় যে নান্দনিক দিকটি রয়েছে সেটিই বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমান প্রজন্মের অনেক লেখকের লেখায় প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উঠে আসছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মনুদ্বাদশ', 'পৃথিবীর শত্রু', লীলা মজুমদারের 'বাতাস বাড়ি', জীবনানন্দের বিভিন্ন কবিতায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কবিতায় এছাড়াও মনোজ বসু, কিন্নর রায়, দেবেশ রায়, ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, নলিনী বেরা প্রমুখের অনেক লেখায় প্রকৃতি ও পরিবেশ নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছিলেন একজন প্রকৃতিপ্রেমিক, তিনি খুব সহজেই প্রকৃতির মধ্যে জৈবিকসত্তা উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তার 'গাছটা বলেছিল' ছোটোগল্পে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছিলেন একজন বহু ভাষাবিদ, কথাসাহিত্যিক। তিনি জীবন ও জগতকে চিনেছেন নিজের মতো করে। কলকাতার ব্যস্ত পরিবেশ ও গ্রাম বাংলার প্রকৃতি এ দুটি পর্যায়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম খোশবাসপুর, মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৪ অক্টোবর ১৯৩০। তিনি দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ভারত সরকারের 'সাহিত্য অকাদেমী' পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্কিম' পুরস্কার এছাড়াও 'ভুয়ালকা' পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়। তার লেখার মধ্যে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। এজন্য অনেকেই কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয় লেখক বলে তুলনা করেন। মুর্শিদাবাদের পাশের জেলা বীরভূম, একই জল হাওয়া তাদের দুজনকেই প্রাণোন্মদনা দিয়েছিল। তাই তারাশঙ্কর বলতেন, "আমার পরেই সিরাজ, সিরাজই আমার পরে অধিষ্ঠান করবে।"

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' গল্পে কতগুলি চরিত্র পায়। কথক, পাতা কুড়ানো বুড়ি, নেলোদা, পাঁচু, থানার দারোগা, ডাক্তারবাবু প্রমুখ। গল্পটি শুরু হচ্ছে এই ভাবে—"বুড়ি গিয়েছিল গাছটার তলায় পাতা কুড়োতে। গাছটা তাকে বলল মর্ মর্ মর্। ভয় পেয়ে বুড়ি পালিয়ে এল আর মরে গেল।"[২] এই গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে একটি গাছ, যা প্রকৃতিকেই ইঙ্গিত করে এবং একটি গাছকে কেন্দ্র করেই এই গল্পের মূল কাহিনি, যা দুটি জাতির হিন্দু ও মুসলমান পাড়ার নো ম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে; যার কোনো নাম নেই, নেই কোনো ফল ফুল। অথচ এই গাছকে কেন্দ্র করেই পুরো গল্পটা। আসলে সাহিত্যের একাধিক অনুষঙ্গে প্রকৃতি বা পরিবেশের যে প্রসঙ্গ পায়—তা কখনো পুরোনো বা মলিন হয়ে যায় না মানুষের অস্তিত্ব এই প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই।

প্রকৃতির মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় সৌন্দর্য। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে এই প্রকৃতির মধ্যেই হারিয়ে যেতে চাই। প্রকৃতি যে সময়ে সময়ে আমাদের সাথে কথা বলে তা লেখক এই গল্পে গাছটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। গল্পে জানানো হয়েছে—"গাছেরা কথা বলে। গাছেরা বাতাস থেকে ভাষা শেখে... কোনও কোনও পাখি যেমন মানুষের ভাষা শেখে, কোনও কোনও গাছেরা ও মানুষের ভাষা শেখে।"[৩]

এই গাছটি মানুষের ভাষায় কথা বলে, তার কথা সবাই শুনতে পায় না যে শুনতে পাই গাছটি থাকে 'মর্ মর্ মর্' বলে সেই মরে যাই। আসলে এই গাছের কথাকে অনেকটা রূপকের ছলে বলা হয়েছে। প্রকৃতি তার নিজের ছন্দে চলে। আর কেউ যদি এই প্রকৃতির নিয়ম মেনে না চলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তা যে-কোনো কারণেই হতে পারে। গল্পটি চারটি পরিচ্ছেদে রচিত। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের তরুণ ডাক্তার বলেছিলেন বুড়ির মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে। ডাক্তার ছিলেন শহরের মানুষ। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিমুখী হয়েছিলেন। তাই তিনি বুড়ির মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক কথাটি বলার পরেও সে কারণে তার একটু কৌতূহল জাগে। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে গাছটার তলায় যান এবং তিনি গ্রামের মানুষ ছিলেন না বলেই বৃক্ষলতার যে নিজস্বতা থাকা সম্ভব এটা তার ধারণায় ছিল না। গাঁয়ের সেরা অবিশ্বাসী সতত উন্নাসিক আর সিনিক এক প্রৌঢ়, শোনা যায় তার সিনিসিজমের উৎস ছিল গাঁজা; যার ফলে অলৌকিকের লৌকিকতা অসহ্য হয়। সিনিক পৌঢ় না কুঁচকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে গাছটার তলায় যায়। গাছটাকে শাসাছিল, মল্ল যুদ্ধের ভঙ্গি করছিল আর গাছটাকে বলছিল—"যদি তোর সাহস থাকে, আমাকে একবার বল মর মর মর।...তারপরেই গাছটা শন শনিয়ে সত্যিই বলল মর মর মর।"[৪]

সেই সিনিক প্রৌঢ় গাছটার গুড়িতে লাথি মারতে গিয়েই পড়ে মরে গেল। লোকেরা পরে আবিষ্কার করে তার মুখের কষায় চাপ চাপ রক্তাক্ত ফেনা।

গাছেরা যে জৈব চরিত্রের তাদের কেউ কেউ ভয়াল নিষ্ঠুর হলেও কেউ কেউ দয়ালু, সহৃদয়। গাছ অনন্ত মৌনের সুন্দর প্রতীক। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় আছে। মানুষের ডান হাত আর বাঁ হাতের মতো। গ্যালাক্সির মধ্যে আমরা যে আছি তারও উল্টো একটা গ্যালাক্সিও আছে। তিনি আরও বলেন গড়ন সমানুপাতিক হওয়া চাই। শব্দ অসমানুপাতিক। এই গাছটা ছিল ফুল ফলহীন কথকের কথায় বৃহন্নলা অর্জুন। এবং এই গাছকে কেন্দ্র করেই একের পর এক মৃত্যু পাতা কুড়ানো বুড়ি, সিনিক প্রৌঢ়, পাঁচু চোর,দারোগা বাবু, সবশেষে ডাক্তার অসীমবাবু আত্মহত্যা করেন। এই গাছ কাটা নিয়ে এবং জায়গা দখলের লড়াইয়ে দুই পক্ষের বেশ কিছু লোক প্রাণ হারায়—"যত্তোসব! এই নাইনটিন এইটটি এইটেও...গুজবে কান দেবেন না। এর মধ্যে একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে। স্রেফ রটনা।"[৫] গ্রামের স্কুল শিক্ষক মঞ্জুর হোসেন এই ঘটনাকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলেন। ঘটনাকে গুজব বলে ব্যাখ্যা দেন। আরও বলেন, এই গাছকে কেটে ফেলার চক্রান্ত। স্কুল মাস্টার আরও বলেন সাধারণের ব্যবহার্য মাটি দখলের চক্রান্ত পুরো ঘটনাকে রাজনৈতিক চক্রান্তে জড়াতে চেয়েছেন—

> গাছটা বারবার বলে থাকবে, মর মর মর। কারণ লোকগুলি মরছিল। চাপ চাপ রক্ত, নো ম্যানস ল্যান্ড লাল হচ্ছিল। প্রকৃতিতে তখন বসন্তকাল, এ সময় মৃত্যু ও রক্তিম সৌন্দর্য হয়।[৬]

আসলে প্রকৃতির রহস্যময়ী। এই গাছকে কেন্দ্র করে একের পর এক মৃত্যু। যারা এই গাছকে অবিশ্বাসী করেছে সেই মরেছে। এমনকী রাজনৈতিকভাবে এই গাছকে কেটে জমি দখলের লড়াইয়ে

যারা মাঠে নেমেছিল তারাও একে একে মরেছে। এই গল্প নিছক রাজনৈতিক তরজা নয় বরং এই গল্পের গাছটা যেন প্রকৃতির প্রতিনিধি হয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে। পরিবেশ বীক্ষা তথা ইকোক্রিটিসিজমের নিরিখে এই গল্পটি পড়লে আমরা সহজেই পরিবেশ ধ্বংসকারী বৃক্ষছেদক মানুষের বিরুদ্ধে যে লেখক প্রতিবাদী, তা বুঝে যায়।

উৎসের সন্ধানে

১. C. Glot felty and H. Fromm (eds) : 'The Ecocriticism Reader : Land Mark's in Literary Ecology, London : University of Georgia press, 1996
২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
৩. তদেব : পৃ. ১১১
৪. তদেব : পৃ. ১১১
৫. তদেব : পৃ. ১১৫
৬. তদেব : পৃ. ১২১

তথ্যের সন্ধানে

১. https://en.m.wikipedia.org>wiki/Ecocriticism
২. সুশান্ত মন্ডল সংকলিত ও সম্পাদিত : 'ইকোক্রিটিসিজম বাংলা সাহিত্য', জানুয়ারি, ২০২১
৩. নবেন্দু সেন সম্পাদিত : সঞ্চিতা বসু 'ইকোক্রিটিসিজম' পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, কলকাতা, রত্নাবলী ২০০৯

দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে পারিবারিক মূল্যবোধের অবনমন

উজ্জ্বল মণ্ডল

দিব্যেন্দু পালিতের (১৯৩৯-২০১৯) জন্ম বিহারের ভাগলপুরে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদশা কেটেছে গ্রামেই। ১৯৫৮ সালে বাবা বগলাচরণ পালিতের মৃত্যুর পর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে চলে আসেন কলকাতায়। তখন সবে সবে স্নাতক পাশ করেছেন। কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই গল্প লেখার হাতেখড়ি। ১৯৫৫ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর প্রথম গল্প 'ছন্দপতন' প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'তে। তখন মন্মথনাথ সান্যাল ছিলেন 'রবিবাসরীয়' বিভাগের সম্পাদক। দিব্যেন্দু পালিতের বয়স তখন সবেমাত্র পনেরো অতিক্রম করেছে; ভাগলপুরে কলেজের দ্বিতীয়-বর্ষের ছাত্র। পরের বছর সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্প 'নিয়ম'। তখন ভাগলপুর থেকে সব গল্পই তিনি ডাকে পাঠাতেন। তারপর প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাবলীলভাবে সৃষ্টিশীল ছিলেন। কলকাতায় আসার পর অভাব-অনটনে কেটেছে, নিজের পাশাপাশি মা-ভাইবোনদের ভাবনাও ছিল। এমতাবস্থায় কখনও কখনও শিয়ালদা স্টেশনে রাতের পর রাত না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু লেখালিখি বন্ধ করেননি। উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ থেকে এমএ পাশ করেন ১৯৬১ সালে। তাঁর কর্মজীবনের সূচনাও হয় সেই বছর। পেশা মূলত সাংবাদিকতা। ১৯৮৭ সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘদিন।

বিশ শতকের ছ'য়ের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে দিব্যেন্দু পালিত নিজেই একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। তাঁর কথাশিল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য এতবেশি যে তাঁকে নির্দিষ্ট কোনো লেখক বা বিশিষ্ট কোনো রচনাশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত বলেও মনে হয় না। যদিও বাংলার কনিষ্ঠ গল্পকারদের তিনি আলবেয়ঁর কামু ও ফ্রান

কাফকার লেখাপত্র পড়বার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, এই দু'জন লেখক বিশ্বসাহিত্যকে অকস্মাৎ বদলে দিয়েছেন। তবে নিজে তাঁদেরকে অনুকরণ করেননি; অনুসরণের সামান্যতম প্রচেষ্টা করেছেন বলেও মনে হয় না। তাঁর লেখায় স্বাতন্ত্র্য এতটাই স্পষ্ট যে, কখনও কখনও মনে হয় এই সমস্ত রচনা আদতে একই লেখকের লেখা তো! দিব্যেন্দু পালিত যেন বারেবারে কলম পাল্টেছেন। পাঠকদের উপহার দিয়েছেন ভিন্নস্বাদের আখ্যান। সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা কথনবিশ্ব। তবে গোড়ার দিকের লেখায় 'পরিশীলিত মন ও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অভাব' ছিল বলেও তিনি মনে করতেন। একইসঙ্গে সেদিনের লেখায় সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রভাবের কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন দিব্যেন্দু পালিত। সমালোচকদের কেউ কেউ তাঁকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী ও লুইজি পিরানদেল্লোর সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর 'গল্প সমগ্র'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কালচিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম খণ্ডে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে লেখা গল্পগুলি স্থান পেয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে জায়গা করে নিয়েছে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত যে গল্পগুলি লিখেছেন সেগুলি। খুব নির্দিষ্ট করে না হলেও এই সময়ের মধ্যে তাঁর লেখার একটি পর্বান্তর লক্ষ করা যাবে। দিব্যেন্দু পালিতের নিজের কথায়—"এই সময়ে ব্যক্তিগত জীবনের কিছু অনিশ্চয়তা বিব্রত রেখেছিল আমাকে, মনও ছিল কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত।"[১] হয়তো নিজের লেখালিখি সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হচ্ছিল তাঁকে। বন্ধ জলাভূমিতে লেগেছিল স্রোতের টান। ২০মে ১৯৮৪ সালে দিল্লির 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় 'Contemporary Bengali Fiction' প্রবন্ধে আশীষ বর্মন লিখেছিলেন—

> Dibyendu Palit has left behind his uncertain early creativity. His language has gradually become very sensitive with an underlying poetic tenor. This style unfolds subtle human nuances both in speech and behaviour pattern of the characters, inter-linking them in a tight and fascinating relationship.[২]

এই সময়টাকে দিব্যেন্দু পালিত নিজে চিহ্নিত করেছেন ১৯৬৪-৬৫'র আগে এবং ওই সময়ের পরে—"ভালো হোক বা মন্দ, দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলি যে একান্তভাবেই আমারপরিবর্তনের চিহ্নবাহক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো।"[৩] সম্প্রতি সমালোচক বিশ্বদীপ দে 'দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্প আজও অপরাজিত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন দিব্যেন্দু পালিত "মানুষের দ্বিচারিতা থেকে কাপুরুষতা, ক্ষমতার সামনে নুইয়ে পড়া অসহায়তা, বিবেক দংশনের মতো বিষয়কে গল্পে এনেও তিনি শিল্পরূপকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেননি। গল্প লিখতে গিয়ে 'মেসেজ' দেননি, গল্পই লিখেছেন।"[৪] একটু গভীরে ভাবলেই আমরা অনুধাবন করতে পারি মন্তব্যটি অত্যন্ত সরলীকৃত। মেসেজ তিনি দিয়েছেন। মেসেজ দিলেই যে গল্পের গল্পত্ব নষ্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। মেসেজ দিতে গিয়ে গল্পরস আনতে ভুলে যাননি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

> একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও সম্পর্ক ছাড়া বহির্জগতে প্রত্যেককেই কোনও না কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। এদের প্রভাব, অর্থাৎ নিজের সমকালকে এড়িয়ে চলা কি সম্ভব...আমার ধারণা যে-সমাজ, সময় ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে আমি লিখছি, লেখার মধ্য দিয়ে সে-সম্পর্কে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি করাই আমার কাজ।[৫]

নইলে 'লোকসভা বিধানসভা'র মতো অনবদ্য ছোটগল্প লিখতে পারতেন তবে তাঁর প্রিয় বিষয় শহুরে জীবনের অনিশ্চয়তা, হতাশা। নগর-সভ্যতা, নাগরিক মানুষের মনের জটিলতা, অসহায়তা,

নিরুপায়তার আখ্যান সৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— "তিনি বিশেষভাবে নাগরিক জীবনের রূপকার। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা, ঊর্দশ্বাসগতি, আর সেই গতিতে ধাবমান নরনারী উঠে এসেছে তাঁর কলমে।"[৬] নাগরিক মনন ও তার পলায়নী মনোবৃত্তি দিব্যেন্দুর কথাশিল্পের প্রধান উপজীব্য। সেই সব নাগরিক অবক্ষয়ের কথন ধরা পড়েছে 'ঘরবাড়ি', 'সোনালী জীবন', 'ঢেউ', 'সহযোদ্ধা', 'আমরা', 'অনুভব', 'সোনালী ঘড়ি', 'পেট' প্রভৃতি রচনায়। নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিক দ্বন্দ্বকে সূক্ষ্মমাত্রায় ধরতে চেয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত। যে লেখাগুলোর জন্য তাঁকে পাঠকমহল একবাক্যে চেনে, প্রতিনিধিস্থানীয় সেই রচনাগুলির বেশিরভাগই নাগরিক জীবনের আলেখ্য। আজকে আমাদের আলোচ্য 'মুখগুলি' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

দিব্যেন্দু পালিতের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক 'সাহিত্য সংস্থা'। বইটিতে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৮০ সালের অন্তর্বর্তী মোট বাইশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। সেখানেও জায়গা করে নিয়েছে ছোটগল্প 'মুখগুলি'। গল্পটি ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে (১৯৮৬) সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে নাগরিক জীবনের সংকট দেখানো হয়েছে। নাগরিকতার প্রাথমিক শর্তই হল ছোট-ছোট পরিবার। আজকের দিনে আমরা যাকে 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি' বলছি। যেখানে যৌথপরিবার ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশ। একান্নবর্তী পরিবারের তুলনায় সদস্য সংখ্যা সেখানে অনেক কম। স্পষ্ট করে বললে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে তাদের একটি বা দুটি ছেলেমেয়ে—এই হল তাদের পরিবার। উপার্জনের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে সরকারি বা বেসরকারি অফিসের মাস-মাইনের চাকরির ওপর। কর্মজীবনের ব্যস্ততায়, পারিবারিক স্বার্থে মানুষ হয়ে পড়ছে অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বভাবভীরু প্রকৃতির। সত্যটা জেনেও সে তার মুখোমুখি হতে চায়না। আমাদের আলোচিত গল্পে একজন মা ও তার বড়-ছেলে দিবাকরের মধ্যে মানসিক দূরত্বকেই দেখানো হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসাররা খিদিরপুরে একটি বৃদ্ধাশ্রম চালায়। স্বামীর মৃত্যুর পর পাঁচ সন্তানের কারোর কাছে আশ্রয় না পেয়ে তাদের মায়ের জায়গা হয় সেই ওল্ডেজ হোমে। বৃদ্ধা মা'কে হোমে পাঠিয়ে পাঁচ সন্তানই নিশ্চিন্তে থাকতে চায়। একটি প্রবাদ আছে, 'ভাগের মা গঙ্গা পায়না'। এখানে সুধার অবস্থা একেবারে সেরকমটাই। চমৎকার লিখেছেন দিব্যেন্দু পালিত—

> সুধা এরপর শাটল কর্ক হয়ে গেল। কোর্টের দু'দিকে পাঁচ ছেলেমেয়ে ও তাদের সংসার র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে। আকাশতোলা হয়ে ঘুরে বেড়ায় সুধা। কখনও বালিগঞ্জে, কখনও ভবানীপুরে, কখনও বাগবাজারে, কখনও রিষড়ায়।[৭]

নিছক দায়িত্ব পালনের খাতিরে সকলেই মায়ের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা করে। কর্তব্যবোধের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত মায়ের জন্য কেউ নাড়ির টান অনুভব করেনা। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে বাৎসল্যের সম্পর্কটুকু থাকে তা এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। তবে সন্তানদের মধ্যে দিবাকর একটু ব্যতিক্রমী চরিত্র। অবশ্য অন্য কোনো চরিত্রকে গল্পকার খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। তাই এ গল্প দিবাকর ও তার মা সুধার গল্প। দিবাকর দ্বিধাগ্রস্ত নাগরিকমনস্ক চাকুরীজীবি। গল্পে দিবাকরের আত্মদর্শন ঘটেছে। তাই গল্পটিকে দিবাকরের আত্মদর্শনের গল্প বললেও চলে। দিবাকরের চোখ দিয়ে দিব্যেন্দু পালিত যেন পাঠকের মনের ভিতরে ঢুকে পড়েন; আমাদের সকলের মুখের সামনে একটি আয়না ধরেন। দিবাকরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আত্মদর্শন ঘটে যায়। দ্বিতীয়ত নাগরিক জীবন ও নাগরিক মনন স্বতন্ত্রভাবে প্রভাবিত করেছে গল্পের মানব-মানবীদের। মহানগর কলকাতা স্বতন্ত্র একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে গল্পে। যা দিবাকরকে তার মায়ের কাছ থেকে অনেক যোজন দূরে

সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু দিবাকরকে গল্পকার খলচরিত্র হিসেবে দেখাতে চাননি। তাহলে গল্পটি এমন শৈল্পিক মর্যাদা পেতনা। গল্পের শুরুতেই দেখবো মায়ের চিঠি এসেছে। সে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, টাই বাঁধা শেষ, অত্যন্ত ব্যস্ত। তবুও মায়ের চিঠি সে খোলে "এবং পড়ার জন্য ব্যস্ত"[৮] হয়ে ওঠে। চিঠিটা পড়ার পর মায়ের অভিমান ভরা চোখদুটো ভেসে ওঠে তার সামনে। কিন্তু নাগরিক অভ্যস্ততায় অচীরে তা মিলিয়েও যায়। কেবল—"বহুদূর ব্যাপ্ত বাড়ি, জলের ট্যাঙ্ক, টি-ভি'র অ্যানটেনা ও গাছগাছালির দৃশ্য প্রতিদিনই যা দেখায় তার চেয়ে বেশি কিছু দেখাল না। শুধু এক রকম শূন্যতা অন্যমনস্ক করে দিল তাকে।"[৯] বাংলা ছোটোগল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ছোটগল্প হচ্ছে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিনব বস্তু'। এবং প্রতীতিজাত 'যন্ত্রণার ফসল'। 'অভিনব' কেননা তা মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভুতিগুলোকে বড়ো করে দেখায় এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার সাহস রাখে। কতকম পরিমাণ উপাদান (minimum materials) নিয়ে কতবেশি মাত্রায় প্রতিক্রিয়া (maximum effect) সৃষ্টি করতে পারে তার উপরেই ছোটগল্পের সার্থকতা নির্ভর করে।

অন্যদিকে 'যন্ত্রণার ফসল' অর্থে ছোটগল্প যে হৃদয়বেদনাজাত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। একটি সামান্য সমস্যাও হতে পারে ছোটগল্পের বীজ—"A short story usually presenting the crisis of a single problem."[১০] যা কিনা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সামিল। 'মুখগুলি' গল্পটি এদিক থেকে সার্থক রচনা। যাইহোক দিবাকর সত্যিটা জেনেও এড়িয়ে যেতে চায়। মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সমাধান করতে চায়না। দিবাকরের মধ্যে অপরাধ-বোধও কাজ করে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। তাই সে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতায় যেতে চায়না। যেখান থেকে মা তাকে সমস্যাটা খুলে বলতে পারবে। তবে সুধা যে তার মনের কথা কখনও বলেনি তেমনটাও নয়। একরকম করে সুধা যেন বলে দেয় কখনও বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হবে ভাবিনি। দিবাকরের মনে পড়ে মাসখানেক আগে বৃদ্ধাশ্রমে মা একদিন বলেছিল, "চিরকাল তোদের মুখগুলোই চিনে রেখেছি, কখনও তো একা থাকিনি।"[১১] সেকথায় আমল দেয়নি দিবাকর। এর পেছনে আছে ওই নাগরিক জীবনের অভ্যস্ততা। নাগরিক মন ব্যক্তিসুখকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়। দিবাকর আত্মপক্ষ সমর্থন করতে থাকে। কিছু দুর্বল যুক্তি সাজিয়ে নিজের মধ্যেই তৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করে। মায়ের জন্য সে চিঠির খাম কিনে দেয়। যাতে মা চিঠি লিখতে পারে।

সবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। অথচ নিজের দামী কলমটা মায়ের হাতে পড়লে নষ্ট হতে পারে ভেবে ড্রাইভারের কাছ থেকে অন্য একটা কলম চেয়ে এনে মাকে দেয়। সুধা তো এসব কিছুই চায়না। সে নিজের পরিবারের সঙ্গে নাতি-নাতনিদের নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে চায়। এমতাবস্থায় তাকে ওল্ডেজ হোমে কাটাতে হচ্ছে, সন্তানদের কাছে অভিপ্রেত নয় এমন অনেক কিছুই সে পাচ্ছে। ডাক্তার তাকে স্বল্পাহার করতে বলেছে। কিন্তু সুধা খেতে বড্ড ভালোবাসে। উমা ও বিনীতার কথোপকথনে উঠে আসে "এত খেলে আবার হার্ট অ্যাটাক হবে।"[১২] যেন কত শুভাকাঙ্ক্ষী, কত সচেতন তারা তাদের শাশুড়ির স্বাস্থ্য নিয়ে! সবই লোকদেখানো, সুধাকে নিজেদের কাছে রাখার ব্যাপারে তারা একবারও মাথা ঘামায় না। কমবেশি প্রত্যেকটি চরিত্রই নাগরিক মনস্কতার পরিচয় দেয়। সেখানে বিনীতা তার শাশুড়িকে 'আপনি' সম্বোধন করতেও সংকোচ করে। ভাইবোনদের একে অপরের সঙ্গে, একই পরিবারে সদস্যের মধ্যেও সম্পর্ক মধুর নয়। মায়ের জন্য হোমে নির্ধারিত টাকা দেওয়ার কথা দিবাকরের ভাই ভাস্করের। দিবাকর এ ব্যাপারে জানতে

চাইলে বিনীতা বলে "তোমার ভাই তুমিই বলো, আমাকে জড়াচ্ছো কেন"[১৩] দিবাকরের মতন বিনীতাও ব্যক্তিসুখকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। নাতনি টুংকার প্রশ্ন "ঠাকুমার ল্যাঙ্গুয়েজের পিকিউলিয়ারিটি?"[১৪] নিয়ে। আসলে তার মানসিক গঠনটাই এমনভাবে তৈরি হয়েছে। ঠাকুমার অনুভূতিটা সে ধরতেই পারেনা। হৃদয় দিয়ে তারা সুধাকে বোঝার চেষ্টা করেনা। সকাল থেকে শুরু করে কী কী খাবার মায়ের জন্য প্রয়োজন তা ভেবেই মরে। কিন্তু সুধার একান্ত চাওয়া-পাওয়া তারা বুঝতে পারেওনা, বুঝতে চায়ও না। বিপলু যখন খাওয়ার টেবিলে বসে প্রশ্ন করে "ঠাকুমা তো মাছ, ডিম খায়না। তার বদলে কিছু দেবে না?"[১৫] এই প্রশ্ন দিবাকর হয়তো এর আগে নিজেকে অনেকবার করেছে। উত্তর পায়নি। ছেলেকে কী উত্তর দেবে অফিস থেকে ফিরে "দিবাকর অ্যাটাচিটা এমনভাবে নামলো যেন বুক থেকে পাথর নামাচ্ছে।"[১৬] বা "তখন হালকা হবার জন্যেই গলার নটটা আগে খুলল।"[১৭]

তথাকথিত নাগরিক শিক্ষিত মানুষকে একটু খোঁচাও দিতে ছাড়েননি লেখক। টুংকার প্রশ্নের জবাবে দিবাকর বলেছে "ঠাকুমা তোমাদের মতো স্কুলে যায়নি, লেখাপড়া শেখেনি।"[১৮] পক্ষান্তরে দিব্যেন্দু পালিত কি আমাদের এটাই বললেন যে তোমরা তো এত লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ছেলেমেয়ে, তোমরা ঠাকুরমার লেখাটার এই অর্থ করলে এই শিক্ষা নিয়ে গর্ব করো তোমরা ঠাকুমার কথার আক্ষরিক দিকটিই এখানে তোমাদের চোখে পড়লো নাগরিকতায় দূরদৃষ্টি এতটাই কম যে গভীর ব্যঞ্জনা তারা অনুধাবন করতে পারে না। 'টুংকা, বিপলুর কি আজকাল পরীক্ষা হয়'—মানে সুধা জানতে চায়, তার স্নেহের নাতি-নাতনিরাও কি খুব ব্যস্ত তাদেরও কি ঠাকুমার জন্য মন খারাপ করেনা তারা কেন আসে না কিন্তু টুংকা এভাবে ভাবতেই পারে না। সমস্ত চরিত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে সুধা। নিজেকে দায়মুক্ত করে বাবা-মা'কে অন্যের ঘাড়ে চাপানোই যেন ছেলেমেয়েদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, ভালো থাকা বিষয়ে তাদের চিন্তা নেই। যেটুকু আছে তাও সৌজন্যবোধের খাতিরে।

নেহাত মা, না গেলেই নয়—তাই সবাই গিয়ে দেখা করে আসে। ফল, বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে আসে। সুধা সব বুঝতে পারে। নিজের কষ্টগুলোকে অদ্ভুতভাবে আড়াল করে। অহেতুক মুচকি হেসে ব্যাপারটা লঘু করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবসময় চেষ্টা করলেও মনের কথাগুলো গোপন থাকেনা। দিবাকরের সামনেই বলে ফেলে "মজার জায়গাতেই এসেছি বটে! পেটের ছেলেকেও ভিজিটার বলে!"[১৯] এই লাইনটাই সুধার মৃত্যুর পরে লেখক আবার ব্যবহার করেন মোক্ষমভাবে। দিবাকর ভাবতে থাকে "পেটের ছেলেকে ভিজিটর বলায় একদিন খুব মজা পেয়েছিল।"[২০] সুধা মোটেও মজা পায়নি। আসল খোঁচাটা গিয়ে বিঁধেছিল দিবাকরের বুকে। তাই কথাটা আবার তার মনে পড়েছে। সুধা এমন একটা ভাব করত যেন সব ঠিক আছে। অথচ আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না যে, সুধা কেবল চেয়েছিল শেষজীবনে সন্তানদের কাছে থাকতে। সন্তানেরা বুঝতে চায়নি, কিম্বা বুঝতে পারলেও ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে গেছে। মানুষ মানুষের সহচর্যই কামনা করে। হোমে কথা বলার মতো কয়েকজন মানুষ পেয়ে যায় সুধা।

কৌশল্যা দি, গিরীনবাবু, চারুদি'কে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমেই সুধা নিজের পরিবার গড়ে তুলেছে। দিবাকর বা তার ভাইবোনেরা এদের কোনোভাবেই চিনত না। অথচ সুধা অনায়াসেই তাদের সম্পর্কে দু'চার লাইন লিখত। কেননা সুধার কাছে এই মানুষগুলো অত্যন্ত পরিচিত। কৌশল্যাদির মৃত্যুর খবরটা পড়ে দিবাকরের প্রতিক্রিয়া, "বাহান্ন বছর বয়সে শুধু জুলপিতেই পাক ধরে না, চলে

যাওয়া রোদের স্মৃতির মতো মৃত্যু ভাবনাও উঁকি দিয়ে যায় মাঝে মাঝে।"[২১] দিবাকর মায়ের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে শঙ্কিত হয় না কি দিব্যেন্দু পালিত দিবাকরের অনির্দেশ্য ভবিতব্যকে যেন একঝলক দেখিয়ে দেন। নামকরণের প্রসঙ্গে বলা যায় কেবলমাত্র অবহেলিত সুধার মুখ নয়। কোনো নির্দিষ্ট একটি মুখ নয়, মুখগুলি। এ গল্প একটি সুধার গল্প নয়, সুধাদের গল্প। মানসিক দূরত্বের কারণে দিবাকর যেমন তার মাকে চিনতে পারে না। তেমনি বেঞ্চিতে বসে থাকা মুখগুলিকেও পাঠক আলাদা করতে পারেনা। দিবাকর যেন বর্তমান শতাব্দীর পাঠক নিজে। দিবাকরের চোখ দিয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকা মুখগুলি একলাইনে পড়ে নেয় আজকের পাঠক—সুধাদের মুখ। সমাজের উদ্দেশে লেখকের বার্তা, দিবাকরের সত্তা থেকে পাঠক যেন নিজেকে আলাদা করতে পারে। সচেতনভাবে নিজের মাকে চিনতে শেখে। নিজের মা যেন অনেক মুখের আড়ালে হারিয়ে না যায়। মুখগুলি নয়, একটি মুখ হয়েই মা যেন সন্তানের নিকট প্রতিভাত হয়!

উৎসের সন্ধানে

১. দিব্যেন্দু পালিত : 'গল্পসমগ্র' ২, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৫৩৩
২. তদেব : পৃ. ৫৩৪
৩. দিব্যেন্দু পালিত : 'গল্পসমগ্র' ১, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭, পৃ. ৪৭৩
৪. বীজেশ সাহা সম্পাদিত : 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা, ১-১৬ জানুয়ারি ২০২৩ (বর্ষ ৮ সংখ্যা ৫-৬), পৃ. ১৫৯
৫. উৎস-১, পৃ. ৫৩৩
৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : 'কালের পুত্তলিকা', কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৫০১
৭. উৎস-১, পৃ. ২১৮
৮. তদেব : পৃ. ২১৭
৯. তদেব : পৃ. ২১৭
১০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২৫, পৃ. ১৭২
১১. উৎস-১, পৃ. ২১৮
১২. তদেব : পৃ. ২১৮
১৩. তদেব : পৃ. ২২১
১৪. তদেব : পৃ. ২২১
১৫. তদেব : পৃ. ২১৯
১৬. তদেব : পৃ. ২২১
১৭. তদেব : পৃ. ২২১
১৮. তদেব : পৃ. ২২১
১৯. তদেব : পৃ. ২১৯
২০. তদেব : পৃ. ২২৩
২১. তদেব : পৃ. ২১৮

নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্পে অবক্ষয়িত সময় ও সমাজের চিত্র : নির্বাচিত দুটি গল্প অবলম্বনে

মনিরা খাতুন

নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪) এমন একজন লেখক যাঁর রচনার কোন পূর্বসূরী নেই। এখনও পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য ধারার কোনো উত্তরসূরী চোখে পড়ে না। তিনি ষাট-সত্তরের দশকের লেখক হিসাবে পরিচিত। এক ভিন্নধর্মী কথাকার তিনি। বিশ শতকের শেষভাগে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক লেখালেখি শুরু হয়। লেখা অর্থকরী পেশা হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে। ফলে লেখার মান অপেক্ষা অর্থের দিকটা অধিক বিবেচিত হয়। পাঠকের 'খাওয়া'র উপর নির্ভর করে লেখক নির্বাচন করতে শুরু করে প্রতিষ্ঠানগুলি। ফলে লেখকের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্র হয়ে পড়ে সীমিত। এর মধ্যে যেসব কথাকার নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চান, তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। নবারুণ ভট্টাচার্য তেমনি এক প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখক, লেখা তাঁর কাছে চিন্তার উপাদান, চিন্তার ফসলযে চিন্তা গঠনমুলক, বিনোদনী নয়। আসলে তাঁর আপত্তি সেখানেই, যেখানে সাহিত্যের ধার কমে যায় প্রতিষ্ঠানের নোনা হাওয়ায় মরচে পড়ে। কারণ সাহিত্যই তো একমাত্র মাধ্যম যা মানুষের বিবেক, সৎবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারে। সেইজন্য তাঁর লেখায় লুকিয়ে থাকে বিস্ফোরক পদার্থ যা অপেক্ষা করে পাঠকের মনের আগুনের জন্য। আর এই দুটি যখন একত্রিত হয় তখনই ঘটে বিস্ফোরণযা চিন্তার অচলায়তনকে ভেঙ্গে দিয়ে বইয়ে দেয় চেতনার নতুন স্রোতধারা। লেখাকে তিনি সময় কাটানোর পন্থা হিসাবে দেখেননি, এটা একটা সমর প্রাঙ্গন। যেখানে তাঁর কাজ পাঠককে জাগ্রত করা, সচেতন করা। তাই বলা যায়, সত্তরের অগ্নিগর্ভ পরিবেশ থেকে রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো যেসকল ভিন্নধর্মী লেখক উঠে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নবারুণ ভট্টাচার্য।

নবারুণের সাহিত্য রচনার প্রথম থেকেই শোনা যায় এক নতুন স্বর। বক্তব্য এবং বলবার ভঙ্গি দুটোই অভিনব। তাঁর গল্প অনায়াসে সাবলীলভাবে পড়ে

ফেলা যায় না। বার বার থামতে হয়। লেখকের দর্শন এবং বক্তব্যকে বুঝতে হয়। তিনি 'ভাতঘুম' সাহিত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর গল্পের প্রতিটি দৃশ্যে আছে প্রবল ঝাঁকুনি, যা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। আসলে তাঁর গল্পগুলিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে যে সময়ের দোলাচলতা, সেই বৈশিষ্ট্য মূলত সত্তর ও তার পরবর্তী দুই দশকের নির্ধারিত, এই সময়ের ব্যাখ্যায় তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন—

> সত্তর ও পরবর্তী দুটি দশকে সাধারণভাবে ভারতীয় এবং বিশেষভাবে বঙ্গীয় পৌর-সমাজে এত বেশি ভাঙনের প্রক্রিয়া নির্বাধ হয়ে উঠেছিল যে স্বাভাবিক সময়োচিত পরিবর্তন সত্ত্বেও দীর্ঘদিন অটুট থাকা বাস্তবের আদলও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক সমাজের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব বিশ্ব পুঁজিবাদের দীর্ঘায়ত ছায়ায় ক্রমশ অবতারিত হয়ে ওঠায় পৌর সমাজের স্তরে স্তরে সংক্রামিত হল বিষক্রিয়া। এই তিন দশকে মূল্যবোধের কোনও চিরাগত আকরন আর অক্ষত রইল না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসে দেখা গেল তীব্র ও জটিল অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও সর্বব্যাপ্ত সংশয়।[১]

অর্থাৎ সময়টা অন্যরকম। চারিদিকে আতঙ্ক-অন্তর্ঘাত-সংঘর্ষ-অস্থিরতা-হল্লা। আকাশে বাতাসে সমাজ বদলের শ্লোগান। তারই সঙ্গে বারুদের গন্ধ, গুলির শব্দ, পুলিশের ভারী বুটের শব্দ। এমনই পোড়া ঝলসানো সময়, ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ তাঁর রচনার ক্যানভাস। বাংলার অন্যরকম একটা সময়ে অন্যরকম গল্প নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটল নবারুণ ভট্টাচার্যের। ব্রয়লার পত্রিকার ব্রয়লার সাহিত্যের আঙিনায় তিনি উড়িয়ে দিলেন হালাল ঝান্ডা।

নবারুণের প্রথম গল্প 'ভাসান' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায়। গল্পটি রচিত হয়েছে সাধু গদ্যে, একজন মৃত মানুষের জবানিতে। গল্পের প্রধান চরিত্র একজন পাগল। লোকচক্ষুর আড়ালে মৃত্যু হয়েছে তার। এক পাগলি তাকে ভালোবেসে আঁকড়ে রাখতে চাইছে। আর সেই মৃত পাগলের অনুভবের ভাষ্য এই গল্প। নবারুণের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসহন্তা সময় ও সমাজকে তুলে ধরা। তাই এই গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তির প্রতিটি বাঁক বদলে ধরা পড়েছে সেই অবক্ষয়িত সময় ও সমাজ। কাহিনির শুরুতে দেখা যায়, দেবী দুর্গার বিজয়া দশমীর যাত্রা হয়—

> যে ট্রাকে করিয়া রাত্রির আঁধারে ভূতের ন্যায় দুর্লভ চালের বস্তারা শহর ঘুরিতে বাধ্য হয় সেই ট্রাকে। দিনের বেলায় উহারা বাহির হইতে পারে না। তাই মধ্যরাত্রেই উহাদের গুদাম হইতে গুদামে চালাচালির প্রশস্ত সময়।[২]

সাবলীল ভাষায় রচিত এই একটা ছোট্ট লাইনে সমাজের অন্ধকার দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী শ্রেণির কালোবাজারি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তোলেন লেখক। পাগলের মৃত্যুর পর পার্কের অপর এক বাসিন্দা পাগলি তার পাশে বসে কাঁদছে এবং কুকুর, বিড়ালের হাত থেকে পাগলের মৃতদেহকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পাগলি কান্নার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন গাইছিল, সেটা শোনার ইচ্ছা থাকলেও পাগল তা শুনতে পায়নি। কারণ যে পার্কে তার মৃত্যু হয়েছিল তার সামনেই ছিল বড়ো রাস্তা। সেখানে বড়ো বড়ো বাস, ট্রাম, এমনকী যুদ্ধের সময় কনভয়ও চলে। রাস্তার এই কোলাহলতা যেন ইঙ্গিত করে সমাজের উত্তাল অবস্থাকে। আসলে সে সময়ে পুলিশি তাণ্ডব, গণতান্ত্রিক অত্যাচার সবকিছু মিলিয়ে রাজনীতির আঁচে উত্তপ্ত ছিল সমগ্র বঙ্গদেশ, নবারুণের গল্পের আধার নগর কলকাতাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সেই টালমাটাল পরিবেশে মানুষের মনে প্রণয়ের অবকাশ ছিল না। পাগলি ও গল্পকথক একই পার্কের বাসিন্দা। পাগলি তার অপরিচিতা

নয়। অথচ কখনও তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়নি কথক। তার কারণ এই সময় ও সমাজের উন্নতা। পার্কের বেঞ্চ যাদের একমাত্র ঠিকানা। কুড়িয়ে পাওয়া বস্ত্র, অন্ন দিয়ে যারা যাপন করে জীবন, প্রনয় তাদের কাছে বিলাসিতা মাত্র।

পাগলটি কুকুর বেড়ালের হাত থেকে কথকের মৃতদেহকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সে দেখতে পায়নি ডেঁও পিঁপড়ের দলকে। যারা পাগলের মৃতদেহে ডান চক্ষু ও বাঁ চক্ষুর মধ্যে গোপন পথের সন্ধান দিয়েছে। এবং নাক ও কান, কান ও চোখের মধ্যে নতুন পথের সন্ধানে ব্যস্ত। তাদের সেই ব্যস্ততার মধ্যে কথক শুনতে পেল তাদের উল্লাসধ্বনি—'কী আনন্দ! কী আনন্দ!' কারণ অনেকদিন পরে তারা মনুষ্য চক্ষু খাবার সুযোগ পেয়েছে। ঠিক সেই সময় কথকের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে এক রাজনৈতিক মিটিং এর কথা। যেখানে একটি লোক বলেছিল 'সকলের খাইবার দাবি'র কথা। লোকটির হাতে ছিল লাল পতাকার উপর কাস্তে হাতুরি আঁকা। নবারুণ ছিলেন আমৃত্যু বামপন্থী, মার্কসিস্ট। কিন্তু সরাসরি কোন দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সরকার ও ক্ষমতার থেকে বহুদূরে অবস্থান করেছেন তিনি। তবুও তাঁর রাজনৈতিক উপলব্ধি, রাজনৈতিক দর্শন চুপিসারে ঢুকে পড়েছে লেখার মধ্যে। এরপরেই কথকের স্মৃতিতে হানা দেয় এক শীতের রাত্রি। একটা গাড়ি থেকে দুটি লোক পোঁটলায় বাঁধা একটি শিশুকে পার্কে ফেলে দিয়ে যায়—

> এক অতি ক্ষুদ্র শিশু। চোখ হয় নাই, নাক নাই, এইটুকু ছোট্ট আলুর ন্যায় মাথাআমার বড় মায়া হইল। সারারাত উহার পাশে বসিয়া পাগলির মতো ঠ্যাঙা লইয়া কুকুর তাড়াইয়া ছিলাম...আমার কেন জানি না মনে হইয়াছিল আমিই এ শিশুটির পিতা। উহাকে কুকুরের ক্ষুধা মিটাইতে দিব না।[৩]

কথকের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠা এই খণ্ডচিত্রের মধ্যে প্রখর বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন লেখক। আসলে সময় সচেতন লেখক ঝড়ের মাঝে চোখ বুজে হাঁটতে শেখেনি। ফলস্বরূপ সমাজের প্রতিটি দিক নিখুঁত ভাবে ধরা পড়েছে গল্পের পরতে পরতে। ঝলসে যাওয়া সময় ও সমাজের পটভূমিতেও কিছু মানুষ ছিল যৌনতার আসক্ত। তার জ্বলন্ত উদাহরণ ছুঁড়ে ফেলা নিরপরাধ শিশুটি। অন্যদিকে শিশুটিকে দেখে কথকের মধ্যে জেগে উঠেছে পিতৃত্ব বোধ। আমরা জানি গল্প কথক পাগল তবুও তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে স্বাভাবিক মানবিক উপলব্ধি। একদিকে সমাজের উচ্চবৃত্তের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যদিকে প্রতিমুহূর্তে কঠিন জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেও সাধারণ মানুষের মধ্যে মরে যায়নি মনুষ্যত্ব বোধ, সচল রয়েছে তাদের মানবিক প্রবৃত্তি। অবহেলিত, দুর্বলের প্রতি নবারুণের ছিল বিশেষ আকর্ষণ। তাই তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র কখনো সভ্যতার অসুখে আক্রান্ত আবার কখনো তার মানসিক সুস্থতা পর্যন্ত থাকে না। তবুও তাদের মধ্যে মানবিকতার প্রকাশ ঘটাতে ভোলেননি কথাকার।

গল্পের শেষে দেখা যায় একটি কালো গাড়ি ও দুটি লোক। যারা স্ট্রেচারে করে শিশুটিকে নিয়ে গিয়েছিল তারা আবার এসেছে কথকের মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য। পার্থক্য একটাই লোক দুটি আগের থেকে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ কাজের পরিবর্তন হয়নি, শুধু চড়েছে বয়সের পারদ। মানুষের যান্ত্রিকতার দিকটি এখানে স্পষ্ট। গল্পের একেবারে শেষলগ্নে কথকের অনুভব—'মনে হইল পাগলিকে আমি বড়ো ভালোবাসি।' গল্পের শুরুতে জেনেছিলাম কথক পাগলিকে কোনদিন ভালোবাসেনি। কিন্তু গল্পের সমাপ্তিতে ঘটেছে মনের পরিবর্তন। ভালো না বাসার অনুভূতিটি ছিল তার জীবিতাবস্থায়। আর মৃত্যুর পরে হয়েছে ভালোবাসার উপলব্ধি। বস্তুত সময় ও সমাজের উত্তালতায়, জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় চাপা পড়েছিল মানুষের অনুভূতি, উপলব্ধিগুলি। কিন্তু

মৃত্যুর পরে থেমে গেছে সমগ্র সংগ্রাম। টিকে থাকার লড়াই আজ আর নেই। মনে নেই কোন ক্ষোভ, কোন ক্রোধ। তাই মনকে স্পর্শ করেছে ভালোবাসা। পৃথিবীটা আজ আর বিভীষিকাময় নয়, পৃথিবী সুন্দর—'মরা চোখে দেখিতেছিলাম পৃথিবী কী সুন্দর! আমারই মতো।'[৪] অর্থাৎ ষাট ও সত্তরের দশকে সমাজে যে ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বপুঁজিবাদের যে দীর্ঘায়ত ছায়া পড়েছিল তারই ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসে যে তীব্র ও জটিল অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, সর্বব্যাপ্ত সংশয় দেখা গিয়েছিল তারই ভাষ্যরূপ 'ভাসান' গল্পটি।

সময়ের চূড়ান্ত ক্ষয় আর ভাঙনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় মানুষের যে কোন সময় পায়ের তলা থেকে সরে যেতে পারে মাটি, যে কোনো সময়ে সে তলিয়ে যেতে পারে অতল গহ্বরে। এই অসহায়তাবোধ, নিরাপত্তাহীনতা ঘিরে আছে প্রতিটি মানুষকে। যে ক্ষমতার চূড়ান্ত শিখরে বসে আছে, তার আশঙ্কা শিখর চ্যুত হবার, আর সাধারাণ মানুষ লেগে আছে ইঁদুর দৌড়ে। প্রতি মুহূর্তে ভয় পিছিয়ে পড়ার। আর সাধারণের চেয়েও নিম্নস্তরের যারা, তাদের জীবন ধারণ রীতিমতো অনিশ্চিত। সময়ের সেই জটিলতাকে তুলে ধরতে গিয়ে ভাঙাচোরা মনের মানুষ, তলানিতে ঠেকা মানবিক অনুভূতি নিয়ে তথাকথিত মানুষ, জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে আত্মহত্যাকারী মানুষ, ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বল্প সম্বল নিয়ে লড়াই করা মানুষের পাশাপাশি কুকুর, বেড়াল পর্যন্ত উঠে এসেছে নবারুণের আখ্যানে। তেমনি একটি গল্প হল 'অন্ধবেড়াল'। গল্পটি 'গোলা' নামের একটি বেড়ালের স্মৃতিতে নিবেদন করেছেন লেখক। 'অন্ধ-বেড়াল' গল্পটি ১৯৯৭ সালে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি একটি অন্ধ বেড়ালের গল্প হলেও গল্পের কাহিনী বুননে লেখক তুলে ধরেছেন সমাজ ও সময়ের দোলাচলতাকে। অন্ধ বেড়াল এবং সে যে হোটেলে থাকে সেই হোটেলটি প্রতীকি মাত্রা অর্জন করেছে। হোটেল তৎকালীন দেশ বা রাজ্যের অবস্থানকে প্রতীকায়িত করে আর অন্ধ বেড়াল হয়ে উঠেছে জন সাধারণের প্রতিনিধি। অন্ধ বেড়ালটির ঠিকানা হল নদী লাগোয়া একটি ছোট্ট হোটেল—

> তার মেঝেটি ছিল কাঠের তক্তার। নদীর পাড়ে এই হোটেলটার একটা টাল ছিল নদীর দিকে। এর জন্যে দোতলা হোটেলটার পুরোটাই নদীর দিকে কিছুটা ঝুঁকে ছিল।...নদীর দিকে মোটা মোটা আটটা কাঠের খুঁটি আর তেড়াবেঁকা কিছু বাঁশ হোটেলটাকে ধরে রেখেছে।[৫]

হোটেলের এহেন বর্ণনা স্পষ্ট করে ভাঙন ধরা সমাজের চিত্রকে। ষাট ও সত্তরের দশকে সমাজে যে ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার ফলে সমগ্র দেশের অবস্থা ছিল টালমাটাল। মুখ থুবড়ে পড়েছিল দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো। ঠিক যেমন হোটেলের বর্ণনা করেছেন লেখক। তবে—"নদীর মধ্যে কোনো নৌকা বা ভটভটি থেকে হোটেলটাকে দেখলে কিন্তু সবসময় বোঝা যায় না যে তার গোটা কাঠামোটাই জলের দিকে টাল খেয়ে রয়েছে।"[৬] তেমনি বাইরে থেকে চোখে পড়ে না রাজ্য তথা দেশের ঘুনধরা অবস্থার চিত্র। হোটেলটি দেশ বা রাজ্যের প্রতীক হবার পাশাপাশি হোটেল মালিক হয়ে উঠেছে দেশের শাসক দলের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন লেখক বলেন—'হোটেলের মালিক রান্না করে। সেই লোককে খেতে দেয়।' আমাদের সকলের পেট যে রাষ্ট্রের কাছে বাঁধা তা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। হোটেল মালিক প্রথমে বেড়ালটিকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেও যখন বুঝল বেড়ালটি অন্ধ তখন আর তাড়িয়ে দিল না কারণ, সব শাসকই চান তার রাজত্বে এমন কিছু অন্ধ জনসাধারণ থাক, যার ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা নেই, শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার সাহস থাকবে না। সে সবই দেখবে, বুঝবে কিন্তু কিছুই বলবে না।

অন্ধ বেড়ালটিও ঠিক তাই। হোটেলে যারা আসে তাদের সব কথা সে শোনে। চোখে না দেখতে পেলেও সব শব্দ শুনতে পায় সে। কালের সাক্ষী সে। কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। টেবিলের তলায় অন্ধকার কোনটা ছেড়ে সে নড়ে না। এমনকী—"বেড়ালরা যখন ঘুমোয় তখন স্বপ্ন দেখে ওদের কাঁপুনি আসে, থাবা নড়ে, ঘুমের ঘোরেই থাবার মধ্যে লুকানো নখ গুলো বেরিয়ে আসে, আবার ঢুকেও যায়। অন্ধ বেড়াল সম্ভবত স্বপ্ন দেখে না। তার ঘুম বড়োই নিথর।"[৭] এমন নিথর আশাহীন জন সাধারনই তো শাসকের কাম্য।

একটি বিধবা মেয়ে তার দুটো বাচ্ছা নিয়ে রোজ হোটেলে আসে। বাসন ধোয়, কাজকর্ম করে। তারাও বেঁচে থাকে বেড়ালের মতো। থালায় ফেলে যাওয়া ভাত-ডাল-ঝোল একটা বাটিতে জমায়। অনেকটা জমে। এছাড়া হোটেলের মালিক ওকে একথালা ভাত আর দুহাতা ডাল দেয়। তিনজনের হয়ে যায় তাতে। মেয়েটি হোটেলে কাজ করলেও তার নির্দিষ্ট কোনো বেতন নেই। হোটেল মালিকের যা ইচ্ছা হয় তা-ই দেয়। গনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় জনগনের প্রতি শাসকের উদাসীনতা প্রকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এখানে। মেয়েটি বিধবা অর্থাৎ সহায়-সম্বলহীনা। তার আছে দুটি সন্তান। তিনজনের খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার দায়িত্ব তার উপর। কিন্তু তার নেই নিশ্চিত কর্মসংস্থান। তাই উচ্ছিষ্ট খাদ্যসামগ্রীকে সে সাদরে গ্রহণ করেছে। গল্প বলতে বলতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে অমোঘ কিছু কথা বলে দেন লেখক। জগত ও জীবনের কিছু চিরন্তন সত্য। যেমন—"খাদ্যের এলাকায় থাকলে খাদ্য জুটেই যায়। এটাই টিকে থাকার নিয়ম।"[৮]

হোটেলে নানা ধরনের মানুষের সমাগম ঘটে, নানান ঘটনা ঘটে। ভাঙা চশমাপরা এক কবি এসে ডাল ভাত খেয়ে যান। তার কোমরে ছিল পিস্তল। তিনি কবি তবু তার কাছে মিলেছে অস্ত্রের সন্ধান। মনে প্রশ্ন জাগে এর কারণ কি তবে আত্মরক্ষা যিনি প্রতিবাদ করেন কলম ধরে, নিজেকে রক্ষার জন্য তাঁকে অস্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রতিবাদী মানুষ তথা সাধারণ মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তার প্রকট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও হোটেলকে কেন্দ্র করে নানা খণ্ড খণ্ড চিত্র যেমন প্রেমিক যুগলের আত্মহত্যা, ট্রলার মালিকের মার্ডার ইত্যাদি ঘটনা ঘটে কিন্তু তাতে হোটেল মালিকের রোজনামচায় কোনো প্রভাব পড়ে না। দেশের আনাচে কানাচে তেমনি নিত্য নতুন ঘটনা ঘটে, যার কোন প্রভাব পড়ে না শাসকের উপর। যে জনগনের ভোটে শাসক শাসনের অধিকার লাভ করে, ক্ষমতার শিখরে পৌঁছায়, পরে ক্ষমতার মোহে ভুলে যায় সেই জনগণকে। কিন্তু মানুষের যন্ত্রণা নবারুণকে কষ্ট দেয়, মানুষের অপমান তাঁকে রাগিয়ে দেয়, তাই গদ্যভাষ্যে তিনি ফুটিয়ে তোলেন প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাঁর প্রতিবাদ উপভোক্তা সংস্কৃতির প্রতি, আধিপত্যবাদের প্রতি।

বাঁধ বাঁধার উপরে একটা ওয়ার্কশপে আসা মানুষজন হোটেলে খেতে এসে অন্ধ বিড়ালকে দেখে ইংল্যান্ডে বিড়ালদের উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রসঙ্গ নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে একটা 'হেল্পলেস ক্যাট'কে শেল্টার দেওয়ার জন্য হোটেল মালিকের প্রশংসা করে। অর্থাৎ দেশের অতিথির কাছে প্রকাশ পায় না দেশের ঘুনধরা অবস্থা, ধরা পড়ে না জন সাধারণের অসহায়তা, অনিশ্চয়তার চিত্র, পরিবর্তে বড়ো হয়ে ওঠে শাসকের জনদরদী রূপ। এরপর লেখকের উক্তি—"কিন্তু যে কোনো অন্ধকার আশ্রয়েই তো আক্রমন আসতে পারে।"[৯] তাই হল। অন্ধকার আক্রমণ নেমে এল বেড়ালের জীবনে। নদীতে জলোচ্ছ্বাসের আগাম সতর্কতা পেয়ে হোটেল মালিক সরে পড়ল জিনিসপত্র নিয়ে। কিন্তু বেড়াল ঘর ছেড়ে বেরোল না। লেখক এখানে দুটো সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ঘরটায় আস্তে আস্তে জল বাড়তে পারে অথবা এক ঝটকায় হোটেলটার গোটা

কাঠামো নদীতে ধ্বসে পড়তে পারে। অর্থাৎ দুটি সম্ভাবনার মধ্যে যাই হোক না কেন বেড়ালের জীবন নিশ্চিত নয়। আসলে অপ্রত্যাশিত রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যুর মিছিল যা ছিল সমকালীন জীবনের সঙ্গী, তা-ই অন্ধ বেড়ালের প্রতীকে নবারুণের আখ্যানে আপন সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর তান্ডবের মধ্যে সুস্থিতি, শান্তি কোথায় চতুর্দিকে সন্ত্রাস, হিংস্রতা। বিপ্লবেরও অপর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাস, অসহায় মানুষের হত্যা। বিবেকহীন, মস্তিস্কহীন, প্রতিবাদহীন জীবন্মৃত মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। মানবপ্রেমী লেখক যেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি দেখেছেন মানুষের প্রতি অত্যাচার করে যাচ্ছে মানুষই। কেবল মানুষের উপরই নয়, সমস্ত প্রাণী জীবজন্তুর প্রতি মানুষ নির্যাতন চালায় কারনে অকারণে। তাই নির্মম নিয়তির মতো তিনি ঘোষণা করেন সভ্যতার মৃত্যু। মৃত ডাইনোসরদের মতো হারিয়ে যাবে সভ্যতামানব সভ্যতা। কারণ তারা রুষ্ট করে প্রাণগুলোকে, প্রকৃতিকে। মানুষের এই নির্মম অমানবিকতার ছবি উন্মোচিত করতে লেখক তাঁর আখ্যানে প্রয়োগ করেন মনুষ্যেতর প্রাণীকে। লেখকের লেখায় এই জীবজন্তুর প্রয়োগ একদিকে যেমন তাঁর পশুপ্রেমকে তুলে ধরে তেমনি মনে হয় মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে যে শুদ্ধতা, মানুষ যে তা হারিয়ে ফেলেছে তাকেও প্রকাশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল দেশবাসী, নবারুণ তা দেখেন নি। তিনি দেখেছেন এক হতোৎসাহ, নিরুদ্যম পরিবেশ, স্বপ্নের ভাঙা টুকরোয় লেগে থাকা মনের রক্তক্ষরণ, দেশভাগের দগ্‌দগে ঘা আর দাঙ্গায় বিষিয়ে ওঠা ক্ষত। ফলে তাঁর মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল ক্রোধ, ক্ষোভ। শুরু করলেন ভাঙার সাধনা। প্রতিষ্ঠিত মতবাদ, সংস্কার, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে হেলায় সরিয়ে দিলেন। রাষ্ট্রীয় শোষণ এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরলেন প্রতিবাদী অস্ত্র। নিজস্ব মত এবং মননকে প্রকাশ করলেন প্রতিবাদী কলমের আঁচড়ে। প্রকাশ্য ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সত্তরের নকশাল আন্দোলনের সময় পুলিশি তান্ডব, গনতান্ত্রিক সরকারের অত্যাচার ইত্যাদির পাশাপাশি ধরা পড়েছে বিশ্বরাজনীতিও। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলার, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা, পারমানবিক যুদ্ধ সবই উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। তাই 'অন্ধবেড়াল' গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদপটে লেখা হয়—

> নবারুণ ভট্টাচার্যের এই গল্প সংকলনে প্রতিফলিত হয়েছে টালমাটাল ঘটানো নব্বই দশক যা গোটা পৃথিবী ও তার বাসিন্দাদের সহজ সরল একটা দুটো নয়, হাজারো জটিল প্রশ্নের সামনে নিলডাউন করিয়ে দিয়েছে।...দর্শন, রাজনীতি, দেশ, সমাজ, মানুষ, প্রাণমণ্ডল সব কিছু নিয়ে লেখকের যে বিশ্ববীক্ষা তা বিরল অনন্যতার সাক্ষ্য বহন করে।[১০]

এ কেবল তাঁর একটি গল্পগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়, প্রতিটি লেখার বৈশিষ্ট। কিন্তু প্রতিটি ভিন্ন একে অপরের থেকে। নির্দিষ্ট ফ্রেমে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। অন্যান্য সাহিত্যিকের ফ্রেমে ফেলা সাহিত্যের মতো নবারুণের সাহিত্য কোনও ব্যাকরণ বা গাইড বুক মেনে রচিত হয়নি। তাঁর রচনা নিজের ব্যাকরণ তৈরি করে। প্রচলিত ভাষা সংস্কারের তোয়াক্কা না করে তিনি লেখ্য ভাষাকে যথাসম্ভব কথ্য ভাষার অনুসারী করেন। তাঁর লেখায় ব্যবহৃত হয় প্রচুর অপশব্দ। এই অপশব্দের বহুল প্রয়োগের কারণ যথাযথ চরিত্রায়ণ। প্রথমত, সব শ্রেণির মানুষই কথাবার্তায় অল্প বিস্তর অপশব্দ প্রয়োগ করেন। দ্বিতীয়ত, সমাজের পরিচিত শিষ্টজনের বৃত্তের বাইরের মানুষেরা এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে বহুল পরিমানে। এতে তাদের 'আনন্দ উৎসব' ও 'প্রতিবাদ উৎসব' একই সাথে ঘটে। প্রতিটি লেখার ভাষা ব্যবহার নতুন নতুন দিগদর্শন করে। প্রতিটি চরিত্র সমাজের

এমনসব কোন্ থেকে তুলে আনা যা অভাবনীয়। সে সময়ের সাহিত্যে কারও প্রতিবাদ ছিল যৌনতার মাধ্যমে, কারও প্রতিবাদ ছিল বঞ্চিত মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠায়, আবার কারও প্রতিবাদ ছিল প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত মননের বিরুদ্ধে, কিন্তু সে প্রতিবাদ ছিল মৃদু। এসবের মধ্যে বাস করেও নিজস্ব শৈল্পিক আকল্পে যে ভাস্বর স্বাক্ষর রেখেছেন নবারুণ, তা তাঁকে অনন্য করে তুলেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন সম্পাদিত : 'নবারুণের আখ্যান বিশ্ব', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৮১
২. নবারুণ ভট্টাচার্য : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ২১
৩. তদেব : পৃ. ২৩
৪. তদেব : পৃ. ২২
৫. তদেব : পৃ. ১৮৪
৬. তদেব : পৃ. ১৮৪
৭. তদেব : পৃ. ১৮৬
৮. তদেব : পৃ. ১৮৫
৯. তদেব : পৃ. ১৮৮
১০. উৎস-১, পৃ. ৭৮

কায়েস আহমেদের গল্প
প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন

তাপস পাল

বাংলাদেশের নিভৃতচারী লেখকদের মধ্যে কায়েস আহমেদ অন্যতম। প্রচারবিমুখ এই সাহিত্যিক জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে চলমান সময়কে তিনি তুলে এনেছেন নিজের গল্পের মধ্যে। ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বড়তাজপুরে তাঁর জন্ম। যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগ ও তাঁর পিতার চাকরি সূত্রে তাঁদের চলে যেতে হয় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে। কিন্তু জন্মস্থানকে তিনি ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর একাধিক গল্পে প্রেক্ষাপট হিসেবে উঠে আসে হুগলি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল। উঠে আসে এখানকার কৃষক আন্দোলন তথা নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন। জীবৎকালে তাঁর শেষ প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'লাসকাটা ঘর' (১৯৮৭)। এই গ্রন্থের তিনটি গল্প 'মহাকালের খাঁড়া', 'দুই গায়কের গল্প' ও 'নিয়ামত আলীর জাগরণ'-এর প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে নকশাল আন্দোলন। অদ্ভুত নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। যাবতীয় তত্ত্বের বাইরে গিয়ে তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে মানুষের অসহায়তা, হিংস্রতা ও বিপন্নতা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে অসহায় হয়ে পড়ে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ ধরা পড়ে তাঁর গল্পের মধ্যে।

১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি থানা এলাকায় শুরু হয় সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষকরা শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু করেন। মাও সে তুং-এর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ এই আন্দোলনের চরিত্র অচিরেই হয়ে ওঠে হিংসাত্মক। মহাজন, কালোবাজারি ও মুনাফালোভী জোতদারদের শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে শুরু হয় নিধনযজ্ঞ। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসহীনতা ও প্রশাসনের ওপর থেকে ভরসা উঠে যাওয়াতেই

আন্দোলন চরম পন্থা অবলম্বন করে। রক্তক্ষয়ী এই সংগ্রামে আন্দোলনকারীদের পাথেয় হয়ে ওঠে হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও বিভৎসতা। আজিজুল হকের লেখায় উঠে আসে আন্দোলন সূচনার কথা—

> লক্ষ্য এবং কর্তব্য স্থির করে কৃষকরা হাজার মাইল অতিক্রমের প্রথম পদক্ষেপটি করলেন, প্রথম পদক্ষেপেই তো হাজার মাইলের সূচনা। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে একদল কৃষক নকশালবাড়ি থানা অঞ্চলে একটা জমির চারপাশে লাল পতাকা পুঁতে ঘোষণা করেন, এই জমির ধান তাদের কারণ জমিটা জোতদারদের নয়। এবং ফসল কাটতে শুরু করেন।[১]

পরবর্তী সময়ে এই কৃষকদের উপর জোতদার ও প্রশাসনের তরফ থেকে যখন দমন পীড়ন শুরু হয় তখনই হিংসাত্মক আকার ধারণ করে আন্দোলন। কায়েস আহমেদের 'মহাকালের খাঁড়া' গল্পে এই হিংস্রতার বাস্তবরূপ আমরা খুঁজে পাই।

গল্পটি শুরু হয়েছে হুগলি জেলার প্রেক্ষাপটে বেগমপুর স্টেশন সংলগ্ন গরলগাছায়। 'আলের ধারে ফ্ল্যাগ পুঁতে ধান কেটে নিয়ে যাওয়া' কিংবা 'রাস্তার ধারে গলা কেটে ফেলে রাখা'র মতো খবর সংবাদপত্রে পড়লেও ভরত কোলে ভাবতেই পারেনি যে তার বাড়ি থেকে মাত্র চার মাইল দূরে গরলগাছায় দেওয়ালে লেখা হবে 'শ্রেণিশত্রু খতম চলছে চলবে'। কিন্তু বিষয়টি দেখে তার বুঝতে একটুও দেরি হয়নি যে অবস্থা সুবিধার নয়। মুহূর্তের মধ্যে এক অদ্ভুত ভয় তার শরীর মনকে আবিষ্ট করে তোলে। ছেলে সুরেন সহ বাড়ির সকলকে সাবধান হতে পরামর্শ দেয় সে। কিন্তু তার এই হঠাৎ সতর্কতার গুরুত্ব কেউই তেমন বুঝতে পারে না। স্ত্রী সরোজিনী অবাক হয়, আর ছেলে সুরেন বিরক্ত বোধ করে। ভরত বোঝাতে পারে না তার শঙ্কার কারণ। শুধু তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে—

ক. গোপী দত্তের মেয়ে সবিতার সঙ্গে তার ছেলের অবৈধ সম্পর্ক ও তার ফলে তার গর্ভবতী হয়ে পড়া; গোপনে গর্ভপাত করানো এবং সবিতাকে বাদ দিয়ে জয়কেষ্টপুরের হারু ঘোষের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়ার ঘটনা।
খ. নিজের চোলাই মদের কারবারের কথা।
গ. ওয়াগনভাঙা মালপত্র পাচারের ইতিহাস।
ঘ. বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুতো পাচারের স্মৃতি।

মনে পড়তে থাকে মদ বিক্রির জন্য তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা কিংবা সমাজ-তন্ত্রওয়ালাদের পিটুনির কথা। ছেলে যখন নিশ্চিন্ত হয় এই ভেবে যে তাদের সঙ্গে কোনো দলীয় রাজনীতির সম্পর্ক নেই কিংবা আশেপাশে আরও অনেক ধনী ব্যক্তিই আছে সুতরাং তাদের অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তখন ভরত বুঝতে পারে পার্টি করুক আর নাই করুক তার ধনী হওয়ার যে অন্ধকার প্রেক্ষাপট আর সবিতার প্রতি তার ছেলের যে অবিচার শুধু সেই কারণগুলোই সমাজতন্ত্রীদের কাছে তাদের শ্রেণিশত্রু হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বোঝাতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে কালীপুজোর রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরবার সময় চার নকশালপন্থী যুবক হরি, ঝন্টে, সুদীপ ও অনাদির হাতে নিষ্ঠুরভাবে খুন হতে হয় সুরেনকে। একমাত্র ছেলের অকাল মৃত্যুতে বিশাল দিগম্বরী নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্তির সামনে নিজেকে রক্তবীজ, অসুর, মহাপাপী বলে অভিহিত করে নিজের মৃত্যু কামনার মাধ্যমে চরাচর স্তব্ধকরা হাহাকার করা ছাড়া ভরত কোলের কিছু করার থাকে না। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর মাধ্যমে তার উপর যেন মহাকালের খড়্গাঘাত নেমে আসে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আত্ম-পর' গল্পটির কথা। একটি অবাঞ্ছিত পক্ষীশাবককে তার মায়ের সামনেই নিতান্ত তুচ্ছভাবে বিড়ালের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন গল্পকথক। কিছুবছর পর তার নিজেরই একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যু সেই পক্ষীশাবকের প্রতি করা নিষ্ঠুর আচরণের বিধাতা নির্ধারিত প্রতিদান বলেই মনে হয়েছে তার। গল্পটিতে ভরত কোলে অদ্ভুদ দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে। তাকে জন্মগত জোতদার বা উচ্চবিত্ত হিসেবে দেখাননি গল্পকার। ভরত কোলের ইতিহাস হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন—

১. তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল আকালের বছর।
২. শ্রীরামপুরের জুতোর দোকানে সে কাজ করত।
৩. খোড়ো চালওয়ালা দুই কামরার মাটির ঘর ছিল তাদের সম্বল।
৪. ভগীরথ সাহার কাছে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণগ্রস্ত ছিল তার বাবা।
৫. সেই ঋণ পরিশোধ করবার তাগিদে মালিকের মালই চুরি করে বিক্রি করতে শুরু করে সে।

অর্থাৎ চরম দুরবস্থা ও অভাব যেখানে একটা মানুষকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে, সেই অবস্থা থেকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে ভরত কোলে। অনৈতিক কাজের সাফাই হিসেবে আনোখীলাল যখন বলে—"ভরতবাবু, গরিবের আবার পাপ কি! গরিব হওয়াটাই পাপ।" আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলেছে, 'উ সালা যো ভগোয়ান মাথার উপরে বইসিয়ে রইয়েছে, উ সালা ভি বোঢ়ো লোকের দলে।'[২] তখন বোঝা যায় ভারত কোলেদের সৃষ্টিতে সমাজ তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। সৎ পথে কাউকে বঞ্চিত না করে উপার্জনের যাবতীয় পথ রুদ্ধ হলে কোনো কোনো মানুষ উপার্জনের বহুবিধ পন্থা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। আর সেই অন্বেষণে প্রথমেই তার সামনে আসে ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সব থেকে সহজ অনৈতিকতার পথ। গল্পকার জানান—

> নেশার কথাই যদি বলো, তাহলে মানুষের সবচেয়ে বড়ো নেশাটাই আছে ভরতের টাকা করা, সম্পত্তি করা। পরিশ্রম করে, ফন্দি-ফিকির করে, কৌশল করে ভরত টাকা করেছে, সম্পত্তি করেছে।[৩]

ভরতের মধ্যে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অনুতাপ আছে। সে জানে তার অর্থ উপার্জনের পথ সঠিক নয়। অন্যকে মাতাল করে, অন্যের ক্ষতি করে উপার্জিত অর্থই যে তাকে শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে, তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি তার। কিন্তু ছেলে সুরেনের বিষয়টি ভিন্ন। সবিতার ক্ষতি করার পরও তার মধ্যে প্রথমদিকে কোনো অনুশোচনা দেখা যায়নি। এমনকি সে সবিতাকে বিয়েও করেনি। সবিতার গর্ভে নিজের সন্তানের মৃত্যুতে প্রতিবাদও করেনি। অন্যদিকে সামাজিক অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবিতার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করেতেও পিছপা হয়নি ভরত কোলে। বিষয়টি মনে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল বলেই ছেলেকে বারবার সাবধানে থাকতে বলে সতর্ক করেছে সে। কিন্তু কালীপুজোর রাতে নিপুর দেওয়া খাঁটি স্কচ পেটে পড়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই তার সবিতার জন্য অনুশোচনা শুরু হয়। আসলে সামাজিক দুর্নামের ভয় কিংবা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল বাবার উপর কিছু বলতে না পারায় সবিতার প্রতি তার যে মানসিক দুর্বলতা চাপা পড়ে ছিল, মদের প্রভাবে তার মুক্তি ঘটে। অবচেতনে সে অনুভব করে সবিতার প্রতি সে খুব অন্যায় করে ফেলেছে। এমনকী তার কাছে ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা করে না সে। মনে হতে থাকে বাবা মা তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বড়ো ঠকিয়েছে। কালীপুজোর অনুষঙ্গে লাউড স্পীকারে

বাজতে থাকা 'এপ্রিল ফুল বানায়া...'[৪] গানের সূত্রে বিষয়টি নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে। এরপরই মানসিক বিভ্রমবশত সবিতাকে অনুসরণ করে সুরেন বাঁশ বাগানে প্রবেশ করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকলে সেখানে তাকে খুন হতে হয় নির্মমভাবে। সবিতার সন্তানের মৃত্যুর প্রতিফল যেন অনন্ত সময় অর্থাৎ মহাকালের পটভূমিকায় ভরত কোলের নিজের সন্তানের বিনিময়ে পরিশোধ করতে হয়।

এই গল্পে নকশাল আন্দোলনের প্রতিভূ যে চারজন যুবক হরি, ঝন্টে, সুদীপ ও অনাদি, তাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতার চরমতম বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন গল্পকার। বিশেষ করে সুদীপ, ঝন্টে ও হরির মধ্যে মানুষ খুনের যে নারকীয় উল্লাসকে চিত্রত করেছেন তিনি তা পাঠককে বিমূঢ় করে দেয়। পরিকল্পনা করে অতিপরিচিত একটি মানুষকে ধীরে ধীরে পাশবিক যন্ত্রণা দিয়ে অসহায় অবস্থায় হত্যা করার বিভৎস বিবরণ আন্দোলনের পরিণতি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করায়। নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে, প্রান্তিক মানুষদের অধিকারের দাবিতে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলনন। যৌবনের স্পর্ধায় আর তারুণ্যের স্বপ্নিল সমাজ গঠনের আঙ্গীকার নিয়ে এর দৃপ্ত ভঙ্গি অত্যাচারীর রাতের ঘুম নিয়েছিল কেড়ে। কিন্তু সেই স্বপ্নিল মনগুলো এই নারকীয় হত্যালীলায় মেতে যে বিভৎস, মানবতাহীন কদাকৃতি প্রাপ্ত হচ্ছে তা দিয়ে আর নতুন সমাজ গঠন আদেও সম্ভব কিনা, কিংবা সম্ভব কিনা প্রান্তিক মানুষগুলোর কোনো উন্নতি, তা পাঠককে আরও একবার ভাবতে বাধ্য করেন গল্পকার। তাইতো জেলেপাড়ার মানুষগুলোও এদের ভরসা পায় না। যুবক ছেলের বাইরে বেরিয়ে ব্যাপারটা দেখবার কথায় নিতাই জেলে ধমক দিয়ে বলে ওঠে 'রাত দুপুরে প্রাণটা হারাও আর কি!'

সমগ্র হত্যাকাণ্ডে অনাদির একটাও কথা শোনা যায় না। বরং 'হরির অ্যাকশন চলাকালে অনাদি বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদটাকে খুঁজছিল'। নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে পালানোর জন্যই কি এই চাঁদের আশ্রয় নেওয়া আবার সুরেনের হাতের উপর দাঁড়িয়ে বারবার ঝন্টুর মনে পড়ছিল কিছুক্ষণ আগেই রাস্তায় টলোমলো পায়ে অতিপরিচিতভাবে সুরেনের তাকে সম্বোধনের কথা। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে কার্যকরি করতে গিয়ে যে নিষ্ঠুরতার উদ্‌যাপন করা হচ্ছে তাতে তাদেরও আত্মিক মৃত্যুর দিকটি উন্মোচিত হয় গল্পকারের নিপুণ দক্ষতায়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদি' গল্পে কিংবা 'মাস্টারসাব' উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনকে দেখানো হয়েছে আন্দোলনকারীদের প্রেক্ষিত থেকে। তাদের সংগ্রাম, স্বপ্ন ও সংগ্রামের স্বার্থে আত্মবলিদানের কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু কায়েস আহমেদ এই গল্পে শুধু মানুষের অসহায়তা দেখিয়েছেন। সে ভরত কোলে হোক কিংবা তার ছেলে সুরেন, সবিতা অথবা অনাদি কিংবা ঝন্টে প্রত্যেকের মধ্যেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অসহায়ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। কায়েস আহমেদের গল্প আলোচনা করতে গিয়ে আশরাফ উদ্দীন আহমদ যথার্থই বলেছেন—

> বৈরী পরিবেশে মানুষ যে অসহায়ত্বের শিকার এই বিশেষ উপলব্ধি কায়েসের গল্প রচনার প্রেরণা। গল্পের চরিত্ররা আত্মগত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত, কখনও তারা নিজের ভেতর ছাড়া অন্য কোনোভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না, হয়তো এখানেই কায়েসের স্বাতন্ত্র্যবোধ।[৫]

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের পরবর্তী গল্প 'দুই গায়কের গল্প'। অন্ধ জগন্নাথ বাবুই ও হরিদাসের কাহিনি এটি। দুজনে ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে উপার্জন করে। উপার্জনের থেকে গান গাওয়াতেই হরিদাসের

আনন্দ বেশি। জগন্নাথ একটু উগ্র মেজাজের মানুষ। তবুও হরিদাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক আত্মিক। হরিদাসের ঘর-সংসার, মা, স্ত্রী থাকলেও সে গান গেয়ে বেড়ানোটাই বেশি পছন্দ করে। সংসারের দিকে তার তেমন মনযোগ নেই। অন্যদিকে জগন্নাথের বিয়ে হলেও মাত্র ছ'মাসের মধ্যে তার বউ অন্য এক যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। তাই শারীরিক চাহিদা মেটাতে সে মাঝে মাঝে নিষিদ্ধ পল্লিতে 'লিলা' করতে যায়। সেখানেই হরিদাসের চোখে পড়ে জগন্নাথের গৃহত্যাগী স্ত্রীকে। পুলিশ ও নকশালদের গুলি বিনিময়ের মাঝাখানে পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে হরিদাস মারা যাওয়ার সময় জগন্নাথকে তাই জনাই বেশ্যাবাড়ি যেতে নিষেধ করে। একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিদাসের মৃত্যু আর অন্যদিকে স্ত্রীর শোচনীয় পরিণতির খবর শুনে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হারমোনিয়ামকে হাতুড়ির মতো উঁচিয়ে জ্বলন্ত জিপের দিকে সে ছুটে যায় অন্ধ আক্রোশে। দুই বন্ধুর আপাত নিরিহ গল্পের মধ্যেও সময়কে তুলে ধরতে ভোলেননি গল্পকার। হরিদাসের ভাবনায় তুলে এনেছেন নকশাল আন্দোলনের ঘটনা—

> তাছাড়া চার পাশে যে সব ঘটনা ঘটছে, দেওয়ালের গোটা গোটা হরফে যে সব কথা লেখা হচ্ছে তাতে মাথা গুলিয়ে যায়। গেলো বছর লালবেহারী ডাক্তারের ভাই আর ভরত কোলের ছেলের ব্যাপারটা ভাবলে এখনও বুক কেঁপে ওঠে।[৬]

সাধারণ প্রান্তিক স্তরের মানুষরাও এই লেলিহান আন্দোলনের আগুনে পুড়ে মরেছে। যাদের জন্য আন্দোলন তাদের মৃত্যুঘন্টা ধ্বনিত হয়েছে নির্বিকারে। ভরত কোলে বা লালবেহারি ডাক্তারের ভাইয়ের মতো ধন্যাঢ্য না হয়েও গুলিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছে হরিদাসকে। চরম অসহায়তার বিদ্ধ হয়েছে অন্ধ জগন্নাথ।

পরবর্তী গল্প 'নিয়ামত আলীর জাগরণ'-এও নকশাল আন্দোলনের কথা পাওয়া যায়। সেনাবাহিনি থেকে অবসর নেওয়ার পর নেয়ামত আলি দারিদ্র্যের মধ্যেও একটু আত্মগর্ব অনুভব করে শান্তি পেত। মদের নেশার ঘোরে সেই গর্বিত অনুভব একটু রং চড়ত ঠিকই কিন্তু তা কারও ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠেনি কখনও। বরং কিছুটা বিরক্তি ও মাঝে মাঝে আমোদের যোগানই দিয়েছে। পিঠের ক্ষতচিহ্ন আর একটা গায়ে দেওয়ার কোট সম্বল করে নিয়ামত আলী দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে জীবনধারন করে। কিন্তু মাতাল হয়ে পরিমল ঘড়ুইয়ের দোকানে একটা বিড়ি চেয়ে না পেলে যখন তাকে বলতে শোনা যায় 'নকশালরা যে বড়ো লোকদের ধ'রে ধ'রে গলা কাটচে ঠিকই কচ্চে শালা'[৭] তখন তা শুনে দোকানের সবাই ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। শ্রেণিবৈষম্যের মাধ্যমে শ্রেণিহীনের আবেগী সমর্থন অন্যমাত্রা দান করে আপাত নিরিহ মাতলামিতে। কিন্তু সেই নিয়ামতকেই যখন পুলিশ নকশাল মনে করে গ্রেপ্তার করে তখন সব হিসেব গোলমাল হয়ে যায়—

> নিয়ামত পিঠে রাইফেলের খোঁচা খায় ঠিক অপারেশনের দাগের ওপর। এই স্মৃতি জাগানিয়া দাগের ওপর পুলিশের রাইফেলের খোঁচায় তার ভেতরকার বহুদিনের পুরোনো, সৈনিকের শ্রেণীগত কৌলীন্যের অহঙ্কারে চোট লাগে। নিয়ামত এক পা-ও এগোয় না। মেরুদণ্ডের পুরোনো জখমের জন্য এঁটেনশনের নিখুঁত ভঙ্গিটি আসে না যদিও।[৮]

সারাজীবন দেশের সুরক্ষায় অতিবাহিত করে শেষে যখন দেশের পুলিশের হাতে বিনা দোষে লাঞ্ছিত হতে হয় তখন এইভাবেই রেগে ওঠা ছাড়া বোধহয় গত্যান্তর থাকে না। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয়, নিয়ামত নিজে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও সে আবেগের বশে হলেও

আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ভুল বশত গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার রাগ যেন বমির আকার নিয়ে উঠে আসে। এই বমন যে সমাজের পচা গলিত রূপের প্রতি ঘৃণা থেকেই জাত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এছাড়া 'লাসকাটা ঘর' গল্পে সমাজতন্ত্রী মনোতোষ মাস্টারের কথা পাওয়া যায়। যার ঘরের রূপ আর বাইরের আদর্শগত রূপের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কিন্তু সরাসরি নকশাল আন্দোলনের কথা এই গল্পে পাওয়া যায় না।

এই গল্পগুলির মধ্যে থেকে গল্পকারের মতাদর্শগত পক্ষপাত প্রকট হয়ে ওঠেনি। মানুষের কথা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পভুবনে। অনুভব করেছেন মানুষের অসহায়তা। আদর্শগত চাপান-উতরের পরিবর্তে এই গল্পগুলোতে মানুষের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতির শিকার মানুষের নির্মম পরিণতি নির্মোহ ভঙ্গিতে উপস্থাপনের অসামান্য শৈল্পিক কুশলতা লক্ষ করা যায় গল্পগুলিতে। এখানেই তিনি নিজস্ব সৃষ্টিভুবনে স্বতন্ত্র।

উৎসের সন্ধানে

১. আজিজুল হক : 'নকশালবাড়ি : তিরিশবছর আগে এবং পরে', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২১
২. গৌরাঙ্গ মণ্ডল সম্পাদিত : 'বাংলাদেশের গল্প', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ৯৯
৩. তদেব, পৃ. ১০০
৪. তদেব, পৃ. ১০৩
৫. আশরাফ উদ্দীন আহ্মদ : 'কায়েস আহমদের গল্পে বিষয় ও আঙ্গিক', কালি ও কলম, এপ্রিল ১৭, ২০১৯ [https://www.kaliokalam.com]
৬. 'কায়েস আহমেদ সমগ্র', মাওলা ব্রাদার্স, ১ জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১৪০
৭. তদেব : পৃ. ১৪৫
৮. তদেব : পৃ. ১৫১

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে জীবন-জীবিকায় প্রযুক্তির আগ্রাসন ও প্রভাব

বাপ্পী বর্মণ

> গল্প কোনো ঘটনার ধারাবিবরণীও নয়। ঘটনাটি হ'ল সেই ধুলোর কণিকাটি, যাকে কেন্দ্র করেই বাষ্প ঘনীভূত হয়, বৃষ্টি-ফোঁটা তৈরি হয়। কিংবা বাস্তবের ঘটনাটি হ'ল সেই শূককীট, গুটিপোকার মতন থাকে। ভালোবাসা ওকে প্রজাপতি করে। অথবা ছোট্ট কুড়িটি, যা গল্পে ইচ্ছে কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে। আমার গল্প মানে সেই ইচ্ছে কুসুম ফোটানো। আমি যা বিশ্বাস করি না তা লিখিনা।[১]

বাস্তবের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর গল্পে দেখা দিয়েছে আমাদের পারিপার্শ্বিক ক্রমপরিবর্তনশীল জগতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ সচেতনার পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতায় টেকনোলজি ও মানুষের সম্পর্ক-জটিলতা। নিছক শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণী নয়, গল্প হয়ে উঠেছে জীবন-জীবিকায় বেঁচে থাকার জীবনালেখ্য। কোনো কল্পনার ফসল নয়, অভিজ্ঞতার স্বেদে-রক্তে-জলে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর (জন্ম ১৯৫২) গল্প নির্মিত। এ প্রসঙ্গে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্প সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রাবণী পালের লেখার একটা অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে—

> স্বপ্নময় চক্রবর্তী বিশ্বাস করেন ছোটগল্প সমাজেতিহাসের এক জরুরী উপাদান এবং তাঁর গল্পে তাই ক্রমপরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার সবকিছু নিয়ে, মানুষ মেশিন মৃত্তিকা প্রকৃতি পরিবেশ, রাজনীতি অর্থনীতি, সব উজ্জ্বলতা, সব ধূসরতা, সব শোক গ্লানি উল্লাস নিয়েই উপস্থিত।[২]

বেঁচে থাকার জন্য জীবনযুদ্ধে যে-সব জীবিকা গ্রহণ করতে হয়েছে, সে সবই স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে জীবন চিনিয়েছে। প্রথম জীবনে বিহারে কিছুদিন ছিলেন দেশলাই কোম্পানির সেলসম্যান হিসেবে। এরপর পেইন্ট-ভার্নিশ টেকনোলজি পড়তে শুরু করেছিলেন। কিন্তু জীবনে চলতে গেলে যে অর্থেরও প্রয়োজন হয় এই তাগিদ বোধ হয় অনেকেরই স্বপ্নকে পেছনে ফেলে দেয়। অর্থের অভাবে

পেইন্ট-ভার্নিশ টেকনোলজির পড়া ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কানুনগের চাকরিতে যোগ দেন। আবার পরোক্ষভাবে এটাও ঠিক মনের অদম্য ইচ্ছা ব্যক্তিকে শুধুমাত্র এক জায়গায় বসিয়ে রাখেনি। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মধ্যেও সেই অদম্য ইচ্ছা শক্তি ছিল, আর সেই ইচ্ছার জন্যই তিনি প্রথমে আবহাওয়া দপ্তরে এবং পরে আকাশবাণীতে যোগ দিয়েছিলেন। একের পর এক কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা দৃষ্টিভঙ্গির ফসল তাঁর নানা গল্প। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'ভূমিসূত্র' (১৯৮২)। এরপর তাঁর একের পর এক গল্পগ্রন্থ 'অষ্ট চরণ ষোল হাঁটু', 'ভিডিও ভগবান নকুলদানা', 'জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা', 'সতর্কতামূলক রূপকথা', 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

টেকনোলোজি'র বিপ্লবে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে ঠিকই কিন্তু যান্ত্রিক সম্পর্ক কীভাবে মানবিক সম্পর্কের উপর ছায়া বিস্তার করেছে, একশ্রেণির সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকায় কতটা সংকট তৈরি করেছে, আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানমনস্কতার এই আগ্রাসনের পরিণতি স্বপ্নময় চক্রবর্তী একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'লজ্জামুঠি', 'ঝরে কাক মরে', 'ক্যারাক্কাস', 'হনুমান', 'এ জীবন লইয়া কী করিব', 'অ্যালুমিনিয়ামের ডানা' গল্পে। প্রযুক্তি কীভাবে মানুষকে জীবন-জীবিকায় সংকটের মুখে ঠেলে দেয়, মানুষের সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের সব স্বপ্নকে নষ্ট করে দেয় তা উল্লেখিত গল্পে আমার লক্ষ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে প্রথমে 'লজ্জামুঠি' গল্পটির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। একটি ছোটো দরিদ্র পরিবারের কাহিনি। বাড়িতে সুচিত্রার বাবা-মা ও দুই ভাই মিলে পাঁচজনের সংসার। তার বাবা চালের কলে কাজ করে। একসময় তার বাবা কর্মহীন হয়ে পড়ে টেকনোলোজির অগ্রগতির কারণে। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিতে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার বাজারে কম সময়ে অধিক কাজ করার জন্য নতুন নতুন আপডেট মেশিন বের হয়ে চলেছে। এই নতুন ও পুরাতন মেশিনের দ্বন্দে সুচিত্রার বাবা কর্মহীন হয়ে পড়ে—"ধানকল বন্ধ হল, সুচিত্রার বাপ বেকার হল। কতসব নতুন নিয়মের মেশিন বেরোচ্ছে। পুরনো নিয়মের মেশিনে পড়তা কম।"[৩]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবারে অবহেলিত অন্যান্য কন্যা সন্তানের ন্যায় সুচিত্রা পাঁচজনের এই অভাবী সংসারে শেষে বাধ্য হয়ে দুই ভাইয়ের পড়াশোনা, সংসারের অভাব দূর করার জন্য মা গঙ্গামনির ইচ্ছাক্রমে আলাপচারিতাময় কলকাতার এক ভদ্র পরিবারে পাড়ি দেয় কাজের মেয়ে হিসেবে। প্রথমে তার কাজ ছিল বাড়িতে তোতাপাখি ও বিড়ালের দেখাশোনা করা। তারপর নিজের বাড়িতে অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য রান্না করা, কাপড় ধোয়ার কাজও মালিককে বলে বাগিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তার জীবনযাত্রা ব্যাহত হলো মেশিনের কবলে পড়ে। মিক্সি মেশিন, ওয়াশিংমেশিন, প্রেসার কুকার তার হাতের কাজ ধীরে ধীরে ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে চাকুরীরত সেই বাড়িতে প্রথমে আসে মিক্সি মেশিন। এই মেশিনে খুব কম সময়ে বিনা পরিশ্রমে রান্নাবাড়ি খাওয়া-দাওয়ার নানা উপকরণ নিমেষে তৈরি হতো। আগে সুচিত্রা কর্তাকে নিজের হাতে ঘোল বানিয়ে দিত, বাটনা বাটত, পুদিনার চাটনি বানিয়ে দিত কিন্তু এখন সেসব তাকে করতে হয় না, মেশিনেই সব কাজ হয়ে যায়। এই মেশিনের রুপোলি দাঁত তার হাতের একটা আঙ্গুল ছিনিয়ে নিয়েছে, যা তার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে রতন কুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা তাও শেষপর্যন্ত হল না। এমনকী বাড়িতে তার ভাইয়েরও দিদির হাতের এই অবস্থা দেখে ঝামেলা বলে মনে হয়েছিল। দিদির হাত দেখে তার মুখে বিরক্তির রেখা—"মায়ের সব কথা শেষ

হবার আগেই হাতের খাবার দূরে ঠেলে দিল চুনী, কী ফ্যাসাদ বাধালি, অ্যা কীরকম বেঁকে রয়েছে ঠোঁট।"[৪] গ্রামে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে 'উপকারী গাছের ছাল থাকে না', সুচিত্রার জীবনেও যন্ত্রের কারণে সেই একই ঘটনা ঘটেছে। যন্ত্রের এই ফ্যাসাদই সুচিত্রার সব স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ গোটা নারীজন্মকে ব্যর্থ করে দেয়। মানুষের চেয়ে যন্ত্র তাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে—"মেশিন ভাল না মানুষ ভাল, মানুষ ভাল না মেশিন ভাল, মেশিন-মানুষ, মানুষ-মেশিন। মেশিন মেশিন মেশিন।"[৫] প্রযুক্তির এই আগ্রাসনে সুচিত্রার ন্যায় সাবিত্রীর জীবনেও সেই একই ব্যর্থতার সুর লক্ষ করা যায়। 'এ জীবন লইয়া কী করিব' (অনুষ্টুপ,১৯৯৫) গল্পে যন্ত্রের টানে ক্রমশ মানুষ একাকী হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের কাছে মানুষের প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। যে কাজ আগে মানুষ নিজের হাতে করত তা এখন যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। ঘুম পাড়ানোর জন্য ভাইব্রেটার, রান্নার জন্য মাইক্রোওয়েভ ওভেন, প্লাস্টিক পিভিসির ফুল, জামা কাপড় পরিষ্কারের জন্য ওয়াশিং মেশিন, ঘর ঝাড় দেওয়ার জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, গান শোনার স্টিরিও, কানে কানে কথা বলার জন্য হেডফোন সবই টেকনোলজির আশীর্বাদে। প্রযুক্তির এই বিপ্লব সাবিত্রীকেও যেন কোথাও ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে দিয়েছে, জীবনকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে যে কমিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত এই যন্ত্র, তা তার কথায় স্পষ্ট—"এ জীবন লইয়া তবে কী করিব, কী করিতে হয়?"[৬]

টেকনোলোজির প্রতিযোগিতাময় বাজারে স্বপ্নভঙ্গের আর এক ছবি ধরা পড়েছে লেখকের 'ঝড়ে কাক মরে' (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ১৯৮৯) গল্পে। এই গল্পের কথক জেরক্স মেশিনের ব্যবসা করবে বলে ব্যাংকে লোন নিয়েছে। সমাজে, পরিবারে, জীবন সঙ্গিনীর কাছে কথকের নিজের আইডেন্টিটি তুলে ধরার স্বপ্ন যেমন কোথাও সুপ্ত হয়ে আছে তেমনি পরিবারের লোকজনও তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তাই মা তার সোনার গয়নাও দিয়ে দিয়েছে ছেলের ব্যবসার জন্য। মোটামুটি একটা সমারোহ করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে প্রবল উৎসাহে হেলা বটতলার মোড়ে নতুন জেরক্স মেশিনের দোকান শুরু করল সে। কিন্তু প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতিতে তার সেই প্রবল উৎসাহ বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। কথকের পরিবারে প্রথম ঝড় আসে দাদাকে কেন্দ্র করে। যন্ত্রের নতুন up-date version-এর চক্রে তার দাদা কর্মহীন হয়ে পড়ে। তার দাদা ডায়মন্ড জুট মিলে টাইপিস্টের কাজ করত। জেরক্স মেশিন বাজারে আশায় টাইপের কাজ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। জেরক্সমেশিনই তার দাদার জীবন-জীবিকার অশনি সংকেত এনে দিয়েছে। তার গলায় শোনা যায় হতাশার সুর—

> জেরকস বসাবো শুনেই দাদা 'জেরকস' শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করেছিল যে ওটা অনেকটা আর্তনাদের মতো লেগেছিল।...দাদা একটুক্ষণ চুপ ছিল তারপর বলেছিল, আমার টাইপটা গেল।[৭]

কিন্তু সেজন্য সে কখনই বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অসমর্থন করেনি। কালের যাত্রায় টেকনোলজি ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমাদের এগোতে হবে। একথা ভেবেই দাদা, কথককে দু'হাজার টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছিল জেরক্সের দোকান দেওয়ার জন্য। পাটের দ্রব্যের পরিবর্তে নাইলন, পলিথিনের ব্যবহার যেমন আটকানো যাবে না, তেমনি জেরক্সও আটকানো সম্ভব নয়। একের পর এক প্রযুক্তির নবনির্মাণ দাদার ন্যায় কথককেও জীবন-জীবিকায় সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শুরুর প্রথম দিকে জেরক্স মেশিনের দোকান খুব ভালোই চলেছিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো মুকুল শিকদারের দোকানকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে নতুন update ver-

sion এর অটোমেটিক জেরক্স মেশিন মুকুল কিনেছে। ঐ মেশিনে অটোমেটিক পদ্ধতিতে মিনিটে কুড়িটি জেরক্স করা যায়—

> কাচের ঘরের মধ্যে ওই মেশিনটা। ছোটোখাটো বডি। খালি সুইচ টেপো। ফ্রেম ধরে নাড়ানাড়ির ব্যাপার নেই, ফিক্সিং চেম্বার নেই, বীডস নেই, কালির গুঁড়ো নেই, তিন সেকেন্ডে একটা করে কপি।[৮]

এযেন নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব। বাজারে মুকুলের সঙ্গে কথকের মেশিন পাল্লা দিয়ে উঠতে পারল না। ক্রমশ তার কাস্টোমার কমতে থাকল। খরিদ্দার কমতে কমতে একসময় মুকুলের অধীনে কাজ করার সিদ্ধান্ত বাধ্য হয়ে নিতে হয়। তার প্রেমিকা চন্দনা তাকে নতুন মেশিন কেনার কথা বললেও সে সাহস পায়নি। কেননা টেকনোলোজির প্রতিযোগিতার বাজারে তার মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ঋণ-ধার করে মেশিন কেনা যে স্বপ্নমাত্র তা কথক বুঝতে পেরেছিল—"ওতে কিছু হবে না চন্দনা, অটোমেটিক মেশিন অনেক দামি, দামের সঙ্গে পারবে যুদ্ধ করে কদিন পরে আরো ভালো আরো দামি কিছু বেরিয়ে যাবে। জানো ঝড় বইছে, টেকনোলজির ঝড়।"[৯]

প্রযুক্তির এই ঝড় যেমন অনেকের জীবিকা কেড়ে নিয়েছে, স্বপ্ন ভঙ্গ করেছে তেমনি মানুষকে যন্ত্রদাসে পরিণত করেছে। আর এই সমস্ত জীবিকাহীন, স্বপ্নভঙ্গ দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জীবনযুদ্ধের বাস্তবচিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। তিনি কখনই কালের যাত্রায় বাস্তবকে অস্বীকার করেননি। তিনি স্বয়ং বলেছেন—"আসলে সময় লেখায়। যে সময়ের আমরা, সে সময়ের ক্লেদ, জল, আচ-আগুন এড়িয়ে লেখা মানে ইতিহাসকে অস্বীকার করা। ওয়াটার প্রুফ পরে জলে নামেনি।"[১০]

কালসচেতন, সমাজসচেতন, বাস্তববাদী স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দৃষ্টিতে এড়িয়ে যায়নি মানুষের যান্ত্রিক মনও। কোনো মানবিকতা নেই, যন্ত্রের ন্যায় শুধু কাজ আর কাজ চাই। আর কাজ মানে মুনাফা। 'ক্যারাক্কাস' (শারদীয় বর্তমান,১৯৯২) গল্পে কথক হয়ে উঠেছে যন্ত্রদাসের শিকার। কারখানার মালিক চেয়েছিলো কোম্পানির বাকি কর্মচারীরাও যেন কথকের মতো অ্যাসিডযুক্ত জলে স্নান করে। কেননা তাহলে মালিককে আর ভর্তুকি দিতে হবে না। এই ভাবনা এসেছে মালিকের একদিনের অ্যাসিড লিক হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গল্পকথক যেহেতু আগেই অ্যাসিড জলে পড়ে গিরগিটির মতো হয়ে গিয়েছে, তাই তার শরীরে কোম্পানির লিক করা অ্যাসিড তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু বাকি অনেকেরই শরীরের নানা জায়গায় অ্যাসিড পড়ার জন্য মালিককে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হয়েছে। কথকের কথায় তা স্পষ্ট—

> পিচকিরির মতো অ্যাসিড ছিটকোচ্ছে চারিদিকে। অ্যাসিডের ফোয়ারা। কত লোক মারা গেল, কতজন অন্ধ হয়ে গেল, কতজনের চামড়া কুঁচকে গেল। আমার গায়েও অ্যাসিড পড়েছিল, আমার কিছু হল না।...তারপর কোম্পানি সারকুলার ইস্যু করল, সবাই যেন ওই সার পুকুরে স্নান করে আমার মতো হয়ে যায়।[১১]

এখানে সার পুকুর মানে অ্যাসিডযুক্ত সেই পুকুরের কথা বলা হয়েছে। মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্য কখন মানবিকতা হারিয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়ে যায় তা হয়ত নিজেও মূল্যায়ন করতে পারেনা। এই গল্পে কোম্পানির মালিকের মধ্যে সেই যান্ত্রিক মনই শুধু কাজ করে। তাই গল্পকথকের সদ্যজাত শিশুটিও তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

আধুনিক সভ্যতায় টেকনোলোজির ঝড়ে আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে নুইয়ে পড়েছি। কেননা, সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠা ও ঘুমানোর প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত নানাভাবে টেকনোলজির আশ্রয় নিয়ে থাকি। মেশিনের প্রতি আমাদের এই আশ্রয়, ভরসা ভালবাসা এনে দেয়। তাই আমরা ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে এমন একটা সময়ে পৌঁছে গেছি যে মানুষের তুলনায় মেশিনই আমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে। লেখকের 'হনুমান' (শারদ আজকাল, ১৯৯৩) গল্পেও আমরা দেখি জীবন-জীবিকার সংকট। গল্পে কদম্ব গুছাইতকে পেটের দায়ে নানা সাজ-অঙ্গাভঙ্গি করতে হয়েছে। কখনো মহারাজ, নারদ, কালি, হনুমান সাজতে হয়েছে। তার এই বহুরূপী সাজ দেখতে একসময় দলে দলে লোক ভিড় করত, প্রশংসা করত। কিন্তু সময়ের প্রবাহে একসময় কদম্ব দেখতে পেলো মানুষ মানুষের তুলনায় বাজারে প্রচলিত যন্ত্রের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। মানুষ আজকাল মেশিনকেই বেশি ভালোবেসে ফেলেছে। সকলে এখন মেশিনের হনুমান, রাম-সীতায় মেতে উঠেছে—

> একটা কালো বাক্সে ব্যাটারি রাখা হয়। রামসীতার পিছন থেকে বের হয়ে এসেছে রাঙা দুটি তার। ব্যাটারি লাগে তারে, আরে আরে, অমনি রামের হাসি-হাসি মুখ নড়ে ওঠে, সীতার হাসি-হাসি মুখ, চির হাসিমুখ নড়ে ওঠে, রামসীতার ভাব জমে উঠে।[১২]

শেষে একদিন মালিককে ভরসা যুগিয়ে পেটের দায়ে নিরুপায় হয়ে কদম্ব এই মেশিনের রামসীতার সঙ্গে হনুমানের ভূমিকা পালন করে। মেশিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাকে চলতে হয়। দর্শনার্থীরা রামসীতার দিকে প্রথমে টাকা পয়সা প্রণামী দেয়, পরে হনুমানকে। এক বুড়ি শুধু রামের দিকেই পয়সা ছোড়ে। হয়তো মানুষ বলে হনুমানের দিকে সে ছোড়েনি। অনেকে বিবেচনা করে হনুমানকে টাকা দিয়েছে যন্ত্র অথবা মানুষ ভেবে। আসলে কদম্ব নিজেও যন্ত্রের তালে তালে যন্ত্র হয়ে পড়েছে। তাই দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে কখনো কদম্ব মানুষ কখনো যন্ত্র বলে ভ্রম হয়েছে। 'অ্যালুমিনিয়ামের ডানা' (শারদীয় পরিচয়, ১৯৯৬) গল্পেও আমরা দেখি মানুষ গুয়ে কীভাবে তারাদাস থেকে যন্ত্রময় টি.ডি হয়ে উঠেছে। নারান বিশ্বাস থেকে শুরু করে নেতা, সমাজের ব্যবসায়ী সকলে পিঠে লাগানো অ্যালুমিনিয়ামের ডানাযুক্ত গুয়েকে নিজেদের কাজে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করত। গুয়ের যান্ত্রিকতার কারণে খগা মণ্ডলের কাজ কমে যায়। গুয়ের কথায় তা স্পষ্ট—

> আর এদিকে খগা মণ্ডল একদিন আমার কাছে দুঃখ করে বল্ল গুয়ে, তুই আমার ভাত মারলি। আমি সাতপুরুষের গেছো। গাছে উঠে ডাবনারকোল পাড়ি। দুই টাকা পাই। তুই কেন এমনধরা করছিস। মহা মুশকিলে পড়লাম।[১৩]

ডিজিটাল যুগে মানুষের উন্নত ভাবনায় প্রতিনিয়ত যা কিছু আবিষ্কার হয়ে চলেছে পরক্ষণেই তা আবার নতুনের আগমনে পুরাতন মূল্যহীন হয়ে পরছে। আমাদের চোখের সামনে ২ও, ৩ও, ৪ও, ৫ও—একের পর এক মোবাইল বাজারে চলে আসছে। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগেও ফটো তোলার জন্য 'স্টুডিও'র যা রমরমা মার্কেট ছিল এখন আর সেরকমটা নাই। এরকম সব ক্ষেত্রে নতুন ও পুরাতন মেশিনের দ্বন্দ্বে সুচিত্রা, সাবিত্রী, কদম্ব গুছাইত, ঝরে কাক মরে গল্পের কথক ও তার দাদা, ক্যারক্কাস গল্পের কথকের নিপীড়িত জীবনযাত্রার যে দুর্বিষহ রূপ স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন তা সত্যিই লোমহর্ষক। এরা প্রত্যেকেই বাস্তবের মাটিতে বেড়ে ওঠা রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তারা কেউই তেমন কোনো অলীক স্বপ্ন দেখেনি। প্রত্যেকেই নিজের

মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল পরিবার সমাজের সঙ্গে। কিন্তু কেউই টেকনোলোজি'র ঝড়ে বা আগ্রাসনে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। প্রযুক্তির ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতায় কেউ বা জীবিকা হারিয়েছে আবার কেউ যন্ত্রদাসে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের লেখার কয়েকটি উক্তি দিয়েই প্রসঙ্গের ইতি টানা যেতে পারে— "একটা সময় আমার মনে হয়েছে প্রযুক্তি-মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানাচ্ছে। যে প্রক্রিয়া মানুষকে ভূমিদাস করে সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়।"[১৪]

উৎসের সন্ধানে

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, পৃ. ভূমিকা
২. শ্রাবণী পাল : 'সত্তর উত্তর গ্রামসমাজ ও বাংলা ছোটগল্প', একুশশতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ১১৮
৩. স্বপ্নময় চক্রবর্তী : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, পৃ. ১৫৪
৪. তদেব : পৃ. ১৬১
৫. তদেব : পৃ. ১৬০
৬. তদেব : পৃ. ১৪৫
৭. তদেব : পৃ. ১২০
৮. তদেব : পৃ. ১২২
৯. তদেব : পৃ. ১২৪
১০. বাসব দাশগুপ্ত ও সুদীপ দাস সম্পাদিত : 'নীললোহিত', পরিবেশ ও মনন সংখ্যা, নিউ রেনবো লেমিনেশন কলকাতা, দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৪, আশ্বিন ১৪১১, পৃ. ৩৫২
১১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃ. ১৩০
১২. তদেব : পৃ. ১৩৩
১৩. তদেব : পৃ. ১৫০
১৪. তদেব : পৃ. ভূমিকা

অন্ন সংকট : 'নিম অন্নপূর্ণা', 'জাতুধান' ও 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'

সুস্মিতা ঘোষ

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের ভালো-মন্দ, উত্তালতা-স্থিরতা সবই অবশম্ভাবীভাবে সাহিত্যে তার পদচিহ্ন রেখে যায়। রেখে যায় সময়ের ছাপ। আর ছোটোগল্প যেহেতু ক্ষুদ্র পরিসরে জীবনের ক্ষণিক উদ্ভাসন, তাই অশনি ঝলকে গল্পদেহে স্থান করে নেয় এইসব আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক যাবতীয় পরিবর্তন। বাংলা ছোটোগল্পে চল্লিশের দশক মূলত প্রগতি মনস্কতায় সঞ্জীবিত। পঞ্চাশের দশকের লেখকরা মধ্যবিত্ত মানুষের বহুবিধ ব্যক্তি-সংকটকে রূপ দিলেও তার মূলটি সামাজিক বিন্যাসের ভিত্তিতেই নিহিত। ষাটের দশকে আমরা দেখেছি সমাজ ব্যবস্থার এই ভিত্তিটি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক ও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের সমাজসংকট এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল এই সময়পর্বে। মানুষের বিশ্বাসে ফাটল ধরানো কিংবা অস্তিত্বের সংকট এই সময়ের সবথেকে বড়ো সংকট। কিন্তু এসব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল প্রাণ ধারণের ন্যূনতম উপকরণের অভাব। বেঁচে থাকবার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় যে তিনটি শর্ত—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান তার প্রথমটির অভাবেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল মানবিক বোধের চিরায়ত সজ্ঞা। শুধু বেঁচে থাকবার তাগিদে মানবত্ব বিসর্জন দিয়ে পশুত্বে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না নিরন্ন মানুষগুলোর। ফলে গল্পের পরিসরেও এই অন্নসংকটই প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে গল্পকাররা দেখাতে থাকেন অন্নহীনের যন্ত্রণা, তাদের সংগ্রাম তথা সংগ্রামহীনতা। কখনও শারীরিক মৃত্যু আবার কখনও আত্মিক মৃত্যু। গল্পে বাণীরূপ লাভ করতে থাকে নিষ্ঠুর, কঠিন, শ্বাসরোধী বাস্তবতা। গুরুত্ব পায় খাদ্যসংকট। কমলকুমার মজুমদার থেকে মহাশ্বেতা দেবী কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রত্যেকের গল্পেই প্রতিফলিত হয়েছে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষদের কথা।যারা ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য এক মুঠো অন্ন জোগাড় করতে বিচিত্র পন্থা অবলম্বন

করেছে। কমলকুমার মজুমদারের 'নিম অন্নপূর্ণা', মহাশ্বেতা দেবীর 'জাতুধান' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' এই অন্ন সংকট ও তা থেকে উত্তরণের বিচিত্র উপায় নিয়ে উপস্থিত হয়।

'নিম অন্নপূর্ণা' ক্ষুধার গল্প। ক্ষুধাই জীবনের চরম সত্য। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেখানে নিম্ন মধ্যবিত্তের সমস্ত মুখোশ খসে পড়ে। গল্পের প্রথমেই দেখা যায় খিদের জ্বালায় যূথী প্রতিবেশীর পাখির খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে ভিজে ছোলা খেতে গিয়ে পাখির ধারালো ঠোঁটে রক্তাক্ত হয় আঙুল। কেউ তার খাবারের ভাগ দিতে রাজি নয়, এমনকি পাখিটিও না। আহত যূথীর চিৎকারে ছুটে আসে বাড়ির বিধবা গিন্নী খেতু মিত্তিরের মা। সে যখন যূথীকে রক্ত মাখা আঙুলটা মুখে পুরে চুষতে বলে যূথী তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ে। কেননা তার মুখে তখনও সযত্নে রক্ষিত ছোলাগুলো ছিল, যা সে মুখে পুরেই চিবোয়নি। কারণ চিবোলেই তো শেষ হয়ে যাবে। তাই অতি কৃপণের মতোই মুখের এক প্রান্তে রেখেছিল এবং হাঁ করে আঙুল মুখে পুরবে, নাকি মুখটা আঙুলের কাছে নিয়ে যাবে এই ভীষণ দ্বিধায় অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থা তার তৈরি হয়েছিল। হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে তার মুখ থেকে ছোলা কটি পড়ে যায় এবং সেই ছোলাকটি গড়িয়ে খেতুর মার জল-সাদা হাজাদস্ট পায়ে গিয়ে লাগে। মুহূর্তে মধ্যে খেতুর মা যূথীকে গালিগালাজ করে এবং তার বেড়া-বেণীটা মুঠো করে ধরে যূথীর মা প্রীতিলতার কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু খেতুর মা যখন প্রীতিলতার কাছে যূথীর নির্লজ্জতার কথা বলছে তখন খেতুর মায়ের সেই কথার ভঙ্গি প্রীতিলতার কাছে বাস্তবতার বিপরীত সুর লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ার ছাঁদের মিল হয়ে ধরা দেয়। লেখক লিখছেন, বিশেষত যেখানে আছে—"বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি বনে বনে, গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি সকলের ঘরে। দীনহীন রাজ্য পায় তব কৃপা বলে।"[১] লেখক এখানে চরম বাস্তবতার মধ্যে ধর্মীয় লোকাচারের প্রসঙ্গ এনেছেন। সমাজের চরম বৈপরীত্য কত অবলীলায় দেখানো যায়, তার দৃষ্টান্ত গল্পটি। পাখিকে খাঁচায় আটকে তাকে ছোলা দেওয়া গেলেও একটি মানুষকে নিরন্ন রাখায় কোনো সমস্যা নেই। বোঝা যায় ব্যক্তিস্বার্থই সবচেয়ে বড়ো। সেই স্বার্থের বাইরে অবস্থানকারীদের বাঁচা-মরা নিয়ে কেউ ভাবতে রাজি নয়।

ক্ষুধার দাপটে মিথ্যাচার থেকে রেহাই নেই শিশুদেরও। ভাতের বদলে চোকর সিদ্ধ পেয়ে ছোটো বোন লতি মায়ের মনোরঞ্জন করার জন্যে বলে—"ভাতের থেকে আমার চোকর খুব ভালো লাগে।"[২] যূথী তখন আরও একটু বাড়িয়ে বলে—"ভাতের থেকে চোকর একশোগুণে ভালো, হাই ক্লাস।"[৩]

গল্পের শেষে দেখা যায় প্রীতিলতা অন্ন যোগানোর জন্যে অন্নপূর্ণা থেকে নিম অন্নপূর্ণায় পরিণত হয়েছে। স্বামী-সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য মরিয়া প্রীতিলতা বাইরের বারান্দায় আশ্রয় নেওয়া রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ ভিখারীর সাস্রয়ের সম্বলটুকু অধিকারের জন্য ধস্তাধস্তিতে বৃদ্ধকে হত্যা পর্যন্ত করতে পিছুপা হয়নি। অনিচ্ছাকৃত হত্যায় অনুশোচনা নেই তার, বরং ভাত ফোটার গন্ধ তাকে আশ্বস্ত করে। স্বামী-সন্তানের খাওয়া দেখতে দেখতে সোহাগ-খোরাকী গলায় সে বলে—"বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে...খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"[৪]

পৌরাণিক অন্নপূর্ণা অন্নের দেবী। তাঁর আশ্রয়ে অন্নহীন অন্নের যোগান পায়। শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বাড়ির গৃহবধূরা সেই অন্নপূর্ণার সঙ্গে সমীকৃত হন চিরাচরিত পরম্পরা অনুসারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় লিখেছিলেন—"বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল

লয়ে যায় ঘরে।" অর্থাৎ মাতৃ সত্তায় স্নেহ, মমতা আর করুণার উৎসার স্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়। কিন্তু পরিবেশ, পরিস্থিতি বিরূপ হলে সেই স্নেহধারাও অকালে শুকিয়ে যেতে বাধ্য। 'নিম' অর্থে বিরূপ। অন্নপূর্ণা এখানে বিরূপ। তিনি অন্নদান করেন না, বরং নিজে ও নিজের আত্মজনদের রক্ষার্থে অন্নহরণ করেন। তাঁর নিজের ঘরেই নিরন্নের হাহাকার। ফলে গল্পটি চরম অর্থনৈতিক সংকটকে মূর্ত করে তোলে।

প্রসঙ্গত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা দেবীর 'জাতুধান' গল্পটি। জাতুধান অর্থ রাক্ষস। এখানে সাজুয়া তিওর এক বিশাল দেহের ভীষণ ক্ষুধার মানুষ। রাক্ষসের মতো সে খায় বলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তার নাম দিয়েছেন জাতুধান। সে নামটিকে সম্মানী খেতাব বলে গ্রহণ করেছে। প্রবল অর্থ সংকটের মধ্যে সাজুয়ার পেট ভরা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই যে বছর চাষ ভালো হয় না সেই বছর সে বেরিয়ে পড়ে, যাতে মা, বউ-সন্তানের পেট ভরে। এরপর গল্পের ক্রম-অগ্রসরতায় দেখা যায় হঠাৎ একদিন ভাগীরথীর বান আসে। সেই বানের জলে সাজুয়া ভেসে গেছে বলে অনুমান করা হয়। নদীর মাইল তিনেক আগে একটা গলিত শবদেহ দেখা যায়, তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, প্রসারিত ও স্ফীত হাতে লোহার বালা দেখে সাজুয়া বলে ধরে নেওয়া হয়। এই সংবাদ পেয়ে কুশপুত্তলি দাহ করে তার শ্রাদ্ধ করে জ্ঞাতিরা। জ্ঞাতিভোজনের চাল দেয় তাদের মহাজন রাম সিংগি। কিন্তু গভীর রাত্রে ফিরে আসে জীবিত সাজুয়া। সাজুয়াদের গোষ্ঠীপ্রধান যখন বলে সেই চাল ফিরিয়ে দিতে হবে কারণ ও চাল শ্রাদ্ধের জন্য। সাজুয়া তখনই স্থির করে চালের বস্তা নিয়ে সে অনেক দূরে চলে যাবে। গোষ্ঠিপ্রধান মাতং সামান্য আপত্তি করে। নিজের শ্রাদ্ধের চাল কি কেউ খায় আর তাছাড়া—"শুদ্ধ হল না, দাহ হল, দেও দেবতার রিষে পড়বি।"[৫] সাজুয়া তখন উত্তর দেয়—"পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার রিষ বেরথা যায়।"[৬] এভাবেই জাতুধান সাজুয়া তার অন্ন সংকটের নিরাময় করে। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে প্রীতিলতা যেমন অন্যকে হত্যা করতে পিছপা হয়নি, তেমনি এই গল্পে সাজুয়া নিজের মৃত্যুকে মূলধন করেছে। নিজেকে সমাজের সামনে মৃত প্রতিপন্ন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

অপরদিকে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'টিতেও অন্নসংকটের এক বিচিত্র রূপ দেখা যায়। গল্পের প্রথমেই দেখি গ্রামের জোয়ান ছেলেরা গান গেয়ে ভূত কিনতে বেরোয়। তাদের নেতা সুরেন্দ্র, গল্পে সুরেন নামেই পরিচিত। সুরেন, নিতাইদের দলটা এসে থামে নিবারণের বাড়ির কাছে। তার বুড়ো বাপ পবনের খোঁজ নিতে ছেলের দল এসে থামে। পবন তাদের ডাকে সাড়া দিলে তারা তার বাড়িতে প্রবেশ করে। এখান থেকেই আমাদের পরিচয় হয় এই দরিদ্র পরিবারটির সাথে। আমরা দেখতে পাই হতদরিদ্র পবন গোবর মিশিয়ে তামাক খাচ্ছে! ঘরে লণ্ঠন নেই। নিবারণের স্ত্রী নিতাইদের লণ্ঠন নিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছে। পবনের ছেলে-মেয়ের গায়ে লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাকটুকুও নেই। এদিকে সুরেন এসেছে ভূত কিনতে। সুরেন অনেক আগে গ্রাম ছাড়ে। তখন গ্রামের চৌধুরী বাবুদের খুব দাপট ছিল। মেজোবাবুর হাতে তুচ্ছ একটা কারণে মার খেয়ে সুরেন এক কাপড়ে গ্রাম ছেড়ে গেছিল। গ্রামের মানুষ জানত সে রেলস্টেশনে কাজ করে। কিন্তু সুরেন এখন প্রতি সপ্তাহে শনি-রবিবার গ্রামে আসে, চকচকে শার্ট, হাতে হাতঘড়ি আর পকেটভর্তি টাকা নিয়ে। প্রতি অমাবস্যার রাতে বের হয় সেই টাকা বিলোতে। শর্ত হল ভূত দিতে হবে। ভূত কেনা বলতে সুরেন কী বোঝায় তা অবশ্য গ্রামের মানুষ বোঝে। সুরেনকে রেলস্টেশন থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজ সন্তানের মতো

মানুষ করেছেন ফাদার পেরেরা। বড়ো ডাক্তার উনি, কলকাতায় তাঁর প্রচুর নাম-ডাক। তাঁর মেডিকেল কলেজে কঙ্কাল সাপ্লাইয়ের কাজ করে সুরেন। এখন দশ টাকা বেড়ে রেট গেছে একশো টাকায়। একশো টাকায় কিনে ফাদারের কাছে বেচে আড়াইশো টাকায়। লাভজনক ব্যবসা, ভালোই চালিয়ে যাচ্ছে সে। সুরেনের বাবার মৃত্যুটা অবশ্য ছিল রহস্যময়। ট্যাঁকভর্তি ধান বিক্রির টাকা নিয়ে ফিরছিল মানুষটা। খুন হয়ে গেল! লোকে বলল ভূতের কারবার। পবন দেখেছিল সেই লাশ। চোখ উলটে গেছে, ভয়ে কালসিঁটে পড়ে গেছে মুখে। সুরেন বিশ্বাস করত আত্মা বলে কিছু নেই। গ্রামের যোগেন মাস্টার তাকে প্রশ্ন করলে সে জানায় তার বাবার কাছে যত টাকা সেদিন ছিল তার এক টাকাও পাওয়া যায়নি। তাই সে যোগেন মাস্টারকে প্রশ্ন করে—"কে নিল সেই টাকা আত্মা না পরমাত্মা কার বেশি টাকার দরকার?"[৭]

বুঝতে অসুবিধা হয় না এই ভূত ধরার কথা আসলে সুরেনের ব্যঙ্গ। তার বাবার হত্যাকারী যে ভূত নয়, মানুষ তা প্রমাণ করতে পারেনি সে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। কারণ ভূত আর যাই হোক টাকা চুরি করে না। তাই নিজে স্বাবলম্বী হয়ে গ্রামের নিরন্ন মানুষগুলির কাছে সে ব্যঙ্গের মাধ্যমে এই বিষয়টাই বোঝাতে চেয়েছে যে ভূত বলে কিছু হয় না। তাই অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ অপহারক তার পিতৃহন্তা ও সেই হত্যাকে যারা ভূতের কাজ বলে মনে করেছিলেন তাদের প্রতি এক নিষ্ঠুর পরিহাসে মেতে উঠেছিল সে। কিন্তু তার সেই পরিহাস গল্পের শেষে করুণ বাস্তবতাকে সামনে এনে দেয়। কারণ নিবারণের সংসারে ছিল প্রবল অভাব-অনটন। তারা ছিল বংশ-পরম্পরায় ঘরামি। এখন ঘরের কাজ যা হয় শহর থেকে মিস্ত্রি আসে। তাই ঘরামির পেশা ছেড়ে নিবারণকে নিতে হলো মাটি কাটার কাজ। মহাজনের কাছে নিজের জমি বন্ধক রেখে সে বর্গাচাষি হয়। আর এই মাটি কাটার কাজ হবে একদিন পরপর। দিনে পারিশ্রমিক সাড়ে চার টাকা। এই অভাবের পরিবারে সাড়ে চার টাকা নিবারণের কাছে অনেক। এই টাকায় অন্তত কিছুটা চাল সে কিনতে পারবে। সাড়ে চার টাকা তার কাছে এক পৃথিবী সুখ! দারিদ্র্য যে কতটা প্রকট হতে পারে, কতটা অভিশাপ বয়ে আনতে পারে তা অবশ্য আমরা দেখতে পাব গল্পের একেবারে শেষ অংশে। শেষাংশে শুরু হয় এক অন্য লড়াই। এই পরিবারের প্রতিটি মানুষ ক্ষুধার্ত। তাদের ক্ষুধা মেটানোর চিন্তাটাই সবার আগে করে তারা। আর তাই শেষপর্যন্ত এক কঠিন পথে পা বাড়ায় নিবারণ। যাতে ক্ষুধাটা মেটানো যায় সবার আগে। একটু গরম ভাত হয়ে দাঁড়ায় জীবনের চেয়েও বড়ো। তাই পেটের খিদে নিয়ে শুয়ে থাকা নিবারণের কানে হঠাৎ আসে যে ভূত ধরে দিতে পারবে সুরেন তাকে একশো টাকা দেবে। ক্ষুধার্ত নিবারণ এই কথা শোনার পর আর নিজেকে থামাতে পারেনি। বাবা পবনের কাছে সে জানতে চায় সে মরে গেলে ভূত হবে কিনা। বৃদ্ধ পবন জানায়—"হ্যাঁ আমি ভূত হবো নিশ্চয়! সুরেন্দ্রকে ডেকে আনিস আমি বোতলে ঢুকে যাবো, তুই একশো টাকা?"[৮] পবনের কথা শেষ হয় না। এরই মধ্যে শোনা যায় তার আর্তনাদ, দুটো দিন আরেকটু বেঁচে থাকার আকুতি, একটু গরম ভাত খাওয়ার মিনতি।

তিনটি গল্পই শেষ হয়েছে অন্ন সংকট থেকে মুক্তি পাবার বিচিত্র পথকে অবলম্বন করে। পেটে ক্ষুধা থাকলে যখন মানুষ কিছু পায় না তখন তারা ভালো খাবারের কল্পনা করে খাবারের স্বাদ নেয়। ঠিক যেমন যূথী নিজেকে পাখি কল্পনা করে বিভিন্ন খাবারের স্বাদ নেয়। কেননা সে শুনেছে কোনো কোনো ময়রা দোকানের ঝাঁপ খুলেই রাস্তায় নামে এক চ্যাঙারি বাসি খাবার হাতে নিয়ে। তাতে জিলিপি, কচুরি, নিমকি আরও সব খাবার থাকে এবং চিলো চিলো বলে সেই সব খাবার

ছড়িয়ে দেয়। আবার কখনও দুই বোন মিলে খাওয়া খাওয়া খেলা করে তৃপ্তি পায়। অন্যদিকে পবনও সুরেন্দ্রদের শিকার করা শজারু দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শজারুর মাংসের ভারি চমৎকার স্বাদ। লাল মাংস, কত নরম আর তেলে ভরা। কতকাল সে এমন মাংস খায়নি।

ধর্ম-শাস্ত্র, গ্রামীণ কুসংস্কারের কথাও উঠে এসেছে গল্প তিনটিতে। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে একদিকে যেমন খেতুর মার মুখ থেকে লক্ষ্মীর পাঁচালীর সুর বেরিয়েছে, তেমনি আবার 'জাতুধান' গল্পে নিজের শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে সাজুয়ার দেশান্তর হওয়া ধর্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধিবিধানকে অসাড় করে দিয়েছে। একদিকে ধর্মীয় শাস্ত্রের বেড়াজাল, অন্যদিকে মানুষের মনে কু-সংস্কারের বাস। 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'-তে দেখি, সুরেনকে নিবারণসহ আরও কয়েকজন ডেকে নিয়ে যায় ভূত ছাড়াতে। ওদের ডাকে সর্বানন্দর বাড়ি গিয়ে দেখে একজন পোয়াতি মৃগিরোগীকে কীভাবে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ওঝা দিয়ে ঝাঁড়-ফুক করানো হচ্ছে। সুরেন অবশ্য তার প্রতিকারও করে আসে শক্ত হাতে।

তিনটি গল্পেই দেখা যায় অন্নের সংকট এবং তা থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি পাবার জন্য বিচিত্র পন্থা। কেউ স্বামী-সন্তানের মুখে একটু অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য অসহায় বৃদ্ধ পথচারীকে হত্যা করে তার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করছে, কেউ নিজের শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে দেশান্তর হচ্ছে, কেউ আবার নিজের ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা পর্যন্ত করছে। ক্ষুধার রাজ্যের পূর্ণিমার চাঁদ যে ঝলসানো রুটি। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যূথী যেমন পাখির খাঁচা থেকে ছোলা নিয়ে মুখে পুরে ক্ষণিকের জন্য খিদে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, পবনও তেমনি খিদের জ্বালায় ওষুধের শিশির থেকে সবকটা ক্যাপসুল মুখে পুরে চিবোতে থেকেছে।

গল্পের পর্বে পর্বে বহু বিচিত্র স্রোতধারা বিন্যস্ত হয়েছে। বিশ্বপুঁজিবাদ মানুষকে নিরাশ্রয় করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশে সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশবাদের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য আক্রমণ যত অবারিত হয়েছে, আধুনিকতাবাদ উৎকট বীভৎসতাকে ততই উপজীব্য করে তুলেছে। জীবননির্বাহের জন্য, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ হয়ে উঠেছে বিকৃত। ক্ষুধা মেটানোর সংকট যখন জীবনের সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে অন্য সবকিছু। মূল্য হারায় মানুষ তথা মানবিকতা। গুরুত্বপায় শুধুই জৈবিকভাবে বেঁচে থাকার তাগিদ।

উৎসের সন্ধানে

১. কমলকুমার মজুমদার : 'গল্পসমগ্র', প্রকাশক শ্রী বিশ্বনাথ মৈত্র, ১৯৬৫, পৃ. ১২৩
২. তদেব : পৃ. ১৩১
৩. তদেব : পৃ. ১৩১
৪. তদেব : পৃ. ১৩৫
৫. মহাশ্বেতা দেবী : 'বেহুলা', প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, পৃ. ৭৫
৬. তদেব : পৃ. ৭৫
৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প সংকলন', বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২০
৮. তদেব : পৃ. ৩১

সত্তরের ছোটোগল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও ভাঙনের সংস্কৃতি

নবীনচন্দ্র দে

রক্তে মিশে থাকা বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি নিয়ে জন্ম হয় এক শ্রেণিচেতনার, যার উৎস ঔপনিবেশিকতার গর্ভে। অর্থনৈতিকভাবে উচ্চ ও নিম্নবিত্তের অবস্থানই সমাজে মুখ্য। কিন্তু এরই মাঝে জীবনীসত্তার বিস্তার ঘটিয়ে আবির্ভাব ঘটে মধ্যবিত্তশ্রেণির; যার দুই চোখ জুড়ে থাকে উদীয়মান ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রাস করে ক্রমশ আধুনিক হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু রাইটার বা কেরানি হিসেবে গড়া হয় তার পরিসর। যদিও মধ্যবিত্ত মানস শুধু কেরানি হয়েই রইল না। দশকের মোড়ে মোড়ে বুর্জোয়া মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, তেলেনাপোতা আবিষ্কারের পথে নামল; যার মধ্যে থেকে উঠে এলো সমাজ-রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির পালটে যাওয়া অভিব্যক্তি। আসলে বাঘের গর্ভ থেকে শুধু হিংস্র বাঘ জন্মায়। আর হরিণের গর্ভ থেকে হরিণ শিশু। কিন্তু মধ্যবিত্ত নিজের গর্ভে কেবল মধ্যবিত্তকেই পোষণ করে না। বাঘের থেকে হিংস্র, সাপের থেকে বিষধর, শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত মধ্যবিত্ত সত্তাকে ভূমিষ্ঠ করে থাকে; যারা কখনো কেড়ে নেয় ক্ষুধার্তের মুখের গ্রাস। আবার কখনো দু'হাতে ভরিয়ে দেয় দরিদ্রের ঝুলি। তাই জন্ম বিদ্রোহী মধ্যবিত্ত সত্তা অবলীলায় জায়গা পেল বাঙালির মানসে, বাংলা সাহিত্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজঐতিহ্যকে ভুলে আজ কেন মধ্যবিত্ত নিয়ে এত টানাটানি? নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এর উত্তরে বললেন, লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না। মধ্যবিত্ত লেখক লেখেন মধ্যবিত্ত পাঠক পড়েন।[১] তা বলে কিষাণ-মজুরদের বাদ দিলেও চলবে না। ইতিহাসের সূত্র ধরে দেখা যায়, কল্লোলেরাই প্রথম আঘাত আনে সাহিত্যের স্থায়ী সত্তায়। কাহিনিকে নামিয়ে নিয়ে যান নিম্ন-মধ্যবিত্তের পর্ণকুঠিরে।

সত্যনিষ্ঠকে স্থান দেয় বস্তুনিষ্ঠের পাতায়। তবু স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারেননি তাঁরা। ইতিহাসের নিয়মে আমরা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে এগিয়ে চলি অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে। যে অভিজ্ঞতা জাগিয়ে তোলে জীবনবোধের নানা অভিমুখ, যা তারাশঙ্কর-বিভূতি-মানিকের লেখায় রূপ নেয় একভাবে, চারের দশকে সুবোধ-নারায়ণ-মনোজ-কমলকুমারের লেখায় প্রকাশ পায় দেশভাগের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে। অপরদিকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মহাশ্বেতা দেবী-সুনীল-শীর্ষেন্দু-দেবেশ-মতি নন্দীর লেখায় এসেছে জীবনের বহুগামিতাকে কেন্দ্র করে। তাই সত্তরে লিখতে আসা লেখকেরা উপেক্ষা করতে পারেননি উত্তাল সময়ের বিপ্লবী মানসকে। তাঁদের হাতে সাহিত্য কেবল art for art's sake হয়েই রইল না। হয়ে উঠল মধ্যবিত্তের বস্তুনিষ্ঠ জীবনের সত্যনিষ্ঠ ছবি।

গতানুগতিকতার বন্ধ খাতে বইতে থাকা মধ্যবিত্ত মনন এক জটিল মায়ার জাল; যেখানে প্রতিমুহূর্তে বদলে যায় চেনা জীবনের পরিচিত সমীকরণ। পল্লিবাসী জনগণ থেকে শুরু করে শহুরে শ্রমিকশ্রেণি—সর্বত্রই একই ছবি। সহানুভূতি করুণার মতো মানবিক অনুভূতিগুলি যেখানে এলোমেলো হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনীতির শ্লথগতি, দুর্নীতি ভেঙে দিচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্নগুলোকে। তাই আজ বুক পকেটের নিচের চেতনা মধ্যবিত্তের অনুভূতির স্তরভেদে অসমর্থ। তাই ভগীরথ মিশ্রও (১৯৪৭) ঘোতন ওরফে মনিশংকর সান্যালের (মিডফিল্ডার, ১৯৯৬) মতো চরিত্রের অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেন। কিন্তু পাঠকের কাছে সেই অনুভূতির তল পেতে হয় মুশকিল। ঘোতন হঠাৎ করে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ফুটবল খেলা ছেড়ে দেয়। কেননা, মারাদোনা যা একখান কাণ্ড করল এরপর আর ফুটবলার হিসেবে মুখ দেখানোই দায়। নিজেকে মিড-ফিল্ডার ভাবতে লজ্জা হয়।[২] চিরদিনের মারাদোনা ভক্ত ঘোতনের অনুভূতিকে বুঝতে পারে না কেউই। আপাতদৃষ্টিতে সুদূর আর্জেন্টিনাবাসী মারাদোনার হাত দিয়ে গোল করা এবং সোদপুরের রেলওয়ে পার্কের ঘোতনের খেলা ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আছে তো কেবল ঘোতনের নীতিবান বিবেকের যন্ত্রণা। যে বিবেককে সহযত্নে লালন করে ঘোতনের মতো মানুষ। শেষপর্যন্ত ঘোতনকে খুলতে হয় চা-বিড়ির ঘুমটি। খেলা ছাড়া, জুটমিলের কাজে যাওয়া—একের পর এক চরম বাস্তবগুলো শুকোতে দেয় না ঘোতনের বিবেকের ক্ষতস্থানকে। এরই মধ্যে খবরে আসে তাদেরই এলাকার অম্বরীশ নামে এক যুবক, যে কিনা বজবজ-ব্যারাকপুর লোকালের একটি কামরায় সোনার পুঁটিলি কুড়িয়ে পেয়ে মালিককে খুঁজে বের করে ফেরত দিয়েছে তাবৎ মাল।[৩] হঠাৎ করে জেগে ওঠে ঘোতনের মিডফিল্ডারের চেতনা। অপরের জন্য গোলের বল বানিয়ে দেওয়া যার কাজ, সেই মিডফিল্ডার (ঘোতন) অম্বরীশের জন্য অভিবাদনের মঞ্চ বানিয়ে তোলে। সকলকে ডেকে নিজের দোকানের পুরনো চকলেট, একটি লাইফবয় প্লাস সাবান ও পুজোয় পাওয়া শার্টের পিস তুলে দেয় অম্বরীশের হাতে। আসলে এর মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিজেই সংবর্ধিত করে ঘোতন। কেননা, কিছুদিন পর সকলকে প্রচার করে ওই গহনা ফেরত দেওয়ার মানুষটি, আসলে সে নিজে। আর ঠিক এখান থেকেই শুরু হয় মধ্যবিত্ত মনের জটিলতা, যে জটিলতা ঘোতনের চারিত্রিক দ্বৈত অবস্থানের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। বিবেক সেখানে তুচ্ছ, নিজের চোখে নিজেকে বড়ো ও সফল করে দেখানোই যেখানে মুখ্য।

জটিল হলেও চারিত্রিক এই দ্বিচারিতাই মধ্যবিত্তের বিশেষ স্বভাব বলে গণ্য। তাই ভগীরথ মিশ্রের লেখা 'রঙছুট' গল্পের ভুটু হোলির দিনে নিজেকে রংখেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু দিনের শেষে নিজেই নিজেকে রং মাখিয়ে অভিযোগ আনে, কান্নাভেজা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির পথ ধরল সে—

> অত করে না করলাম, তব্বো কেন ওরা অঙ দিল আমারে...জোর করে মাখিয়ে দিয়ে পাইলে গেল...কত করে মিনতি করলাম, আমার শরীল খ্যারাব, আমারে অঙ দিওনি, কেউটি শুনলোনি আমার কথা...কেউ শুনলোনি...।[৪]

কিংবা রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৯৫৬) ভিক্ষুক কোনো (কর্ণ, ১৯৮৭) যখন নিজের পাওয়া জিলিপি অপরকে দিয়ে নিজের কাছে নিজেই হয়ে ওঠে দাতা কর্ণের সমতুল্য। আসলে এই ঘোতন, ভুটু, কোনোর মতো চরিত্রগুলি আমাদেরই সমাজেরই মধ্যবিত্তের এক একটি ছবি; যাদের চরিত্রের দ্বৈত সত্তাই তৈরি করে মধ্যবিত্ত মননের জটিল সমীকরণ।

সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে চালু হয় টেলিভিশন। পেট না ভরলেও মন ভরবার কারিগর পেল মধ্যবিত্ত, যা নাড়িয়ে দিল তিলোত্তমার সহজ স্বপ্নের দিনগুলো। বাড়তে থাকল গগনচুম্বি ফ্ল্যাট কেনবার হিড়িক। সকালের সবজি বাজারের চেনা পরিচিত ভিড় পথ বদলে হাজির হলো রাতের শৌখিন পণ্যসামগ্রীর বাজারে। পালে হাওয়া পেল পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা। অর্থনৈতিক অসাম্য থাকলেও মান বজায়ের পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে উঠল বাঙালি। অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্রর মতে, অতিথিদের কী খেতে দিতে হবে, তত্ত্বের সামগ্রী কী পাঠাতে হবে, উৎসব উপলক্ষে কী উপহার বিতরণ করতে হবে, এইসব ব্যাপারে ব্যারিস্টার ও স্কুলমাস্টার একই ভাবজগতের অধিবাসী; ফলে ব্যারিস্টার হয়তো নিজের আয়ের থেকেই উৎসবের খরচ জোগাতে পারে, কিন্তু স্কুল মাস্টারকে ঋণে আকণ্ঠ ডুবতে হবেই। মধ্যবিত্তের এই অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য তাদের অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক অসাম্য।[৫] তাইতো অমর মিত্রের (১৯৫১) মালা (উড়োমেঘ), ১৯৯৩ দোতলার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা নন্দিনীকে দেখে আর অবাক হয়। নন্দিনীর ঘরের রঙিন টেলিভিশন, তাতে আসা চেনা পৃথিবীর অচেনা দৃশ্য ও শব্দ, দামি পণ্যসামগ্রী, রেফ্রিজারেটর, ভিসিডি—মালাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করে। উপরের ফ্ল্যাটের সাথে নিচের তলার ফ্ল্যাটের পার্থক্য বোঝে মালা। কিন্তু প্রাইম টাইমের বিজ্ঞাপনে আসা সেকস ও বিউটি যৌথ আকর্ষণকে উপেক্ষা করবার দৃঢ়তা নেই তার মনের। আবার তাকে মাসিক পন্যের তালিকায় জায়গা দেবার ক্ষমতাও নেই মালার স্বামী আবিরের। আসলে এই অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও প্রত্যাশার অনিঃশেষিত স্রোতই মধ্যবিত্ত মনের অমিতব্যয়িতার পরিচয়। যেমন ভালো মাছ, তার দামও তেমন। দেখতে ইচ্ছে করে, কিনবার সাহস হয় না।[৬]

আবিরের এই মানসিক টান বুঝেও বোঝে না মালা। এই অবুঝ অভিমানই জমা করে তাদের সংসারে উড়োমেঘের জলীয় বাষ্প। সংসারে যার প্রয়োজনীয়তা নগণ্য। কিন্তু সমাজে নিজের ঠাট বজায় রাখবার প্রতিযোগিতায় তার অবস্থান সীমাহীন। যদিও এই ভাবনা সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কেননা, এর পাশাপাশি বাঙালি সাম্যবাদী মনের নিরঙ্কুশ অনুভূতিকে ভুললে চলবে না। যে অনুভূতিতে আকবর বাদশার সাথে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ থাকে না। দারিদ্র্যকে সামাজিক দূষণ বলে চিহ্নিত করে বুর্জোয়া মানসিকতা। কিন্তু সেই দারিদ্র্যকে সঙ্গে নিয়েও মানুষ বাঁচে। যেখানে ঠাঁট বজায় রাখবার মানসিকতা থাকলেও তাকে ছাপিয়ে ওঠে মানবিকতার অন্য ছবি। আসলে অমিতব্যায়িতা মধ্যবিত্ত চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কিন্তু তা কখনোই মধ্যবিত্তকে চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড হতে পারে না।

লক্ষ্য করার মতো অমিতব্যায়িতা আবার জন্ম দেয় এক সুবিধাবাদী মানসিকতার বা অর্থগৃধ্নুতার। সকল বিত্তেই যার অবস্থান কম বেশি সমান। একথা ঠিক এই সুবিধাবাদিতা পুঁজিবাদী মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে মধ্যবিত্ত মানসেই তার হাতেখড়ি। তাই তো মধ্যবিত্ত মানস কসুর করে না সুবিধাবাদের নির্লজ্জ পদলেহনে। কসুর করে না জড়ায়ুর বৈধ ডিম্বাশয়কেও বিকিয়ে

দিতে। আসলে এই অর্থগৃধ্নুতা কোনো নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ নয়। তা কেবল চাহিদাপূরণের ছদ্মবেশী স্বার্থের রুপোলি সুখ। কানাই কুণ্ডু (১৯৩৫) তাঁর 'অমৃত মন্থন' গল্পে যেন সেই কথাই বলার চেষ্টা করলেন। নিঃসন্তান জুমেলি। কিন্তু দুধে টসটসে বুকের যন্ত্রনাকে সহ্য করতে পারে না সে। নিষ্কৃতি পেতে তাই হাটে হাটে অন্যের সন্তানের মুখে তুলে দেয় মাতৃত্ব মেশানো নিজের বুকের দুধ। বিনিময়ে জুমেলির স্বামী বিতান গুনে গুনে আদায় করে টাকা। যা দিয়ে চলে তাদের ভাত কাপড়ের নিত্য জোগান। জুমেলির উদ্দেশ্য যেখানে শারীরিক যন্ত্রণার উপশম, সেখানে বিতানের লক্ষ্য প্রণোদিত। স্ত্রীর যন্ত্রণার সাহায্য তার উপরিতল মাত্র। সাত দিনে পাঁচ হাটে চক্কর দেয় জুমেলি ও বিতান। সময় যায়, কিন্তু নিজের সন্তান ধরে রাখতে না পারবার কারণ খুঁজে পায় না জুমেলি। শুধুমাত্র মা হবার কষ্টটুকুই জোটে তার ভাগ্যে। মা হবার আনন্দ বিগত পাঁচ বারের পুহাতি জুমেলির ভাগ্যে জোটে না। সন্তান ধরে রাখবার আশায়, বিতানের এনে দেওয়া বৈদ্য মহারাজের শিকড়ের পাতা মধু দিয়ে নিত্য খেয়েছে সে রাতের পর রাত। কিন্তু বুকের দুধ শুখতে না শুখতেই আঁশটা পানি আর রক্তের ঢলে পাঁচো বাচ্চা খালাস।[৭] কিছুটা ঘৃণা ও কিছুটা বিরক্তি নিয়ে একসময় জুমেলি নিজেই উপস্থিত হয় সেই বৈদ্যের আখড়ায়। ক্ষোভে আক্রোশে ফেটে পড়ে জুমেলি বৈদ্যের ওপর। কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যায় বিতানের নিষ্ঠুর অভিসন্ধির সত্য জেনে— "তোর মরদ তো খালাসিকে দাওয়া খরিদ করেছিল রে। পয়দাকে নাহি। জরা উসিকো পুছ।"[৮] সুবিধাবাদী স্বামীর নিষ্ঠুর মানসিকতার পরিচয় এর থেকে বেশি আর কি হতে পারে জুমেলির সাথে মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) স্তনদায়িনীর সাদৃশ্য আপত দৃষ্টিতে পাঠক পেতে পারেন। কিন্তু বিষয়ের গভীরতায় ও মধ্যবিত্তের অর্থগৃধ্নু মানসিকতার যে ছবি কানাই কুণ্ডু এঁকেছেন, তার পরিচয় হয়তো মহাশ্বেতা দেবীর কাছেও ছিল না। যদিও অমর মিত্রের 'কোকিল', শৈবাল মিত্রের 'পৃথিবীটা কার বশ', রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কে হবেন কোটিপতি'-র মতো গল্পে মেলে এই সুবিধাবাদী মানসিকতার এক অন্য পরিচয়।

পাশ্চাত্যের স্পর্শে বাঙালি মধ্যবিত্ত মননের দ্রুত উন্মেষ ঘটে। যে উন্মেষ ব্যাপ্ত করে মধ্যবিত্ত মনের পরিসর। এর পাশাপাশি বামপন্থী বিশ্বাস ও চিন্তা মধ্যবিত্তের ব্যক্তিজীবনের মান উন্নয়নের সহায়ক হয়ে ওঠে। সনাতনী ভাবধারা মার্কসীয় ভাবনায় বর্জনীয়। কিন্তু উপেক্ষিত হয়ে তা আস্তাকুঁড়ে পড়েও থাকেনি। তাই গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের সম মর্যাদার সাথে বিসম ভাবধারার সঙ্গমে জন্মঘটে নব সংস্কৃতির। যে সংস্কৃতি উন্মুক্ত করে বাঙালির মনকে। কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ নামক একটি সংশয় রয়ে গেল মধ্যবিত্তের মনের আড়ালে। যে সংশয় রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের গোপন সঙ্গমে বাড়িয়ে তোলে মধ্যবিত্তের উটের গ্রীবার বিপন্ন বিস্ময়কে। মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতার এই গোপন ছবি ধরা পড়ে সমীর রক্ষিতের রমার (জন্ম ও মৃত্যুর অবদান, ১৯৭৪) জীবনের কাহিনির মধ্য দিয়ে। রমা নিজের তিন বছরের বিকলাঙ্গ সন্তান নয়নকে হারায়। যদিও এই বিকলাঙ্গ সন্তানের মৃত্যুর কারণ হিসেবে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কখনো নিয়তির প্রসঙ্গ, কখনো রমার পাপী পেটের প্রসঙ্গ। এর সাথে মেলে রমার শাশুড়ির সুনিশ্চিত মতামত, যে পেটে বিকলাঙ্গ ছেলে জন্মায় সে পেটটার দোষ প্রমাণের জন্য নিয়তির প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে পেটটা যার সে যে কতবড় পাপীসেটাই প্রমাণ করে।[৯] তাইতো দোষ মেটাতে রমাকে স্নান করতে হয় হাজামজা পুকুরে, দণ্ডী কাটতে হয় বাবার থানে, কোমরে বাঁধতে হয় বেলপাতার মাদুলি। এতে শাশুড়ি খুশি হয়, খুশি হয় তার সনাতনী বিশ্বাস। কিন্তু ডাক্তার যায় রেগে। মাদুলি দেখে ডাক্তার যে আগুন হয়েছিল সেকথা রমা ভোলেনি—"এতেই যদি সারবে তবে আমার কাছে আসা কেন যা যা বলেছিলাম খাইয়েছিলে সিংমাছের ঝোল রোজ একটা করে ডিম অন্তত একসের দুধ ওষুধও তো খাওয়াও না

ঠিকমত।"[১০] এই ঘটনা কেবল নয়নের বিকলাঙ্গা দূর করতে গিয়ে ঘটেনি, আগেও ঘটেছে। নয়নকে জন্ম দিতে গিয়ে রমাকে মুখ বুজে মানতে হয়েছে রক্ষণশীলতার কঠোর নিয়ম। এ এক্ষেত্রে রমার স্বামী প্রকাশ তার নীরব সমর্থন জানিয়ে গেছে। স্বভাবগত ছিঁচকাঁদুনে রমা তাই আজ আর কাঁদে না। কান্না যদি শোক প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হয়, তবে তাতে তার শাশুড়ির অধিকারই অধিক। আসলে সংস্কার ততক্ষণই মান্য, যতক্ষণ না সে জীবনের পথকে না আগলে দাঁড়ায়। তারপর সেই সংস্কারের রূপান্তর ঘটে কুসংস্কারে। রমার পরিবারের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটেছে। সময়ের সাথে সাথে ভাবনার পরিবর্তন ঘটে বটে। কিন্তু তার মূল্য একটা তরতাজা প্রাণ তা মানা কঠিন। তবুও মানতে হয়। এবং অনুভব করতে হয় জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার ব্যবধানকে। যে ব্যবধান মানে না কোন সনাতনী সংস্কার। না মানে কোন অপ্রাসঙ্গিকতার অকাট্য যুক্তি। চায় তো কেবল সত্য-সুন্দরের মঙ্গলময় অভিবাদন। তাই শেষপর্যন্ত রমার শাশুড়িকেও বলতে হয়, দুধটা খেয়ে নাও বৌ অত ভেঙে পড়লে চলে শরীরটা তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।[১১] কেননা, জীবনের থেকে বড় কিছুই নয়। না সংস্কার না রক্ষণশীলতার স্থবির মূল্যবোধ।

সুবিধাবাদী মনোভাব, অমিতব্যয়ী স্বভাব, উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশা, সঙ্গে রক্ষণশীল মানসিকতা—এই সমস্ত দিকগুলিই মধ্যবিত্ত বাঙালির চরিত্রের অঙ্গ। এরসঙ্গে আবার বাঙালি মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা ভুললে চলবে না। যে সংস্কৃতি চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার দুর্গোৎসব -সমস্ত ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে স্বমহিমায়। যদিও সেখানে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহনের বদলে স্বভাবের ঔদ্ধত্যতা প্রকাশই মুখ্য। তাইতো রাস্তার মোড়ে বাজতে থাকা রবীন্দ্রসংগীত, আর রবীন্দ্রসংগীতে এমএ পাস করা মেয়েটির শিক্ষার মূল্য কাগজে-কলমে একই দাঁড়ায়। আসলে মধ্যবিত্ত বাঙালির সংগীত-প্রীতি অনেকটা ঐ নকল ফুলের মতন। র-কে ড়, শ-কে য, হৃদয়কে হিরিদয় বলে আবেগে চক্ষু মুদলেই তাঁর গান হয় না। আসল বস্তু হল খাঁটি ভালোবাসা[১২] আর ভালোবাসা নেই বলেই গানকে বাঙালি অনেক ক্ষেত্রেই বেছে নেয় দাম্পত্য কলহের আড়াল হিসেবে। হাস্যকর হলেও এটাই বর্তমান মধ্যবিত্ত বাঙালির সংস্কৃতি সাধনা। ঘরের মধ্যে বইছে ভীষণ আগুনের হল্কা। ছেলে গর্জে ওঠে, বেশ করবো রেকর্ড কিনবো। এ তো তোমার বাবার পয়সায় নয়।

বউ ঠিকরে জবাব দেয়, স্যাকরার দোকানে আমার পলা বাঁধানোটা কবে থেকে তৈরি হয়ে পড়ে আছে। সেটা আনার জন্যে পয়সার ভারি অভাব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। শচীনকর্তা গুমরে ওঠেন, যদি এ চাঁদনি রাতে, নিদ নামে আঁখি পাতে...ত্রিলোচন ভেবে মরে কি করে পরমহংস হওয়া যায়। ঝগড়াটা বাদ দিয়ে কী প্রকারে কেবল গানটুকু আত্মসাৎ করা যায়। এভাবে গান শোনার সাধনা দেখা যায়।[১৩] (সুব্রত মুখোপাধ্যায় : 'শচীনকর্তার গানের আড়ালে') শুধু গানের প্রসঙ্গে নয়, শিল্পীর শিল্পত্ব প্রকাশেও এই হৃদয়হীনতার পরিচয় মিলে। প্রতিভা তাই বেঁচে থাকার শুষ্ক মরুভূমিতে মিলিয়ে যাচ্ছে এক বিন্দু জলের মতো। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের (১৯৫০-২০১৯) সৃষ্ট যাত্রাশিল্পী পুটু চক্রবর্তীর (যাত্রামঙ্গল) কথাই ধরা যাক; যে যাত্রা করার জন্য ছাড়ে জুটমিলের কাজ। ফলে মা করে তাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উৎখাত। তবুও থেমে থাকেনি সে। এই যাত্রায় দিয়েছে তাকে তার স্ত্রী, তার সন্তান। সাতষট্টি বছরে এসেও পুটুর এই শিল্পীসত্তাকে ঠিক বোঝেনা তার পরিবার। তার ছেলে বড়বাজারে মারওয়ারির গদিতে পাঁচশো টাকা বেতনের কর্মচারী। যার কাছে বাবার যাত্রা করে পাওয়া পুরস্কারের (সবজি) কোনো মূল্য নেই। কেননা, তার কাছে মধ্যবিত্তের শখ থাকতে পারে, কিন্তু স্বাদ করে তাকে পূর্ণতা দেওয়া ঘোর পাপ। পরিবারের তুমুল কলরবের মাঝখানে পুটু তাই গলা ছেড়ে পার্ট বলে—

ভগবান, আমি তোমায় চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ। পারো তো নেমে এসো সামনে আমার। আর কত যুগ ধরে আকাশবিহারী হয়ে থাকবে। গরিব ভুখা মানুষের বন্ধু কে বলে তোমায়। কে বলে তুমি বঞ্চিতের সখা। ভুল, এসব ভুল। হ্যাঁ, তাই তো তোমায় আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।[১৪]

মধ্যবিত্ত মনন সম্পর্কে কোনো কথাই কখনো সার্বিক নয়। জীবকোষের অভিব্যক্তি থেকে দ্রুত ঘটে মনের অভিব্যক্তি। তাই যে মধ্যবিত্তকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১) মানুষ রতন বলে চিহ্নিত করেন, সেই মধ্যবিত্তই কিন্নর রায়ের (১৯৫৩) চোখে হাইব্রিড বলে প্রতিপন্ন হয়। বিত্ত শব্দটা একসময় শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চিহ্নিত করত। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির মুক্তদুয়ার সেই নিয়মের ধারাবাহিকতা ভেঙে দিয়েছে। তাই আজ ড্রাগের নেশা মধ্যবিত্ত যুবকের মনে মহাপৃথিবীর ছবি আঁকে। যাটোর্ধ্ব মানুষটি নিঃসঙ্গতা কাটাতে বিনোদনের কথা ভাবে। এভাবে সত্তর দশকের মূল্যবোধের ভাঙন-বিপর্যয়-সংকটের গল্প এই সময়কালকে সঠিকভাবে চিনিয়ে দেয়।

উৎসের সন্ধানে

১. ধনঞ্জয় দাশ : 'মার্কসবাদী সাহিত্যে বিতর্ক', নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫৮, কলকাতা ৫৪, পৃ. ৩৭২
২. ভগীরথ মিশ্র : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৪
৩. তদেব : পৃ. ১৬
৪. ভগীরথ মিশ্র : 'সেরা ৫০টি গল্প', প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩০৬
৫. অশোক রুদ্র : 'সত্তর দশক ও বাঙালি মধ্যবিত্ত', সত্তর দশক খণ্ড দুই, অনিল আচার্য সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯১, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১০৭
৬. অমর মিত্র : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫০
৭. কানাই কুন্ডু : 'অমৃত মন্থন', প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৬৫
৮. তদেব : পৃ. ১৪
৯. সমীর রক্ষিত : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৩, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১০৮
১০. তদেব : পৃ. ১০৮
১১. তদেব : পৃ. ১১০
১২. সুব্রত মুখোপাধ্যায় : 'শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৪, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫২
১৩. তদেব : পৃ. ১৫২
১৪. তদেব : পৃ. ১৮০

স্বরূপ ও বিবর্তন : নির্বাচিত গল্পের আলোকে

রবীন্দ্রনাথ মুদি

বাংলা ছোটোগল্পে অন্ত্যজ মানুষের জীবনকে যাঁরা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনিল ঘড়াই। তাঁর রচনার মধ্যে সেই সব চরিত্র ভিড় করেছে, যাদের পায়ের তলার মাটি নেই। লেখক স্বয়ং ছিলেন একজন অন্ত্যজ মানুষের প্রতিনিধি। সমাজ ও সংসারকে খুব কাছের থেকে দেখেছেন তিনি। প্রখর বাস্তববাদী মানবদরদী এই লেখকের লেখনিতে তাই ধরা পড়ে সমাজের অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত মানুষদের জীবন্ত রূপ। তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে যেমন ধরা পড়েছে অন্ত্যজ মানুষের বিচিত্র জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, আচার-বিচার তেমনই ধরা পড়েছে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানও। তাঁর 'চৌকিদার', 'কানাকড়ি', 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ', 'চালচিত্র', 'ভোটবুড়া' ইত্যাদি গল্পে অন্ত্যজ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের স্বরূপ ও বিবর্তন প্রতিভাত হতে দেখা যায়।

অনিল ঘড়াই এর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'চৌকিদার'। একদা লেঠেল দলের সর্দার সনাতন বর্তমানে সাত নম্বর অঞ্চলের 'সনা চৌকিদার'। রাত পাহারা দেওয়া শরীরের পক্ষে ভালো নয় জেনেও পেটের দায়ে তাকে একাজ করতে হয়। পেটের দায়ে কাজটা করতে গিয়ে তার পেটের সমস্যা হয়েছে। ফলে অসময়ে চুল-দাড়ি পেকে কাশফুল। তার একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই থাকলেও, তা আগলানোর কেউ নেই। বউ সুষমা ভরাট গতর নিয়ে পালিয়ে যায় পর পুরুষের হাত ধরে। যাওয়ার আগে তিন বছরের শিশু সন্তান বিশুকে রেখে যায়। সেই বিশু এখন কলেজে পড়া বিশ্বনাথ। সে সাধারণ ছেলের মতো নয়, গ্রামের স্কুল থেকে বেশি নম্বর পেয়ে শহরের সরকারি কলেজে পড়ে। মাঝে মধ্যে বাবাকে চিঠি লেখে, সেই চিঠিই 'সনা চৌকিদারের আশ্রয়'। গ্রামের মানুষের কাছে রাজনীতি হল বড়োলোক মানুষের যথেচ্ছাচার। 'সনা চৌকিদার' তাই রাজনীতি করে না—

> রাজনীতি গরীবের ঘোড়ারোগ, সনাতন এই জ্ঞানে এতদিন এড়িয়ে এসেছে গ্রাম্য রাজনীতিকে। দু'বেলা যার পেটে ভাত জোটে না, সে করবে রাজনীতি ভোটের

> যায়, তার খড়ের ঘরে খড় পচে সূর্যের আলো খেলা করে ঘরের ভেতর। বাবুবদল বা চেয়ার বদল তার কাজে এক ধরনের খেলা ছাড়া কিছু নয়। যে রাজনীতি দেশ ও দশের মঙ্গল চায় না সেই জঘন্য নীতির উপর থুতু ফেলে সনাতন।[২]

কিন্তু সনাতনের ছেলে বিশু বাবার ঠিক উল্টোটা। শহরের হোস্টেল থেকে পালিয়ে রক্ত গরম করা শ্লোগান লেখে। কোনো অন্যায় অবিচার দেখলে সে চুপ করে বসে না থেকে তার প্রতিবাদ করে। মাধবের কথায় জানা যায়—"বিশু রাজনীতি করলেও তার নীতি বড়ো পরিষ্কারা।"[২] এসব ছেলেমানুষী কথায় সনাতনের মন ভোলে না। ছেলের জন্য প্রতিটি রাত বিনিদ্র কাটে তার। একসময় শোনা যায় কে বা কারা শহরে পুলিশ খুন করে ফেরার হয়েছে। পুলিশ তাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে।

একদিকে ৭নং অঞ্চলের বন্দুকওয়ালা মানুষ হলধরবাবু এই পঞ্চায়েতের মাথা। তাঁর মেয়ের ঠ্যাং ভেঙেছে ভিন্ন পার্টির লোক বেণুবাবুর উৎসর্গীকৃত কালো ষাঁড়টি। এই নিয়ে হলধরবাবু তিতি-বিরক্ত। ঠিক করা হয় ষাঁড়টিকে মেরে ফেলা হবে। মাধব আবিষ্কার করে দাগা ষাঁড়টির স্বভাব সনাতনের ছেলে বিশুর মতো। একদিন কালু সেখ, যার বিঘা দেড়েক উচ্চফলনশীল ধান তছনছ করে ছিল, সে ষাঁড়টার মাথায় বল্লম ছুঁড়ে মারে। এসব দেখে সনাতনের চোখে জল নামে। বেণুবাবু পশুর ডাক্তার নিয়ে এলেও হলধরবাবু চিকিৎসা করতে দেননি। সনাতন গ্রামের অত্যাচারী ঐ দাগা ষাঁড়টিকে নিয়ে এই পঞ্চায়েত এলাকার বাইরে চলে যেতে চায়। কিন্তু ভাগাড়ের কাছে এসে ষাঁড়টি মারা পড়ে। ঠিক তখনই পুলিশ সেখানে নকশাল বিশুর লাশ ফেলে যায়। লাশ দেখে বেদনায় ডুকরে ওঠে সনাতন। এখন—

> দু'খানা মৃতদেহের মাঝখানে লাঠি হাতে টানটান শরীরে দাঁড়িয়ে থাকল সনাতন। কাক-শকুনের সাথে লড়তে তার আজ এক ফোঁটাও ভয় নেই। সে নিজে মরবে কিন্তু দখল দেবে না লাশের।[৩]

গল্পে দেখা যায় কেউ রাজনীতি প্রসঙ্গে উদাসীন থাকে আবার কেউ-বা রাজনীতির কূটনীতির প্রতিবাদী হয়ে লাশ হয়ে যায়।

অনিল ঘড়াই-এর 'কানাকড়ি' গল্পে লোকের বাড়ির কাজের মাসি যমুনামাসির ছেলে নকড়ির কথা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়। যমুনামাসির নিজের ছেলে নয় সে, মাত্র ন'টা কানাকড়ি দিয়ে মাসি তাকে কিনেছিল। যমুনামাসির অভাবের সংসারে নকড়ি প্রায় কিছুই করে না। মোড়লবাড়িতে পেটভাতায় বাগালি করা তার পোষায় না। এই নকড়ি গান বাঁধে, নেশা করে। যমুনা মাসিকে সে দেখে না। যমুনামাসি মারা যাবার পর বাপ-ঠাকুরদার ভিটেমাটি ছেড়ে সে এখন রীতিমত কবিয়াল। পাগল পারা নকড়ি মাঝে মাঝে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যাদের সঙ্গে সে মেলামেশা করে তারা ছ্যাঁচোড়, গাঁজাখোর-মদখোর, মাতাল-বাচাল। শোনা যায়, নকড়ির বাবাও ছিল ডাকসাইটে মাতাল। এ হেন নকড়ি গান বাঁধে। তারপর নকড়ির প্রেমে পড়ল হারাধন মোড়লের বড়ো মেয়ে আলপনা। নকড়িও তাকে নিয়ে গান বাঁধল। কিন্তু তাদের প্রেম সফলতা পায় নি। অবশেষে নকড়ি বিয়েথা করে ঘোরতর সংসারী মানুষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মনের আগুন নেভেনি। বোলানের নামে যে রং-পাঁচালি রচনা করে, তার বিষয় গ্রামের প্রধানের অপকীর্তি। যে প্রধান তার বিধবা মায়ের জি আর কেটে দেয়, পঞ্চায়েতের টাকা নয়ছয় করে। যার দশ বিঘা জমি তাকে জি আর পাইয়ে দেয়। তাকে নিয়ে গান বাঁধতে সদা প্রস্তুত সে। সে রাজনীতি প্রসঙ্গে কতটা সচেতন তার বিতর্কে না গিয়ে বলা যায়, রাজনৈতিক নেতাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সে গান বাঁধে। ভয় পেয়ে সকলে বারণ করে, সে কিন্তু থামবে না—

> যা কিছু অনাচার, অন্যায় তা আমি গান বেঁধে ঘরে ঘরে গিয়ে শুনিয়ে আসব। এতে কুনো পাপ নেই। মানুষ ভুল করলে তারে শুধরে দিতে হয়। না শুধরালে তা গাঁ-সমাজ সব কিছু পচিয়ে দেবে।[৪]

গতবছর গণপতির হাতে মার খেয়েও কোনো তোয়াক্কা না করে এবছরও তাঁকে নিয়ে গান বেঁধেছে সে। কিন্তু গানের মহড়া হয়, গান গাওয়ার সুযোগ হয়নি তার। বোলানের আগের দিন সে খুন হয়ে যায়। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না কে বা কারা খুন করেছে তাকে। পরের দিন গ্রামের প্রধান গণপতিবাবু তার কাটাছেঁড়া দেহটার গলায় কাঠটগরের মালা পরিয়ে দেয়, খুচরো ফুল ছড়িয়ে দেয় গায়ে। দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়। এভাবে আমরা একটি প্রতিবাদী মানুষকে অকালেই ঝরে যেতে দেখি। অনিল ঘড়াই-এর অপর একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ'। গল্পে এক অদ্ভুত পেশার লোক দেখা যায়। চাম-পুঁটুলি হাতে নরহরিকে দেখা যায়। বিষ নামানো অভিচার ক্রিয়াটি তার রপ্ত। এটা তার বাপ ঠাকুরদার ব্যবসা। এই নরহরির ছোট ছেলে নারাণ বড় ঠোঁটকাটা। রাজনীতি সচেতন এবং প্রতিবাদী। তাকে বলতে শোনা যায়—

> বাঁধে নতুন মাটি পড়ার কথা ছিল। সন ঘুরে ফির এট্টা সন এল। মাটি আর পড়লনি। পলাশী-কালীগঞ্জের রাস্তাটা সেই কবে থেকে হোঁক লেগে পড়ে আছে অথচ দেখদিনি জ্ঞান ফেরাবার কেউ নেই।[৫]

এই নারাণই শহরে গিয়ে আট ক্লাস অবধি পড়েছে। তারপর কুসঙ্গে পড়ে বিড়ি খাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু তার প্রতিবাদী মন থেমে থাকেনি—

> এখন একটু গরমিল দেখলেই রুখে দাঁড়ায়। অঞ্চল অফিসে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিল নারাণ। খড়িশ সাপের ডেঁকার মত ফুসে উঠেছিল নারাণ, শিল্পী লোনের টাকা কোথায়, প্রধান বাবু জবাব দাও নইলে চেয়ার উল্টে ফেলে দেব। টাকার বদলে রক্ত নেবা।[৬]

নারাণ শহরে গিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু আর পাঁচ সাধারণ নেতার মত নয়। মানুষের বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে পাশে থাকত সে। শহরের বাবুদের এনে গ্রামের মানুষদের হকের কথা বোঝাত। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে এই নারাণকে গ্রামের প্রধান মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। সেই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানকে সাপে কেটেছে। গুণিন নরহরি তাঁকে বাঁচাতে গিয়েও পারে নি। মৃত ছোটো খোকা তার মনকে তছনছ করে দেয়। তার জানা সব মন্ত্র ওলোট-পালোট হয়ে যায়। সে প্রধানবাবুকে মেরে ফেলতে চায়—"নরহরির দু'হাত বাবুর কণ্ঠনালী ছুঁয়েছে। দশ আঙুলের বজ্রগেরোয় বাবুর নীলচে শরীর ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে নারাণ হয়ে যায় মূহূর্তে।"[৭] এইভাবে নকশাল করা ছেলের মৃত্যুর বদলা নিয়েছে সে। 'চালচিত্র' গল্পে গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনের চিত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামবাংলার মানুষের জীবন ভোটের সঙ্গে, ভোটের রাজনীতির সঙ্গে আজও প্রাসঙ্গিক। গ্রামে-গঞ্জে আজও দেখি পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। সেখান ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। গ্রামের পূর্ব পাড়ায় প্রহ্লাদ মাস্টারের খড়ের চাল। তার বৃদ্ধা মা'র সঙ্গে থাকে সেখানে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই প্রহ্লাদকে নানা কাজে ঘুরতে হত। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে প্রহ্লাদ মাস্টারের পা ভাঙ্গাল। সে রাজনীতিতে এসেছে বিশেষ কারণে—

> গ্রামের রাজনীতিতে প্রহ্লাদকে নামতে হয়েছে সাধারণ মানুষের চাপে পড়েই। সবুজ বনানীতে ঘেরা ধুলোমাটির দেশে অবিচার-অত্যাচার, শোষণ আর ষড়যন্ত্রের শিকড়টা সমূলে উৎখাত করার জন্য তার এই সংগ্রাম।[৮]

মতাদর্শের দিক থেকে বিপরীতে রয়েছে তারই সহপাঠী নারাণ। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, কেবল রাজনৈতিক মতানৈক্য। নরেন ধূর্ত, গভীর জলের মাছ। যেন-তেন প্রকারে ভোটে জিততে চায়। দাসপাড়ায় টাকা আর মদ দিয়েছে, ঘোষপাড়ায় সংকীর্তনের জন্য পাঁচশ এক টাকা দিয়েছে। তার বিশ্বাস ভোটে একবার সে জিতবেই, কিন্তু—"টাকা আর গম দিয়ে ভোট কেনা যায় না গাঁয়ের মানুষ তা আর একবার প্রমাণ করল।"[৯] ভোটে প্রহ্লাদ মাস্টারের জয় হল। গ্রামের খেটে খাওয়া অন্ত্যজ মানুষ তার প্রিয় প্রার্থীকেই বেছে নিল। আর খল ও ধূর্ত নরেনের জামানত বাজেয়াপ্ত হলে রাগে-অভিমানে মোটরসাইকেলে লাফিয়ে বসে পেট্রোলের ছোঁয়া ছেড়ে ডাক দেয়—"আয় মকবুল, আজ তোদের মাল খাইয়ে মুতিয়ে দেব।"[১০]

অনিল ঘড়াই-এর 'ভোটবুড়া' গল্পেও রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে সরাসরি। গল্পে অন্ত্যজ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে। গল্পে সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধ ছেলে চৈতন্যবুড়ো অসহায়ভাবে দিনযাপন করে। এ পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। চৈতন্যবুড়োর জোয়ান ছেলে ছিল মরল এবং স্ত্রী হৈমবুড়ি পুকুরঘাটে কুঁড়াজালি তুলতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে মারা যায়। চেয়ে চিন্তে কোনোভাবে তার দিন চলে। জেলেপাড়ায় যে সকল জেলে মাছ ধরতে যায়, তাদের কাছে সে মাছ চায়। কোনো কোনো দিন কেউ মাছ দেয়, আবার কেউবা চুনামাছ দিয়েও পুছে না। এই চৈতন্যবুড়োই হল 'ভোটবুড়ো'। গ্রামের মানুষের কাছে বাতিল এই মানুষটি ভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কথিত আছে—"চৈতন্যবুড়া হলো পার্টির পয়মন্ত ভোটার। সে যে দলের হয়ে প্রথমে গিয়ে ভোট দেবে সেই দলই নাকি জেতে।"[১১] গত দু'টি নির্বাচনে তেমন ঘটনাই ঘটেছে। তাই এবার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজনৈতিক দলের কাছে চৈতন্যবুড়োর ভোট অপরিহার্য হয়ে ওঠে। উভয় দলই তাকে অগ্রিম বুকিং করতে চায়।

চৈতন্যবুড়োকে দশ গাঁয়ের লোকে চেনে-জানে। কিন্তু কেউ তার খবর রাখে না। একদিন সাধন তাকে একটি মরা কেরি পাখি দিয়েছিল। কেরি পাখির মাংস খাওয়ার পর অনেকদিন কোনো মাংস খায়নি সে। রামপদর ছেলের খাল ধারের হোটেলে মুরগির মাংস হয়, তার ঘ্রাণ নাকে এলেও বুড়ো খেতে পায় না। কাঠপোলটার পাশের মিষ্টি দোকানের ছেলে নবকুমার বুড়োর অবস্থা দেখে চারটে রসগোল্লা দেয়। অভাবে চৈতন্যবুড়ো এখানে সেখানে চেয়ে-চিন্তে যা পায় খায়। তিনুজালির 'মাঝলা' মেয়ে ছুটু অনেক সময় বুড়োকে তানু ভাত এনে দেয়। তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে। একবার চৈতন্যবুড়োর জ্বর হল, জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করল সে। ছুটু তার বাবাকে ডেকে আনল। বেগতিক দেখে তিনুজালি গাঁয়ের কয়েকজনকে ডাকল। সঙ্গে এলেন কৃজনবাবু। কৃজনবাবু জানান ভোট পর্যন্ত কোনোমতে একে বাঁচাতে হবে। তার তত্ত্বাবধানে তাকে নিয়ে যাওয়া হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর তির্যক বাক্যবাণে কৃজনবাবু হাতজোড় করে ফিরে এলেন। ক'দিন পরে চৈতন্যবুড়ো পুরোপুরি ফিট হয়ে গেল। একদিন ছুটু এসে চলে যাওয়ার পর ফাঁকা মাঠে বসেছিল সে। কয়েকটি মুখচেনা ছেলে সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে জগাই সাহা নামক ছেলেটি বলে ওঠে—"দাদু তোমার কাছেই আসছিলাম। ভোটের তো আর বেশি দেরি নেই, তাই আগাম তোমাকে রিজার্ভ করে রাখলাম। এবার কিন্তু আমাদের হয়ে পয়লা ভোটটা দিতেই হবে।"[১২]

ছেলের দল পাঁচটা একশ টাকার নোট ধরিয়ে চলে গেল। ভোটের সাতদিন আগে দল-বল নিয়ে কৃজনবাবু এলেন। কৃজনবাবুর কথায় চৈতন্যবুড়ো সায় দিলেন। বিনিময়ে পাঁচশ টাকা দাবী করলেন। আসলে আজ চৈতন্যবুড়োর টাকার খুব দরকার। নগদ এক হাজার টাকা। আপদে-বিপদে

তাকে যে দেখাশোনা করে সেই তিনুজালির মেয়ে ছুটুর বিয়ের জন্য এক হাজার টাকা দরকার। এই টাকার জন্যই তার বিয়ে আটকে আছে। গোপনে দু' দলের কাছেই তাই সে পাঁচশ-করে অগ্রিম নিয়ে নেয়। মহা ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয় ছুটুর। ছুটুর বিয়ের রাতেই উভয় রাজনৈতিক দলকে ঠকিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় বুড়ো। চৈতন্যবুড়োর এমন আচরণকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে অন্ত্যজ মানুষ রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন নয়। তাই ভোট বেচে দেয়। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে চৈতন্যবুড়ো টাকার বিনিময়ে ভোট বিক্রি করে একজনকে নতুন জীবনে প্রবেশ করিয়েছে। বোকার ভান করে রাজনৈতিক নেতাদেরই বোকা বানিয়েছে। রাজনীতির পরিবর্তে মানবতা জয়লাভ করেছে।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অনিল ঘড়াই তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে অন্ত্যজ মানুষের রাজনৈতিক জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তাতে অন্ত্যজ মানুষ সময় সচেতন ও রাজনীতি সচেতন। দরকারে কখনো সে প্রতিবাদ করেছে, প্রতিবাদ করে মৃত্যুবরণ করেছে, আবার কোথাও রাজনীতিকে ব্যবহার করে মানবতার জয়গান গেয়েছে। অন্ত্যজ মানুষ যে শুধু দারিদ্র্য জীবন-যাপন করে বা শ্রমসাধ্য জীবন-যাপন করে তা নয়, রাজনীতি সম্পর্কে তারা বেশ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. অনিল ঘড়াই : 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৪, পৃ. ১৬
২. তদেব : পৃ. ১৬
৩. তদেব : পৃ. ২০
৪. তদেব : পৃ. ২৭৫
৫. তদেব : পৃ. ৩০২
৬. তদেব : পৃ. ৩০৫
৭. তদেব : পৃ. ৩০৯
৮. অনিল ঘড়াই : 'নুন সামাডের গল্প', পাল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৯, পৃ. ১২৪
৯. তদেব : পৃ. ১৩০
১০. তদেব : পৃ. ১৩২
১১. উৎস-১, পৃ. ৩১৩
১২. তদেব : পৃ. ৩২১

তথ্যের সন্ধানে

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান', পূর্বালোক, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩
২. তপোধীর ভট্টাচার্য : 'ছোটগল্পের সুলুক সন্ধান (উত্তরার্ধ)', দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭
৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
৪. ভবেশ বসু, সুনীল মাঝি সম্পাদিত : 'এক জীবন অনন্ত জীবন', তূর্য, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
৫. সুজিত সেন সম্পাদিত : 'দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ', গ্রন্থমিত্র, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩
৬. সুনীল মাঝি, ভবেশ বসু সম্পাদিত : 'অনিল ঘড়াই পরিক্রমা', তূর্য, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
৭. সুবোধ দেব সেন : 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ', পুস্তক বিপণী, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০
৮. সুস্নাত জানা, সুনীল মাঝি সম্পাদিত : 'প্রসঙ্গ অনিল ঘড়াই', দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুন ২০০৪

বাংলা অণুগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও বহুমাত্রিকতা

সুমন সরকার

বাংলা সাহিত্যে অণুগল্পের পথ চলা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে। যদিও অণুগল্প সংরূপটি অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, জাতকের কাহিনি ইত্যাদি ছিল তার আদি রূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'বঙ্গামিহির', 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'দিগদর্শন' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে অনেক অণুসাহিত্য প্রকাশিত হতো। তবে অণুগল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম লিখিত হল 'লিপিকা' গ্রন্থে। 'লিপিকা'র 'গলি', 'পট', 'সওগাত', 'রথযাত্রা' ইত্যাদি অণুগল্পের নমুনা। সার্থক অণুগল্প বনফুলের কলমেই উঠে এসেছে। এরপর অমিয় চট্টোপাধ্যায়, প্রগতি মাইতি, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখ লেখক অণুগল্প লিখেছেন। বিভিন্ন পত্রিকা যেমন—'পত্রাণু', 'কফিহাউস', 'গল্পাণু' ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অনেক অণুগল্প লেখা হয়েছে। অণুগল্পের অনুবাদও নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

● **অণুগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :** কম শব্দের ব্যবহার করে সীমিত পরিসরে কোনো ঘটনা বা চরিত্রের আখ্যান নির্মিত হলে অণুগল্প তৈরি হয়। 'অতিশয় স্বল্প পরিসরে রচিত যথার্থ ছোটগল্পকে অণুগল্প বলা হয়।'[১] একে অতিশয় ক্ষুদ্র, অথচ খাঁটি গল্প হতে হয়। এক্ষেত্রে শব্দের সংখ্যা একহাজারের মাত্রা অতিক্রম করা যায় না। এ প্রসঙ্গে রঞ্জন ঘোষালের প্রস্তাবটা উল্লেখযোগ্য—

> অণুগল্প মানে চুটকিলা নয়। কিন্তু রস-কাহিনি হতেই পারে। অণুগল্পে থাকবে বাক্‌সংযম, ক্ষিপ্র গতি, মেধাসন্নিধান অথবা অনুভব নিবিড়তা বা দুটোই। অণু-গল্প হল গল্পের জগতের আইপিএল। এতে প্রতিটি বাক্যে থাকবে ছয়, চার কিংবা উইকেটের পতনের উত্তেজনা। গল্প পরিণতির দিকে যত গড়াবে তত বাড়বে স্নায়ুযুদ্ধ এবং ঐ সময়স্বল্পতার মধ্যেই ঘটাতে হবে বিশ্বরূপ দর্শন।[২]

অর্থাৎ অণুগল্প হল অমিত শক্তিধর স্ফুলিঙ্গ, যার প্রতিটি শব্দের মধ্যে আছে অর্থের প্রচণ্ড শক্তি। শব্দের সময় কাল মিনিট পাঁচেক হলেও এর অর্থের ব্যঞ্জনা পরমাণুর মতো। এই নির্মেদ গঠনশৈলীর কারণে অণুগল্প স্বল্পায়তনের হয়।

● **অণুগল্পের বৈশিষ্ট্য**

ক. 'অল্প কথায়, অল্প পরিসরে অসামান্য উন্মোচন'[৩]—অণুগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

খ. অণুগল্পে প্লট থাকাটা বাধ্যতামূলক নয়।

গ. অণুগল্পে সংলাপ থাকলে উৎকৃষ্ট অণুগল্প তৈরি হয়।

ঘ. চরিত্রের সংখ্যা খুব কম হবে।

ঙ. রহস্যময় ও ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দের অবতারণা করা হয়।

চ. অতিমাত্রায় বাক্য সংযম ও কাহিনির সংকোচন হবে।

ছ. শব্দ সংখ্যার নির্দিষ্ট সীমা নির্ণয় না করা হলেও অতি অবশ্যই একহাজার শব্দের বেশি করা যাবে না।

জ. অযথা প্রকৃতির বা মানুষের চরিত্রের বর্ণনা করা যায় না।

ছ. পরিণতিতে চমক থাকবে।

অর্থাৎ অণুগল্পের ক্ষেত্রে স্বল্প শব্দের ব্যবহার আর বাক্যের সংযম থাকবে। এই সীমিত শব্দের প্রয়োগে অণুগল্পে অর্থের আণবিক বিস্ফোরণ ঘটবে। তাই অণুগল্প সর্বদা নির্মেদ বাক্য ব্যবহারের পক্ষপাতি। এই প্রকরণে খুব কম বাক্য ব্যবহারের পরেও পরিণতিতে চমক থাকে। একজন অণুগল্পকার অবশ্যই এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে খেয়াল রেখে অণুগল্পের জন্ম দেয়।

● **অণুগল্পের সূচনাপর্বের কথা :** বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অণুগল্পের যাত্রা বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। যদিও প্রথম দিকে অণুগল্পের নাম অণুগল্প ছিলনা। 'গল্পাণু', 'গল্পস্বল্প', 'কথিকা', 'মুহূর্ত গল্প' ইত্যাদি নামে অণুগল্পকে ডাকা হতো। যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র চূর্ণক, কথিকা, ফেবল, প্যারাবল জাতীয় রচনাগুলি অণুগল্প রচনার প্রাথমিক পর্বে দেখা যায় অনেক আগে থেকে। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি যার নমুনা। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু পত্রিকা অণুসাহিত্য প্রকাশ করত। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫২), 'উপদেশক পত্রিকা' (১৮৫২), 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'দিগদর্শন', 'রহস্য সন্দর্ভ' ইত্যাদি পত্রিকাতে এই ধরনের অনেক অণুসাহিত্য ছাপা হত। ১৯৭০ সালে অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের 'পত্রাণু' পত্রিকায় 'অণুগল্প' নামটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তাঁর পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অণুগল্প লেখার জোয়ার আসে। যদিও বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক অণুগল্পের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'লিপিকা' গ্রন্থের বেশ কিছু গল্প অণুগল্প। যেমন-'কৃতঘ্ন শোক'(ভারতী, কার্তিক,১৩২৬), 'প্রথম শোক', 'একটি দিন', 'একটি চাউনি', 'পট', 'রথযাত্রা', 'সওগাত', 'গলি', 'বাঁশি, 'প্রশ্ন' ইত্যাদি। একে বাংলা অণুগল্পের সূচনা পর্ব বলা যায়।

● **প্রধান অণুগল্পকারদের পরিচয় :** অণুগল্পের পথিকৃৎ বলা যায় বনফুলকে। বনফুলের হাত ধরে অণুগল্প মান্যতা পেতে শুরু করে বাংলা সাহিত্যে। তাঁর 'বনফুলের গল্প সমগ্র' বই দুটিতে প্রায় চারশো গল্পের মধ্যে সত্তর থেকে আশিটি গল্প অণুগল্প। 'নিমগাছ', 'বাড়তি মাশুল', 'চোখ গেল', 'অমলা', 'খেদি', 'বিধাতা', 'হিসাব', 'প্রতিবাদ', 'রামগল্প', 'মিনির চিঠি' ইত্যাদি। অণুগল্পের যাত্রায় অমিয় চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রগতি মাইতি, বিভা বসু, সুজয় চক্রবর্তী, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন ঘোষাল, দীপঙ্কর বেরা, সরিৎ চট্টোপাধ্যায়, সত্যবান বিশ্বাস, ব্রতী মুখোপাধ্যায়, রতন শিকদার, সুবর্ণা রায়, বিলাল হোসেন, কামরুজ্জামান কাজল, খালিদা খানুম, স্বপ্নময় চক্রবর্তীরা এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রগতি মাইতি 'ইস্ক্রা' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি 'ঐহিক' পত্রিকা, 'পারক'-ই পত্রিকা, 'অণুরণন পত্রিকা', 'গল্পবৈঠক', 'অলিন্দ', 'সাহিত্য cafe', '৪নং প্লাটফর্ম' ইত্যাদি পত্রিকাতে

নিয়মিত লেখালিখি করেন। তাঁর রচিত অণুগল্পের বিখ্যাত দুটি বই 'নির্বাচিত অণুগল্প সংগ্রহ' ও 'অল্প কথায় গল্প'। তাঁর অণুগল্পের বৈশিষ্ট্য উচ্চবিত্ত মানুষের সফলতা ও নৈরাশ্যের ছবি দেখানো। 'পারক' পত্রিকায় 'ঘুড়ি ও বিন্দু' (পৌষ সংখ্যা, ১৪২০) গল্পে সেই ছবিই উঠে এসেছে। ব্রতী মুখোপাধ্যায় '৪নং প্লাটফর্ম', 'মহুল' পত্রিকা, 'দক্ষিণের জানলা', 'অংশমালী পত্রিকা' ইত্যাদি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর রচিত 'অন্ধকারের উপকথা', 'একদিন বাঘ' ও 'ভদ্রাসন' বিখ্যাত অণুগল্প গ্রন্থ। তাঁর অণুগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানুষ যাদের তুচ্ছ বলে ফিরিয়ে দেয় তাদের কথা উঠে আসে। 'বিড়ালিনী', 'নিঝুম' অণুগল্পগুলি এর প্রতিনিধিস্থানীয়। সিদ্ধার্থ সিংহ 'বেঙ্গল ওয়াচ' পত্রিকার সম্পাদক। মাসিক ব্লগজিন 'নবপ্রভাত', 'মোলাকাত' পত্রিকা, 'সানন্দা', 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় নিয়মিত কলম চালান। বইমেলা, ২০১৩-তে একুশ শতক থেকে প্রকাশিত 'দশ ডজন অণুগল্প'-এর বইটি তাঁর খুবই বিখ্যাত। অণুগল্প লেখার পাশাপাশি অণুগল্পের অনুবাদও তিনি করেছেন। 'বেঙ্গল ওয়াচ' পত্রিকায় সাহাদাত হোসেন মান্টোর ছয়টি অণুগল্প অনুবাদ করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'শত লেখকের শত অণুগল্প' বইটি সম্পাদনা করেন। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য জীবন যুদ্ধে হার না মানা মানুষের গল্প বলা। দীপঙ্কর বেরা 'গল্প কুটির', 'কেয়াপাতা', 'মহুল', 'ঋতবাক', 'নবপ্রভাত', 'ঈশান কোণ', পত্রিকায় লেখালিখি করেন। ব্যঙ্গের আড়ালে সামাজিক ব্যভিচারের ছবি দেখান। 'ডাস্টবিন', 'ময়লা', 'ভবিষ্যতের যোগ্যতা' অণুগল্পগুলি প্রতিনিধি স্থানীয়। রঞ্জন ঘোষালের 'কড়াপাক ও নরমপাক' অণুগল্পের বইটিতে অণুগল্পের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। তাঁর লেখায় কল্পবিজ্ঞান, জাদুবাস্তবতা দেখা যায়। 'দেশ', 'সানন্দা', 'আদরের নৌকা', 'ম্যাজিক ল্যাম্প' পত্রিকায় লিখতেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'অণুগল্প সংগ্রহ' অণুগল্পের বই ২০১৪ সালে অভিযান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি আন্তর্জাতিক অণুগল্প প্রতিযোগিতার অণুগল্প 'ক্রোধ' সংকলনে অতিথি লেখক ছিলেন। বইটি 24by7 publishing থেকে প্রকাশিত হয়।

● **অপ্রধান অণুগল্পকারদের পরিচয় :** সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, বিমল কর, চণ্ডী লাহিড়ী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সাধন চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ দস্তিদার, হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন চক্রবর্তী, শাঁওলী দে, কিন্নর রায় প্রমুখ লেখকের কলমে অণুগল্প দেখা যায়। তবে পৃথকভাবে বই আকারে অণুগল্প কারো প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন পত্রিকার দাবিতে মাঝে মাঝে লিখেছেন। সুনীলের 'সিঁড়িতে', সমরেশ মজুমদারের 'ভূমিকা বদল', বিমল করের 'যশোদা', বুদ্ধদেব গুহ'র 'একটি সোয়েটার নিয়ে', শীর্ষেন্দুর 'সুখ ও দুঃখের দিক' অণুগল্পগুলি 'আদরের নৌকা' পত্রিকায় ছাপা হয়। কিন্নর রায় 'দশতলার প্রজাপতি', অভিজিৎ রায় 'নিখোঁজের সন্ধানে', তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'কথা রাখার কথা ছিল', লতিফ হোসেনের 'শক থেরাপি' 'পারক' পত্রিকার ২০২০ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশ হয়। এদের লেখাগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রেম ও রাজনীতিকে আশ্রয় করে লেখা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর মনোজ বসু ছাড়া বাকিরা অণুগল্প লেখায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি।

● **অণুগল্পের পত্রিকায় অণুগল্পের চর্চা :** বাংলা অণুগল্পের ব্যাপক চর্চা শুরু হয় 'পত্রাণু' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। অণুগল্প চর্চার ক্ষেত্রে পত্রিকার ভূমিকা সর্বাগ্রে। কারণ নবীন লেখকদের সুযোগ হয় অণুগল্প প্রকাশের। অণুগল্পের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে 'পত্রাণু', 'কফিহাউস পত্রিকা', 'অল্প কথায় গল্প পত্রিকা', 'লহমা', 'মুহূর্ত গল্প', 'স্বল্প কথায় গল্প', 'অনুরণন', 'ক্রন্দসী', 'সোনারতরী', 'পারক', 'অণুপত্রী', 'পহিল', 'অনুভূতি', 'রঙমশাল', 'মউল', 'বার্ণিক', 'শতানিক', 'ঋতুযান',

'পরম্পরা', 'অভিযান' ইত্যাদি পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে অণুগল্পের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এই পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত অণুগল্প লেখা এবং অণুগল্পের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'মহুল' পত্রিকা ১৪২০, বর্ষা বিশেষ অণুগল্প সংখ্যা, 'অণুপ্রাণন' ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৪২৬, বিশেষ অণুগল্প সংখ্যা, 'আদরের নৌকা', উৎসব সংখ্যা, ২০১৪, 'গল্পের সময়' বিশেষ অণুগল্প সংখ্যা, 'অণুগল্প পত্রিকা'(ত্রৈমাসিক সংখ্যা), 'কালিকলম ও ইজেল' অণুগল্প বিশেষ সংখ্যা, 'দেখা' পত্রিকা অণুগল্প বিশেষ সংখ্যা, ৭ আগস্ট, ২০১২ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

● **বাংলা অণুগল্পের চর্চায় ব্লগজিন ও ওয়েবম্যাগাজিনের ভূমিকা :** অণুগল্প নিয়মিত প্রকাশ করে এই ব্লগজিন ও ওয়েবম্যাগাজিনগুলি হল—'গল্পের সময়', 'অচেনা যাত্রী', 'কাশফুল', 'আদরের নৌকা', '৪নং প্লাটফর্ম', 'তেল-চর্বিমুক্ত মিহিন্দা', 'কিশলয়', 'আবহমান', 'কেয়াপাতা', 'প্রতিবিম্ব', 'উন্মেষ পত্রিকা', 'পারিজাত সাহিত্য পত্রিকা', 'কল্পবিশ্ব পত্রিকা', 'জয়ঢাক', 'সচলায়তন' পত্রিকা ইত্যাদি। ওয়েবম্যাগাজিনগুলির গুরুত্ব অপরিসীম কেননা এখানে যে কেও অণুগল্প প্রকাশ করতে পারে। যেখানে মুদ্রিত পত্রিকাতে এই সুযোগ থাকে না। আবার মুক্ত পরিসরের কারণে প্রচুর সমালোচনা হয়। যে কারণে নবীন ও প্রবীণ লেখক তাদের লেখাকে অনেক বেশি পরিমার্জনার সুযোগ পায়।

● **বাংলাদেশে অণুগল্পের চর্চা :** বাংলাদেশে 'অণুগল্প পত্রিকা', 'অনুভব পত্রিকা', 'বেঙ্গল ওয়াচ', 'রঙমশাল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে অণুগল্পের চর্চা। বিলাল হোসেন, খালিদা খানুম, হাফিজুর রহমান, মোহম্মদ হোসাইন, চন্দন আনোয়ার, ফরিদুর রহমান, মাহফুজ রিপন ইত্যাদি সাহিত্যিক অণুগল্প নিয়মিত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের লেখক বিলাল হোসেন তাঁর ত্রৈমাসিক 'অণুগল্প' পত্রিকায় অণুগল্পের প্রকাশ ও অণুগল্প নিয়ে নানান প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। বিলাল হোসেনের অণুগল্পের বইগুলি হল—'পঞ্চাশ' বইটি কালজয়ী, ২০১৫-তে প্রকাশিত হয়। 'মহাপ্রভু ও অন্যান্য অণুগল্প', অনুপ্রাণন থেকে ২০১৫-তে, 'বিলাল হোসেন এর ১০০ অণুগল্প' বইটি ২০১৮তে অনুপ্রাণন থেকে প্রকাশিত হয়। 'মুক্তিযুদ্ধের অণুগল্প' নামে হাফিজুর রহমান অণুগল্পের বই প্রকাশ করেন।

● **বহির্বঙ্গে বাংলা অণুগল্পের চর্চা :** ত্রিপুরাতে 'নান্দীমুখ'(সম্পাদক-স্বপন সেনগুপ্ত), 'আয়োজন' (সম্পাদক- বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী), 'শব্দস্নান' (সম্পা—সন্তোষ রায়), অমিতাক্ষর(অমিত দে), 'একুশ শতক', 'চিত্রপট', 'নান্দনিক', 'মানবী', 'অনার্য' ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অণুগল্পের চর্চা শুরু হয়েছে। 'নতুন জোনাকি' ব্লগজিনে ২০১৩ থেকে প্রতিভু দত্তের সম্পাদনায় অণুগল্প প্রকাশ হচ্ছে। আসামে 'বাংলা ভাষা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অণুগল্পের চর্চা শুরু হয়েছে।

● **বাংলা অণুগল্পের অনুবাদ :** 'বেঙ্গল ওয়াচ' পত্রিকায় সাহাদাত হোসেন মান্টোর ছয়টি অণুগল্প অনুবাদ করেন সিদ্ধার্থ সিংহ। চন্দন ঘোষ 'অণু-সন্ধান' বইটিতে লিডিয়া ডেভিসের অণুগল্পের অনুবাদ করেছেন। 'কালি কলম ও ইজেল' পত্রিকায় ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার অণুগল্প 'বন্দর শহর' এছাড়াও হোয়াইটমোর, কাফকা, টম ফোর্ড-এর অণুগল্পের অনুবাদ হয়। অনুবাদক ফজল হাসান লিডিয়া ডেভিসের 'দ্য মাদার' অণুগল্পের অনুবাদ 'মা', 'ফিয়ার' অণুগল্পের অনুবাদ 'ভয়'। ওসামা আলমোরের বেশ কিছু অণুগল্প 'সংবাদ বাংলাদেশের মুখপত্র' কাগজে প্রকাশিত হয়। 'ফুলব্লাড অ্যারাবিয়ান' বইটি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। অণুগল্পগুলি—'লাথি', 'হাড় বাছাই', 'সংকোচন', 'তিক্ত ঠান্ডা', 'আলোর রশ্মি', 'অভিব্যক্তির স্বাধীনতা', 'পিরামিদের চূড়া', 'লড়াই ছেড়ে দিও না',

'জলাভূমি', 'হাসি মুখের লোকজন', 'বিক্রীত জাতি', 'অপমান', 'পিঁপড়া', 'যে জন সুখী' ইত্যাদি। 'পাতা' প্রকাশনী থেকে মুম রহমানের 'অণুগল্প কাফকা অনুবাদ' নামে বই বের হয়। অনুবাদের ফলে আরবি, উর্দু, ইংরেজি ভাষা না জানা থাকলেও পাঠক অনায়াসে পড়তে সক্ষম হয়। গবেষকও বাংলা ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার অণুগল্পের ধারাকে বুঝতে সক্ষম হয়।

● বাংলা অণুগল্পের গঠন শৈলী : 'শৈলী বিজ্ঞান' (Stylistics) ভাষার বিভিন্ন উপকরণ-ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি—তাদের বিন্যাস ও ক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে চালিত করার জন্যে ব্যাকরণ কতগুলি নীতিনির্দেশ প্রস্তুত করে। শৈলী বিজ্ঞানে লেখকের নিজস্ব মনন, চিন্তনের নিজস্ব রীতি দেখানো হয়। লেখকের নিজস্বতাকে তুলে ধরে। চন্দন ঘোষ 'অণু-সন্ধান' বইটিতে অণুগল্পের আখ্যান না থাকলেও চলে এই মন্তব্য করেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে মাত্র ছটি শব্দে—'For saleõ baby shoes, never worn' আস্ত একটি অণুগল্প লেখেন। এডমান্ড ভালাদেশ বারোটি শব্দে 'দি সার্চ' নামে অণুগল্প লেখেন। চিনা সাহিত্যে একে 'স্মোক লং' বলা হয়। দীপঙ্কর বেরা, রঞ্জন ঘোষালের অণুগল্পে আখ্যান থাকবে। ব্রতী মুখোপাধ্যায়ের অণুগল্পে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বিলাল হোসেনের অণুগল্পে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাংলা অণুগল্পের চর্চা গল্পচর্চার গোড়া থেকে তার অঙ্কুর ছিল। পরবর্তীতে ক্রমবিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে অণুগল্পও নির্দিষ্ট নামে ও আকারের মান্যতা পায়। প্রথম দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প, গল্পস্বল্প, কথিকা ইত্যাদি নামে পরিচিত হলেও পরবর্তীকালে 'অণুগল্প' নামটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়। এই প্রকরণকে কেন্দ্র করে পত্রাণু, কফিহাউস পত্রিকাগুলি একরকম অণুগল্প চর্চার জোয়ার সৃষ্টি করেন। বাংলা ভাষায় এই অণুগল্প ওপার বাংলাতেও আলোড়ন তৈরি করেছিল। তার ধারা আজও বহমান। অধুনা বিলাল হোসেন, মাহফুজ রিপনেরা এই ধারার বাহক পরম্পরা। আধুনিক যুগ প্রযুক্তি নির্ভর তাই গ্রন্থ পাঠে পিডিএফ-এর সুবিধা এসেছে। তাছাড়া অধিকাংশ মানুষ মোবাইল নির্ভর যেখানে অণুগল্পের মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের লেখা অনায়াসে পড়ে ফেলা যায়। তাই এই সংরূপটি চর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাল নির্ভর ব্লগ বা গ্রুপের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এইভাবে বাংলা অণুগল্প ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে নির্দিষ্ট আসনটি অলংকৃত করছে।

উৎসের সন্ধানে

১. শুদ্ধসত্ত্ব বসু : 'বাংলা সাহিত্যের নানারূপ', বিশ্বাস বুক স্টল, কলিকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৬, পৃ. ১৪১

২. রঞ্জন ঘোষাল : 'কড়াপাক ও নরমপাক', প্রস্তাব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৬, বৈশাখ ১৪২৩, পৃ. ৮

৩. চন্দন ঘোষ : 'অণু-সন্ধান', অণুগল্প : গদ্যসাহিত্যের অঙ্গানে এক দুরন্ত চিত্রল মৃগশাবক, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮২